CUL-H06935-96-P8266
756.3
017/3

# ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রম-বর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

আই সি এ ৪১৬/৮৯

# জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করুন

বহু জাতি, সম্প্রদায় ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত আমাদের দেশ। আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবার জন্য নানা বিভেদকামী শক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত করার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সুতরাং জাতিগত ভাষা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধ, আঞ্চলিক সমস্যা এবং বৈষম্য তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোগের মীমাংসা শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথেই করতে হবে। এই সকল সমস্যা যাতে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন না করে সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি এ ৪১৬/৮৯

# আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এর প্রবণতা রুখতে পারে সুসম আঞ্চলিক বিকাশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে, ঘামে এ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবলমাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর·····এই হোক্ এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সংগ্রামী শপথ।

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

আই সি এ-৪১৬/৮৯

# পরিচয়

৫৮ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৯ পৌষ ১৩৯৫

প্রবন্ধ



কাব্যনাট্য



গল্প



নাটক



দীর্ঘ কবিতা



পুস্তক পরিচয়



প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

7563
017/8

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

P8266

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

কবিতাগুচ্ছ

# গণেশ পাইনের ছবি : নন্দনের ভিত্তি

মৃণাল ঘোষ

"বুদ্ধিরও একটা হৃদয় আছে, হৃদয় যার খোঁজ রাখে না।"

—গণেশ পাইন

( এক )

## শিশু ও স্বপ্নের ঘোড়া

'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' নামে ছবিটি শিল্পী গণেশ পাইনের ১৯৮৮-র কাজ। এই লেখাটি শুরু করার সময় পর্যন্ত কলকাতায় আমাদের দেখা এটিই তাঁর শেষতম ছবি। 'আর্ট ফর ক্রাই' নামে যে প্রদর্শনীটি হল কলকাতায় ১৯৮৮-র সেপ্টেম্বর মাসে, যার উদ্যোক্তা 'চাইল্ড রিলিফ অ্যাণ্ড ইউ' বা সংক্ষেপে 'ক্রাই' নামে বম্বেভিত্তিক একটি সমাজসেবী সংস্থা, সেই প্রদর্শনীর জন্য শিল্পী এঁকেছিলেন এই ছবিটি। তাঁর নিজস্ব মাধ্যম টেম্পেরাতেই আঁকা ছবিটি। আয়তনে তাঁর বড় ছবিগুলি সাধারণও যেমন হয়, অনেকটা সেরকমই। তবু ছবিটির মধ্যে এমন কিছু আছে যা তাঁর দীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছরের ছবির ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটু স্বতন্ত্রভাবে আমাদের আকর্ষণ করে।

ছবিটির নামকরণের মধ্যে বিষয়ের সামান্য ইশারা আছে। অন্তর্লীন ভাবের কোনো ইঙ্গিত নেই অবশ্য। গণেশ পাইন তাঁর প্রদর্শিত অধিকাংশ ছবিরই নামকরণ করে থাকেন। ড্রয়িং হলে অনেক সময় হয়ত নাম থাকে না। কিন্তু টেম্পেরা বা অন্য মাধ্যমের পূর্ণাঙ্গ চিত্রে সাধারণত নাম থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই নামের মধ্যে ছবির উপরিস্তরের বিষয়ের অপ্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে। কখনো কখনো কোনো ছবির নামের মধ্যে অন্তর্লীন ভাবের সামান্য ইঙ্গিত যে থাকে না, তা নয়। তবে সংখ্যায় তা কম, 'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' নামে ছবিটি প্রথম ধারারই অনুসারী।

পেছনে একটি চিত্রিত ঘোড়া আর তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি শিশু, ছবিটির বিষয় বলতে এটুকুই। এত সহজ, সাবলীল, জটিলতাহীন অথচ ভাবসমৃদ্ধ ছবি এর আগে তাঁর কাছ থেকে কমই পেয়েছি। ছবিটির প্রেক্ষাপট আনুভূমিকভাবে দুটি রং-এর ক্ষেত্রে বিন্যস্ত। উপরের প্রায় দুই তৃতীয়াংশে শাদা ও ধূসরের নানা মাত্রার মধ্যে হাল্কা বাদামী আভার আলো

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। সে আলোয় বৈভব তেমন কিছু নেই। ডান দিকের অংশে উজ্জ্বলতা যেটুকু বা থাকে বাঁ দিকে তা ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে আসে। ধূসর ও নীলের ছায়ায় হাল্কা গোলাপীর আভা নিষ্প্রভ হতে থাকে ক্রমশ। পশ্চাতপটের এই অংশ আকাশ হতে পারে, অথবা হতে পারে শূন্য কোনো দেওয়াল। অথবা তেমন কোনো প্রাকৃতিকতার ইঙ্গিত নাও থাকতে পারে। ঘনীভূত এক শূন্যতার বিস্তার শুধু থাকে সেখানে। শূন্যতার সেই আলোতে গোধুলির মায়া নেই, সেরকম মায়া, যা দৃশ্যকে আপাত অপরিচয়ের অন্তহীন বিভা দেয়। সেই আলোহীনতায় ঘনায়মান সন্ধ্যার সর্বগ্রাসী ছায়াও নেই, যা প্রকৃতির ও জীবনের পরিচয়ের সমস্ত আভাসকে বিলুপ্ত করে দেয়। এই দুই-এর মধ্যবর্তী কোনো এক মাত্রার আলো সেই শূন্যতাকে ম্লানতায় বিষাদময় করে রাখে। সেই রিক্ততায় ত্যাগের মহনীয়তা নেই, আবার বিনষ্টির নিঃসীম আর্তির প্রতিধ্বনিও নেই। শূন্যতার এই নিরাভরণ বিস্তার ছবির মূল চরিত্র শিশুটির অস্তিত্বের এক অনিবার্য পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ক্রমশই মাত্রাময় হতে থাকে। এই শূন্যতাকে অতিক্রম না করে আমরা শিশুটির কাছে পৌছতে পারি না। আবার শিশুটি না থাকলে এই ব্যাপ্ত শূন্যতাও নিছকই শূন্য হয়ে যায়। শিশুটি সেই শূন্যতাতে যেন প্রাণসঞ্চার করে। এক বিচিত্র প্রাণ, যা জীবনে উদ্ভাসিতও নয়, আবার মৃত্যুতে নাস্তিময়ও নয়। যা আলোতে সপ্রকাশও নয়, অন্ধকারে নির্বাপিতও নয়। শূন্যতা যেমন শিশুর একটি মাত্রা, শিশুটিও তেমনি শূন্যতার এক মাত্রা। শূন্যতা যেমন শিশুটিকে উন্মীলিত করে, শিশুটিও তেমনি শূন্যতাকে উদ্‌ঘাটিত করে। শূন্যতার স্বরূপ নির্দেশ করে। শূন্যতা ও শিশু, দুই পরস্পর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যে অন্বিত হতে থাকে।

পশ্চাৎপটে নিচের এক তৃতীয়াংশে গভীর বাদামী রং-এ বিষাদময় অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। তুলির নিপুন কারুকাজে সেখানে যে সূক্ষ্ম টেক্সচার গড়ে ওঠে, তা স্তিমিত আলো ও গম্ভীর অন্ধকারে কিছুটা মায়ার সঞ্চার ঘটাতে চায়। কিন্তু গাম্ভীর্যকে প্রগলভ হতে দেয় না কখনোই। উপরের শূন্যতা যদি আকাশ হত, তাহলে সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিচের রং-এর ক্ষেত্রটিকে জমি মনে করা যেত, এই দুটি ক্ষেত্র মিলিত হয়েছে যে রেখায়, তাকে দিগন্ত মনে করা যেত, কিন্তু ডান দিকের প্রান্ত ঘেঁষে উপরের শূন্যতার ধূসরতা নিচের দিকে সঞ্চারিত হয়ে যায় বলে আকাশ ও জমির সেই দ্বৈততা ভেঙে যায়। নিচের অংশটি হয়ে ওঠে শুধুই অলংকৃত আলো আঁধারীর বিমূর্ত এক ক্ষেত্র। অথবা এমন একটি সমতল বা অলম্ব তল যার উপর ঘোড়াটি আঁকা থাকে।

গণেশ পাইনের ছবির প্রেক্ষাপটে প্রায়শই প্রাকৃতিকতার আভাস থাকে না। মুখ্যত তা হয়ে ওঠে অন্ধকারের মায়াময় ও মহনীয় এক বিন্যাস ভূমি। সেই অন্ধকার থেকে আলোর জেগে ওঠা বা আলোর মধ্যে অন্ধকারের সঞ্চার, আলো ও অন্ধকারের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাঁর ছবিতে অনন্য বৈভব আনে। এই ছবিটির পশ্চাৎপট সেই তুলনায় অনেক সরল। অনেক নিরাভরণ। তেমনি সরল ছবিটির রচনাবিন্যাস। শিশুটি যে টুপি পরে আছে সেই টুপির শীর্ষবিন্দু প্রেক্ষাপটের উপরের প্রান্তরেখাকে প্রায় মাঝ বরাবর স্পর্শ করেছে। ঠিক মধ্যবিন্দুতে নয় অবশ্য, একটু ডান দিকে ঘেঁষে। সেই শীর্ষবিন্দু থেকে সমগ্র রচনাটি নেমে গেছে একটি ত্রিভুজের মতো। টুপির শীর্ষবিন্দু থেকে ঘোড়ার পায়ের দুদিকের বিস্তার ত্রিভুজের দুটি বাহু। শিশুটি দাঁড়িয়ে আছে আলম্ব এক সরল রেখায়, অনেকটা যেন স্তম্ভের মতো। হাটুর উপর থেকে তাঁর সম্পূর্ণ অবয়ব দেখা যাচ্ছে। সপ্রতিভ দু চোখ মেলে সে সামনের দিকে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁর সামনে দুহাতে ধরা ঘোড়সওয়ারের লাঠি। তাঁর মাথায় বিচিত্র এক টুপি। তাঁর পরণের গভীর বাদামী রং-এর জামাটি যেন এক ইমারতের আভাস আনে। সেই জামার গায়ে গভীর রং-এ চতুর্ভুজ আকৃতির কোটরের আভাস লেগে থাকে। পোশাকের মধ্যে ইমারতের আভাস এই শিল্পীর কোনো কোনো ছবিতে আগেও দেখেছি। দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যায় 'নাইট অব দ্য মার্চেন্ট' (১৯৮৫) ছবিটি। জামার তলায় ছেলেটির একটু উজ্জ্বল রং-এর গেঞ্জিও দৃশ্যমান। মাথার টুপিটি শিশুটিকে শৈশবের খেলার স্বপ্নময় জগতে নিয়ে গেছে। টুপিটিতে কথনোবা পাওয়া যাচ্ছে উল্টোনো এক নৌকার আভাস। ছবির সমস্ত ঐশ্বর্য রয়েছে ছেলেটির মুখে, মুখের অভিব্যক্তিতে। সরলভাবে গড়া সেই মুখ। দুই চোখ ছুঁয়ে কোনো কল্পিত রেখা টানলে মুখের নিচের অংশটি একটি অর্ধবৃত্তের আদল পায়। ছেলেটির চোখদুটি নিষ্পাপ বিস্ময় ও করুণায় ভরা। এত মায়াময় চোখ এর আগে কি তাঁর খুব বেশি ছবিতে দেখেছি আমরা? এই চোখে কোনো অলৌকিকের স্বর্গীয় বিভা নেই, বা পুতুল-প্রতিম প্রতীকায়নের স্থাণুতা নেই, যা গণেশ পাইনের ছবির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ চোখ যথেষ্ট প্রভাময় হয়েও স্বাভাবিক। এ চোখে প্রজ্ঞার বা অভিজ্ঞতার ভার নেই। আছে অমলিন বিস্ময়ের দীপ্তি। সেই বিস্ময় করুণায় সঞ্জীবিত। সেই করুণাকে আরও সকরুণ করেছে মুখের উপর ছড়িয়ে থাকা ম্লান আলো। আলো ও আলোহীনতার রহস্যে ছেলেটির মুখ ও শরীর এক স্বপ্নময়তার উন্মোচন ঘটাচ্ছে।

সেই স্বপ্নময়তারই স্মারক হয়ে উঠছে কি পেছনের নীল ঘোড়াটি? শিশুটির রূপায়ণের স্বাভাবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ঘোড়াটি অনেকটাই পুতুল-প্রতিম, আরোপিত। সূক্ষ্ম সরল রেখার ঘন সন্নিবেশে গড়ে উঠেছে ঘোড়ার চিত্রিত স্বরূপ। তার মুখের পাশে দ্বিতীয় এক মুখের আভাস। সেই দ্বিতীয় মুখ সম্ভবত ছায়া নয়। কেননা ঘোড়ার শরীরে অন্য কোনো অংশের ছায়া পড়েনি। কোথাও। ছায়ার মতো এই মুখ কি তবে ঘোড়ার গতি বা চলমানতার আভাস আনছে? যে আভাস ঘোড়াটিকে একটু প্রতীকময় করছে। যদিও এটুকু ছাড়া, যদি এটুকুকে প্রতীকী মনে করি, ছবির আর কোথাও প্রতীক প্রবণতা নেই। প্রতিমাই সরাসরি ছবির ভাব হয়ে উঠছে। ছবির অন্তর্লীন বক্তব্যে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুরও তমসার যে পরিকীর্ণ ছায়া কখনো করোটি, কঙ্কাল বা পঞ্জরাস্থির প্রতীকে, কখনো পশুমুখের দন্তর ভয়াবহতায়, কখনো নর নারীর আরোপিত পুতুলপ্রতিম অভিব্যক্তির বিমানবিকতায় কখনো বা অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র বিচ্ছুরণে আভাসিত হত, এই ছবিতে তেমন কোনো নেতিময় তমসা নেই। আবার তেমন কোনো সদর্থক আলোকময় সম্ভাবনার সুপ্রত্যক্ষ প্রতীকও নেই। নেই কোনো দীপশিখা, আলোকবর্তিকা, অলৌকিক কোনো জলযান। কেবল একটি শিশু তাঁর সকরুণ ও নিষ্পাপ দৃষ্টি নিয়ে অন্তহীন দাঁড়িয়ে থাকে। পশ্চাৎপটে বিস্তৃত থাকে বিমূর্ত এক ম্লান শূন্যতা। তাঁর শরীরে আলগ্ন থাকে নীলিম ঘোড়াটির স্বপ্নিল আভা। ক্রমান্বয়ে তাঁর চোখদুটিই হয়ে উঠতে থাকে যেন অভাময় দুটি দীপশিখা। তাঁর মাথার টুপিটিই হয়ে উঠতে থাকে অলৌকিক কোনো জলযান। একটি শিশু প্রশান্ত ও সকরুণ উপস্থিতি নিয়ে গোধূলির ম্লানতায় তাঁর বিষণ্ণ স্বপ্নকে মেলে রাখে শুধু। তাঁর দু-হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরে থাকা লাঠিতে ও দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাঁর বীরত্বের স্বপ্ন প্রতিফলিত হচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে অজানা কোনো সুদূরে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন? কিন্তু তাঁর জীবনে খেলার ঘোড়ারও কোনো বাস্তব উপস্থিতি নেই। কেবল স্বপ্ন আছে। স্বপ্নের ঘোড়া আছে। কিন্তু সেই স্বপ্নের কোনো চরিতার্থতা নেই। অথচ স্বপ্ন আছে বলে তাঁর সত্তা একেবারে তমসাময় নয়। এই স্বপ্নের উপস্থিতি অথচ তার অচরিতার্থতা, এক ধরনের দ্বৈতের সৃষ্টি করে। সদর্থকতা ও ট্র্যাজিক চেতনার দ্বৈত। আলো ও অন্ধকারের দ্বৈত। যা ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠে এই সময়েরই নিহিত দ্বৈতের প্রতিফলন।

বছর দুয়েক আগে গণেশ পাইন এক সাক্ষাৎকারে তাঁর ছবির ফর্মের বিবর্তন সম্পর্কে সারগর্ভ এক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। "মাঝে মাঝে মনে হয়

আমার সমস্ত ছবিই যেন পেণ্ডুলামের মতো দুলছে মাত্র দুটো বিন্দুতে। একটা বিন্দু ন্যাচরাল ফর্মের। যেগুলি একটু বাস্তবধর্মী কাজ। আর অন্য বিন্দুটিতে থাকে জ্যামিতিক বা কিউবিস্টিক্ ফর্ম বা মেজাজ।" ('আজকাল'—২ জুন ১৯৮৬) ফর্মকে যেমন ভাগ করা যায় এই দুটি ধারায়, তেমনি কন্‌টেণ্টেও চলে আসে ভিন্ন দুই প্রবণতা। রূপ যখন হয় স্বাভাবিকতার অনুসারী, ভাবেও থাকে তখন সমন্বয় ও সুষমার প্রতিফলন। জেগে থাকে সদর্থকতার বিভা। আবার জ্যামিতিক বা কিউবিস্টিক হয় যখন রূপ, রূপের ভাঙনেই যখন থাকে রূপারোপের বিশিষ্টতা, সেই ভাঙন তখন এক অন্ধকারের দ্যোতক হয়ে ওঠে। 'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইণ্টেড হর্স' ছবিটিতে রূপের সেই স্বাভাবিকতা আছে। সেই স্বাভাবিকতার মধ্যে প্রশান্তিরও প্রতিফলন আছে। সেই প্রশান্তি কখনোই দ্বন্দ্বহীন নয়। গণেশ পাইনের আলো কখনোই অন্ধকারের অনুষঙ্গ নিরপেক্ষ হয় না। কখনো নিঃসর্ত সদর্থকতার দীপ্তির মতো সমতল হয় না। আলো ও আলোহীনতার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই ফুটে উঠতে থাকে তাঁর ছবির অন্তর্নিহিত ভাব। কখনো সমস্তটাই ঢেকে থাকে নিপাট অন্ধকারে। অমোঘ মৃত্যুর রূপকল্পে আচ্ছন্ন থাকে তাঁর প্রতিমাপুঞ্জ। কখনো সেই মৃত্যু, সেই অন্ধকার জীবনে সঞ্জীবিত থাকে। সেই মৃত্যু ভেদ করে জীবনের সন্ধান চলে। এই ছবিটিতে স্বপ্নের যে বিচ্ছুরিত আলো, যা শূন্যতাকে জীবনের দিকে উন্মুখ রাখছে, তাকে বলা যায় এই দ্বিতীয় ধারার।

তবু স্বাভাবিকতার এই ধারার মধ্যেও এই ছবিটি এক জায়গায় স্বতন্ত্র। প্রতীকের কোনো ভার নেই এখানে। নেই কোনো দর্শনের জটিলতা। অথবা যদি থাকেও তা, তাহলে আছে প্রতিমারই অবিচ্ছেদ্য সত্তা হয়ে। নন্দনে ও দর্শনে একীভূত সহজের এক শিল্পরূপ পেলাম এখানে যা একই সঙ্গে আমাদের লোকায়ত ও ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে এই সময়েরই এক শিল্পিত ভাষ্য হয়ে উঠছে যেন। পাশ্চাত্য আধুনিকতার উত্তরাধিকার সেই আত্মস্থতায় এতই অন্তর্লীন হয়ে গেছে যে খুব গভীরে তার ক্ষীণ আভাস ছাড়া বাইরে তার কোনো প্রতিধ্বনি নেই।

অবশ্য প্রতিমার এরকম নির্ভার সংহতি আমরা যে হঠাৎ পেলাম এই একটি ছবিতে কোনো পূর্ব ইঙ্গিত নিরপেক্ষভাবে, তা নয়। ১৯৮৮-র শুরু থেকে পর পর কয়েকটি ছবিতে এর পূর্বাভাস যেন পেয়ে আসছিলাম আমরা। যেমন, জানুয়ারি মাসে বিড়লা অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে 'দ্য টাইগ্রেন' নামে মিশ্র মাধ্যমের ছবিটি। প্রেক্ষাপটে একটু অন্ধকার ছড়ানো। সেই অন্ধকার

পেছনে রেখে বসে আছে একটি কিশোরী মেয়ে। সামনের দিকে বুকের উপর দুই বিনুনি ঝোলানো। আয়ত দুই চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তির মাধুর্য ছড়ানো। দুই হাত জোড়া করে রাখা সামনে। সেই হাতে একটি ফুল। কিশোরীর এই সুরেলা সৌন্দর্যের উপস্থাপনার মধ্যে এক বিপরীত অনুভবের সংঘাত সৃষ্টি করেছে মেয়েটির মাথায় পরা একটি বাঘের মুখোশ। মুখোশটিও সরল রূপায়ণে গড়া। কিন্তু তাতে আছে তীক্ষ্ণ কয়েকটি রেখা। সেই রেখায় গড়া মুখোশটি কৌতুক ও বীরত্বে মেশানো অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা আনছে মেয়েটির মধ্যে। এপ্রিল মাসে চিত্রকূট আর্ট গ্যালারির প্রথম গ্রীষ্মের প্রদর্শনীতে আমরা পেলাম অনেকটা সমধর্মী আর একটি ছবি 'চাইল্ড পারফমিং অ্যাজ ফেয়ারি'। আগের ছবিটিতে যেমন মেয়েটি মুখোশ পরে বাঘের সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে, এখানে পরীর সাজে সেজে মেয়েটি যেন পরীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় ছবিটি জুন মাসে 'গ্যালারি ৮৮'-র উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে দেখা মিশ্র মাধ্যমে আঁকা 'হেড' নামে একটি জন্তুর মুখ শুধু। প্রথম দুটি ছবি থেকে এটি একেবারেই বিপরীত ধারার। একটি জন্তুর একক মুখের অভিব্যক্তিতে পাশবিকতার সংহত প্রতিমা গড়ে তোলা। চতুর্থ ছবিটি আবার প্রথম দুটি ছবির ধারারই অন্য এক প্রসারণ। সেপ্টেম্বর মাসে 'সোসাইটি অব কণ্টেম্পোরারি আর্টিস্টস্'-এর ড্রয়িং-এর প্রদর্শনীতে আমরা পেলাম 'উওম্যান অ্যাণ্ড দ্য ফ্লাওয়ার' নামের মিশ্র মাধ্যমের একটি ড্রয়িং। পশ্চাৎপটে নিপাট অন্ধকার। বাদামী রং-এ আঁকা দীঘল চোখের এক নারী-প্রতিমা বসে আছে একটি চেয়ারে। তাঁর অভিব্যক্তিতে প্রশান্তি, ভয় ও গাম্ভীর্যের সংমিশ্রণ। পেছনে টেবিলে ফুলদানীতে ফুল। সেই ফুলের পেছন দিক থেকে উঁকি মারছে মাছি জাতীয় এক পতঙ্গ? সহসা একটি পতঙ্গেরস ন্তর্পণ উপস্থিতি ছবিটিতে সূক্ষ্ম এক অপ্রাকৃত কালিমার প্রতিফলন গড়ে তোলে।

১৯৮৮-র শুরু থেকে এই চারটি ছবির পর আমরা দেখলাম 'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' ছবিটি। কিন্তু খুব সম্ভব প্রথম দুটি ছবির পরেই এটি আঁকা। তাহলে বলা যায় ১৯৮৮-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখা উল্লিখিত এই পাঁচটি ছবির মধ্যে কেবল 'হেড' নামের ছবিটিই শিল্পী যাকে বলেন 'জ্যামিতিক বা কিউবিস্টিক' ফর্মের ছবি। বাকি চারটিই 'ন্যাচারাল ফর্মের'। এই স্বাভাবিক রূপায়ণের মধ্যেও সহজ রূপবন্ধে সুষমার সকৌতুক ও সকরুণ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে জীবনের ও সময়ের অথবা চিরায়তের নিবিড়তর সত্যকে ছুঁয়ে যাওয়ার বিরল এক সিদ্ধির দিকে শিল্পী এগিয়েছেন ক্রমান্বয়ে বাঘের

মুখোশে মেয়ে, পরীর সাজে মেয়ে ও 'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' এই তিনটি ছবিতে। এর ঠিক আগে ১৯৮৭-র শেষদিকে ডিসেম্বর মাসে 'সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস্'-এর বার্ষিক প্রদর্শনীতে তিনটি ছবি আমরা দেখেছিলাম—'ম্যান অ্যাণ্ড দ্য ব্লু কোলাজ', 'দ্য রাইডার', আর 'দ্য হেড' নামে কেবল একটি মানুষের মুখের ছবি।' এই তিনটি ছবি পর্যন্ত মৃত্যু ও জীবনের যে জটিল বুননের কাজ চলছিল তাঁর ছবিতে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮-র পূর্বোক্ত তিনটি ছবি এক নতুন নন্দন ও দর্শনের ইঙ্গিত বয়ে আনল।

গণেশ পাইনের জন্ম ১৯৩৭-এর ১১ জুন। ১৯৮৭তে তিনি পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন। কলকাতায় সরকারি আর্ট কলেজের শিক্ষা শেষ করেন তিনি ১৯৫৯-এ। মোটামুটি ১৯৫৮ থেকে তিনি নিয়মিত ছবি এঁকে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষের প্রথম সারির শিল্পীদের তিনি একজন। তাঁর খ্যাতি এখন প্রায় আন্তর্জাতিক। এর পেছনে রয়েছে তাঁর নিজস্ব এক শিল্পরীতি, নিজস্ব এক নন্দন ও দর্শন। তাঁর এই নিজস্বতাকে বোঝার চেষ্টা থেকে যখন এই লেখার সূত্রপাত, সেই সময় আমাদের দেখার সুযোগ হল 'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' নামে ছবিটি। এ পর্যন্ত তাঁর নন্দন ও দর্শনের এক ঘণীভূত রূপ অনুভব করা গেল এই ছবিটিতে। সেজন্য এই ছবিটি বোঝার চেষ্টার মধ্য দিয়েই শুরু করা গেল এই রচনাটি।

## ( দুই )

## 'বীজকম্প্র অন্ধকার'

তাঁর শৈশবের এক খেলার গল্প বলেছিলেন একবার গণেশ পাইন। (টেলিগ্রাফ-১৬ জুন ১৯৮৫) ছেলেবেলায় কাগজের নৌকা বানিয়ে জলে ভাসাতে ভালবাসতেন তিনি। এই ছিল তাঁর প্রিয় এক খেলা। অনেক শিশুই হয়ত এরকম নৌকা ভাসায়। কিন্তু তাঁর খেলা ছিল আর একটু অন্যরকম। ঢেউ-এর দোলায় দুলে দুলে চলত যখন সেই নৌকা, তখন তাতে আগুন জেলে দিতেন তিনি। ভাসমান সেই নৌকা আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তার ছায়া পড়ত জলের গভীরে। এক মায়াবী আলোয় দীপ্ত হয়ে উঠত জলের ভেতরের অন্ধকার। মুগ্ধ হয়ে সেই অন্ধকারের দীপ্তি দেখা, এই ছিল তাঁর খেলা। শৈশবের এই খেলার মধ্যে কি ছিল বড় হয়ে শিল্পের যে স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলবেন এই শিল্পী তাঁর সেই তত্ত্ববিশ্বের সারাৎসারেরই এক পূর্বাভাস? এই শৈশব স্মৃতি শিল্পী গণেশ পাইনের ছবির মরমী অন্ধকারের

জগতের এক প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে যায় যেন। একদিক থেকে দেখতে গেলে অন্ধকার তাঁর ছবির এক অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। অন্ধকার থেকেই উদ্ভাসিত হয় তাঁর ছবি। যেন বা অন্ধকারই ধারণ করে তাঁর ছবির প্রতিমাপুঞ্জকে। অন্ধকার ভেদ করেই তাদের সঞ্চরণ। যেমন মাটি ভেদ করে উঠে আসে উদ্ভিদ। জলের উপর ভেসে চলে জলযান।

শিল্পের এই অন্ধকারের স্বরূপ হতে পারে দুরকম। ধ্রুপদী শিল্পে আমরা শুনতে পাই আলোরই জয়গান। আলোর জন্য প্রার্থনা। বাস্তবতার সমৃদ্ধি জীবনকে যখন উদ্ভাসিত করে, শিল্পেও ছড়িয়ে পড়ে সেই উদ্ভাস। আমাদের গুপ্ত যুগের শিল্পে, অজন্তার ছবিতে, কোণার্কের সূর্যময় ভাস্কর্য খচিত 'যৌবনের হাট'-এ বা খাজুরাহোর শরীরি আবেগের উদ্বেলতার মধ্যেও আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। চীন বা জাপানের ছবির ছন্দোময় শীলিত রেখা যে আলো দিয়েই গড়া হয়, তার পেছনে থাকে আবিশ্ব শাশ্বত এক ঐক্যের বোধ। ধ্রুব এক অধ্যাত্মচেতনার অমলিন প্রতিভাস। মানবতার চিন্ময়ত মেধার ধ্যানেই হয়ে থাকে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের শিল্পকলা। রাফায়েলের ছবিতে নেপথ্যের অন্ধকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাময় দীপ্তি পেতে থাকে মাতা মেরির মুখের দিব্যতা। টিশিয়ানের ছবিতে পৃথিবীর মানবী যখন স্বর্গের দেবতার কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, দ্যুলোক যখন ভূলোকেই তার চরিতার্থতা খুঁজে পেতে চায়, ছবির সমগ্র শরীরে তখন বিচ্ছুরিত হতে থাকে সোনালী আলোর আভা। আবার অনেকটা এই একই পরিপ্রেক্ষিতে যখন আবির্ভাব হয় একজন লিওনার্দোর, তখন পাল্টে যায় আলো-অন্ধকারের পারস্পরিক গুরুত্বের মাত্রা। খ্রীষ্টের শেষ ভোজের ছবিতে আলোকেই যেন আরও মাত্রাময় করে তোলে সংশয়ের স্তিমিত আঁধার। আলো আর অন্ধকারের সংমিশ্রণ ছাড়া মোনালিসার স্মিত হাসির রহস্য সম্পূর্ণ তাৎপর্য পায় না।

অন্ধকারের দুই সত্য লুকিয়ে থাকে এভাবে আলোর যুগের মধ্যেও। একদিকে আদিম ও প্রত্ন শিল্পের অভিব্যক্তির তীব্রতার গভীরতর অন্ধকার, অন্যদিকে ধ্রুপদী শিল্পের অমলিন আলোকময়তা, যেমন ধরা যাক, তিব্বতের প্রথাগত মহাকালের মূর্তি ও অজন্তার বা চীনের ধ্রুপদী ছবি, অথবা মেক্সিকোর বা মায়া সভ্যতার বা মিশরীয় শিল্পের বিপরীতে ইউরোপীয় রেনেশাঁসের শিল্প; আলো অন্ধকারের এরকম সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ছাড়াও অন্ধকারের আছে আর এক ধরনের ক্রম-বিবর্তন। গথিকের অন্ধকার মাসাচ্চিত্তর মধ্য দিয়ে ফ্রা-অ্যাঞ্জেলিকো বা অন্য দিকে জান ভান এইক হয়ে যেভাবে এসে বত্তিচেলিতে

পৌঁছায়, তাতে আমরা অনুভব করতে পারি অন্ধকারের সম্ভাবনার বা কবির ভাষায় 'বীজকম্প্র' তার প্রগাঢ় এক বিবর্তন। এই সম্ভাবনাই কি আরও প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে না লিওনার্দো বা আরও পরে রেমব্রাণ্টের মরমী অন্ধকারের মধ্যে? যা ছিল 'বীজকম্প্র', তা যেন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আঁধারেরই প্রস্ফুটন। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন শুনি—"তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে।"

একদিকে আলোর মধ্যে, আলোর যুগের মধ্যে অন্ধকারের এই দুই সত্য। অন্যদিকে আলোর দুই প্রান্তবর্তী তীব্র নাস্তিময় অন্ধকার। হিয়েরোনিমাস বচ (১৪৭০-১৫১৬) ও ফ্রাঁসোয়া গোইয়ার (১৭৪৬-১৮২৮) মধ্যে প্রায় তিন শ' বছরের ব্যবধান। মাঝখানে কেটে যায় রেনেশাঁস ও বারোকের ঐশ্বর্যের সময়। এর দুই প্রান্তে এই দুই শিল্পী অন্ধকারের তমিস্রাকে ভাঙতে চান অন্ধকার দিয়েই। অন্ধকার এখানে আগুনের মতোই দহনক্ষম। তরবারির মতোই ধারালো। অন্ধকারের এই দুই বিপরীত স্বরূপের একটিকে যদি বলি প্রতিবাদী অন্ধকার, অন্যটিকে বলতে পারি 'বীজকম্প্র অন্ধকার'।

সুদর্শনার আর্তকণ্ঠে যখন শুনি, "আলো, আলো কই? এ ঘরে কি কোনো দিন আলো জ্বলবে না?" তখন সেই আলোহীনতা ত মৃত্যুরই নামান্তর। 'পথের সঞ্চয়'-এর রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর শূন্যতাকে দেখেছিলেন অন্ধকারময়: "আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো, শূন্যতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্যার মতো অন্ধকারময়।" 'জাপানযাত্রী' রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই অন্ধকারই বিপরীত তাৎপর্যে মহীয়ান হতে পারে। "দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো, তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো, তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল।" একেই কি কবি বিষ্ণু দে বলেছিলেন— "অন্য অন্ধকার"? 'ঘন নীল, স্পন্দমান ছন্দে ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে'—'লক্ষ লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার'।

দৃশ্যতাই ত ছবির প্রাণ-স্বরূপ। আলোতেই অভিব্যক্ত হয় সেই দৃশ্যতা। অন্ধকারের পটেই সেই আলোর বিস্তার। ছবির আলো ও অন্ধকার তাই পরস্পরসাপেক্ষ। আলো অন্ধকারকে গড়ে তোলে। অন্ধকার আলোকে। আমাদের আধুনিকতার পুরোধা শিল্পী যিনি, সেই অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে আলোকে অনেক ম্লান করে নিয়েছিলেন, বাস্তবতার অন্তর্লীন মরমী সত্যকে প্রস্ফুটিত করার জন্যই। ইউরোপীয় রীতির যথাযথতার আলোকে যেভাবে

আমাদের পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করছিলেন রবিবর্মা বা বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা, তাতে দৃশ্যতার আপাত সত্য-প্রকট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঐতিহ্যের ও সত্তার পরিচয় মিলছিল না তাতে। সেই পরিচয়কে উদ্ধার করতেই সেই যথাযথতার রূপ থেকে সরে যেতে হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথকে। সরে যেতে হয়েছিল আলোর উচ্চকিত প্রাবল্য থেকেও। পরতে পরতে ওয়াশের পর্দায় ছায়াকে মেলে দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। আলোকে ছায়ার 'মোহিনী আড়াল' দিয়ে ঢেকেই তিনি অনাবৃত করেছিলেন সত্যের মুখ। সেই সত্য উদ্ভাসিত করেছিল আমাদের জাতীয় চেতনাকে। আলোকে জ্যামিতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ। অন্ধকারের মায়া আর রেখার জ্যামিতি এই দুই-এ মিলে যে নাগরিক চেতনা রূপ পাচ্ছিল গগনেন্দ্রনাথে অবনীন্দ্রনাথের বিপরীতে তা গড়ে তুলছিল আধুনিকতার দ্বিতীয় এক ভুবন। অবনীন্দ্রনাথে যদি হয় লৌকিক চেতনার উদ্বোধন, গগনেন্দ্রনাথে নাগরিক চেতনার। আলোতে আবিল ছিল, চরিত্রহীন ছিল প্রাক-আধুনিক যে ভারতীয়তা, অন্ধকার দিয়েই তাঁর স্বরূপ খুঁজেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। এই জাতীয় চেতনারই অন্যতর আলোকিত অভিব্যক্তি দেখেছি নন্দলালে। জাতীয়তার যে ধ্রুপদী ছন্দকে আধুনিকতায় উদ্বোধিত করছিলেন তিনি, আলোর দীপ্তি সেখানে অপরিহার্য। সেই দীপ্তি সামান্যকে অসামান্য করছিল, অকিঞ্চনকে মহীয়ান। ঐতিহ্যের গরিমা দিয়ে আমাদের ক্ষীণতাকে জয়ের পথ ছিল তাঁর। তাঁকে তাই সৃষ্টি করতে হচ্ছিল সত্যের প্রভাময় রূপ। এই আলোর অন্যতর এক বিবর্তন আমরা পরে দেখেছি বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে। আবার যামিনী রায় লোকায়তিক আত্মপরিচয়ে আলো ও অন্ধকারকে করে নিয়েছিলেন সমানুপাতিক। তাঁর ছবিতে আলোর প্রখরতাও নেই, অন্ধকারের নিঃসীমতাও নেই। আছে কেবল সমানুপাতিক আলো আঁধারে সমানুপাতিক ছন্দের লাবণ্য। আলোয় যে লাবণ্যের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন নন্দলাল, তাঁর পরের প্রজন্মে সেই লাবণ্য মেদুর হয়ে যাচ্ছিল আলোরই আবিলতায়। বেঙ্গল স্কুলের সেই গতানুগতিকতার কথা আজ আর অজানা নয়। এও ত আমাদের জানা, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল একদিকে, যেমন যামিনী রায়ের, অন্যদিকে আর এক ধরনের প্রতিবাদেই উদ্ভাসিত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের ছবি। আমাদের ছবিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম, যিনি উদ্বোধিত করতে পেরেছিলেন সেই অন্ধকারের, যাকে আমরা বলেছি 'বীজকম্প্র অন্ধকার'।

চল্লিশের দশকের অন্ধকারের স্বরূপ আলাদা। তা মানুষের পরাজয়ের নিঃসীম অন্ধকার। "অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।...চার দিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ সব, / ইন্দ্রলোকের অপ্সরী-দের ঘাটা, / গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।" এই জীবনানন্দীয় অন্ধকার, যাকে বলা যায় প্রতিবাদী অন্ধকার, চল্লিশের দশক থেকে ক্রমশ আমাদের ছবিতে সোচ্চার হচ্ছে। এই অন্ধকার কেবল আক্ষরিক অর্থে আলোহীনতা থেকেই জাত নয়। অভিব্যক্তি থেকেও জাত। রেখার দুর্মর ভাঙনে পরাভূত মানুষের রূপ দেখেছি জয়নুল আবেদিন বা সোমনাথ হোরের ছবিতে। সাধারণ অর্থে সেখানে আলো আছে। কাগজের শাদা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আক্ষরিক আলো। অথচ বিপন্ন রেখা, নিঃসীম অভিব্যক্তি তাকে কালিমার কালোতে আবৃত করছে। সোমনাথ হোরের সেই শাদার উপর শাদার গ্র্যাফিকসগুলোকে মনে আছে? আলো কত নিঃসীম আঁধারময় হতে পারে তার এরকম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে? এই প্রতিবাদী অন্ধকার, দহনক্ষম অন্ধকার অপ্রতিরোধ্যভাবে লিপ্ত হয়ে আছে আমাদের পঞ্চাশ, ষাট, ও পরের দশকেরও ছবিতে। নিখিল বিশ্বাস প্রথমটায় একটু রঙিন আলো দিয়ে শুরু করে ক্রমান্বয়ে চলে গেলেন অন্ধকারের নিঃসীমতার দিকে। তাঁর যুযুধান মানুষেরা, তাঁর তীব্র বেগবান ঘোড়ারা, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ করুণাময় যিশু এই অন্ধকারেরই নানামুখী প্রকাশ। প্রকাশ কর্মকারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নারী প্রতিমাদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত কালিমার উপমা কি হতে পারে না 'শিশুতীর্থ'র সেই 'রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো' অন্ধকার? মনে আছে যোগেন চৌধুরীর মানবীর সঙ্গমলিপ্সু, ধাবমান সেই বাঘের প্রতিমা, তার পশ্চাৎপটের সেই নিঃসীম কালো? এরকম অন্তহীন দৃষ্টান্তে সমৃদ্ধ আমাদের আধুনিকতার প্রতিবাদী অন্ধকার। এরই পাশাপাশি চলছে অন্ধকারের ধ্যানময় এক স্বরূপের অন্বেষণও। নীরদ মজুমদারের নীল অন্ধকারে যে মগ্নতার প্রশান্তি আছে, তার বিবর্তন চিত্রভানুর মতো তরুণ শিল্পী পর্যন্ত এই প্রজন্মেও আমরা কিছু কিছু দেখছি। তুলনায় যদিও তা কম।

এরকম একটা উত্তরাধিকারের প্রবহমানতায় যদি আমরা গণেশ পাইনের ছবির দিকে তাকাই, তাহলে তাঁর অন্ধকারে এক স্বতন্ত্র চেতনার উদ্বোধন দেখতে পাই। এ স্বাতন্ত্র্য শুধু কোনো সফল শিল্পীর রূপভঙ্গির অনিবার্য নিজস্বতাই নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। কেবলই গোধুলির বা আরও একটু দূরতর ঘনায়মান সন্ধ্যার বিষাদময় ধ্যানমগ্ন ছায়াময় আলোয় ছেয়ে থাকে তাঁর

ছবির পশ্চাৎপট, কখনওবা সমগ্র পরিমণ্ডল। অন্ধকারের নিঃসীম নাস্তি নেই সেখানে। কোনো দহন নেই। নেই একেবারে, এরকম বলা হয়ত ঠিক নয়। আমরা কেন ভুলে যাব 'অ্যাসাসিন' (১৯৭৯) বা 'ইভিল কনভার্সেশন'-এর (১৯৮৫) মতো ছবি? বরং আমরা দেখব প্রতিবাদী এই অন্ধকারেই গণেশ পাইন সময়ের ও বাস্তবতার এক নিঃসীম প্রতিবাদী ভাষ্য রচনা করে যান। দেখব, প্রায়ই যে বলা হয়ে থাকে, বাস্তবতা নেই তাঁর ছবিতে, কত ভ্রান্ত সেই ধারণা। তবু সেই প্রতিবাদী অন্ধকারও এক ধ্যানমগ্নতায় সমাচ্ছন্ন। সমকালের ভাষ্য হয়েও চিরায়ত মানবিক আত্মগত এক সংঘাতেরও শৈল্পিক ভাষ্য হয়ে ওঠে তা। এই দ্ব্যর্থতা, আলোর অভাবের অস্পষ্টতায় প্রাণ পায় যে দ্ব্যর্থতা, তাই তাঁর ছবিকে করে তোলে বহু সম্ভাবনার, বহু অর্থময়তার আকর-স্বরূপ। এই নিস্তেজ আলো, প্রকারান্তরে যা দ্যুতিময় অন্ধকার, তা বীজকল্প। বহু সম্ভাবনার গর্ভগৃহস্বরূপ। বাস্তবতার বলা ঠিক নয়, বলা ভাল, স্বাভাবিকতার বা যথাযথতার প্রায় সমস্ত আদল থেকে যে দূরে সরে যান গণেশ পাইন, তা রেখায় যেমন, আলোতেও তেমনি, এই বীজকল্পতার উদ্বোধনের জন্যই ত। তাই চেতনার যে উপরের স্তর, যেখানে আলোর বা অন্ধকারের সরল, সহজে বোধগম্য এক অর্থ থাকে, তাঁর থেকে দূরবর্তী তাঁর ছবির উৎস, ছবির অন্ধকারেরও উৎস। যে যৌথ নিশ্চেতনায় কেবল মানুষের নয়, সমগ্র প্রাণীর, শৈশব থেকে বিশ্বের বিকাশের ইতিহাস লুকিয়ে থাকে, সেই অন্ধকারের উৎস থেকে জেগে ওঠে তাঁর প্রতিমারা। এই অন্ধকার বা আলো তাই আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত প্রবাহের বাইরের। মিথিক্যাল বা পুরাণকল্প মূলক বললেও হয়ত এর সবটা বোঝান যায় না। পুরাণকল্পের আপাত অসম্ভবতায় শুধু নয়, বা প্রিমরডিয়াল-এর তীক্ষ্ণ তীব্রতাতেও নয়, তার থেকে স্বতন্ত্র এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে উঠে আসে তাঁর প্রতিমারা। সঙ্গে আনে এক 'অদ্ভুত আঁধার', যে আঁধার দিয়ে কেবল আমাদের অপূর্ণতার প্রতিবাদই হয় না, আমাদেয় আলোরও, আমাদের স্বরূপেরও এক ভাষ্য রচিত হয়ে যায়। তাই এই অন্ধকার ইয়ুং কথিত সেই 'অটোনোমাস কমপ্লেক্স' এরই উদ্বোধন; আত্মতার যে গহনে শিল্পের জন্ম। সচেতন সেই আত্মতা যৌথতায় মিলে যায় নিশ্চেতনার গভীর তিমিরে। সেই তিমিরকে উদ্বোধিত করতে পেরেছেন গণেশ পাইন।

অথচ তাঁর অন্ধকার কালো নয় কখনোই। এমন কি তাঁর ছবিতে নিশ্চিদ্র কালো রং-এর ব্যবহার বিরল। তাঁর আলোর রং মুখ্যত প্রভাময় হলুদের

এক বিশেষ রূপ, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাম্বার। কখনো বা অন্ধকারের ছায়া মেশানো গভীর বাদামী। এই বাদামী প্রায়ই আলো থেকে অন্ধকারের দিকে গড়িয়ে যায়। এ ছাড়া তাঁর অন্ধকার কখনো গভীর নীল, কখনো শ্যাওলা সবুজ। তাঁর রং থেকে সব সময়ই এক বিনম্র প্রভা বিচ্ছুরিত হয়, যা বিষাদময়। পড়ন্ত গোধুলির মতো বিষাদময়। কালোতে তিনি অন্ধকারের আভা আনেন কেবল যখন কালি কলমে ছবি আঁকেন। কালি কলমের ড্রয়িং তিনি অজস্র করেন। হয়ত টেম্পেরায় আঁকা ছবির থেকে এ পর্যন্ত তিনি ড্রয়িং একেছেন অনেক বেশি। এই ড্রয়িংগুলোতে, আমরা মুগ্ধ হই দেখে, কেমন করে সরু কালো রেখার জাল বুনে ক্রমান্বয়ে তিনি গড়ে তোলেন পুঞ্জীভূত স্তিমিত অন্ধকার। শাদা জমি ছেড়ে ছেড়ে তাতে আনেন বিচ্ছুরিত আলো। আলো ও অন্ধকারের সেই দ্বৈততায়, তাঁর ছবি দেখার নিয়মিত অভ্যাসে, সেখানেও আমরা স্তিমিত রং-এর উপস্থিত অনুভব করি।

অন্ধকারের আর এক ভিন্নধর্মী প্রকাশ অনুভব করা যায় তাঁর ছবির প্রতিমা বিন্যাসে। 'বীজকম্প্র অন্ধকারে'র প্রেক্ষাপটে তাঁর মানব-মানবী বা প্রকৃতির অন্য যে সব প্রতিমাপুঞ্জ সংস্থাপিত হয়, যেন সেই অন্ধকারের সংক্রমণ ঘটে যায় তাঁদের মধ্যেও। স্বাভাবিক আলোতে রূপের যে স্বাভাবিকতা, সে স্বাভাবিকতাকে সব সময়ই পরিহার করেন গণেশ পাইন। কিন্তু সে রকমভাবে স্বাভাবিকতা থেকে অনেক শিল্পীই দূরে সরে যান। নন্দলাল বা যামিনী রায়ের কোনো ছবিতে সে অর্থে আমরা প্রকৃতির অনুরূপতা দেখি না। স্বাভাবিকতা থেকে দুধরনের বিচ্ছিন্নতা পাই দুই শিল্পীর মধ্যে। নন্দলালে ঘটে এক ধ্রুপদী আদর্শায়িত রূপের প্রকাশ। যামিনী রায় তাঁর সমতল দ্বিমাত্রিক প্রতিমায় লোকায়তিক প্রশান্তির প্রকাশ ঘটান। প্রতিবাদের প্রতিমার অভিব্যক্তিময় প্রগাঢ় ভাঙন ছাড়া রূপের স্বাভাবিকতার মধ্যেও, তা থেকে বিচ্ছিন্নতা সাধারণত এই দুরকমভাবে ঘটে থাকে। সাধারণভাবে আলোর নির্দিষ্ট উৎসহীন সমতল ও দ্বিমাত্রিকভাবে উপস্থাপিত হয়েও গণেশ পাইনের প্রতিমাবিন্যাস এই দুই ধারার থেকেই আলাদা। প্রতিমাকে তিনি অপ্রাকৃত করে তোলেন। এ কাজে সব চেয়ে বেশি সহায়ক হয় তাঁর রেখা। এক ধরণের ঋজু, তীক্ষ্ণ, কোমলতা বা কোনো রকমের ছন্দিত পেলবতাবর্জিত তাঁর রেখা সাধারণত পরস্পর কৌনিকতায় মিলিত হয়। তীক্ষ্ণ কোন তৈরি করে। এক দিক থেকে এই কৌনিক তীক্ষ্ণতা তাঁর প্রতিমাকে স্বাভাবিকতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মানব বা মানবীর নাকের ড্রয়িং-এ প্রায়ই একাধিক তলের

অসমানুপাতিক বিন্যাস ঘটে যায়। এক ধরণের অস্বাভাবিকতা আসে তাতে। ঠোঁট হয় দীঘল। স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ। পুরু। কখনো কখনো একাধিক তলের বিন্যাস ঘটে সেখানেও। ললাটে, কপোলে বা চিবুকে হঠাৎই রং-এর পর্দার পরিবর্তন হয়। পর্দার হাল্কা বিবর্তনে এক ধরণের জ্যামিতিক মোজাইক তৈরি হয়। সেই আলো ছায়ার পর্দার পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ কোণের এই জ্যামিতিক আলো ছায়াগুলি মূর্তিকে এক অপরিচয়ের দিকে নিয়ে যায়।

আর যাকে মাথার আচ্ছাদন। পুরুষের ক্ষেত্রে সেই মাথার আচ্ছাদন চুলের স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করে দুই প্রান্তে বিস্তৃত হয়। তাঁদের দূরতর কোনো ইতিহাসের চরিত্র করে তোলে। বর্তমান থেকে বিমুক্ত করে চিরায়তের প্রতিভূ করে তোলে। নারীর ক্ষেত্রে যেমন চুল। এই 'আঁধার কেশভার'-এর দৃশ্য প্রতিমাকে গণেশ পাইন অনেক সময়ই কাজে লাগান জীবনজোড়া এক রহস্যের জগতের দরজা খুলতে। 'শান্তিনিকেতন'-এর কোনো এক প্রার্থনায় বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, "তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শ লাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি।" এই উদ্ধৃতির সূত্রে শঙ্খ ঘোষ একবার লিখেছিলেন তাঁর এক ছোট লেখায় (আজকাল—৯ আগষ্ট ৮৮) রবীন্দ্রনাথের আঁধারের প্রতিমা সম্পর্কে, "আকাশের মধ্যে মেলে দেওয়া এই স্তব্ধ হৃদয়ই কখনো দেখা দেয় রাত্রিবেলার 'আঁধার কেশভারে'র প্রতিমায়, যে প্রতিমা মুছে নিয়ে যায় সব ভুল আলোর জৌলুশ, খুলে দেয় আমাদের অস্ফুট হয়ে থাকা ঢাকনা, আর ঠিক তখনই এক সুরের রণনে ভরে যায় আমাদের সমস্ত সত্তা, গহন এক রাত্রে যেমন ভরে গিয়েছিল শচীশের, মহাকাশে সে শুনতে পাচ্ছিল বিশ্বকবির গান।" একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল কি উদ্ধৃতিপুঞ্জ? কিন্তু গণেশ পাইনের ছবির নারীর 'আঁধার কেশভার' ঠিক এ ধরনেরই এক গানের অনুরণন আনে আমাদের মধ্যে। তাঁর অন্ধকার ও আলোকেও কি বলা যায় না সেরকমই এক সংগীতের উদ্বোধক? তাঁর নারীমুখ 'আঁধার কেশভার' নিয়ে সেই সংগীতকেই গহনতর করে তোলে।

আর সব শেষে—তাঁর মানব-মানবীর চোখ। এই চোখ আমাদের পৌঁছে দেয় তাঁর প্রতিমার প্রাণকেন্দ্রে। প্রাণ দেয় কি তা প্রতিমাকে? কিন্তু সে অন্য এক প্রাণ। আমাদের প্রথাগত ও সনাতন দেবী প্রতিমায় চোখের অপ্রাকৃত দীঘলতার মধ্য দিয়েই নেমে আসে স্বর্গের বিভা, নেমে আসে অলৌকিকের আলো। গণেশ পাইনের ছবির চোখ সেই প্রতিমার আদলে

তৈরি হয়। আয়ত সেই চোখে কখনো পুরোটাই হয় অন্ধকার, কেবল মাঝখানে ছোট বৃত্তাকার বিন্দুর মতো জ্বল জ্বল করে আলো। কখনো পুরো চোখদুটিই থাকে কালোতে ভরাট। কখনো শাদা রেখার উদ্ভট ঘোরের উজ্জ্বলতার মধ্যে এক ঘোলাটে ছায়া দিয়ে গড়ে ওঠে চোখ। চোখের এই বিভিন্ন রূপায়ণ অভিব্যক্তিতে আনে আলো ও অন্ধকারের বিভিন্ন মাত্রা। তেমনি সবটা মিলে, এই চোখ, নাক, ঠোঁট, ললাট ও কপোলের সূক্ষ্মতর জ্যামিতি, এই সমস্তের সন্নিবেশে গড়ে ওঠে যে মুখাবয়ব বা রেখার দ্বিমাত্রিক কৌনিকতার তীক্ষ্ণ বিন্যাসে গড়ে ওঠে নর নারী বা পশুপাখির যে শরীর, তা বিন্যাসের এই অস্বাভাবিকতায় যে অপরিচয়ের আবরণ টেনে দেয়, তাকেও কি বলা যায় না স্বাভাবিক আলোর সর্বপ্রকাশ্য স্বচ্ছতাকে আড়াল করা এক ছায়াই ? এভাবে প্রতিমা আর স্বাভাবিকের প্রতিবিম্ব থাকে না বলেই সম্ভবত প্রণব রঞ্জন রায় একে বলেছিলেন 'প্রতিমা-বিকল্প' ( দেশ, বিনোদন-১৯৮৩ )। এই 'প্রতিমা বিকল্প' এক ধরনের প্রকৃতি বিকল্পও। এভাবে ছায়া দিয়ে স্বাভাবিকতার আলোর অভাব দিয়ে গণেশ পাইন তাঁর নিজস্ব এক নন্দনের জগৎ গড়ে তোলেন।

এই নিজস্বতা অকৃত্রিম, স্বতস্ফূর্ত, বিকল্পহীন। এই অকৃত্রিমতার জন্যই তাঁর এই খ্যাতি সম্ভবত প্রকৃতি বিকল্পতার জন্যও। এই প্রকৃতি বিকল্পতা দিয়ে অন্ধকারের আবরণে আলোর চকিত উদ্ভাস দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন নিজস্ব এক দর্শন। এই দর্শনের মধ্যে সম্পৃক্ত আছে একদিকে আমাদের ছবির আধুনিকতার বিশিষ্ট এক আত্মপরিচয়, অন্য দিকে তাঁর প্রগাঢ় কাল চেতনা। এই আত্মপরিচয় ও কাল চেতনার অভিনবত্বেই গণেশ পাইনের ছবির জগতেরও অভিনবত্ব।

'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' নামে পূর্বোক্ত ছবিটি তাঁর এতদিনের আলো ছায়াময় অভিব্যক্তির ধারাবাহিকতায় যেন এক নতুন পদক্ষেপ-স্বরূপ। অন্ধকার এখানে অস্ফুট মেদুর অথচ প্রভাময় এক শূন্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে। আলো এখানে ঘণীভূত শৈশবের স্বপ্নময়তার রূপ নিয়েছে। এই বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মপরিচয় ও দায়বোধেরও এক নতুন দিগন্তে পৌঁছলেন যেন শিল্পী গণেশ পাইন। বিমানবিক সমস্ত মৃত্যু ও শূন্যতা আমাদের এই সময়ে প্রায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তবু এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এক মানবিক স্বপ্ন, চিরায়ত এক মানবিক বিভা। এই দ্ব্যর্থতার দর্শন দিয়েই গণেশ পাইন সমকাল ও চিরায়তকে মেলান।

## ( তিন )

### আত্মপরিচয়

"রাজবংশের পরে রাজবংশ ভেঙে পড়ে···পর্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করে হিন্দু পাঠান মোগল মারাঠা শিখ আর ইংরেজ, কিন্তু গ্রামীন কৌম থেকে যায় একই রকম।" তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' উপন্যাসে ডেটিনিউ যতীন এই কথাক'টি ভেবেছিল। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ চার্লস মেটকাফ-এর পরিচিত উক্তি এটি। তারাশঙ্কর এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় ও বাংলার কৌম জীবনের মূলগত সত্যের প্রবহমানতার কথা বলিয়েছিলেন। তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসটিতে তিনি দেখিয়েছেন এই গ্রামীণ কৌমের স্বরূপ ও বিবর্তন ধারা। 'বারোমাস' পত্রিকার ১৯৮৭র শারদীয় সংখ্যায় 'মার্কস-এর দিকে' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। তাতে তিনি মার্কসের শেষ জীবনে কৌমের বিশেষত প্রাচ্য কৌমের বিবর্তন প্রসঙ্গে এক প্রাজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন তথাকথিত ওয়েস্টার্নিজম ও ওরিয়েন্টালিজম সম্পর্কে। বলেছিমেন, "এ দুই মতবাদের বিরোধের দিকটাকে আমরা ঈষৎ ফাঁপিয়ে দেখতে অভ্যস্ত; তেমন নজর করি না, এদের ঐক্যটা কোথায়।" এই লেখাতেই তিনি প্রসঙ্গক্রমে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন গ্রামীণ কৌম সম্বন্ধে তারাশঙ্করের ঐ উক্তি।

এই কৌম চেতনার প্রবহমানতার মধ্যে, তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতির মধ্যে, আমাদের ঐতিহ্যবিধৃত আত্মপরিচয় কেমন করে উজ্জ্বল হয়ে থাকে সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে এইটুকু বুঝে নিতে চাই যে আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যতার বিরোধ কতখানি প্রাসঙ্গিক। এক এক সময় মনে হয় আসলে আছে কি সেরকম কোনো বিরোধ? আজকে আধুনিকতার ক্ষয়ে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণে যুদ্ধের বারুদে, আণবিক অস্ত্রসম্ভারে একাকার হয়ে যায় নি কি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূলগত অনেক সমস্যাই? অস্তিত্বের সংকটই যখন হয়ে ওঠে আত্মিক সংকটের প্রধান এক উপসর্গ, তখন প্রগাঢ় এক নাস্তির মধ্যে সব মানুষই ত একাকার হয়ে যায়। তাই আজকের শিল্পী কোনো বিপন্নতা বোধ করেন না, পাশ্চাত্যের অর্জনকে নিজের করে নিতে। এরকম কোনো বিরোধের কথা তাঁর মনে রাখলে চলে না, কেননা প্রকাশ তাঁর কাছে শুধু সুন্দরের সমস্যা নয়, অস্তিত্বের সমস্যা। তাই তাঁর ক্রোধ, তাঁর ক্ষোভ যখন প্রকাশ পায়, তখন একের চুলচেরা হিশেব থাকে না তাঁর; এটা প্রাচ্য নন্দনের অনুবর্তী হল, না পাশ্চাত্য নন্দনের। তবু শিল্পীর

সৃষ্টি উঠে আসে চৈতন্যের যে গভীর থেকে সেখানে তাঁর ঐতিহ্য ত মিশে থাকেই ওতোপ্রোত হয়ে। যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় তাঁর প্রকাশ, তাহলে সৃষ্টির নিয়মে অবধারিত ভাবেই সেখানে চলে আসে ঐতিহ্যের নির্যাস। বিপর্যয় ঘটে যখন সৃষ্টিতে স্বতস্ফূর্ততা থাকে না। যখন আরোপিত হয়ে ওঠে তা। তাই আত্মপরিচয়ের সমস্যা এক অর্থে আত্মগত সততার সমস্যা।

প্রায়ই ত দেখা যায় চিত্রকলার আধুনিকতায় আমরা যাকে পাশ্চাত্যের বলি, তার মূল উৎস পাশ্চাত্যের নাও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে 'বিভাব' পত্রিকার ১৯৮৮-র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকারে মকবুল ফিদা হুসেনের কয়েকটি কথা খুবই প্রণিধানযোগ্য। পাশ্চাত্যের প্রাচ্যতা সম্পর্কে বলেছিলেন তিনি, "শুধু সেজানে পিকাসো শুধু তাদেরই বা আলাদা করি কেন···সমস্ত সার্থক পশ্চিমি শিল্পধারার উৎসই হচ্ছে প্রাচ্য, বিশেষ করে ভারতবর্ষ, আলজিরিয়া, মরক্কো থেকেও ঐসব পশ্চিমি শিল্পীরা তাদের ঋণ নিয়ে পরে নিজের ধ্যান ধারণায় জারিত করে মৌলিক শৈলী বলে চালিয়ে পার পেয়ে গেছে। আমরা যাকে টু-ডাইমেনশনাল বা দ্বিতীয়মাত্রিক ছবি বলি—যা নাকি একান্তভাবেই প্রাচ্যের; পশ্চিমি শিল্পীরা তা আত্মসাৎ করে নিজেদের বলে চালিয়েছে। বিশ্বশিক্ষা ও শিক্ষার অভাবে আলজিরিয়া মরক্কো বা অন্যান্য প্রাচ্য দেশের স্থানীয় শিল্পীরা নিজেদের প্রকৃত শক্তি সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই ছিল না—তারা পশ্চিমের এই আত্মস্থ করে নেবার ব্যাপারটা সনাক্ত করতেই পারে নি।" আমাদের প্রধানতম এক আধুনিক শিল্পী প্রাচ্য পাশ্চাত্য রূপবোধের পার্থক্যের ধারণাকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন তার পরিচয় হিসেবেই এই কথাগুলি প্রাসঙ্গিক। শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত অর্জনকে বিশ্বমানবিক উত্তরাধিকার হিসেবে দেখলে কোনো বিরোধ থাকে না আর।

কিন্তু আত্মপরিচয় অর্জনের ত একটা ব্যাপার থাকেই শিল্পের ক্ষেত্রে। নিজের ঐতিহ্যের জমিতে পল্লবিত হয়ে ওঠার বিশেষ সমস্যা। তাকে অস্বীকার করা যায় না। আসলে আত্মপরিচয়ের সমস্যার মূলে থাকে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তা থেকে যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যান শিল্পী, তখনই তাঁর শিল্প নন্দনের মতো ঘুলিয়ে ওঠে তাঁর শিল্পের আত্মপরিচয়ও। এক ধ্যানমগ্ন আত্মস্থতা থেকেই নিজের কেন্দ্রের সন্ধান পান শিল্পী। সেই কেন্দ্র তখন একাত্ম হয়ে যায় তাঁর ঐতিহ্যের কেন্দ্রের সঙ্গেও। ঐতিহ্যের কেন্দ্রে প্রবহমান থাকে যে কৌম সংস্কৃতির চেতনা তার প্রতিফলনেই দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন তাঁর সৃষ্টি।

২

গণেশ পাইনের ছবিতেও এই কৌম চেতনার প্রতিফলন আত্মপরিচয়ের, বা ভারতীয়তার, যদি ভারতীয়তা কথাটি ব্যবহার করতে চাই, প্রধান সূত্র। এই কৌম চেতনাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন আত্মগত ধ্যানের কেন্দ্র থেকে। যে অন্ধকারের কথা বলেছি আগে, যে অন্ধকার যৌথ নিশ্চেতনার গহন অথচ 'বীজকম্প্র অন্ধকার', সেই অন্ধকারেই একীভূত থাকে কৌম চেতনা। সেই কৌম চেতনা থেকে উৎসারিত প্রতিমাপুঞ্জই আত্মগত চৈতন্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে সৃষ্টি করে তাঁর শিল্পের আত্মপরিচয়। লোকায়ত রূপকল্প বলব না একে। লোকায়তের মধ্যে যে সরলতা থাকে, থাকে যে জটিলতা মুক্ত-সরসতার প্রকাশ, গণেশ পাইনের ছবি বা প্রতিমাকল্প কখনোই সেরকম সরল নয়। তাতে থাকে যে দর্শন চেতনার জটিল ও বহুমাত্রিক বিন্যাস, তা এই সময়ের জটিলতারই প্রতিফলন। এই সময় চেতনা ও ঐতিহ্য চেতনা বা কৌম চেতনার সমন্বয়ই সেই আত্মপরিচয়কে বিশিষ্ট করে।

গণেশ পাইনের চেতনায় প্রায় সব সময় সংলগ্ন থাকে এক আত্মসৃষ্ট-নির্জনতার বোধ। এই আত্মগত অস্তিত্বের বাইরে, তিনি অনেক সময় বলেছেন, তাঁর ভূমিকা অনেকটা অভিনেতার মতো। মগ্নতার এই একাকীত্ব তাঁর আশৈশব সঙ্গী। এই মগ্নতাই তাঁকে ঐতিহ্যময় পারিবারিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে একাত্ম করেছে। আশৈশব তিনি মধ্য কলকাতার এক সম্পূর্ণ বাঙালি ঐতিহ্যের যৌথ পরিবারে বড় হয়েছেন। তাঁর ঠাকুমার মুখে শোনা রূপকথার জগৎ শৈশবে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁকে একাত্ম রেখেছে। সেই একাত্মতা থেকে তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে বাঙালি ঐতিহ্যের বিশিষ্ট কিছু বোধ। তাঁর নিজের কথায় বরং শুনি এই একাত্মতার স্বরূপ—"আমার চার পাশে যে রূপ জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল ছেলেবেলায় এ (তাঁর ছবির জগতে আসা) বোধহয় তারই প্রভাব। (বাড়ির) সামনে ঐ যে মন্দির, ওতে গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ মূর্তি আছে, গাঢ় হলুদ গায়ের রঙ, আকর্ণ বিস্তৃত চোখ, উর্ধ্ববাহু, সব মিলে অদ্ভুতএক ভাবের উপস্থাপনা। মনে পড়ে, আমি থেকে থেকেই গিয়ে দাঁড়াতাম ঐ জোড়ামূর্তির সামনে। আর ঐ, ও পাশের বাড়িটা, ওটাও এক পাইনদের, ও বাড়ির ঠাকুর দালানে টাঙান ছিল একটি ওলিওগ্রাফি—অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অদ্ভুত কাল্পনিক এক রচনা।…বিশাল মুখমণ্ডল, ভয়ঙ্কর দর্শন, বিশাল দাঁত, মুখের অভ্যন্তর থেকে অগ্নি তরঙ্গ নির্গত হচ্ছে…ব্যাপারটা পার্থিব সঙ্গতির ধার ধারে না, কিন্তু আমি যখনই ও বাড়ি গেছি তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি ও ছবির সামনে। কেন জানি না অসম্ভব টানতো ছবিটা আমাকে।

ঐ সব ছবি আর মূর্তি, সেই সঙ্গে ছিল ঠাকুমার গল্প।…" ('দেশ'—১৫ মার্চ ১৯৮৬) শৈশব থেকে বাঙালি কৌম চেতনার সঙ্গে এই একাত্মতা তাঁর পরিণত বয়সের রূপ চেতনার মধ্যেও সেই ঐতিহ্যের সংযোগকে অমলিন রেখেছে। তথাকথিত অর্থে কোনো ধর্মীয় ভাবনায় ভাবিত নন তিনি। বলেছেন, "সত্যি বলতে ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নেই, আমাদের পরিবারে কিছু ট্র্যাডিশন চলে আসছে, বহু কালের ট্র্যাডিশন। পরিবারের একজন হয়ে কেমন করে ঐ ট্র্যাডিশনের বাইরে থাকি।" (পূর্বোক্ত উৎস) তথাকথিত ধর্মচেতনার বাইরে এক আধুনিক জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ তিনি। কৌম চেতনাকে আধুনিক জীবন চেতনায় অন্বিত করে নেওয়ার মধ্যেই নিহিত তাঁর ছবিতে ভারতীয়তার আত্মপরিচয়ের স্বরূপ।

তাঁর ছবির বিবর্তন এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয় হতে পারে। এখানে আমরা সে আলোচনায় যাব না। কেবল তাঁর নিজস্বতায় পৌঁছনোর পথটি কিছুটা অনুসরণ করতে চেষ্টা করব। চল্লিশ দশকের পর থেকে আমাদের ছবির আধুনিকতার ভাবনায় বেঙল স্কুল যেমন বর্জিত হচ্ছিল, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের রূপভাবনার সঙ্গেও এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল। গণেশ পাইনের আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অবনীন্দ্রনাথকে নতুন মাত্রায় আবিষ্কার। তাঁর ছবিতে যে মায়াময় আলো বা বিষাদক্লিন্ন ছায়া তার আদি উৎস সম্ভবত অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথকে তিনি দেখেছেন একজন স্বভাববাদী শিল্পী হিসেবে। বলেছেন, "মনে রাখতে হবে অবনীন্দ্রনাথ আসলে ন্যাচারালিস্ট।" আর এই স্বভাববাদিতার জন্যই তাঁকে অনুসরণ করতে হয়েছে মুঘল রীতি। দূরে সরতে হয়েছে পাশ্চাত্য আধুনিকতায় রূপায়ণগত বাস্তব নিরপেক্ষতা থেকে। "রঁদ্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি, কিন্তু কিউবিস্টদের কথায় উদাসীন।" তাঁর ছবিতে কল্পকাহিনী, পুরাণকথা ইত্যাদির আবরণের মধ্যেও "তাঁর সমসময়ের সাধারণ মানুষ প্রকৃতিও যে দারুণভাবে হাজির।" ('লাল নক্ষত্র', শারদীয়, ১৩৯২) পুরাণকল্প ও কাল্পনিকতার মধ্য দিয়েও সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকা, এই সূত্রেই গণেশ পাইন অবনীন্দ্রনাথ থেকে অর্জন করেছেন। এবং এই বৈশিষ্ট্যকে সব সময় বজায় রেখেছেন। তাঁর ভারতীয়তা ও আধুনিকতার সমন্বয়ের প্রাথমিক সূত্র এটাই।

১৯৫৫তে 'জাহানারা' নামে একটি ছবি এঁকেছিলেন। ছবিটিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৭. ৩. ৫৫., এবং স্বাক্ষর রয়েছে কেবল নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে—'গ. প.' এরকম। একেবারে শুরুতে গণেশ পাইন এরকম আদ্যাক্ষর

দিয়ে সই করতেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত কিছু কিছু ছবিতে এরকম দেখা যায়। এরপর থেকে তিনি বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নাম সই করেন এবং বাংলাতেই তারিখ দেন বছরের শেষ দুটি সংখ্যা লিখে। এই ছবিটি দীর্ঘদিন শিল্পীর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল। তাঁর নিজের কাছে অবশ্য কোনো ছবিই থাকে না। অনেক সময় আঁকার আগেই বিক্রি হয়ে যায় তাঁর ছবি। এই ছবিটি ১৯৮৭-র আগস্টে কলকাতার চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে 'সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস'-এর যে প্রদর্শনী হয়েছিল, সেখানে প্রথম প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়েছিল সোসাইটিরই অসুস্থ একজন শিল্পীর চিকিৎসার সাহায্যের জন্য। এখানে বলে রাখা ভাল, ১৯৬৩ থেকে গণেশ পাইন 'সোসাইটি অব কন্টেম্পোরারি আর্টিস্টস'-এর সদস্য। তাঁর ছবি নিয়মিত দেখার সুযোগ হয় সোসাইটির প্রদর্শনীতেই। তিনি কখনো একক প্রদর্শনী করেন নি। 'জাহানারা' ছবিটি এখন পর্যন্ত আমাদের দেখা টেম্পেরা মাধ্যমে তাঁর প্রথম কাজ। ছবিটিতে রয়েছে তাঁর নব্য ভারতীয় রীতির অনুশীলনের প্রথম দিকের পরিচয়। একটি প্রাসাদের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছে আনত চক্ষু দীর্ঘাঙ্গী এক রাজকন্যা। ছবির বিষয়ে এবং আঙ্গিকেও মুঘল অনুষঙ্গ অনুভব করা যায়। চিত্র ক্ষেত্রের বিভাজন, রং-এর পর্দার বিন্যাসে কোমলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয় ছবিটিকে আকর্ষণীয় করে তোলে। পরবর্তীকালে ভারতীয় মরমী সৌন্দর্য চেতনাকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করবেন যে শিল্পী, সেই ভারতীয়তাকে তিনি কেমন করে আয়ত্ব করছেন তাঁর প্রস্তুতি পর্বে, সেই অনুশীলনের নজির হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছবিটি।

এরও আগের ৩১. ১২. ৫৪-তে আঁকা 'তোতা কাহিনী' নামে একটি ছবি আছে কলকাতার ডাঃ প্রকাশ কেজরিওয়ালের সংগ্রহে। জল রং-এ আঁকা ছবিটি। এখানে নব্য-ভারতীয় রীতির সঙ্গে বা অবনীন্দ্র রীতির সঙ্গে এক ধরনের তীক্ষ্ণতার জ্যামিতির যান্ত্রিকতাকে তিনি মিলিয়েছেন। এই দুটি উৎসই ক্রমান্বয়ে একীভূত হয়ে গড়ে তুলবে গণেশ পাইনের নিজস্ব রীতি, যা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব, আমাদের ছবির নতুন এক আত্মপরিচয়ের স্মারক। ১৯৫৬-র 'কৃষ্ণ যশোদা', 'বুদ্ধ ও কৃষ্ণ গৌতমী', ১৯৫৭-র 'রক্তকরবী' বা 'ডেথ অফ এ ড্রিম' এই সব ছবিতে ক্রমে ক্রমে তাঁর জল রং-এর চর্চার মধ্য দিয়ে এক নরম আলো ও সুরেলা স্মিত ছায়ার ক্রম বিবর্তন লক্ষ্য করি আমরা। লক্ষ্য করি ভারতীয়তার সংহতিকে আত্মস্থ করার প্রয়াস। এর মধ্যে ১৯৫৬-র 'দ্য ডিসেন্ট' নামে ছবিটি একটু অন্য ধরনের। অনেকটা গগনেন্দ্রনাথের আলো

আঁধারের সুরেলা সংঘাত, সেই সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরের সরল-রৈখিক জ্যামিতিক তীক্ষ্নতা ছবিটিতে আলাদা এক আবহ রচনা করে। সম্ভবত এই প্রথম।

এই জ্যামিতির সঙ্গে হতাশার স্তিমিত সংশয় মিলে গড়ে উঠেছে 'দ্য ডেথ অব অ্যান এনসেন্ট ম্যান' নামে ১৯৬১-র জল রং-এর যে ছবিটি নানাকারণে তা গুরুত্বপূর্ণ। মৃত্যুচেতনার পদধ্বনি আমরা সম্ভবত এখানেই প্রথম শুনলাম। অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে আলোও এখানে নিরাশার প্রতীকরূপ হয়ে উঠল। ১৯৬২ গণেশ পাইনের প্রথম পর্বের আঙ্গিকের বিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ। এই বছরের 'প্রিন্স' নামে ছবিটিতে তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকের প্রথম পদক্ষেপ অনুভব করা যায়। ছবিটি গুয়াশ বা অস্বচ্ছ জল রং-এ আঁকা। রাজবেশে সজ্জিত এক যুবকের আবক্ষ মূর্তি। মুখের পার্শ্বচিত্র। মাথায় মুকুট। কানে কুণ্ডল। চোখ দীর্ঘ ও আয়ত, কিন্তু অন্ধকারময়। পরিচ্ছদে ও মুকুটে প্রত্নতার আভাস। পেছনের প্রেক্ষাপটে বেগুনি অন্ধকার। তাতে সোনালি ও লালাভ আলোর বিচ্ছুরণ। ছবিটি অনেকটা 'আইকনিক' বা প্রতিমোপম। একটি স্থির প্রতিমার উপস্থাপনায় আঙ্গিক ও প্রকরণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে একটি ভাবের উদ্বোধন ঘটানো হচ্ছে। ছবিটিতে এক দিকে রয়েছে অতীতের জন্য আকুতি, অন্যদিকে বর্তমানের নিঃস্বতার এক বিষাদমগ্ন পরিমণ্ডল। গণেশ পাইনের নিজস্ব রীতির প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমরা।

অভিব্যক্তিবাদী ভাঙন আসতে থাকে ১৯৬২ থেকেই। ১৯৬৩-র 'দ্য ল্যাম্প' নামের ছবিটিতে পাই আলোর নিঃসীমতার মরমী রূপ, 'দ্য হুইসলার' নামে জল রং-এর ছবিতে প্রথম জীবন ও মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সংঘাত। ১৯৬৪-তে আসতে থাকে স্যুররিয়ালিজমের নানা অনুষঙ্গ। এভাবেই আমরা পৌঁছে যাই ১৯৬৬-র 'দ্য সোমনামবুলিস্ট' নামের ছবিটিতে। এই ছবিটিতেই আমরা প্রথম পাচ্ছি এক রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারের অনুষঙ্গ। এর মধ্যে রয়েছে অভিব্যক্তিবাদী ভাঙন ও স্যুররিয়ালিজমের বাস্তব অতিক্রান্ত স্বপ্নময়তা। নিরাশার অভিব্যক্তিময় একটি মুখের মধ্য দিয়ে এক নিঃশিগস্থ যুগের প্রতীক স্বরূপ হয়ে উঠছে ছবিটি।

এ ভাবেই গণেশ পাইন তাঁর ছবিতে আত্তীকৃত করেছেন আবিশ্ব উত্তরাধিকার। কিন্তু বাইরের সমস্ত ছায়াই এসে মিলেছে তাঁর অকৃত্রিম বাঙালিত্বের মধ্যে। বাংলার আবহমানের কৌম চেতনা, তার সংস্কৃতির সারাৎসার আবিশ্ব অর্জনে সমন্বিত হয়ে সৃষ্টি করেছে তাঁর একান্ত নিজস্ব শিল্প-রূপ, বিশিষ্ট এক আঙ্গিক প্রস্থান, ঠিক যে রকম রূপ আর কোথাও নেই, ছিল

না কখনও। সেই শিল্পরূপের সম্পূর্ণ স্ফুরণ ঘটতে পেরেছে সত্তরের দশকে। যে-বিশিষ্ট আঙ্গিক প্রস্থানের জন্য গণেশ পাইনের খ্যাতি তা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়েছে সত্তরের দশকে। এই সব শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করা যায় দৃষ্টান্ত হিসেবে। দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারিতে আছে ১৯৬৭-এর 'মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড', ১৯৭১-এর 'হারবার', কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ১৯৭২-এর 'দ্য ফিশারম্যান', ১৯৭৪-এর ছবির মধ্যে কলকাতার 'অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস'-এ আছে 'দ্য ব্লু হার্ব', দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারিতে 'ড্রিম', ১৯৭৫-এর 'ফুট প্রিণ্ট' ও ফুট প্রিণ্টস' নামে দুটি ছবি যথাক্রমে এইচ. পি. লোহিয়া ও ডাঃ মুকুন্দ লাট সংগ্রহের। ১৯৭৭-এর 'কনভারসেশন', '৭৮-এর 'দ্য টিথ', 'বিফোর দ্য চ্যারিয়ট', '৭৯-র 'অ্যাসাসিন' যথাক্রমে এইচ. পি, লোহিয়া, ডাঃ কেজরিওয়াল ও ভিক্টর ব্যানার্জীর সংগ্রহের। এই ছবিগুলোর মধ্য দিয়েই গণেশ পাইন প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজস্ব এক আঙ্গিক ও নিজস্ব এক দর্শন। সমাধান খুঁজেছেন ছবিতে সমকালীন ভারতীয়তার আত্মপরিচয়ের সমস্যার।

## ( চার )

### সময় ও সমকাল

গণেশ পাইনের ছবিতে বাস্তবতা নেই, এরকম একটা ধারণা অনেকের মধ্যেই আছে। তাঁর নিজের অনেক উক্তিও অনেক সময় হয়ত প্রশ্রয় দিয়েছে এ ধরনের ভ্রান্তিকে। যেমন, ১৫ মার্চ ১৯৮৬-র 'দেশ' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, "আমি চেষ্টাও করেছি রিয়ালিটি ধরে কাজ করতে, কিন্তু পারি নি।...এক মুচিকে একবার আঁকলাম, মুচি আর মুচি রইল না, হয়ে গেল দার্শনিক। আরও দু-একখানা ছবি এঁকেছিলাম কিন্তু রিয়ালিটি প্রকাশ করতে পারি নি। ও পথ আমার নয়। দেখুন, বাস্তবকে সহ্য করতে পারি না, মাঝে মাঝে এমন বাস্তবের রূপ দেখেছি, না পালিয়ে উপায় থাকে নি।" ২ জুন ১৯৮৬-র 'আজকাল' পত্রিকায় বলেছেন—"না। টপিক্যাল কোনো সমস্যা নিয়ে ছবি আঁকতে তেমন অনুপ্রাণিত বোধ করি না আমি। মানুষ হিসেবে, ভারতের নাগরিক হিসেবে রিঅ্যাক্ট করি ঠিকই। কিন্তু শিল্পী হিসেবে তেমন করি না।" আবার ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৭-র যুগান্তরেঃ প্রশ্ন ছিল, সমকালীন বিষয় নিয়ে আপনি এত ভাবেন, অথচ সমকাল নিয়ে ছবি আঁকেন না কেন?" তাঁর উত্তর—"আঁকি না বিরক্তির জন্যে, ক্রোধের জন্যে।" এর

পরের বাক্যেই অবশ্য তিনি এমন কথা বলেছেন যাতে আলোকিত হয়ে ওঠে তাঁর সমগ্র দায়বোধের ব্যাপারটি, সমাধানের সূত্র উঠে আসে এই সময়ের শিল্পে বাস্তবতাবোধের জটিল সমস্যারও। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে আর একটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখি, কেমন করে এই সমস্ত উক্তিকে তিনি নস্যাৎ করেছেন। নস্যাৎ করেছেন, যাঁরা তাঁর মুখ দিয়ে বের করতে চান এ কথা যে, বাস্তবতা নেই তাঁর ছবিতে, তাঁদেরও। ২ জানুয়ারি ১৯৮৮-র 'দেশ' পত্রিকায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আসলে কী জানেন, প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে কোণঠাসা হয়ে বলেছিলাম। ঠিক আছে, আমি কল্পনাবিলাসী অলীক মিথ্যা নিয়েই থাকি। কিন্তু ব্যাপারটা সর্বৈব সত্যি নয়। মনের ভিতরে একটা ক্রিস্ট্যালের মতো কিছুতে বাইরের জগতের সব ছাপ তো পড়ছে।...তবে পড়ে প্রতিসরিত হচ্ছে। হয়ে একটা কেন্দ্রগত বোধের মধ্যে একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেইখান থেকেই আমার বেশিরভাগ ইমেজারিগুলো উঠে আসে। তার মধ্যে শুধু কল্পলোকের বাহার আছে, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুল দেখেন, তাঁদের সঙ্গে আমার তর্ক নেই।"

বাস্তবতার যে আটপৌরে রূপ আমরা সব সময় দেখতে অভ্যস্ত শিল্পের বাস্তবতা তা থেকে আলাদা, এটা আজ আর তেমন করে বলবার মতো কোনো কথাই নয়। তবু শিল্পের অনুভবে অনেক সময় বিপর্যয় ঘটে এরকম ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও। গণেশ পাইনের ছবিতে বাস্তবতা নেই যে অর্থে পৃথিবীর যে কোনো মহৎ শিল্পেই বাস্তবতা থাকে না। এটা বাস্তবতার একটা মাত্রা। অন্য অর্থে, চলমান ঘটনা প্রবাহের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন থাকে না তাঁর ছবিতে, বাস্তব নিরপেক্ষতার তা আর একটা মাত্রা। পৃথিবীতে এরকম আলোকিত যুগ কখনো কখনো আসে যখন শিল্পী সময়ের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন। সময়ের মহত্তর আহ্বান যখন শিল্পীকে উদ্দীপিত করে। আমাদের এই সময়ে সেরকম কোনো আলো নেই। তাই সমকাল কেন হয় না তাঁর ছবির বিষয় পূর্বোক্ত এই প্রশ্নের উত্তরে গণেশ পাইন ক্রোধের কথা বলেন। "আমি ঈর্ষা করি সেইসব শিল্পীদের, যাদের সামনে সময়ের বিপুল আহ্বান ছিল। মাইকেল এঞ্জেলোর 'ডেভিড' তেমনি একটা সময়ের সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন ভাগ্যবান। তিনি ভারতমাতা এঁকেছিলেন। আমি আঁকবো না। কারণ আমার সামনে সেই সময় নেই। মহৎ মানুষের জন্ম নেই মৃত্যু নেই।"

এই শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশক পর্যন্ত জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের যে

আলো ছিল, চল্লিশের দশক থেকে ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে আসতে থাকে তা। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্রমবর্ধমান হতে থাকে সেই ক্ষয়। সেটাও আজ আর নতুন করে জানানোর মতো কোনো কথা নয়। এই সময়ের মধ্যেই এখনো আমরা আছি। ষাটের দশকের কোনো সচেতন শিল্পীর পক্ষে তাই মূল্যবোধের এই অবনমন, মানবিক অস্তিত্বের এই বিপন্নতাকে এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই গণেশ পাইনের ছবির জগৎ অনেক সময়ই মৃত্যুতে পরিকীর্ণ থাকে। জীবনের স্বাভাবিক প্রবহমানতার মধ্যে হঠাৎই উঠে আসে ভয় ও মৃত্যুর প্রতীক। স্বপ্নের রাজকুমারের ছবি আঁকেন, তার সঙ্গে থাকে ঘোড়া। সেই ঘোড়ার চক্ষু ভয়াল কোটর স্বরূপ। অন্ধকার। তার দেহ নেই, আছে দেহের ভয়াল। (দ্য প্রিন্স, ১৯৬৭) যে যুবক তাঁর সমস্ত অর্জন আগলে দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁর চোখে যৌবনের দীপ্তি থাকে না। থাকে বরং এক ভয়ের শূন্যতা। চেয়ারের উপরের অংশ তাঁর বুকের কাছে এসে বুকের খাঁচার অস্থি-সংস্থানের সঙ্গে মিলে তাঁর শরীরে মৃত্যুর ছায়া ঢুলিয়ে রাখে। প্রেক্ষাপটের মেঘের অন্ধকার থেকে সূর্য কি হয়ে ওঠে যেন ঝুলন্ত এক ফাঁসির বৃত্তাকার বন্ধন? ('হিজ বিলংগিংস', ১৯৭৩) সূর্যোদয়ের আগের অপ্রাকৃত তমসায় নদীতে জাল ফেলে অনন্ত প্রতীক্ষায় থাকে ধীবর। তাঁর জাল হয়ে ওঠে পঞ্জরাস্থির বিচিত্র এক নির্মাণ। ('দ্য ফিশারম্যান', ১৯৭২) চায়ের কাপ সামনে নিয়ে নিঃসঙ্গ বসে থাকে একজন যুবক। পেছনে বেয়ে যাওয়া নীল লতা সময়ের সঞ্চরমানতার কথা বলে। যুবকের বিষাদমগ্নতা তাতে কোনো দীপ্তি পায় না। বরং তাঁর শরীরের আবরণ ভেদ করে ভেতরের কঙ্কাল দৃশ্যমান হতে থাকে। ('দ্য ব্লু হার্ব', ১৯৭৪) হিংস্র কোনো পশুর উন্মুক্ত মুখগহ্বরে দৃশ্যমান দন্তপংক্তি বিভৎস হিংস্রতার প্রতীকস্বরূপ হয়ে ওঠে। (দ্য টিথ, ১৯৭৮) আকাশের রং-এর প্রদীপ্ত যে নীল, তা কত অন্ধকারময় হতে পারে দেখে বিমূঢ় হই আমরা যখন সেই প্রেক্ষাপটে উদ্যত অসি হাতে এক ঘাতককে দেখি। তাঁর শরীরে স্ত্রী পুরুষের সমাহার। তাঁর চোখে মুখে মৃত্যুর নির্লিপ্ত শীতলতা। তাঁর সামনে পড়ে থাকে কোনো কষাইখানার কংকালের রাশি। উদ্যত অসি নিয়ে সে কিসের প্রতীক্ষা করে? ('অ্যাসাসিন', ১৯৭৯) একজন মল্লযোদ্ধা তার একক অস্তিত্বের প্রদর্শনপরায়ণতায় হয়ে ওঠে শক্তির দম্ভের মূর্ত প্রতীক। ('এ রেসলার', ১৯৭৯) একক নিঃসঙ্গ এক পাখির প্রতিমা কেবল রেখার অঙ্কনগত সঙ্কলনের বিমানবিক তীক্ষ্ণতায় হয়ে ওঠে ঘনায়মান কোনো কালো ছায়ার প্রতীক। ('দ্য বার্ড', ১৯৮৪) এমন কি

নীল নৌকায় অনন্ত অন্ধকার পাড়ি দিতে চলেছে যে মানুষ, যে সাঁকো পেরিয়ে সে পৌছতে চায় নৌকায়, সেই সাঁকো হয়ে ওঠে কোনো মৃত মানুষের পরিত্যক্ত কঙ্কাল। ('ব্লু বোট', ১৯৮৩) 'আঁধার কেশভার' আলুলায়িত মেলে দিয়ে অসীম জলাশয়ে কলসি থেকে জল ঢেলে যায় যে মায়াবী নারী, এমন কি তারও প্রেক্ষাপটে আকাশে ভাসমান থাকে মৃতের করোটি বা চোয়ালের দুই অংশ। ('পিচার', ১৯৮৫)

এরকম মৃত্যুর প্রতীক ছড়িয়ে থাকে তাঁর ছবির পর ছবিতে। এতে কি থাকে না সময়েরই অমোঘ ছায়া? ১৯৭৮-এর সেই জন্তুর উন্মুক্ত দন্তপংক্তির হিংস্রতা বা '৭৯-র সেই মুক্ত অসি হাতে ঘাতক কি সেই সময়েরই, সেই সময় সঞ্জাত বাস্তবতারই সারাৎসার হয়ে ওঠে না? বিমানবিকতার এই প্রতীকপুঞ্জে তাঁর কর্মের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নভাবে সংস্থাপিত হয় না। তাঁর ছবিতে দুটি প্রবণতার কথা তিনি বলেছেন—একটি ন্যাচারালিস্টিক, অন্যটি জ্যামিতিক বা কিউবিস্টিক। এই 'কিউবিস্টিক' ধারার মধ্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার অর্জন আত্তীকৃত আছে। কিউবিজম বাস্তবতার তথাকথিত সরল বিন্যাসকে অস্বীকার করেছে। বস্তুর যে অংশ দৃশ্যমান নয়, তাকে দৃশ্যের মধ্যে এনে বস্তুর সত্তায়ও সে ঘটিয়েছে এক রূপান্তর। রেখা এমন জ্যামিতিক বিন্যাসের তীক্ষ্ণতায় বিন্যস্ত হয়েছে যে তাতে তার স্বাভাবিকতা ভেঙে গিয়ে ঈপ্সিত অন্য অর্থের দ্যোতনা এসেছে। এই দ্যোতনা প্রায়ই এক যান্ত্রিকতার দ্যোতনা। প্রকৃতির অন্তর্লীন মানবিক সত্যকে সে বিমানবিকতার দিকে নিয়ে গেছে। কিউবিজম তার উৎস মুহূর্তে ছিল অবশ্য মানবিক চৈতন্যের জয় ঘোষণারই শিল্প আঙ্গিক। জন বার্জার তাঁর 'মোমেন্টস অব কিউবিজম' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত কিউবিজমের বিকাশের সময়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব দিগন্ত উন্মোচনের সময়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। মানুষ তাঁর ক্ষমতার ও চৈতন্যের বিকাশকে যখন অপরিসীম ভাবতে পারছে, সেই অপরিমেয়তার দৃশ্য-ভাষা তখন সে আবিষ্কার করেছে কিউবিজমের মধ্যে। কিন্তু ১৯১৪-র বিশ্বযুদ্ধ মানুষকে তাঁর চৈতন্যের শীর্ষভূমি থেকে এক তমসাময় গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল। আলোর সম্ভাবনার দিগন্ত হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে আঙ্গিক, তাই তখন ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল অন্ধকারের ভাষায়। কিউবিজমের জ্যামিতিকতা তখন এক বিমানবিক যান্ত্রিকতার ভাষায় পরিণত হল। তা হয়ে উঠল বিমানবিকতার বিরুদ্ধে শিল্পীর প্রতিবাদের এক হাতিয়ার। এই প্রতিবাদকে পিকাশো অমর করেছেন

তাঁর 'গুয়ের্নিকা'র চিত্রভাষায়। একটি নিরীহ বিড়ালের মুখের কিউবিজমধর্মী ভাঙন তাঁর ছবিতে হয়ে উঠতে পারে ফ্যাসিজমের মূর্ত প্রতীক।

আমাদের শিল্পীরা কিউবিজমের জ্যামিতিকে নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এমন কি আপাত লোকায়তিক সরলতার মধ্যে বা ধ্রুপদী স্থৈর্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিমানবিক যান্ত্রিকতা বোঝাতে একে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বদ্রিনারায়ণ বা জাহাঙ্গির সাবাভালার মতো সুষমার শিল্পীরাও। গণেশ পাইন এই কিউবিজমের জ্যামিতিকে বাংলার কৌম সংস্কৃতির পুরাণকল্পের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর নিজস্ব এক প্রতিবাদের ভাষা গড়ে তুলেছেন। এভাবে শিল্প-আঙ্গিক দিয়ে তিনি করেছেন সময়ের ও বাস্তবতার বিশ্লেষণ। তাঁর 'আইকনিক' প্রতিমাগুলি বাস্তবতার উপরিস্তরের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ না রেখেও হয়ে উঠতে পেরেছে বাস্তবতারই অবিচ্ছেদ্য মাত্রা। বাস্তবতার বিশ্লেষণ। এখানেই শিল্পী হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব।

কিন্তু গণেশ পাইনের সময় চেতনার বিশেষ ব্যতিক্রম এখানেই যে তাঁর ছবি কেবল নিখিল নাস্তির গর্ভেই শেষ হয়ে যায় না। তাঁর সমস্ত অন্ধকারই এক প্রভাময় আলোর দ্যোতনায় দীপ্ত। প্রকৃতির সমস্ত প্রবাহের মধ্যে "একটা সর্বগ্রাসী সৌন্দর্য, সর্বব্যাপী একটা ব্যালান্সকে আবিষ্কার" করেন তিনি। এই 'ব্যালেন্স'ই তাঁর ছবিতে ধ্রুবতারার মতো এক সদর্থকতার আলো জ্বেলে রাখে। আবার সমস্ত সদর্থকতার মধ্যেই, মানুষের সমস্ত সফলতার মধ্যেই থাকে এক স্তিমিত বিষাদ। সত্তার অনিবার্য সীমাবদ্ধতা তাঁর সমস্ত আপাত সার্থকতাকে ছায়াময় করে দেয়। "একটা বস্তু তার নিজস্ব অস্তিত্ব অস্তিত্ববান এবং সেই সম্পূর্ণ অস্তিত্বকে অনুভব করার মতো আমাদের কোনোরকম অধিকার দেওয়া নেই। আমাদের চেতনার সেই ক্ষমতাই হয়ত নেই।" এই যে দ্বৈত, এক দিকে "সর্বগ্রাসী সৌন্দর্য' অন্যদিকে সমস্ত সৌন্দর্যের পরিণাম-হীনতা, এক দিকে অন্তহীন হয়ে ওঠা, অন্যদিকে অর্থহীন ক্ষয়, সীমাহীন নষ্ট হয়ে যাওয়া, এই দ্বৈতের দর্শনই কি গণেশ পাইনের ছবিতে আলো ও অন্ধকারের, জীবন ও মৃত্যুর প্রতীক হয়ে উঠতে থাকে?

এই দ্বৈত মানবিক সত্তার দুই ভিন্ন প্রকাশের দ্বৈতের মধ্যে মিলে যায়। অ্যাপোলেনিয়র বলেছিলেন, শিল্পী আছে দুরকম। একদল প্রকৃতিরই মতো। আবেগের অনিবার্যতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় তাঁদের সৃষ্টি। মেধার নিয়ন্ত্রণ সেখানে গৌণ। আর এক দল প্রেরণায় বিশ্বাসী নন। মেধার তীক্ষ্ণতা

দিয়ে সচেতনভাবে তাঁরা গড়ে তোলেন রূপ। প্রকৃতির 'সর্বগ্রাসী' সৌন্দর্য কখনও সময়ের তাৎক্ষণিক মলিনতা থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। আবার বুদ্ধির প্রাবল্যে কখনো শিল্পে ফর্মের সর্বস্বতা আরাধ্য হয়ে ওঠে। এই দুই বিচ্ছিন্নতা থেকে কিভাবে শিল্পী বাঁচাবেন নিজেকে, বিশেষত সেই যুগে যখন শিল্পীর সামনে থাকে না কোনো "সময়ের বিপুল আহ্বান"? তখন ঐতিহ্যই তাঁকে বাঁচায়, ঐতিহ্য দিয়ে যদি তিনি সময়কে জয় করতে পারেন। যদি মনন দিয়ে তিনি মেধার নৈর্ব্যক্তিক শুষ্কতাকে জয় করতে পারেন। গণেশ পাইন এক নিবন্ধে একবার লিখেছিলেন, "পাস্কাল বলেছিলেন : হৃদয়েরও একটা যুক্তি আছে, বুদ্ধি যার খোঁজ রাখে না। তেমনি একথাও হয়ত বলা যায়, বুদ্ধিরও একটা হৃদয় আছে, হৃদয় যার খোঁজ রাখে না।" (লাল নক্ষত্র, শারদীয়, ১৩৯২) মেধাও মননের এই অন্বয়ের মধ্য দিয়েই কি এই শিল্পী আবিষ্কার করেছেন সেই 'ব্যালেন্স' যা এক প্রান্তে সৃষ্টি, আর এক প্রান্তে ক্ষয়, এই দুই এর মধ্যে মানবিক সত্তার অমলিন দীপ্তির শিল্পরূপ দিয়ে যায়। হৃদয়বান মেধা—এই যেন তাঁর সৃষ্টির মূল সুর।

'বয় অ্যাণ্ড দ্য পেইন্টেড হর্স' সেই 'ব্যালেন্স'-এরই শিল্পরূপ। সত্তার অনিবার্য ক্ষয় থেকে এখানে এক উত্তরণ। মৃত্যু পেরিয়ে জীবনের আহ্বান। শিশুর সামনে বাস্তবের ঘোড়া নেই। কিন্তু তাঁর স্বপ্নের ঘোড়া তাঁর চোখকে, তাঁর সত্তাকে দীপ্তিময় করে রাখে। ছায়াময় এক দীপ্ত। শূন্যতার সঙ্গে যার নিয়ত টানাপোড়েন।

এই টানাপোড়েন কেমন ভাবে রূপান্তরিত হবে, এই জিজ্ঞাসা তাঁর পরবর্তী বিবর্তনের দিকে আমাদের উন্মুখ রাখে।

## সার্কাসময়দানের ভূত

শিবশম্ভু পাল

সেদিন বন্ধুর বাড়ি ঘণ্টাদুই আড্ডা দিয়ে যখন বেরই
দরজার চৌকাঠ থেকে প্রস্থানের রাস্তা যেন চৌমাথার মোড়
চারজনে আমরা চারদিকে
কে যে কোনদিকে গেল, সব রাস্তা একরকম, সবখানে একই
দুরূহ প্রদোষছায়া, একটু আগেও ছিল আকাশে আশ্বাস
প্রকাশ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, একটু আগেও ছিল সরব বাতাস…

বেরিয়ে আসার পর কে কী বলেছি আমরা কিছু মনে নেই
না থাকারই কথা, দাঁতে-লেগে-থাকা
মাংসের আঁশের মতো দুএকটা কৌতুকের প্রসঙ্গবিহীন কোটেশন
দুএকটা ভাজা মৌরি—আর কিছু নয়
তারপর অতীন্দ্রিয় নিরক্ষর জিভের কমপ্লেকস :
একসময় খসে যায় সেই ক্ষীণ অবশেষ, যেন
মেঘময় অন্তরীক্ষে দুএকটি শব্দের ক্ষণপ্রভা
আঁধার বাড়িয়ে দেয় প্রস্থানপথের, নাকি পথের প্রস্থানে ?

বন্ধুর বাড়িটি ক্রমে পিছিয়ে যায় যতই এগোই
যেতে যেতে ভেতরের অন্ধকার উনুনের ধোঁয়ার মতন
আমার সর্বাঙ্গ থেকে ভলকে-ভলকে
বাইরে বেরিয়ে আসে, সমস্ত শরীর শুধু পাকদণ্ডী গ্রিড
তলায়-তলায় থাকে জ্বলন্ত কয়লার মতো আতঙ্কের হিমাক্ত শিহর ॥

তারপর বৃষ্টি নেমে গেল।
ছুটে কোনো লাভ নেই। নদী মোহনার মতো প্রান্তরেখাহীন

গম্ভীর প্রান্তরে আমি ভিজে যাই অপ্রাকৃত নবধারাজলে
ফাঁকা মাঠ, সিগারেট, দেশলাই, আমি
চেতনাচেতন এই পদার্থের চতুরঙ্গে একটাই সামান্য ধর্ম ;
সবকিছু ভেজা।
দুঃখ এই, সিগারেট থাকলেও ধরানো গেল না
ধোঁয়ার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে অভাগীর স্বর্গে যাওয়া যেত !

আমার পুঁথিগত প্রবেশপ্রস্থান বিদ্যায়
ছিল না সাঁতারের কোর্স
সদর খোলা থাকে, কিছুটা সিঁড়ি ভাঙাভাঙি
কিছুটা বৃথা আপশোষ।

জেনেছি সভাগৃহ, সবান্ধব খানাপিনা
ভিক্ষা দিই বেছে বেছে
অন্ধ-খঞ্জকে, ওরাই নরনারায়ণ
বাতাস সুখে বয়ে গেছে।

অথচ বন্ধুটি ভীষণ নাস্তিক, বলে :
সরলীকরণের অসুখ।
আঁধার নিয়ে আছে অনেক পাঠভেদ, মানুষ
একটু নীচে গেলে পশু।

আরও যে কীসব বলেছিল, বড় বেশি অসংলগ্ন, কখনো কারণ
উল্লেখ করেই থামে, কখনোবা কার্য বলে, কারণ বলে না
মাঝখানে খোসগল্প, প্রসঙ্গবদল ঘনঘন
প্রায়শই সংলাপে মহিলা জরিপ হয়, ঢুকে পড়ে মুড়ি তেলেভাজা
আমরা মজেছিলাম ইতস্তত শহরে কৌতুকে
থেকে থেকে ফুলকি ওঠে, উড়ে গিয়ে নিভে যায় মূর্খ শূন্যতায়…
বস্তুত বন্ধুর জিভে ভাষার পালিশ যত, অবিন্যাস তার ঢের বেশি
বুঝেছি সমস্ত তার অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, দ্বিধান্বিত, স্ববিরোধে ভরা
গ্রহণবর্জনে ঘিঞ্জি, কাটাকুটি থেকে
কখনো পাখির ডানা, কখনো বা গাছপালা, মানুষের বাঁকা প্রোফাইল

বিভিন্ন বিষয়ে তার এত খশড়া, খশড়াই শুধু—
আমাদের ক্রমাগত পোড়াতেই হয় সিগারেট
বুঝতে পারি, ফাণ্ডা বলে ওর কিছু নেই।

তবুও যেটুকু বলে আওয়াজটা কমবেশি বক্ষভেদী বটে
প্রাক্তন নায়ক যেন ছিঁড়ে ফেলছে দিস্তে দিস্তে প্রেমপত্র, আর
কখনো বা চড়চড় করে
পাতাপোড়ানোর শব্দ, গির্জার ঢং ঢং নিশীথে গম্ভীর,
প্রায়শই ঝলকায় ইটিওঘাটের পড়ে কাঁটাতার, মাঠ
হিমেল পার্বত্যদেশ, কুয়াশাবিভোর
বিদ্যুৎপ্রতিম কাঁপে স্যানাটোরিয়াম, দুর্গপ্রাসাদের অলিন্দ-আহ্বান
তবুও যেটুকু বলে পাঁচিলে রক্তের ফিনকি ছিটকে যায়, ত্রিশূলের ডগা
চকচক করে ওঠে জিজ্ঞাসার কপিশ আভায়।
বিশ্বাস্যতা পেয়ে যায় বন্ধুবর এবং সমীহা।

মেঘে ঢেকে আছে আকাশ    মেঘ ঠিক বলা যায় না
দমকা হাওয়ায় অশ্লীল হাসি রাতদুপুরের হায়না।
কোনোখানে বাঁক নেই    রাস্তা গিয়েছে সোজা
সোজার অর্থ জটিল ছলনা, বলেছিল পদ্মজা।
উত্তর কোনদিকে?    কোনদিকে দক্ষিণ?
একা হয়ে যাই, একা হয়ে যাই প্রিয়বান্ধবীহীন।
কার বাড়ি গিয়েছিলাম?    সে কি ছিল হানাবাড়ি?
মনে পড়ে গেল বন্ধুকে গিলে খেয়েছিল মহামারী।

কে তুমি দিগন্ত ফুঁড়ে বলে উঠলে, মামন্তুসর
কে তুমি স্থবির জীর্ণ ছিন্নপত্র বলে উঠলে, মামন্তুসর
কে তুমি দমকা হাওয়া বলে উঠলে, মামন্তুসর

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই, পায়ের তলায় অবলুণ্ঠিত করঙ্কে সিঁদুর
ভাঙাঘট, শুকনো জবা, ঘিয়ের অস্পষ্ট গন্ধ, টুকরো পোড়াকাঠ
কতক্ষণ পথ হাঁটছি, আলো নেই, অন্ধকারও নেই

চোখে যেন চোখ নেই, নির্বাচন নেই কোনো পলক ফেলার
পায়ে যেন পা নেই, দূরান্তিক নিয়ন্ত্রিত রোবটের লোহা
একাকিত্বে নেই কোনো ধূপছায়া বিষাদের সাবেকি লিরিক।

ভূতের অসাধ্য কিছু নেই, তার ভূমতলে ব্যস্ত নেটওয়ার্ক
বিপণন করে থাকে ছায়ানিরোধক ক্রিম, সুগন্ধি, গৈরিক
পানের দোকানে পাবে অথবা বন্ধুর ভাঙা হিতোপদেশেও।

অনন্ত নিষ্ফলা মাঠে একটা যদি ভাঙা নীলকুঠি
ঘূর্ণির মতন ওড়ে পরকীয়া আমন্ত্রণ, মুর্গির পালক, শালপাতা
পেঁয়াজের খোসা, কানা ভিখিরির আর্ত সরু হাত।

তারপর ছুটে আসে স্পষ্টতর হেডলাইট, চাকা
আলোর সরলরেখা ছেদ করে কোনাকুনি আমার পাঁজর
সমস্ত ধূসর কেটে ওই ত কণ্ডাকটার হাতছানি দেয়—

অরোরাবোরিয়ালিস, শোকের রাত্রির মতো এ মাঠেরও অবসান আছে।
এখন ফিরেছি ঘরে মাত্রাগোনা পয়ারের অন্ত্যমিলে অথবা অমিলে!
স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক
হাতের নাগালে জানলা, ছিটকিনি, পায়ের কাছেই
হাওয়াই চপ্পল, যাও, বাথরুম যাও।

হাসি পায়। হাসি ত পেতেই পারে, যেহেতু এখন
আমার ঘামের সঙ্গে বাতাসের ঘরোয়া সংগতি
বাতাসের সঙ্গে থাকে ব্যাণ্ডেলের মাপাজোখা দয়া
এর মধ্যে চমৎকার নির্ভরতা তৈরি হয়ে যায়
সবকিছু পরস্পরে জুড়ে যায় স্পর্শগ্রাহ্য মিলনের আষাঢ়েশ্রাবণে
এখন চাইতেই পারি পর্দার ওপাশে গিয়ে ঃ এককাপ চা।

সার্কাস ময়দান, তুমি এত ফাঁকা কেন
যে-ফাঁকে গল্পের গরু গাছে উঠে চরিত্রহনন করে আমার বন্ধুর?
প্ররোচনা দিয়েছিল আমাদের একক প্রস্থান।
অন্ধকার আকাশের নিঃশব্দ তারার নীচে থমথমে শ্মশানের হাওয়া।

হাওয়ায় জীবাণু ছিল রাত্রিচর সন্দেহের হাতে
দশবছর আগেকার ঘড়ি ছিল, বুকপকেটে মাত্র পাঁচ টাকা।
হাসি ত পেতেই পারে এখন।
রাত্রি গাঢ়তর হল, সাঙ্গ হল নৈশাহার, সহশয্যা হবে
এবার বাড়িয়ে দিই পাখার ঘূর্ণন। তারপর বেডসুইচের
অভিমুখে যেতে গিয়ে হঠাৎ চমকে যাই, দেয়ালে কী দেখি!

–কনভোকেশনের ফটো কাত হয়ে ঝুলে আছে কেন?

# অনন্যপ্রস্থান

সমরেশ রায়

সিদ্ধার্থ

কিসা

প্রজাবৃন্দ

সময় : শেষ বৈকাল

স্থান : কপিলাবস্তু নগরীর অরণ্যস্পর্শী উদ্যান

প্রথম প্রজা : এখানে-ও তিনি নেই ! তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে ?
আজকে এই শুভদিনে-ও বিজনে-নির্জনে-নদীতীরে—
একাকী ঘুরে বেড়াবেন তিনি ! কি তাঁর দুঃখ ?

দ্বিতীয় প্রজা : রৌদ্রতাপে ক্লিশিত বসুন্ধরা-বুকে শ্যামল মেঘচ্ছায়ার মতো—
হয়তো কোন দূর ক্ষেতের ধারে
কুশল জিজ্ঞাসায় কর্ষকের শ্রান্তি হরণ করছেন ;

তৃতীয় প্রজা : রোহিনীর স্রোতঃপথ ধরে, অরণ্য গভীরে বনদেবতার মতো
হয়তো চলেছেন একাকী, উদাসীন ! কেন তাঁর ঔদাসীন্য ?
আমরা কি করে তাঁকে পাবো. স্বইচ্ছায় তিনি দেখা না দিলে !

চতুর্থ প্রজা : বার্তাবহরা সকল সম্ভাব্য স্থানে তাঁর সন্ধান করছে,
সঙ্গীহীন তিনি কোথায় কেউ জানে না—

প্রথম প্রজা : তাঁকে জনকত্বের সংবাদ দান আমাদের উদ্দেশ্য নয়,...
তিনি তা জানবেনই—
যেমন করে মহীরূহ পায় ঝড়ের সংকেত,
গর্ভিনী মেঘ জানে মৃত্তিকার তৃষ্ণা,
পক্ষীকূল জানতে পারে প্রভাত অন্তিম !

আমরা শুধু প্রণাম জানাবো, আশীর্বাদ চাইবো—এইমাত্র

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রজা : ও-ই ওই তিনি আসছেন

প্রথম প্রজা : স্নিগ্ধ তেজে দীপ্ত পূর্ণচন্দ্রমার মতো, ধীর পদক্ষেপ,
মনস্কতাহীন দৃষ্টি যেন ঝড়াক্রান্ত পক্ষীশাবক !
বিশদ বস্ত্রে দেবোপম—
বর্ণের উজ্জ্বলতায় কণ্ঠের হীরকমালা বিষন্ন;
সেই বিষন্নতাই মৃদু ছায়ার মতো তাঁর মুখে ! তিনি উদ্বিগ্ন !

( সিদ্ধার্থের প্রবেশ )

সমবেত : জয় হোক যুবরাজ, জয়ী হোন রাজা শুদ্ধোধন,
দীর্ঘজীবী হোক এই শিশু, আশীর্বাদ করুন দেবতা,
বৃষ্টিস্নানে ভিজুন পৃথিবী, শস্যসজ্জা করুন মৃত্তিকা—
মাতা হোক সব বন্ধ্যা নারী, প্রিয় পাক প্রোষিতভর্তৃকা ।

সিদ্ধার্থ : আমি সংবাদ শুনেছি, নগরী থেকে এ-তো দূরে এসেছো
এই সংবাদ দিতে ?

প্রথম প্রজা : গর্বিত জনককে আমাদের স-প্রণাম অভিনন্দন

সিদ্ধার্থ : তোমাদের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ

দ্বিতীয় প্রজা : আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী আমরা

তৃতীয় প্রজা : সুখ-সংক্রামিত আমরা যেন আপনার বেদনার-ও অংশী হতে
পারি

সিদ্ধার্থ : বেদনার অংশ দেওয়া যায় ? বেদনা এমন আচম্বিতে আসে—
এই শিশুর জন্মের সঙ্গে যেমন আনন্দ ?

চতুর্থ প্রজা : বেদনাও আপনার কারুণ্য লাভ করুক—আমাদের মতো

সিদ্ধার্থ : সুখের প্লাবন আসে, দুকূল ভাসিয়ে স্মৃতি রেখে দ্রুত নেমে যায়,
—যেমন বর্ষায় রোহিণী ;
বেদনা বিন্দু বিন্দু জমে বুকের গভীরে—
তার অংশ কি করে বা দেওয়া যায়—কি করে বা নেবে ?
আনন্দ—যদি কিছু থাকে তোমাদের হোক, বেদনা আমারই
থাক ।

তৃতীয় প্রজা : শুধুই সুখের অংশী হলে বিবেকের কাছে অপরাধী হবো ;
দুঃখ কি অবিভাজ্য ? মৃতের আত্মজনের বেদনায়
অংশ নেয় না প্রতিবেশী-বন্ধু-স্বজন ?

সিদ্ধার্থ : মৃত্যু কেবলই দুঃখের বাহন? আত্মার মুক্তি পথ নয় যা অবিনশ্বর?
এমনই তো বলেন শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ, বেদ যাদের প্রাণবায়ু?

দ্বিতীয় প্রজা : ব্রাহ্মণ আমাদের উপাস্য, দেবতারই মতো,
শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান তাঁকে করেছে নির্লিপ্ত—যেমন প্রকৃতি।
শাস্ত্র-অজ্ঞ আমরা মৃত্যুতে কাতর হই,
চোখের জলেই আমাদের তর্পন ও সান্ত্বনা।

সিদ্ধার্থ : ব্রাহ্মণও উপাস্য দেবতারই মতো?
মানবিক সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ তিনি?
শুধুই শাস্ত্রজ্ঞাণে অধিগত ঈশ্বরিক নির্লিপ্ততা?

প্রথম প্রজা : তপে ও যজ্ঞে, এ তাঁর অর্জিত, সাধারনের উর্ধে তিনি—
এ-ই আমাদের আজন্মের সংস্কার

সিদ্ধার্থ : তাঁর বেদনা-জরা-মৃত্যু-নেই? ব্যাধি তাঁকে পরিহার করে?
ক্ষুধায় পীড়িত হন না?
তাঁকে মুগ্ধ করে না লোভ—ক্রোধ?

তৃতীয় প্রজা : এই সংস্কার—বিশ্বাসেই গড়া আমাদের জীবন,
সাধারণ সুখ-দুঃখ নিরপেক্ষ তাঁর নৈর্বক্তিকতা,
প্রতিবেশীর দুঃখ-শোক-বেদনায় অংশ নিতে—
অকৃত্রিম আমাদের আগ্রহ;

সিদ্ধার্থ : তোমাদের আগ্রহ আমাকে স্পর্শ করে;
বেদনা কি সর্বজনীন হয় আনন্দের মতো,
সে—তো ব্যক্তিগত, একান্ত গোপন!

প্রথম প্রজা : এই শুভক্ষনে বেদনা-শোক-দুঃখের কথা কেন—
অসতর্ক উক্তি মার্জনা করবেন যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : তোমাদের আশীর্বাদ-ভালোবাসা-শুভেচ্ছা নবজাতকের পাথেয়

দ্বিতীয় প্রজা : কপিলাবস্তু আজ পুষ্পসজ্জায় অপরূপা—
মঙ্গলবাদ্যে বরিত হচ্ছেন নবজাতক,
গৃহাঙ্গন চিত্রিত করছে অঙ্গনারা—

তৃতীয় প্রজা : সন্ধ্যায় আলোক মণ্ডিত নগরীকে
বক্ষে ধারণ করবে আমাদের প্রাণদায়িনী রোহিনী,
নগরীকেন্দ্রে পঞ্চপ্রদীপ অনির্বান থাকবে শিশুর শুভকামণায়,

দেবাশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন পুরোহিত—

প্রথম প্রজা : পক্ষকাল ব্যাপী উৎসবের আদেশ দিয়েছেন রাজা—
দুঃখের নির্বাসন—নৃত্যে—গানে –আনন্দে,
অমঙ্গলের মৃত্যু—শাস্ত্রপাঠে—পূজায়—আরতিতে,
মাত্র স্নিগ্ধ—সুন্দর—নির্মল আনন্দের আদেশ দিয়েছেন
রাজা,—

আমাদের রাজা!

চতুর্থ প্রজা : যজ্ঞস্থান নির্দেশ করেছেন ঋত্বিক, বণ্টিত হয়েছে যজ্ঞদায়িত্ব—
করণ-কারণে ব্যস্ত যজ্ঞাভিজ্ঞ যাজ্ঞিক
উৎসর্গের পশুপাল নির্বাচনে ব্যস্ত রাজপুরুষ।

সিদ্ধার্থ : রাজপৌত্রের মঙ্গলকামনায় সূচিত হচ্ছে দীর্ঘসূত্রী যজ্ঞ,
অথর্ববৈদিক যাদুকরী ক্রিয়াকরণে মুগ্ধ হবেন
শাস্ত্রান্ধ রাজা-রাজপরিবার—প্রজাকুল ;—
তোমরা জয়ধ্বনি দাও কেন, রাজার—আমার?

প্রথম প্রজা : এই দেশাচার, সামাজিক নিয়ম—
রাজপরিবারের আনন্দেই আমাদের আনন্দ।

সিদ্ধার্থ : কোন দেশাচার? কে স্থির করেছে এই নিয়ম? এ কী
প্রশ্নাতীত স্বার্থগন্ধহীন?
তোমরা পীড়িত নও যজ্ঞ-যাজনের পেষনে—
শ্রান্ত নও প্রতিদানহীন স্বেচ্ছাশ্রমে?
তোমরা ব্যবহৃত হও না আমাদের প্রয়োজনে, যুদ্ধে শান্তিতে?
রাজ নিয়ম নিয়ন্ত্রিত তোমাদের আনন্দ ;
তোমাদের শ্রমজাত স্বেদের আহুতি—যা শুদ্ধতম—স্বীকৃত
হয় দেবস্থানে?

প্রথম প্রজা : রাজা যাঁর অর্চণা করেন, দেবতা যাঁর আহ্বানে সাড়া দেন—
সেই ব্রাহ্মণ আমাদের ঈশ্বর ;
তাঁরই আহ্বানে :
বৃষ্টি নামে, উদ্গত হয় বীজ, ব্যাধিমুক্ত হয় মানবকুল।
রাজা-রাজ্য—প্রজার হিতার্থে তাঁর যজ্ঞে
আমাদের স্থান নির্দিষ্ট পুরুষানুক্রমে।

সিদ্ধার্থ : কে নির্দেশ করেছে, ব্রাহ্মণ?

যিনি বেদপারগ, ঈশ্বরের শরীরী প্রতিভূ, সর্বজ্ঞ ?
স্থায়ী ও জটিল যজ্ঞে যিনি নিয়ন্ত্রন করেন দেবাশীর্বাদ ?
যাঁর যজ্ঞাগ্নি অনির্বাণ রাখতে ক্ষীণ হয় অরণ্য,
নিহত হয় বৃষ-ছাগ-মেদযুক্ত বরাহ ?
যিনি উচ্চারণ করেন কূটার্থক মন্ত্র—যা নাকি অমোঘ,
উদ্দেশ্যসাধক, অনিবার্য ?

রাজভৃত্য তাড়িত দাস-বাহক আর শ্রমণ
—রাজরোষ যাদের কর্মপ্রেরণা—
শ্রমকাতর অশ্রুসিক্ত মুখে কার দীর্ঘায়ু কামনা করে রাজার,
ব্রাহ্মণের ?

কোন ঈশ্বর আশীর্বাদে ধন্য হয় তারা ?

সমবেত : দেবস্থানে অপরাধী করবেন না যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : কেন এই প্রশ্নের তাড়না সমাধানহীন জিজ্ঞাসার পীড়ন—
কেন সঙ্গীহীন ঘুরে বেড়াই বিজন অরণ্যে !

সমবেত : এ আমাদের-ও বিস্ময় যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : কেন যজ্ঞাহুতি অন্তরে ঝরায় না ঈপ্সিত দেবকারুণ্য ?
আমি কি ঈশ্বর পরিত্যক্ত ।

সমবেত : শান্ত হন যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : যা প্রাচীন তাই অপরিবর্তনীয় ?
যা কিছুই আচরিত তার বিরুদ্ধ চিন্তাও পাপ ?
শ্রমস্বেদে নয়, জন্ম পরিচয়েই পাওয়া যায় সব ?
তোমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা, এ আমার অর্জিত ?

সমবেত : যুবরাজ আপনার দর্শন আমাদের সুখের,
আশীর্বাদ সৌভাগ্যের, বাচন মঙ্গলের কারণ ;
যা স্বত, তা অর্জনের প্রশ্ন নেই ।

সিদ্ধার্থ : নির্বিবেক ঐতিহ্যের স্থূল অনুসরণে আমি ক্লান্ত

প্রথম প্রজা : এ আপনার বংশপরম্পরাগত অধিকার

সিদ্ধার্থ : কেমন করে অর্জিত হোল এ অধিকার, কৌশলে না বাহুবলে ?
কে দান করেছিল ? তোমাদেরই পূর্বপুরুষ !
সেকি কোন প্রাকৃতিক অঘটন থেকে আত্মরক্ষার আদিম
কামনায় ?

| | | |
|---|---|---|
| | | কোন শত্রু আক্রমনের সম্ভাবনায় ! |
| | | সেই সমবেত দান কি অবিকৃত, এখন ? |
| সমবেত | : | যুবরাজ ! আমরা তো সেই দূর অতীতের সাক্ষী নই ; |
| | | মেঘের গর্জ দেখে অনুমান করি ফসলের ভবিষ্যত, |
| | | বায়ুর গতি দেখে বুঝি ঝড়ের সম্ভাবনা, |
| | | মাটির গন্ধ শুঁকে বলি তার উপাদান ; |
| | | আপনার দুর্জ্ঞেয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজ্ঞাত, |
| | | আপনার জিজ্ঞাসা আমাদের অপরিচিত ! |
| | | এই শুভক্ষণে আপনার সুখ আমাদের আকাঙ্খা ; |
| সিদ্ধার্থ | : | আমি এখন-ও তাকে দেখি নি— |
| | | শুদ্ধোদন পৌত্র, যশোধরার শোনিত স্নাত, আমার ঔরসজাত,— |
| | | তাকে—আমার পুত্রকে । |
| প্রথম প্রজা | : | পুত্র দর্শনের বিলম্বের কারণ আমাদের মার্জনা করুন । |
| সিদ্ধার্থ | : | বিলম্বের কারণ তোমরাই ? আমি নই ? |
| | | সদ্যজাত শিশুর আকর্ষণ এত তীব্র ! |
| | | এতো মোহময় প্রসবক্লান্ত যশোধরা, এ তো গর্ব জনকের ! |
| | | আনন্দের উজ্জলতা তবু ঢাকে বিষাদের মেঘ ! |
| | | আমাকে বিদায় দাও, তোমাদের উৎসব সার্থক হোক । |
| প্রথম প্রজা | : | ( চতুর্থ প্রজাকে ) নগরীতে যুবরাজের আগমনী ঘোষনা করো, |
| | | প্রত্যুৎগমন প্রত্যাশী নগরবাসীদের সচেতন করো, |
| | | পুষ্পসম্পাতকামী কামিনীদের উত্তেজিত করো— |
| | | জয়ধ্বনিতে মুখরিত হোক আকাশ-বাতাস ! |
| সিদ্ধার্থ | | রাজপথে যেতে চাই না, |
| | | নিভৃত আরণ্যপথে পুর প্রবেশ আমার বাসনা |
| প্রথম প্রজা | : | প্রজারা দর্শন প্রত্যাশী, আপনার দুর্লভ সহগামীত্ব তাদের আকাঙ্খা— |
| সিদ্ধার্থ | : | কি আশ্চর্য ! |
| চতুর্থ প্রজা | : | যুবরাজ প্রণাম ( প্রস্থান ) |
| দ্বিতীয় প্রজা | : | আপনার আগমনী গাইতে গাইতে যাবো, অনুমতি দিন |
| সিদ্ধার্থ | : | আমি তো ফিরি নি দূর বিদেশ থেকে, |

বিজয়ী সৈন্যের পুরোভাগে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে,
আমি এই নগরীতেই ছিলাম, আছি,—
আমাকে এ সংবর্ধনা কেন ?

তৃতীয় প্রজা : সিংহাসন উত্তরাধিকারী আবির্ভূত,
শুদ্ধোদন বংশের আরো এক পুরুষের স্থায়িত্ব নিশ্চিত—
প্রত্যহের বাইরে এই দিন

সিদ্ধার্থ : তাই এই উৎসব ? সিংহাসন উত্তরাধিকারী পেলো,
বংশধারা রক্ষা পেল, তাই ? এইমাত্র ?

সমবেত : যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : তাই শিশুর জন্মের সঙ্গে দেবতার পূজা,
প্রভুত্বের স্থিরতায় কৃতজ্ঞতার যজ্ঞ !
শুধুই বৈভবের উত্তরাধিকারী এই নবজাতক ?
যে বৈভব-ক্ষমতা-শাসন তোমাদের শুভাশুভ নিরপেক্ষ !
তার পরিবারিক শোক-আনন্দে তোমরা অভিভূত ! কেন ?

সমবেত : যুবরাজ এই আনন্দের উপলক্ষ থেকে বঞ্চিত করবেন না
আমাদের

সিদ্ধার্থ : তোমাদের বাসনা চরিতার্থ হোক, অগ্রসর হও

সমবেত : তাপিত বসুন্ধরা বুকে ইন্দ্রের করুণার মতো,
দেবতার আশিস বর্ষণে স্নাত হোক—
ক্রনম্ভ শস্যশীর্ষের গুপ্তপ্রাচূর্যের মতো,
সম্ভাবনাময় হোক—
পাকাধানের অমৃত গন্ধবহ হৈমন্তিক বাতাসের মতো,
প্রিয়ংবদ হোক—এই নবজাতক !

প্রথম প্রজা : প্রণাম করো তাঁকে, যাঁর অনুগ্রহে এই জীবন

সমবেত : প্রণাম সেই করুণাকর ঈশ্বরকে

প্রথম প্রজা : স্মরণ করো তাঁকে, যাঁর আশীর্বাদে বৃষ্টিপাত

সমবেত : প্রণাম সেই করুণাকর ঈশ্বরকে

প্রথম প্রজা : প্রণাম করো মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রককে

সমবেত : প্রণাম সেই করুণাকর ঈশ্বরকে

প্রথম প্রজা : জন্ম মৃত্যুর নিয়ামক, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কার্য ও কারণ যিনি,
তাঁর বন্দনা করো

সমবেত : প্রণাম সেই করুণাকর ঈশ্বরকে !

সিদ্ধার্থ : এরা বিশ্বাসে অন্ধ, সংস্কার তাড়িত অপরিচিত অবজ্ঞেয়,
গৃহ দেবতার মতই এদের ঘরে অধিষ্ঠিত দুঃখ,
তবু অনাবিল আনন্দে মত্ত হয়—
রাজা পৌত্র পেলে, সিংহাসন উত্তরাধিকারী পেলে,
যুবরাজ পিতা হলে

প্রথম প্রজা : জয় জয় জয় গাও জয়

সমবেত : শাক্যকুমারের জয়

প্রথম প্রজা : যশোগানে ভরো দশদিগ্, দুঃখশোকের হোক ক্ষয়

সমবেত : শাক্যকুমারের জয়

প্রথম প্রজা : ধনজনগৌরব প্লাবন নামুক, দীর্ঘায়ু হোন মহারাজ

সমবেত : রাজা শুদ্ধোদন জয় জয়

প্রথম প্রজা : ঈশ্বর করুণা নামুক অপার দীর্ঘায়ু হোন যুবরাজ ,

সমবেত : সিদ্ধার্থের জয় জয়

সিদ্ধার্থ : তোমরা থামো, বন্ধ করো জয়ধ্বনি, এ আমার প্রাপ্য নয়,
তোমাদের সুখদুঃখ নিরপেক্ষ আমার জীবন
এবং রাজার, সকল অভিজাতের—
বিবেকের কাছে অপরাধী কোর না !

সমবেত : আঘাত করবেন না যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : তোমরা কেউ আমার পরিচিত নও,
যে নামে সম্বোধিত হও তা আমার অজ্ঞাত এবং জীবীকা
( প্রথম প্রজাকে ) তুমি কোথায় থাকো, কি করো তুমি ?
আমি তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই !

প্রথম প্রজা : আপনার পরিচয়ের উপযুক্ত নই আমি ;
কৃষি আমার কর্ম,
হলকর্ষণে ধরিত্রীর সম্পদ আহরণ আমার জীবীকা ;

সিদ্ধার্থ : যে ভূমিখণ্ড দীর্ণ করো তা তোমার ?

প্রথম প্রজা : অরণ্যগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ
অগ্নিদেব ছিলেন সহায় ।
যিনি আমার প্রভু এ ভূমি ও তাঁরই—আমাদের রাজার ।

সিদ্ধার্থ : সংঘবদ্ধ শ্রমে যে ভূমি হয়েছিল অরণ্যমুক্ত

পুরুষানুক্রমে যাকে তোমরা করেছ কর্ষণযোগ্য,
সে ভূমিতে রাজার কি অধিকার !

প্রথম প্রজা : রাজ্যের অধীশ্বর তিনি, প্রশ্নাতীত তাঁর স্বামীত্ব

সিদ্ধার্থ : কি করে তিনি হলেন মানুষের-ও অধীশ্বর ?
প্রকৃতি আর যূথবদ্ধ মানুষের সংগ্রামের ফসল
—সমবেত শ্রমের পুরস্কার—
কি করে অধিগত করলেন তিনি ?

প্রথম প্রজা : যূথপতি যেমন নিয়ন্ত্রণকরে আপন যূথকে,
তিনি শাসন করেন আমাদের, তাই তিনি রাজা
—আমাদের রক্ষাকর্তা।

সিদ্ধার্থ : যূথপতি অংশ নেয় অন্যের শ্রমলব্ধ আহারের ?
সংগ্রহ করে না স্ব-আহার সমান শ্রমে ?

প্রথম প্রজা : সে-তো জান্তব, মানবিক নয়

সিদ্ধার্থ : মানবিক তোমার শ্রমের ফসলে অনায়াস অধিকার ?
রাজকর, দেবতার নির্দিষ্ট অংশ বণ্টন শেষে,
অবশিষ্ট শস্যে পরিবার পালনক্ষম তুমি ?

প্রথম প্রজা : ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রিয়ায় বসুন্ধরা যে শস্য দান করেন
রাজা ও দেবতা তার স্বামী,
তাঁদের সেবাই আমাদের কাম্য,
আমাদের একদিন অন্যদিনের মতই পার্থক্যহীন যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : তোমাদের স্বেদে কোমল হয় মৃত্তিকা, উৎপন্ন হয় শস্য,
তুমি দীর্ণ না করলে মাত্র দেবাশীর্বাদে উদ্গত হবে বীজ ?

দ্বিতীয় প্রজা : আমাদের শ্রম-ও কি ব্যর্থ হয় না যুবরাজ ?
অতৃপ্ত দেবতার রোষে বন্ধ্যা হয় মেঘ,
নির্জলা ধরিত্রী হন রুক্ষ,
নিষ্ফলা হন বসুমতী।

সিদ্ধার্থ : তুমিও স্বস্বেদে সিক্ত ফসল নিবেদন করো
(দ্বিতীয় প্রজাকে) রাজভোগে, দেবসেবায় ?
অবিচ্ছিন্ন দারিদ্রের উপাসক তুমিও,—প্রভুত্বের, অবিবেক
শক্তির রাজার ?

দ্বিতীজ প্রজা : আমি তন্তুবায়, বস্ত্রবয়ণ আমার জীবীকা

সিদ্ধার্থ : নিজেই সংগ্রহ করো সকল উপকরণ ?
দ্বিতীয় প্রজা : শ্রমমূল্যের বিনিময়ে বয়ণ আমার কর্ম,
উপকরণের দায়িত্ব পণ্যস্বামীর।
সিদ্ধার্থ : তোমার স্বগোষ্ঠীর তিনি ?
দ্বিতীয় প্রজা : না যুবরাজ
সিদ্ধার্থ : মাত্র শ্রমমূল্যে ক্রয় হয় বংশ পরম্পরাগত শিল্প অধিকার ?
দ্বিতীয় প্রজা : বয়ণ আমার স্বাভাবিক উত্তরাধিকার, বাণিজ্য তাঁর
সিদ্ধার্থ : তুমি তো রচনা করো বস্ত্র আপন অর্জিত কুশলতায়,
তোমারই শ্রমজাত পণ্যে ধনবান পণ্যজীব, তোমার প্রভু !
তাঁর প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত তোমার দক্ষতা !
অর্জিত শ্রমমূল্যে সহজ তোমার দিন যাপন ?
দ্বিতীয় প্রজা : আমাদের মতোই সামান্য আমাদের প্রয়োজন,
স্বভাগ্যের নিয়ন্তা নই আমরা !
সিদ্ধার্থ : ( তৃতীয় প্রজাকে ) তুমি ?
তৃতীয় প্রজা : আমি ভূমিহীন, শিল্প অশিক্ষিত সামান্য ব্যবসায়ী,
অস্থির আমার পণ্য, অনির্দিষ্ট উপার্জন ;
সিদ্ধার্থ : গৃহপতির ঋণে তোমার মূলধন ?
তৃতীয় প্রজা : নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নেই আমার,
তিনিই আমার গৃহপতি যখন যাঁর ঋণে আমার ব্যবসায় ;
সিদ্ধার্থ : পণ্যশুল্কে পীড়িত হও ? ঋণে ? অসাধু রাজভৃত্যের তাড়নায় ?
বাণিজ্যপথে দস্যুভয়ে ভীত হও ?
তৃতীয় প্রজা : জন্মক্ষণেই আমরা নিয়তি নির্দিষ্ট যুবরাজ !
সিদ্ধার্থ : তোমরা সবাই নিয়তি আর ঈশ্বরের কাছে নির্বিবেক ?
অপ্রশ্নেয় রাজাও দেবতার মতো ?
মাত্র অনায়াস কর গ্রহণে অধিকারী তিনি ?
প্রথম প্রজা : জন্মান্তরের সুকৃতি আর দেব ইচ্ছায় তিনি রাজা,
প্রজার সকল সম্পদে তাঁর অধিকার অবারিত,
সানুগ্রহ গ্রহণে তিনি ধন্য করেন আমাদের।
সিদ্ধার্থ : তিনি আমাদের অন্তর্গত নন ?
সমাজের উর্ধ্বে তাঁর অবস্থান ?
সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধিকার ?

তোমাদের প্রদত্ত কর কি ব্যায়িত হয় প্রজার স্বার্থে ?

সমবেত : রাজ্যের স্বার্থে তাঁর এই ব্যবস্থা সময় স্বীকৃত

সিদ্ধার্থ : রাজা বৃদ্ধি করেন না আপন বৈভব ?
ক্ষমতা সংহত হয় না রাজপুরুষ-মন্ত্রী-আর সেনার সাহায্যে ?
গূঢ়পুরুষ রচনা করে না সংবাদ ?
তিনি চালিত হন না স্ব-স্বার্থে ?
তাঁর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হন না এমন কি ঈশ্বর-ও ?
সংহত ক্ষমতার শীর্ষে, বিরাজ করেন না তিনি ?
রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় না মানুষের বিরুদ্ধে ?
তিনি হয়ে ওঠেন না দেব সদৃশ ? নৈর্বক্তিক ?

সমবেত : যুবরাজ আপনার প্রশ্নের নির্মমতায় আমরা কাতর,
মার্জনা করুন আমাদের !

সিদ্ধার্থ : রাজা রক্ষা করবেন না প্রজাকে
দস্যুতা থেকে, অসাধুতা থেকে, দারিদ্রের পেষণ থেকে ?
শক্তির মূঢ় প্রকাশেই নির্মূল হয়
সকল মানবিক স্খলন, দুঃখ—যা নিহিত দারিদ্রে—
কর্মহীনতায় ?

দ্বিতীয় প্রজা : আমাদের ক্লেশে দয়াবান তিনি,
নিয়ন্ত্রণ করেন প্রজার দিন যাপন—প্রকৃতিকে যেমন করেন
ঈশ্বর ;
অশেষ শক্তির অধিশ্বর তিনি, নির্মম তার প্রকাশ !

সিদ্ধার্থ : করুণা আর দাক্ষিণ্যেই শেষ হয় দারিদ্রের অভিশাপ
দুঃখ-যন্ত্রণা ?
রাজা কর্ষককে দেবেন না বীজ-খাদ্য,
ব্যবসায়ীকে মূলধন, রাজভৃত্যকে যথাসময় যোগ্য বেতন ?
জনপদ রক্ষা করবেন না স্বভৃত্যের শোষণ থেকে ?
ব্যাপ্তি পাবে না বৈভব ?
ব্যক্তির ও রাজকোষের পুঞ্জিভূত ঐশ্বর্য
ব্যয়িত হবে না সকল মানুষের স্বার্থে ?
মানুষের দুঃখের অংশ নেবেন না তিনি—রাজা, আমাদের
রাজা !

তৃতীয় প্রজা : যুবরাজ, আপনি স্বভাব-কোমল—যেমন দূর্বাদল,
উচ্চারিত শব্দরাজি শিশির চর্চিত তৃণময় স্নেহময়,
মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মতো মোহময় কণ্ঠস্বর—শ্রান্তিহর,
আপনার কণ্ঠে এ কী তীব্রতা ?

সিদ্ধার্থ : আমি কি আহত করেছি তোমাদের ?

সমবেত : অপরাধী করবেন না যুবরাজ !

( নেপথ্যে কিসা গোতমীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে )

কিসা : ( নেপথ্যে ) আমি এঁকেই প্রার্থনা করেছি,
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেছি প্রাসাদ অলিন্দ থেকে ;
কামনার তীব্রতায় আঘাত করেছি নিজেকে—যেন ক্রুদ্ধ
সর্পিনী ;
স্মরণের উত্তেজনায় ধুয়ে গেছে চন্দনের পঙ্ক !
যিনি আমার স্বপ্নের-জাগরণের, আমার প্রাণবায়ুব আশ্রয়
—সেই যুবরাজ সিদ্ধার্থের জয় হোক !

সিদ্ধার্থ : অরণ্যস্পর্শী উদ্যানে কে এই রমণী, তোমাদের সঙ্গিনী ?

দ্বিতীয় প্রজা : না যুবরাজ ! অনুমতি পেলে সন্ধান করি

সিদ্ধার্থ : কে আমার জয়ধ্বনি দাও কলস্বরে !

( কিসার প্রবেশ )

কিসা : শুভযাত্রায় বিঘ্নকারিণীর সপ্রণাম অভিনন্দন গ্রহণ করুন
যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : নগরীপ্রান্তের এই উদ্যানে একা এসেছো ?
কি নামে তুমি সম্বোধিত হও ? তুমি কার কন্যা ?

কিসা : কিসা আমার নাম, কপিলাবস্তুবাসিনী

সিদ্ধার্থ : আমার বিস্মিত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো

কিসা : যৌবনের প্রতীক, সকল রমণীর কামনা যুবরাজ সিদ্ধার্থের
জয় হোক !

প্রথম প্রজা : উদ্যান প্রবেশ মুখে অপেক্ষা কোরব যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : স্বাভাবিক নয় তোমার আচরণ

কিসা : আমি আপনার জয় কামনা করি যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : কোন সংগ্রামে ?

কিসা : যার বিচারক অনঙ্গ

সিদ্ধার্থ : আমি অনভ্যস্ত এ জয়যাত্রায়, জয়মাল্য তোমাকেই অর্পণ করছি

কিসা : এ রণে পরাজয় রমণীকামনা, আমি তার প্রার্থী, জয়মাল্যের নয়—

সিদ্ধার্থ : আর্যে আমি আজ পুত্রের জনক,
যশোধরা জননীর মর্যাদায় আসীন,
প্রজাগণ উদ্যান প্রবেশমুখে অপেক্ষমান—

কিসা : এই সর্বজনীন উৎসবে আপনার সঙ্গ আমার কামনা—
মুক্ত করুন বাসনার যন্ত্রণা থেকে

সিদ্ধার্থ : প্রতিক্ষনে বিন্দু বিন্দু দুঃখ জমে বুকের গভীরে,
তা থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায় ?

কিসা : প্রজাদের এ সম্পদেও অংশ চান যুবরাজ ?

সিদ্ধার্থ : আমি কি পরস্বাপহারী ? বেদনা নেই, জ্বালা নেই যা একান্ত আমারই !

কিসা : রাজভোগের জন্যই আমাদের সকল সম্পদ

সিদ্ধার্থ : প্রজার রঞ্জক তিনি শুধুই সম্পদের অধিকারী ?
সুখের-আনন্দের-ঐশ্বর্যের ? দুঃখের নন ?
তিনি অংশ নেন বেদনার, মানুষের যা নিত্যসঙ্গী ?
প্রাচুর্যের অন্ধকার থেকে অনুভব করা যায়
সম্পদের উৎস অগনন মানুষের বেদনা ?
প্রজার দুঃখস্পর্শক্ষম তিনি, আমার জনক, রাজা শুদ্ধোদন ?

কিসা : তিনি আপনার পিতা !

সিদ্ধার্থ : তিনি তো জনকমাত্র !
পালক যুগযুগ অনুসৃত সংস্কার, রাজ আচরণ,
ব্রাহ্মণ নির্দিষ্ট সমাজবিধি—
যে ব্রাহ্মণ ঈশ্বর প্রতিভূ, যিনি প্রশ্নাতীত নন।

কিসা : আমার রক্ষা কর্তা রাজাকে নমস্কার,
প্রণাম ঈশ্বর সদৃশ ব্রাহ্মণকে—
যাঁর যজ্ঞাহুতি মানবের সুখসমৃদ্ধির কারণ,
মানব ভাগ্যের যিনি নিয়ন্তা !
যুবরাজ আপনি বিচলিত, স্বভাবচ্যুত,

আদেশ করুন স্বয়মাগতা আমি দূর করি সকল দাহন—
রমণ সুখক্লান্ত আপনি প্রতিষ্ঠিত হবেন স্বক্ষেত্রে !

সিদ্ধার্থ : শরীরী সুখ তো ক্ষণস্থায়ী,
বিদ্যুতের মতো, হেমন্তের বৃষ্টির মতো—
তা দিয়ে আমার কি হবে !

কিসা : ঋতুস্নানে রমণীরা শ্রেষ্ঠ কোন গুনে ? যৌবনে-সৌন্দর্যে-কামকলায় !

সিদ্ধার্থ : তুমি তো সেই রাজবৈভবের আলিঙ্গন চাও—
শুদ্ধোদন পুত্র আমি যার অংশী—যার ভারে আমি ক্লান্ত !

কিসা : সে ক্লান্তি বৈচিত্র্যহীন কামকলায়,
অভ্যাসের দুর্নিবার আকর্ষণে নিরানন্দ রাত্রি যাপনে !
সব ক্লান্তি দূর করে দেবো,
ক্ষণে ক্ষণে খুলে দেবো বৈচিত্র্যের সহস্র দুয়ার ;
যুবরাজ ! আমি হবো শ্রান্তিহর
—প্রখর গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রোহিণী যেমন—
প্রান্তরের রহস্য হবো তৃণের মতন স্নিগ্ধ, অরণ্যের মতো মোহময় !
মাঠে বনে ছুটে যাবো মৃগের গন্ধ পাওয়া হরিণীর মতো—
অকারণ কলহাস্যে মাতাবো আকাশ,
আরণ্য স্তব্ধতা খানখান করে দেবো ময়ূর শীৎকারে !

সিদ্ধার্থ : আমার রক্তে বহমান প্রভুত্ব স্পর্ধার, শাসকের উদ্ধত শক্তির,
সংক্রমণ তোমার কামনা ;
যে উত্তরাধিকার স্বীকারে-অস্বীকারে আমি বিক্ষত
তাঁর সংগম তোমার অভীপ্সা !
রাজপরিবার নিরপেক্ষ আমি তোমার কামনার যোগ্য নই,—
তুমি শান্ত হও ।

কিসা : শান্তি আসে বাসনা পূরণে, কামনার দাহ নিবে গেলে

সিদ্ধার্থ : নগরীতে ফিরে যাও পরিচিতের সাহচর্যে দূর হবে শারীরী উদ্দামতা—
শোভন নয় তোমার আচরণ !

কিসা : আমি প্রত্যাখ্যাত ! শূন্যহাতে ফিরে যেতে হবে

অতৃপ্ত আকাঙ্খার ভস্ম বয়ে!
মুহূর্তের দর্শন প্রত্যাশার অলিন্দের প্রহরগুলি মিথ্যা।
মিথ্যা নিদ্রাহীন রাত্রির যন্ত্রণা?
সত্য নয় আপনার স্মরণতপ্ত দেহের জ্বালা?
এ দাহন কি করে জুড়াবো যুবরাজ!
ছুটে যাবো অরণ্য গভীরে? যুবরাজ বলে দাও কে আমাকে ক্লান্তি দেবে?
প্রত্যাখ্যান লজ্জা আমি কোথায় গোপন কোরব, কোন্ পর্বত গুহায়?
তুমি রিক্ত, তোমার পৌরুষ মৃত,
বজ্রাঘাতে দগ্ধ বনস্পতির মতো! [আকুল কান্নায় ভেঙে পড়বে]

সিদ্ধার্থ : তুমি স্থির হও, শান্ত হও! [অপেক্ষমান প্রজাদের দিকে এগোবেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনুসরণ করতে করতে কিসা গেয়ে উঠবে]

কিসা : নিব্বুতা নূন সা মাতা, নিব্বুতা নূন সো পিতা।
নিব্বুতা নূন সা নারী যস্ সায়ং ইদসো পতি॥
[সিদ্ধার্থ খুব ধীরে ধীরে কিসার সামনে দাঁড়াবেন]

সিদ্ধার্থ : জননীর, জনকের সে-নারীর হৃদয়—
নিবে যায় দাহহীন আগুনের মতো?
হৃদয় শান্ত হয়, শীতের রোহিণী যেমন?

প্রথম প্রজা : যুবরাজ নগরবাসীদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে,
বিলম্ব দুর্ভাবনার কারণ হবে

সিদ্ধার্থ : নিবে যায় প্রত্যাশার দাহ?

কিসা : যুবরাজ!

সিদ্ধার্থ : তোমরা জানো না!
জন্মজন্মান্তরের নির্বিবেক আত্মসমর্পণে ক্লান্ত,
দেশাচার, কালাচার বেদব্রাহ্মণের অন্তঃহীন আবর্তনে অসুস্থ,
ঈশ্বর আর রাজার পেষণে যন্ত্রণাবিদ্ধ তোমরা—
তোমরা কপিলাবস্তু—মগধ—কোশল

বা অন্য কোন নগরী কি রাজ্যের মানুষ ?

সমবেত : যুবরাজ করুণা করুন !
রাজা আমাদের রক্ষাকর্তা, দেবতা আমাদের আশ্রয় !
যুবরাজ ক্ষান্ত হোন আশ্রয়হীন করবেন না আমাদের !

সিদ্ধার্থ : তুমি কোন নিবৃত্তির গান গাইলে কিসা ?
অন্তরের হিংসা-দ্বেষ-মালিন্য কি নেবে ?
নেবে লোভ-ক্রোধ-আভিজাত্য স্পৃহা ?
অনন্তকাল ধরে বয়ে আনা প্রশ্নহীন নির্বিকার দাসত্ব ?
জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বহতা অন্তরের অশ্রুর নদী ?

প্রথম প্রজা : দুঃখ আমাদের আজন্মের সাথী,
বেদনা আমাদের সমব্যথী, উদ্বিগ্ন হবেন না যুবরাজ।

সিদ্ধার্থ : তোমরা কি বিবেকহীন আভিজাত্যের দাস ?
তোমরা অনুভূতিহীন সেই বৈভবের স্পর্ধায়—
যার স্রষ্টা তোমরা ?
তোমরা কি বসুন্ধরাকে দীর্ণ করে আনো না ফসল—
ধরিত্রীর গর্ভ খুঁড়ে লুকোন সম্পদ,
অরণ্য প্রান্তর পার হয়ে নিয়ে যাওনা পণ্য রাজ্য থেকে
রাজ্যান্তরে ?

সমবেত : যুবরাজ করুণা করুন, শান্ত হোন,
উদ্বিগ্ন করবেন না, অস্থির করবেন না আমাদের।

প্রথম প্রজা : আমাদের বাঁচতে দিন
যেমন করে বেঁচেছেন আমাদের পিতৃপুরুষ ;
অত্যাচারের পাশে অনাচার, অনাহারের পাশাপাশি প্রাচুর্য,
অবিচারের সঙ্গে ঔদাসীন্য—আছে, থাকবে চিরকাল,
আমাদের বাঁচতে দিন যেমন করে বেঁচে এসেছি এতকাল !
কোন বছর বৃষ্টিহীন রুক্ষতায় জ্বলে যায় মাঠের ফসল—
আমাদের দুর্ভাগ্যই তার কারণ ;
কোন বছর ফসলের প্রাচুর্যে উপছে পড়ে ক্ষেত—
দেবতার করুণাই তার কারণ ;
বৃষ্টিহীন বৎসরের পর ব্রাহ্মণ বয়ে আনেন গর্ভিনী মেঘ
হোমে—আহুতিতে—যজ্ঞে শাস্ত্রসিদ্ধ বিভিন্ন ক্রিয়ায় ;

আমাদের বাঁচতে দিন, এমন করেই বেঁচেছেন আমাদের
পূর্বপুরুষ।

দ্বিতীয় প্রজা : আমাদের এমন করেই বাঁচতে হয়,
এমন করেই বাঁচি।
শীতে আগুনের চারপাশে, গ্রীষ্মে খোলা আঙিনায়
দারিদ্র্য আমাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী ;
দুর্বৎসরে স্থগিত থাকে রাজকর
সুবৎসরে দ্বিগুণ হওয়ার জন্য
আরোপিত হয় নতুন কর রাজা ও রাজ্যের প্রয়োজনে,
আমাদের দুঃখের অপর নাম সুখ—
এমন করেই আমাদের বাঁচতে হয়!
আমরা সব যুদ্ধেই পদাতিক—এমন করেই বাঁচি।

তৃতীয় প্রজা : যুবরাজ করুণা করুন!
আমাদের আপন আতঙ্ক আছে, গোপনভয়—
আরো বড় ভয়ে আক্রান্ত করবেন না আমাদের ;
আপনার কথায় আমরা সন্ত্রস্ত, ভীত,
কেঁপে উঠছে বংশপরম্পরা গড়া বিশ্বাসের ভিত্তি.
শীতল হয়ে আসছে রক্তস্রোত!
যুবরাজ করুণা করুন—
বিশ্বাসের নির্ভরতাচ্যুত করবেন না
বঞ্চিত করবেন না শারীরী উষ্ণতা থেকে!

সমবেত : করুণা করুন, শান্ত হোন, উদ্বিগ্ন করবেন না ভীত করবেন না
আমাদের!

সিদ্ধার্থ : তুমিও জানো না কিসা কি সে, যা নিবে গেলে হৃদয় শান্ত হয়!

কিসা : আমি শাস্ত্র অজ্ঞ সামান্যরমণী যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : আমাকে জানতে হবে
কি করে অন্ধকারের চক্রান্ত ভেদ করে আলো আসে,
আমাকে জানতে হবে
শাস্ত্রের বন্ধন থেকে জ্ঞানের,
অকারণ সঞ্চয়ের স্তূপ থেকে বৈভবের,
একক প্রভুত্ব থেকে শাসনের মুক্তির পথ!

দ্বিতীয় প্রজা : যুবরাজ ক্রমশ উদ্যানাভিমুখী নগরীর কলরব,
এ মুহূর্তে আপনার চাঞ্চল্য বিষাদের কারণ—
অপরাধী করবেন না রাজপদে।

সিদ্ধার্থ : কি হবে ওখানে গিয়ে?
জয়ধ্বনি দিতে পারে দুঃখের নিবৃত্তি?
আশীর্বাদে খুলে যায় জিজ্ঞাসার দুয়ার,
চেতনার তৃতীয় নয়ন দৃষ্টি পায় হোমটিকায়?

প্রথম প্রজা : শান্ত হবে পীড়িত আত্মা, স্থির হবে উত্তাল মন
সুস্থ হবে উত্তপ্ত চেতনা;

সিদ্ধার্থ : পীড়নের শেষ আছে? অশ্রুর, যন্ত্রণার?
অন্তঃহীন পদযাত্রী মানুষের অশ্রুর থেকেও বেশি সমুদ্রের জল?
জন্মে যন্ত্রণা, যন্ত্রণা মৃত্যুতে অসুখে বার্দ্ধক্যে;
অপ্রেম মিলনে দুঃখ, দুঃখ প্রেমের বিচ্ছেদে, অপূরণ আকাঙ্ক্ষায়।
আনন্দের তৃষ্ণায় দুঃখ, অস্তিত্বের তৃষ্ণায় দুঃখ, প্রভুত্বের তৃষ্ণায় দুঃখ।

তৃতীয় প্রজা : এই আমাদের অনতিক্রমণীয় নিয়তি

সিদ্ধার্থ : অন্তরের বাসনা-ক্রোধ-লোভের
দুর্নিবার জ্বালা যদি নিবে যায়—
বিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজে পাবে না আত্মা?
সংস্কার মুক্ত হবে না জ্ঞান?
দারিদ্রের অভিশাপ দাসত্বের বেড়ি ছিঁড়তে পারবে না মানুষ?
শেষ হবে না দাম্ভিক প্রভুত্বের, শোষণের?
মুক্ত হবে না ঈশ্বর, মানুষের ঈশ্বর,
জটিল মন্ত্রের মোহ থেকে?

সমবেত : আপনার উত্তেজনায় বিহ্বল আমাদের করুণা করুন,
উত্তরহীন জিজ্ঞাসাপীড়িত আমাদের অন্তরে শান্তি দিন—
করুণা করুন, কৃপা করুন!
কুমার! আমাদের তাপিত হৃদয়কে ক্ষোভমুক্ত করুন
যুবরাজ! আমাদের দুঃখের অবসান করুন!

সিদ্ধার্থ : তোমরা নগরীতে ফিরে যাও, উৎসবে অংশ নাও,
আমাকে বিদায় দাও

সমবেত : এই বিজন অরণ্যপ্রান্তে আপনাকে রেখে কোথায় যাবো ?

সিদ্ধার্থ : রাজাকে আমার প্রণাম দিও, প্রণম্যদের শ্রদ্ধা—
তোমরা আমার শুভেচ্ছা নাও ;

কিসা : দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ফেলবেন না আমাদের !
পুত্র দর্শন করবেন না যুবরাজ ?

সিদ্ধার্থ : আমার একমাত্র বন্ধন ছিঁড়তে দাও, কৃপা করো আমাকে !
ক্ষুব্ধ কোর না যশোধরার স্মৃতিময় অন্তর,
স্পর্শ কোর না বিক্ষত হৃদয়—আমাকে করুণা করো !

সমবেত : যুবরাজ !

সিদ্ধার্থ : আমার এই শেষ উপহার গ্রহণ করো কিসা

[ কণ্ঠের হীরকমালা খুলবেন ]

কিসা : বহুমূল্য ঐ কণ্ঠহার।

সিদ্ধার্থ : তুমি আমাকে নির্বাণের গান শুনিয়েছো—
আমার কৃতজ্ঞ উপহার গ্রহন করো !

[ নতজানু কিসা হীরকমালা অঞ্জলিতে নেবেন ]

আমি মানুষের মুক্তির সন্ধানে যাবো, সেই নির্বাণের সন্ধানে !

সমবেত : কোথায়, কোথায় যুবরাজ

সিদ্ধার্থ : কিছুই জানি না !
শুধু জানি আমার অঞ্জলি ভরে মানুষের দুঃখের ফুল নিতে
হবে—

সমবেত : একাকী কোথায় যাবেন ?

সিদ্ধার্থ : এই শান্ত নগরী থেকে দূরে,
অরণ্যগভীরে—পর্বত গুহায়—লোকারণ্য জনস্থানে—জনহীন
প্রান্তরে,
জলহীন—প্রাণহীন ধূ ধূ বালুচরে,
আলোকিত বহির্দেশে, অন্তরের প্রত্যন্ত প্রদেশে
আনন্দের—শান্তির—দুঃখহীন পরিপূর্ণ জীবন সন্ধানে আমি
যাবো—
অন্তহীন প্রব্রজ্যার পথে—তোমরা ফিরে যাও !

সমবেত : অকরুণ ত্যাগে কাতর করবেন না, যাবেন না অনভ্যস্ত পথে,
সঙ্গী করুন আমাদের
সিদ্ধার্থ : সূর্য অস্তে নেমেছেন, অন্ধকার নিবিড় হচ্ছে,
তোমরা ফিরে যাও অন্যথায় কষ্ট হবে—
কিসা তোমাদের সঙ্গে আছেন—আমাকে বিদায় দাও
সমবেত : আর কি দেখা পাবো না যুবরাজ !
সিদ্ধার্থ : প্রত্যাবর্তনের জন্যই আমার এ যাত্রা ;
ক্ষুধাহীন দুঃখহীন বাঁচার পথ,
অন্ধ প্রভুত্বের অবসানের উপায় জেনে আমি ফিরে আসব ;
ভয়শূন্য, অ-ক্ষুব্ধ, উদ্ভাবী প্রতিবেশ—
যেখানে সহজ নিঃশ্বাস নেয় মানুষ, অপাপবিদ্ধ শিশু,
কি করে রচিত হয় আমাকে জানতে হবে—
তারপর আমার প্রত্যাবর্তন তোমাদেরই কাছে, সেই
শিশুর কাছে,
—তোমরা অগ্রসর হও ।
[ ধীর পদক্ষেপে মঞ্চের বাইরে চলে যাবেন ]
প্রথম প্রজা : তোমার সঙ্গেই বিদায় নিল সকল সুখ-শান্তি
সমবেত : যার সন্ধানে তোমার প্রস্থান
প্রথম প্রজা : নিমজ্জিত হলাম দুঃখের অগাধ পাথারে
সমবেত : যার অবসান তোমার অভীপ্সা
প্রথম প্রজা : আর-ও অকরুণ হোল বন্ধন
সমবেত : যার উন্মোচন আকাঙ্খায় তোমার প্রব্রজ্যা
কিসা : আমৃত্যু অপেক্ষা করবো অরণ্যমুখী অলিন্দে,
মিলন কামনায় ত্যাগ করবো সমাজ সংসার—
তোমার জন্য, তোমারই জন্য !
সমবেত : দুঃখের দহনে তোমার জন্য প্রস্তুত হবো,
অপেক্ষা করবো তোমারই জন্য—
জয় হোক, তোমার জয় হোক !

# আততায়ী

## মূল নাটক ঃ সফদার হাশমি

### অনুবাদ ঃ রণজিৎ রায়চৌধুরী

[ অনূদিত নাটিকাটির হিন্দী নাম—হত্যারে। এটি জনবাদী নাটক বিশেষাঙ্ক 'উত্তরার্ধ'-এ জননাটক মঞ্চের একগুচ্ছ নাট্যসংকলন হিসেবে প্রথম কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে জননাটক মঞ্চের রীতি অনুসারে নাট্যকারের কোন নাম নেই। বাস্তবে মঞ্চ তাঁদের প্রতিটি নাটককেই যৌথ রচনা বলে বিশ্বাস করেন। তবে তাঁদের বহু নাটকের মূলকাঠামোটি দীর্ঘকাল ধরে হাশমিই রচনা করে আসছিলেন। বইটিও হাশমি-র লেখা। বছর চার আগে দিল্লিতে প্রথম যেদিন সফদার হাশমি-র সঙ্গে আমার আলাপ হয়, সেদিনই তিনি আমি হিন্দী পড়তে জানি শুনে সংকলনটি উপহার দিয়েছিলেন। আজ এটি সংগ্রামী নাট্যকর্মীদের জন্য সম্ভবত অন্যতম স্মারক হয়ে গেলো।

নাটকটি পাঠ বা অভিনয়ের সময় যাঁরা আপাত অসঙ্গতি খুঁজে পাবেন, তাঁদের প্রথমেই বুঝতে হবে—হাশমি কোন আপোষ করতে জানতেন না। অনেক কথাই তাই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য নাটকে স্থান পেয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর কি ভাবে নাটক লেখা উচিত হাশমি এ নাটকে তাই আমাদের শিখিয়েছেন। পরিচয়ের জন্য এই কাজটুকু করতে পেয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবোধ করছি

অনুবাদক ]

[ বৃত্তাকার অভিনয় স্থল। চারপাশে দর্শকের স্থান। পাঁচজন অভিনেতা বৃত্তের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় এবং সমবেত ভাবে গান ধরে ]

॥ গান ॥

তালার তালা আলিগড়ের—
গৃহের বন্ধু শত্রু চোরের—
অবাক হয়ে দেখছো কি ভাই ?
আমরা সেথায় গল্প বানাই !

সূত্রধার । তো দোস্তো, এটাই হলো তালাবানানোর শহর আলিগড়। সে সব এমন তালা, যার বিবরণ চট করে দেওয়াটাই মুশকিল। কারণ, এখন তো যাঁদের মান সম্মানের পরোয়া আছে, তাঁরা মুখে কুলুপই এঁটে থাকছেন। আমি বলি কি এই মওকায় বরং শহরটাকেই একটু চিনে নেওয়া যাক। এখানে ঘরে ঘরে নিত্যদিন তালা তৈরির ধুম। কোথাও হয়তো ঢালাই হচ্ছে, কোথাও চলছে পেটাই। কিছু লোক তো কেবল চাবি তৈরিতেই ব্যস্ত। আর এই সব কাণ্ড কারখানায় সত্যি বলতে কি সব জাতি সব ধর্মের লোকই আছে। ছোট্ট একটি তালা, তা তৈরিতে কিন্তু নানা ভাগ রয়েছে। ধরা যাক মুসলমানেরা। ওরা যদি ঢালাই নিয়ে ব্যস্ত, সেটাকে গড়ে পিটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত করছে হিন্দুরা। তাই তো বলছিলাম আলিগড়ের তালার জবাব নেই! ভাবুন একবার। তালা তৈরির শুরুটা হয় বিশমিল্লাহের নাম করে। তালা তৈরি শেষ হয় 'জয় রাম' ধ্বনি দিয়ে। না: হাত ঘুড়ে সে তালা কেবল তৈরীই হয় না, ঐ তালাই সবকটি হাতকে একতাবদ্ধ রাখে। সে হিন্দুই হোক বা মুশলিম প্রত্যেকেই জানে এক পক্ষকে বাদ দিয়ে আর এক পক্ষের দ্বার আলিগড়ি তালা বানানো সম্ভব নয়।

তাই তো উসকে দেওয়ার লোকের অভাব না থাকলেও আলিগড়ে চট্‌করে দাঙ্গা বাধানো যায় না। তবু বন্ধুগণ, যারা নিপাট ভালোমানুষ, তাদের পক্ষে তো সব সময় বদমায়েশদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সত্যি সম্ভবও নয়। আলিগড়ের মতো একটা সুন্দর বাগানকে তছনছ করার জন্য তাই

শয়তানদের চোখের ঘুম উধাও! তাদের নোংরা হাতগুলো দিনরাত…।

বাপ দাদার কাছ থেকে শুনেছি তালা তৈরি এখানকার মানুষদের কয়েক পুরুষ ধরে পেশা। তাই তো এখানকার তালার এমন দুনিয়াজোড়া সুনাম। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো শয়তানেরা ও বহুকাল ধরে এখানে একটা গণ্ডগোল বাধানোর জন্যে তক্কে তক্কে ঘুরছে। চেষ্টা করছে কিভাবে এখানকার স্বাধীন মুক্ত কারিগরদের কেমন করে গোলাম করা যায়। তাই তো ফন্দিবাজেরা ফিকির করছে বড় বড় তালা তৈরির ফ্যাক্টরি গড়ে, ছোট্ট কারখানাগুলোকে ধ্বংশ করতে। কারিগরদের পথে না বসালে কেউ ফ্যাক্টরির মাল কিনবেই না। তাই তো ফ্যাক্টরি বসানোর চেষ্টা চলছে।

শুধু সেই স্বার্থ রক্ষার জন্যেই তারা এমন সুন্দর বাগানের মতো দুনিয়াটাতে নানা ধরনের চক্রান্ত করে চলেছে।

[ বলা শেষ হতেই সূত্রধার অভিনেতাদের পাশে গিয়ে বসে। দুজন অভিনেতার একজন উদ্যোগপতি অন্যজন তার ম্যানেজার সেজে এগিয়ে আসে। ]

উদ্যোগপতি। মস্ত একটা তালা তৈরির ফ্যাক্টরির আমি মালিক। নিজের ফয়দার জন্য আমি সব কিছুই করছি। তবু বজ্জাৎগুলোর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না। আই এ্যাম্ টেরিব্‌লি আপসেট্ মিস্টার গুপ্তা!

ম্যানেজার। ইয়েস মাডাম্।

উদ্যোগপতি। নিকুচি করেছে ম্যাডামের।

আমাদের মালের শেল্ পজিশান কি বেড়েছে?

ম্যানেজার। নো ম্যাডাম!

উদ্যোগপতি। এ নিয়ে বিশেষ কিছু ভেবেছেন?

ম্যানেজার। ইয়েস ম্যাডাম।

উদ্যোগপতি। নাঃ আপনাকে আর বোধহয় চাকরিতে রাখা গেল না।

ম্যানেজার। ইয়েস ম্যাডাম! ওঃ নো ম্যাডাম!

উদ্যোগপতি। ইডিয়েট! আই মিন্—ইউ আর সো ইউজলেস? ব্যাপারটা বুঝতে শিখুন মিঃ গুপ্তা। ঐ ছোট ছোট তালা তৈরির

কারখানাগুলো যতকাল থাকবে ততকাল আমাদের ব্যবসায় ভবিষ্যত নেই!

ম্যানেজার। ইয়েস ম্যাডাম।

আপনি লাখ্ টাকা দামের কথা বললেন। আপনি না মহান ন-ন।

উদ্যোগপতি। সাট্আপ। ইতিহাসের শিক্ষা হল পথের কাঁটা সাফ্ করো। বুঝলেন আশা করি? তাছাড়া ব্যাপারটা ন্যাশন্যাল ইনকামের। দেশের অগ্রগতি ঘটাতে হলে বড় বড় ফ্যাক্টরি গড়তেই হবে। কুঁচো উদ্যোগকে আমি একদম অপছন্দ করি।

আসুন আমরা একত্রিত হয়ে সময়ের দাবিকে সম্মান দিতে প্রস্তুত হই। বলুন জয়হিন্দ। ওয়ান্, টু থ্রি।

[ ম্যানেজার অপেক্ষারত অভিনেতাদের একজনকে ধরে টানাটানি করে। কিন্তু কিছুই করতে পারেনা অবস্থা দেখে অভিনেতারা হেসে ওঠে ]

ম্যানেজার। নাঃ ম্যাডাম এভাবে কিচ্ছু হবার নয়। ব্যাটারা নিরেট।

উদ্যোগপতি। তাহলে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুলের পথটা দেখলেই তো হয়। ওদের মধ্যে ঝগড়া। বাধিয়ে দিন!

ম্যানেজার। দ্যাটস্ দ্যা ট্রিক। দেবীজী আপ মহান হ্যায়।

উদ্যোগপতি। এ কাজের জন্য আমাদের একজন পাকা লোক চাই।

গুপ্তাজী। সে হবে এক পাকা ঘুঘু—
ভিটেয় যারা চরে
বিভীষণের ছানার মতন—
কিম্বা জয়চাঁদ বা মীরজাফরের।

উদ্যোগপতি। এগিয়ে এসো বাছাধন—
মুঠো ভরেই পাবে॥

গুপ্তাজী। ভাঙবে যে উনি ঐ অটুট দেওয়াল
যেন তেন কৌশলেতে—
রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়েও—
যে জানে তার স্বার্থ পেতে—

[ একজন অভিনেতা ভিড়ের মধ্যে উঠে দাঁড়ায় এবং গুণ্ডার ভূমিকা নেয় ]

গুণ্ডা। আমায় ডাকে কোনসে চাঁদু—
দেখতে কে চায় হাতের যাদু?

সাহস থাকে হাঁক দে আবার ॥
দোকান পাটে আগুন দেবে ?
ঘর গেরস্তি উল্টে যাবে ?
যুবতীকে করবো হরণ ?
নাকি বহু বারের মতন—
হিন্দু এবং মুসলমানে—
উস্কে দেবো কানে কানে,
ভীষণ কোন দাঙ্গা কি চাই ?
বল দেবো কীসের দাওয়াই ?
সে সবাই তো বা হাতকা খেল—
ফ্যালো কড়ি, মাখবো তো তেল ॥

উদ্যোগপতি। ভরতে হলে ঘর সোনা চাঁদি দিয়ে—
আমার ডাল দাও গলিয়ে ॥

[ উদ্যোগপতি ম্যানেজারের কানে কানে কিছু বলে। ম্যানেজার গুণ্ডার কানে কানে কিছু বলে। তারপর দুজনেই ভালোমানুষের ঢংএ একপাশে গিয়ে দাঁড়ায় ]

গুণ্ডা। [ কর্মরত কারিগরদের নানা ভঙ্গির মূকাভিনয়কে প্রদক্ষিণ করতে করতে ]

খাও—খাও – খাও
এককে খাও। দুইকে গিলে নাও ॥
প্রত্যেকে খাও প্রত্যেকেরে—
কায়দা করে লড়িয়ে দেরে ॥
ঝগড়া মানেই সবাই একা
তখন ধরে সবকটা খা ॥

[ ছড়া কাটা শেষ হলে মাঝখানে বসে থাকা কারিগরদের একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ]

পেন্নাম হইগো রামকৃষ্ণজী। আরে। সাক্ষাৎ ভগবানের নামে নাম আপনার। আর আপনি কিনা ঐসব গরুখোর ম্লেচ্ছগুলোর সঙ্গে কাজ করছেন! ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। আপনার জাতের লোকেরা কি বলবে জানেন ?

[ রামকৃষ্ণ আস্তিন গুটিয়ে পাশেই বসে থাকা সাদিকের দিকে তাকায় ] গুণ্ডা

এবার সাদিকের দিকে এগোয় ] আস্লাম আলায়কোম ! আরে দোস্ত ! কাফেরগুলোর সঙ্গে মিশে নিজের আখের নষ্ট করছো ভাই ! আফশোষ ।

[ আস্তিন গুটিয়ে সাদিক যেন রামকৃষ্ণকেই তাড়া করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি উল্টে যায় ]

ওরা দুজনে । আরে শালা ভাগ । শালা শয়তান ।

গুণ্ডা । [ বিচলিত ]

আরে রসিকতা বোঝোনা !

সাদিক । আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে চাও বজ্জাৎ ?

গুণ্ডা । আরে ছিঃ ছিঃ তাই কখনো হয় !

রামকৃষ্ণ । খচ্চরটা যাতে পালাতে না পারে সাদিকভাই ।

[ গুণ্ডা বিপদ বুঝে পালায় । ওরা খানিকটা ধাওয়া করে যায় । বাকি অভিনেতারা হেসে ওঠে ]

সূত্রধার । ও হোঃ হোঃ হোঃ । যাক শেষ পর্যন্ত ফন্দিটা ভেস্তে গেছে যাহোক ।

[ রামকৃষ্ণ এবং সাদিককে লক্ষ্য করে ]

তা দোস্তো দিনভর তো মেহেন্নত কম হলো না । এবারে একটু খেলাধুলা করলে হতোনা ?

[ উত্তরের অপেক্ষা না করেই পকেট থেকে হুইসল বের করে বাজাতে থাকে ]

সমবেত কণ্ঠ । শুরু হোক ।

হরিকিশেন । চু-উ-উ-উ । আবে সাদিক তোকে আজ তোর দোস্ত রামকৃষ্ণ-ও বাঁচতে পারবেনা । এক চু দিয়ে যদি তিনটেকে মোর করতে না পারি তাহলে আমার নামও হরিকিশেন নয় । আমরা দুই বুড়ো রফিক আর আমি এক দিকে । আর তোরা দুজন একদলে ।

সাদিক ও রামকৃষ্ণ । আরম্ভ ।

সাদিক । রামকৃষ্ণ দে তো একবারটি ধুলো উড়িয়ে । মনে হচ্ছে তোর চাপ, কালকের কথাটা ভুলেই গেছে ! নে শুরু কর ।

রেকারি । শুরু হোক ।

সমবেত কণ্ঠ । খেলা চলুক ।

সাদিক । বিশমিল্লাহিরমারহীম । এই চু-উ-উ-উ-উ ।

রামকৃষ্ণ । [পেছন থেকে] বোল পবন পুত্র বীর হনুমান জীকে জয়।
সাদিক টেনে ধরবি কিন্তু।

[এই ভাবে কবাডি খেলাটা চলতে থাকে]

সাদিক । [খেলা বন্ধ রেখে]
আরে! কিছু খেয়াল আছে! মগরেবের নামাজ আদায় করতে হবে। আমি মজজিদে চললাম রামু। তুই আরতি করতে যাবি না? [দর্শককে] খেলায় একবার মাতলেই হল। ধর্মকর্মের কথা খেয়ালই থাকে না। চল বে চল রামু।

[রফিক আর হরিকিশেন অভিনয় স্থলের দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ চাপ]

সূত্রধার । মন্দির অথবা মস্‌জিদ। রামকৃষ্ণ কিম্বা সাদিক মহম্মদ এদের মধ্যে যা তফাৎ তা ঐ নামের। রামকৃষ্ণদের ঘরের পাশেই সাদিকদের ডেরা। এখানে মন্দিরের দেয়াল ঘেঁসেই মসজিদ। প্রতিদিনই ওরা দুই বন্ধু—হাত ধরা ধরি করে—দুনিয়াদারের নাম করতে যায়। [প্রস্থান]

[সাদিক আজান দেয়। রামকৃষ্ণ আরতি করে। শব্দ শুনে গুণ্ডা ব্যস্ততা নিয়ে প্রবেশ করে]

গুণ্ডা । এবার। এবারে কে তোকে বাঁচাবে শালা। [সাদিকের পেছনে দাঁড়িয়ে ছোরা বের করে] হর হর মহাদেব [ধ্বনি দিতে দিতে সাদিকের পিঠে ছোরা বসিয়ে দেয়]

সাদিক । আঁ আঁ। রামকৃষ্ণ, রামু বাঁচা বাঁচা ভাই…
[পড়ে যায়]

গুণ্ডা । এবারে ও বেটার পালা। নারা-এ তকবির আল্লাহোয়াকবর। [রামকৃষ্ণকেও ছোরা মারে]

রামকৃষ্ণ । হায়। মেরে ফেল্লেরে আমায়। সাদিক ও সাদিক, বাঁচা ভাই। [পরে যায়]

[ব্যস্ত পায় সূত্রধার প্রবেশ করে। গুণ্ডা বিপদ বুঝে পালায়]

সূত্রধার । [মৃতদেহ দুটিকে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়ে] আজ আবার দুটো খুন হল। একজনার নাম রফিক মহম্মদের বেটা সাদিক। আর একজন হরিকিশেনজীর ছেলে রামকৃষ্ণ। ওদের দুজনার ঠিকানাই সেই এক—সরদার চৌকি মহল্লা, জিলা এবং শহর আলিগড়। পাশাপাশি ঘর ওদের। দুজনেই ন্যংটো বেলার

বন্ধু। একজন তালা ঢালাইর কারিগর আর একজন পেটাই এর। যখন ওদের খুন করা হয়—তখন ওরা দুটিতে আপন আপন সৃষ্টিকর্তার জয়গান গাইছিল। হয়তো দুজনে সেই ওপর ওয়ালার কাছেই চলে গেল। কে জানে? একমাত্র ঈশ্বর কিম্বা পুলিশের দ্বারাই এর উত্তর জানা সম্ভব। পুলিশ! মানে, কে মরল? কোথায় মরলো কিভাবে মরলো কেনো মরলো—কখন মরলো এমনি হাজার প্রশ্ন। তাছাড়া মর্জি হলে বলা, না হয় সাংবাদিকদের কাছ থেকে দূরে থাকা। এমনি সমস্ত জটিল কাজ পুলিশের। এসব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে নেই। মনে রাখবেন এসব ক্ষেত্রে বাধা দিলে আপনার কপালে সরকারী কাজে বিঘ্নঘটানোর দায়ে শাস্তি পর্যন্ত জুটতে পারে। কাজেই নিজের চোখে যা দেখলেন তা মনেমনেই রাখুন। ভুল করেও যেন এ নিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল কিন্তু তাহলে সাংঘাতিক হবে। জানেন তো এদেশে একজন ব্রাহ্মণ চামারকে কিম্বা ঠাকুর যাদবকে খুন করে তাহলে কিচ্ছু হয় না। কিন্তু ভুল করেও কি একজন মুশলমানের হাতে কোন ভাবে হিন্দু খুন হয়ে যায় তাহলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। কি তাইতো? আর সে বদনামটাই বহুকাল ধরে আলিগড়ের কপালে জুটছে! যাকৃগে যাক্। আমি আমার নাগরিক কর্তব্যটুকু করি। পুলিশ কমিশনার সাহেবকে খবরটা দিয়ে রাখি।

[ কোন একটি দরজার কড়া নাড়ার ভঙ্গি করে ]

রক্ষা করুন, শহরটাকে বাঁচান কমিশনার সাহেব। [ চাপরাশির পোষাকে গুণ্ডা প্রবেশ করে ]

গুণ্ডা । খুব যে হল্লা করছো! জানো সাহেব এখন কত কষ্টে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন।

সূত্রধার । আরে মহা গজব হয়ে গেছে ভাই। দয়া করে সাহেবকে একবারটি জানাবে?

[ উদ্যোগপতি ও গুপ্তাজী প্রবেশ করে। গুণ্ডা তাদের দেকে গা ঢাকা দেয়। উদ্যোগপতি এখানে কমিশনারের ভূমিকায় ]

সূত্রধার । ইওর অনার। কিছু বদলোক শহরে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। আমার চোখের সামনে একজন হিন্দু ও একজন

মুশলমান খুন হলো ! হুজুর, লোক দুটো যখন প্রার্থনা করছিল তখন তাদের খুন করা হয়।

উদ্যোগপতি। আই সি। কিন্তু এটা কোন কমপ্লেন বা গ্রিভান্স জানানোর সময় নয় !

গুপ্তাজী । আপনার জানা উচিত, ( সূত্রধারকে ) অভিযোগ জানানোর একটা সময় আছে।

সূত্রধার । কিন্তু স্যার খুনখারাপি তো ওরকম মাপ মেনে চলে না। তাছাড়া এটা গোটা শহরের জান্‌মানের প্রশ্ন। এক্ষুনি শক্ত হাতে না সামলালে আখেরে বিপদ হতে পারে স্যার !

উদ্যোগপতি। হোয়াট্ ডু ইউ মিন ?

গুপ্তাজী । এই মিস্টার। সব ছেড়ে তুমি আমাদের কর্তব্য শেখাতে এসেছো !

উদ্যোগপতি। অত উতলা হবেন না মশায়। দাঙ্গাবাজরা কোথায় থাকে আমরা জানি। আপনি চিন্তা না করে বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোন তো। আমি ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। প্লিজ এবারে যান।

গুপ্তাজী । কেটে পড়ুন মানে মানে।

গুণ্ডা । সূত্রধার কে ]
আবে চল কামিনে।

[ সূত্রধার চলে যায় ]

উদ্যোগপতি। শহরের লোকজন তো দেখছি বেশ চালাক হয়ে উঠেছে গুপ্তাজী ! এতো ভালো কথা নয় ! গুপ্তাজী, আপনি কি বলেন ?

ম্যানেজার । ম্যাডাম, এক্ষুনি আমাদের ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো দরকার।

[ গুপ্তাকে ইসারা করে। ]

উদ্যোগপতি। ছাটস্ রাইট। [ গুপ্তাজী গুণ্ডার কানে কানে কিছু বলে। কমিশনার ওরফে উদ্যোগপাতি গুণ্ডাকে পুলিশের টুপি পরিয়ে দেয়। গুণ্ডা স্যালুট করে ] ও কে।

[ উদ্যোগপতি ওরফে কমিশনার ও গুপ্তাজী চলে যায়। গুপ্তা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে পায়চারী করে ]

গুণ্ডা । কোন হায় বে? তেরে মা কী…

সূত্রধার । সেপাইজী সেপাইজী খুন!

[ রফিক আর হরিকিশন এসে দাঁড়ায় ]

দুজনেই । খু-উ-উ-ন! পুলিশ পুলিশ।

গুণ্ডা । ঝামেলা হঠাও। এই শালারা তোরা কে শুনি? খুব যে চেল্লাচ্ছিস!

সূত্রধার । মানুষ খুন!

গুণ্ডা । আবে নাদান। মানুষ খুন হবেনা তো কি আলু করলা খুন হবে? তার জন্য শালা চেল্লাবে? বেল্লিক কোথাকার। এই শালা তোর নাম কি বে উল্লুক? চল দেখাবি চল কে খুন হয়েছে।

[ সূত্রধার গুণ্ডা ওরফে পুলিশকে লাশদুটোর সামনে নিয়ে যায়। গুণ্ডা বিজ্ঞের মতো পরীক্ষা করে ]

গুণ্ডা । এ নির্ঘাৎ মাল টেনে লড়ালড়ি করার ফল। নয়তো জুয়া খেলার পরিনতি।

সূত্রধার । একি বলছেন সেপাইজী! [ দর্শককে ] আসলে মশায়রা, সেপাইটার মুখ থেকেই মালের গন্ধ আসছে! [ সেপাইকে ] জুয়া কি খোলা রাস্তায় খেলা হয় মালিক? বিশ্বাস করুন চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি একটা লোক পালাচ্ছে আর লাশ দুটো এখানে পড়ে!

গুণ্ডা । আচ্ছা! তা তোমাকে তো একবার থানায় যেতে হবে মানিক! [ লাশগুলো দেখে ] মনে তো হচ্ছে এরা দাঙ্গা করেই মরেছে।

সূত্রধার । কি বলছেন! ওরা দাঙ্গা করেছে?

গুণ্ডা । হ্যাঁ আমি বলছি করেছে। ওদের একটা হিন্দু একটা মুশলমান! দাঙ্গা নয় তো কি? ওরে বাপ! দাঙ্গা! আমি নেই [ দ্রুত প্রস্থান ] গুপ্তাজী একটি খবরের কাগজ পাঠরত অবস্থায় পায়চারি করছে। উদ্যোগপতি রেডিওর খবরের অনুকরণে ]

ম্যানেজার । দারুন খবর। শেষ পর্যন্ত আলিগড়ে দাঙ্গা বেধেছে এ-এ-এ!

উদ্যোগপতি । এখনকার বিশেষ বিশেষ খবর হল। আলিগড়ে গণ্ডগোল।

আমাদের বিশেষ প্রতিবেদক জানাচ্ছে শহরে দুই সম্প্রদায়ের লোক একটি কবাডি খেলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল বাধায়। ফলে কিছু লোক আহত হয়।

ম্যানেজার। হিন্দুরা মুশলমানদের এবং মুশলমানরা হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়।

উদ্যোগপতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পুলিশ সমাজবিরোধীদের ওপর নজর রাখছে।

ম্যানেজার। শহরের বেশ কিছু দোকানপাট লুট হয়েছে।

উদ্যোগপতি। বিশেষ সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, স্থানীয় প্রশাসন অত্যন্ত তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে।

ম্যানেজার। কিছু মাল গুদামে একদল দুস্কৃতিকারী আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারী করতে হয়েছে।

উদ্যোপতি। বিলম্বে পাওয়া সংবাদ অনুসারে শহরে এখন শান্তি বিরাজ করছে!

ম্যানেজার। আলিগড়ে কার্ফু।

[ দুজনেই পাশে গিয়ে বসে ]

সূত্রধার। কাণ্ডটা দেখলেন! পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার নাম করে দেখলেন তো কেমন ক'রে তা আরো বিপজ্জনক করে তুললো! দাঙ্গাকারীদের তো ছাড়, খোদ আততায়ীদের না ধরে তাদের হাতেই শহরের ভাগ্য কেমন তুলে দেওয়া হল। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় আততায়ী এবং পুলিশের চেহারার মধ্যে কেমন মিল!

[ রফিক এবং হরিকিশেন লাশ দুটির ওপর থেকে চাদর সরিয়ে তাকিয়ে থাকে ]

সূত্রধার। মৃত্যু সব সময়ই মৃত্যু।

মৃত্যুর কোন ধর্ম বা জাত নেই। রক্তপাত নিশ্চয় আপনার আমার কারোই পছন্দ নয়। মৃত সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকা ঐ হরিকিশেন এবং রফিকের পিতৃহৃদয় নিশ্চয় হাহাকারে ভরে উঠছে।

এবং পিতৃহৃদয়ের কোন জাতপাত নেই। সে হৃদয় না হিন্দু না শুধু মুশলমান। এ মুহূর্তে হরিকিশেনকে কেবল রফিকই

সান্ত্বনা দিতে পারে। রফিকের কষ্টের একমাত্র ভাগিদার ঐ হরিকিশেন! ঐ দুজন পিতাকে কি জাত ধর্ম দিয়ে সত্যি সত্যি পৃথক করা সম্ভব?

ওরা একই সঙ্গে দেওয়ালি মানায়। একই সঙ্গে ঈদের উৎসব করে আজ এমন মর্মান্তিক মুহূর্তে প্রকৃত বন্ধুর মতো একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে!

যে মাটিতে হরিকিশেন আর রফিক জন্মেছে, এ সেই মাটির শিক্ষা। এ সেই দেশেরই অহঙ্কার!

[ নিজনিজ পুত্রের শবের ওপর দুই পিতা কান্নায় ভেঙে পড়ে ]

সূত্রধার । রফিক চাচা হরিকিশেনজী, মিথ্যে কান্নায় কিছু হবার নয়। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন। চলুন এর প্রতিকার করা যাক। যাকে আমরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছি, চলুন সেই জন প্রতিনিধির কাছে যাই। এ অঞ্চলের ভালোমন্দ তো তাঁকেই দেখতে হবে। চলুন আপনারা।

[ ইতিমধ্যে উদ্যোগপতি নেতার পোষাকে নিজেকে সাজিয়ে নেয়। এবং গুণ্ডা মাথায় গান্ধীটুপি চাপিয়ে দাঁড়িয়ে ]

সূত্রধার । দাদাজী। অনেক আশা নিয়ে ঐ দুজন পিতা আপনার কাছে এসেছেন! প্রকাশ্য দিনের আলোয় ওঁদের ছেলে দুটি খুন হয়ে গেছে। পুলিশ এত বড় ঘটনায়ও উদাসীন! তাই ওঁরা আপনার কাছে সুবিচার চাইতে এসেছেন দাদা।

উদ্যোগপতি । গরীবের এখানে আপনাদের পায়ের ধুলো পরেছে, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

রফিক । মালিক, আপনিই আমাদের মা-বাপ। আমরা ভিন্ন ধর্মের মানুষ কথাটি ঠিকই। তেমনি এওতো ঠিক যে আমাদের চালচুলোয় কোন ফারাক নেই।

হরিকিশেন । হুজুর। এক্ষুণি খুনোখুনি বন্ধ করান। এরি মধ্যে বহু পরিবার বিপন্ন হয়ে পরেছে। দয়া করুন।

উদ্যোগপতি । আপনারা শান্ত হোন।

আমার ওপর ভরসা রাখুন। মনে রাখবেন ঐ খুনে শুধু আপনারা নিঃসন্তান হন নি আমিও পুত্রহীন হয়েছি ভাই সব। এর একটা বিহিত না হওয়া পর্যন্ত আমি জল স্পর্শ করবো না

কথা দিচ্ছি। সারাজীবন আপনারা তো জানেন আমি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছি!

[ গুপ্তাজী ওরফে ম্যানেজার গুণ্ডা ওরফে পুলিশ 'সাবাস' 'সাবাস' বলে হাত তালি দেয় ]

সূত্রধার। সাম্প্রদায়িকতা! এতো···।

উদ্যোগপতি। যে সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলতে চেষ্টা করছে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তাকে গুড়িয়ে দেবো। চলুন, আমরা মিছিল বের করবো। ধর্ণা দেবো। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য চাঁদা তুলবো।

গুপ্তাজী তুরন্ত বিল বই ছাপতে দিন। আমি মনে করি, আমাদের এক্ষুনি এই সব কার্যসূচী নেওয়া দরকার।

সূত্রধার। কিন্তু দাদাজী···।

ম্যানেজার ও গুণ্ডা। আমরা তো এমনকি মাইনরিটি কমিশনের সামনে একথাও বলেছি সব মসজিদে ঘণ্টা বাজানো, এবং মন্দিরে আজান দেওয়া বলৎ করা হোক। আসুন এভাবেই আমরা হিন্দু মুশলমানের ভেদভাও মেটাই।

উদ্যোগপতি। দুঃখিত। এক্ষুণি আমাকে একটা হরিজনদের মিটিংএ যেতে হচ্ছে।

[ গুপ্তা এবং গুণ্ডাজী সরে যায় ] আপনারাও আমার সঙ্গে চলুন ভাইসব। এক্ষুনি একটা অনুসন্ধান কমিটি তৈরী করে দাঙ্গার ব্যাপারটার তদন্ত শুরু করা যাক।

[ গুপ্তা এবং গুণ্ডা পিছনের দিকে সরে যায়। রফিক ও হরিকিশনকে লাশদুটির দিকে এগোতে দেখা যায় ]

উদ্যোগপতি। নো। এসব চলতে পারে না। ওসব আদিখ্যেতা চলবে না বলে দিলাম। গুপ্তাজী লোকগুলোর কি মৎলব বলুনতো!

ম্যানেজার। সরি ম্যাডাম [ গুণ্ডাকে ] এই হারামখোর। আগে ভাগে এ্যাডভান্স দিয়েছি, মৎলব মতো কাজ না করলে সব ফেরৎ দিতে হবে বুঝলি খচ্চর। ঐ ভরত মিলন দৃশ্যটি দেখবার জন্য তোমাকে পুলিশের পোধাক দিইনি বেল্লিক।

গুণ্ডা। জী সরকার। লেকিন আমার একটা কথা ছিল···।

উদ্যোগপতি। সাট্ আপ্। যতোসব নিষ্কর্মার ঢেঁকি। কোন কাজ

সামলাতে জানো না। এদিকে ব্যাপারটা আমার কাছে জীবনমরণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটা গণ্ডগোল পাকাতেই হবে বুঝালে উজবুকের দল ?

[ গুণ্ডাকে ইসারা করা হয়। উদ্যোগপতি রফিকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। গুপ্তাজী যায় হরিকিশানের দিকে। গুণ্ডা হাতে লুকোনো ছোরা নিয়ে ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে ]

উদ্যোগপতি। রফিক মহম্মদ, তোমার বুকখানা কি পাষান হয়ে গেছে ভাই ?

ম্যানেজার। হরিকিশান, তুমি তো জানো পুত্র শোকে রাজা দশরথ প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উদ্যোগপতি। রফিক ভাই। এ আক্রমণ শুধু তোমার সন্তানের ওপর হয়নি! বাস্তবে এটা ইসলামের ওপরই আক্রমণ। যদি আল্লাতাল্লার খুশি চাও তাহলে কাফেরদের ওপর তোমার বদলা নিতেই হবে।

ম্যেনেজার। আগে বাঢ়ো হরিকিশান। তোমার সামনে হিন্দুধর্মের শত্রু দাঁড়িয়ে। ভগবান তো বলেছেন, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র, যা কিছু তিনিই করান ; ভয় কী ? খড়্গ ওঠাও। ধর্মযুদ্ধে শত্রুর বিনাশ করো।

উদ্যোগপতি। ইসলামের নামে—এগোও রফিক।

ম্যানেজার। ধর্মের জন্য তোমাকে অস্ত্র ধরতেই হবে হরিকিশন।

উদ্যোগপতি। মনে রেখো রফিক, এটাই খোদার মর্জি।

ম্যানেজার। ঈশ্বরের নাম করে অগ্রসর হও হরি।

উদ্যোগপতি। ভুলে যেওনা রফিক, দুটো তরোয়াল একটা মাত্র খাপে রাখা যায় না।

ম্যানেজার। মারো হরিকিশন।

[ গুণ্ডা দুজনার হাতেই দুখানা ছোরা তুলে দেয়। দুজনায় পরস্পরের দিকে এগোতে থাকে। গুপ্তাজী ও গুণ্ডা 'মারো' 'কাটো' বলে চিৎকার দেয়। শেষ পর্যন্ত ওদের হাত থেকে ছোরা দুটো খসে পরে। রফিক ও হরিকিশন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ]

ম্যানেজার। ওঃ নো! হরগিজ নেহি।

উদ্যোগপতি। বেজন্মাগুলোকে খতম কর। শহরে গণ্ডগোল লাগাতেই হবে।

[ গুণ্ডা ছোরা দিয়ে রফিক্ এবং হরিকিশনকে খুন করে। ওরা মাটিতে লুটিয়ে পরে। উদ্যোগপতি, গুণ্ডা এবং গুপ্তাজী দাঁড়িয়ে ]

সূত্রধার। তো বন্ধুগণ, এই হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নমুনা। স্বচক্ষেই আপনারা দেখলেন তো কি ভাবে বিষ ছড়ানো হয়। কিভাবে একের পেছনে অন্যকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। তাইতো স্বাধীনতার এতকাল পরেও দেশে দাঙ্গার বিরাম নেই! সরকার তথা পুলিশি ব্যবস্থাকে স্বাক্ষী রেখেই, আমেদাবাদ, কানপুর, মীরাট, টাটা মোরাদাবাদে দাঙ্গা হয়েছে। সরকারী রিপোর্টই বলছে যে…

[ সাদিক সদরের তলা থেকে উঠে দাঁড়ায় ]

সাদিক। রেডিও খবরের কাগজ যে সংবাদটা প্রকাশ করে না, তা হলো, এতকিছুর পরেও হিন্দু মুসলমান এদেশে মিলে মিশেই বাস করে। তারা জন্ম, মৃত্যু বিবাহ সব অনুষ্ঠানেই একে অন্যের পাশে থাকে।

[ রামকৃষ্ণ চাদরের তলা থেকে উঠে আসে ].

রামকৃষ্ণ। আপনারা এও নিশ্চয় জানেন না যে আমেদাবাদ ইত্যাদি স্থানে দাঙ্গার ফলে শেষ পর্যন্ত কারিগর সম্প্রদায়েরই সর্বনাশ হয়েছে। রেডিও বা সংবাদপত্র নিশ্চয় আপনাদের জানতে দেয়নি যে আলীগড়ের লক্ষ লক্ষ তালার কারিগরের রুটি রুজি আজ বড় বড় ফ্যাক্টরি স্থাপনের ফলে বিপন্ন।

রফিক। এরপর যখন দাঙ্গার খবর পড়বেন মনে রাখবেন, আমেদাবাদের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়েছে, সেখানে এখন বৃহৎ কারখানার রমরমা। তেমনি আলীগড়ে প্রতিদিনই ফ্যাক্টরি বাড়ছে।

হরিকিশেন। এবং এ সমস্তকেই আমাদের রাষ্ট্রনেতারা বলে থাকেন—লঘু উদ্যোগ কার্যক্রমে। তো, সেই লঘু উদ্যোগের ফ্যাক্টরি বসানোর জন্য কিছু তাজা প্রাণ যদি নষ্টই হয়—হবে।

সূত্রধার। ঘরে ঘরে আগুন, শহর জুড়ে কার্ফু, শিশু এবং নারীদের মান ইজ্জৎ বিপন্ন। বাপ-মার কোল খালি করে জোয়ান মদ্দিরা খুন…।

রামকৃষ্ণ। পরিবর্তনের পরাকাষ্ঠা! ঐ লঘু উদ্যোগই নির্দোষকে হত্যা করে যে উদ্যোগ কোটিপতিদের মুনাফার জন্য আপনার

আমার ভালোর জন্য নয়। ওরা নিজেদের সিন্দুক ভর্তি রাখার জন্য যে কোন পাপই হাসতে হাসতে করতে প্রস্তুত।

সূত্রধার। আমীরদের জন্য দুনিয়ায় গরীব মানুষদের বাঁচার কোন উপায় পর্যন্ত নেই।

সূত্রধার। তাই আজ সর্বপ্রথম আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আজ আমাদের প্রথম কর্তব্য এই সমস্ত শয়তানদের মুখোশ খুলে দেওয়া। আমাদের আরো মনে রাখতে হবে এই যে, আপনি আমি যারা মাথার ঘাম-পায়ে ফেলে দুমুঠো অন্নের সংস্থান করি তাদের কারো সঙ্গে কারো ঝগড়া নেই!

সমবেত। মনে রাখবেন। শত্রু আমাদের প্রত্যেকের পেছনে সর্বনাশ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুদের চিনতে ভুলবেন না বন্ধুগণ।

[ উদ্যোগপতি গুপ্তাজী ও গুণ্ডা হতাশভঙ্গিতে বসে পড়ে। অভিনেতারা তাদের আড়াল করে দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ]

# ক্ষত-অক্ষত

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

এক

হাড়-জ্বালানো একটা শব্দ, পাখির। কী পাখি? কে জানে! হতে পারে কোকিল, কিম্বা কাক! একটানা চেঁচিয়েই চলেছে। সেই জন্যই ধনার মাথা গরম।

দু বোতল মহুয়া সাত সকালে পেটে ভরে তবেই না ধনা এসেছে ডিউটিতে। তাতেও মাথা ঠাণ্ডা নয়। বরং শিরা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। বিরক্তি। তার ওপর এই পাখিটা!

ঢিল ছোঁড়ে ধনা। ঘন পাতায় ঢাকা ছাতিম গাছটির সবচেয়ে অন্ধকার গভীর ডালে। ইটের টুকরো গিয়ে লাগে ও পাশের লাল পাকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের দেওয়ালে। ঠক্ ঠক্। ট্যাঙ্কির পাইপ ফেটে গিয়ে যেখান দিয়ে অনবরত জল ঝরেই চলেছে—ঝর ঝর টপ্ টপ্—

ঘুসুরের বাচ্চা, শালা রামপরবেশ এই সকালে গা ধুতে—ঝরা জলের নিচে—মরবে শালা এই ক্ষেপেই—টি. বি. রুগী—এতো অত্যাচার…রামপরবেশকে টেনে তুলতে সেদিকে দৌড়ায় ধনা। পিছন থেকে দিদিমনি যেন ডাকলো—ধনুরে—ও ধনু—

কাঁচা মাংসের ঝুড়ি এলো কিচেনে। শাল্লা দু লম্বরী। একবার দেখলে হয়। না, তার আগে এ্যাক্ উই ঘুসুরের বাচ্চাকে—মরবে ব্যাটা এই লটেই।

ধনা দৌড়ায়। গজ প্লাস্টার রক্ত মল—যতো সব নোংরা যেখানে সেখানে পড়ে ডাঁই। তার-ই মাঝে রামপরবেশ—মাথায় জল গায়ে জল। মূর্তিমান মৃত্যু। শুকনো চামড়ায় ঢাকা কখান হাড় মাত্র, বধির অথর্ব, প্রায় মূক, জ্যান্ত কঙ্কাল!

একজন আয়া আসে। ও ধনু, দিদিমনি—ফাইলটা—

কারো কথায় কান দেবার ফুসরৎ নেই ধনার। টেনে আনে, দুহাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারে ধনা।—লাতা লাতা—রামপরবেশ যেন কী সব বলে। টেনে আনতে না পেরে, কোলপাঁজা করে তাকে তুলে নিয়ে ধনা বিড় বিড় করে, শাল্লা দেড় কেজি ওজন্যার জ্যান্ত লাশ—অ্যাতেই অ্যাত্তো বাহাদুরি।

ছাতিম তলায় কলেরা ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের সামনে সিমেণ্ট-বাঁধানো চত্বরে ধনা রামপরবেশকে ধপ্ করে নামিয়ে রাখে। তারপর তার শরীরের নিম্নাঙ্গের ভেজা কাপড়ের টুকরোটিকে খুলে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ বৃদ্ধ রামপরবেশের গায়ে সকালের রোদ পড়ে ঠিকরোয়।

নিজের জামার নিচের দুটো বোতাম খুলে ফেলে, জামা দিয়েই রামপরবেশের গা মুছিয়ে দেয় ধনা! রামপরবেশ বসে বসে হাঁপায়।

ততোক্ষণে এধার ওধার থেকে দুচারটা রোগী উঁকি দিতে শুরু করেছে। একটা গজের কাপড় হাতে নিয়ে অফিস কাম ডিপথেরিয়া ওয়ার্ড থেকে ধনা বেরিয়ে আসে। হেই—হেই করে মারতে তেড়ে যায় কৌতূহলীদের।

ধনাকে চেনে সকলে। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে সে। ডাক্তারবাবুরা, নার্স, আয়া, জমদার যায় ডি. এম. ও সাহেব পর্যন্ত ধনাকে সমঝে চলে। স্নেহের সুরে কথা না বললে, প্রেস্টিজের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সব জায়গায় শাস্তি চলে না। আর ধনা দোষীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না।

সবাই মুখ সরিয়ে নিলে গর গর করে গজটা রামপরবেশের নিম্নাঙ্গে জড়ায়। বাপের মতো আদর করে। রামপরবেশের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে সব জল শুকিয়েছে কিনা। —লাগা? লাগা? অর্থাৎ ধনা জিজ্ঞেস করে টানা-হেঁচড়ায় রামপরবেশের লেগেছে কিনা। রামপরবেশ বোঝেনা ধনার ভাষা, ধনা বোঝেনা রামপরবেশের ভাষা—এই ভাবেই ইঙ্গিতে সংকেতে দুজন দুজনের কথা বোঝে। এ ওকে ভয় পায়, ও একে ভয় পায়; দুজনেই শত্রুর মতো আচরণ করে। ধনার ভয়, এতো মেহনতেও যদি মরে যায় রামপরবেশ! দুতিন বছরের পুরানো রুগী, পোঁদে দগ্‌দগে ঘা, বেন্না বেন্না শালা বুড়হার সব রক্ত শেষ, নাকে সিক্‌নি! কটা মজবুত হাড় মাত্র সম্বল। তাই নিয়ে আর কদিন? বছর দুতিন ডিঙিয়ে গেছে।

তবে আগের চেয়ে এখন সুস্থ রামপরবেশ। আর যাই হোক শাল্‌লা পোঁদ ঘস্‌টে ঘস্‌টে ইস্টিশান চত্বরে হাবা খেতে যায় মৌজে—এ্যাতো ধকলেও জান কাহিল হয় না।

সারা সদর হাসপাতাল চত্বর ধনার দখলে। কোনো দাদা বা মস্তানের ট্যাঁ ফো করবার জো নেই তার কাছে। এ সব ধনা বোঝে কিনা কেউ বোঝে না। নিজের খেয়ালে নিজের জীবন হাতে নিয়ে ধনা আকণ্ঠ মদ চোলাই তাড়ি গিলে চলে। ফাই-ফর্মায়েশ খাটে। ধনা না কি জাতে ডোম। তো ডোমের কাজটি তার পছন্দ নয়। গাড়ি ভর্তি পচা লাশ যাবে মহাতাবপুরের

শ্মশানে—ধনা থাকবে সঙ্গে। হাতটি লাগাতে বলো, সে কথা বলবার সাধ্য কি! ধনা গাইবে গান, বাজারের হিট্ সব হিন্দিগানের প্রথম কলি···রাম তেরি গঙ্গা ময়লি হো গেয়ি···

রামপরবেশের হাত ধরে ধনা। ধনা হাঁটে পা-পা। রামপরবেশ এক হাতে গুঁতা মেরে বসে বসে এগিয়ে যায়।

রোগীকে বেড়ে বসিয়ে এবার ধনা কিছুটা নিশ্চিন্ত। ততোক্ষণে পাখিটাও উড়ে গেছে। রামপরবেশের বরাদ্দ চারপিশ পাঁউরুটি আর আধ-মগ দুধ। সেটি খাওয়ানোর তদ্বির করতে গিয়েই নোতুন ঝামেলা বাধালো ধনা।

হৈ-হুল্লোড়। নার্স আয়া ওয়াড়-ইনচার্জ জমাদার ওয়ার্ডবয়—সব্বার ছোটাছুটি। দুধ নয় তো, দুধ-মেশানো জল। ওয়ার্ডবয়কে ধরে থাপ্পড় কষালো ধনা। চারপিশ পাঁউরুটির দুপিশ হাওয়া।

ধনা নির্বিকার। আবার গাছতলায় এসে বসে সে। গা চুলকায়। কানের ভিতর পায়রার পালক ঢুকিয়ে খরর খরর শব্দে আরাম পায়। কুত্তার পাছায় ঢিল মেরে কেঁই-কেঁই শব্দ শুনে মজা পায়।

ওদিকে তজুমা চলে। ফোঁস ফোঁস শব্দ করে কিচেনের ওয়ার্ডম্যান সুপারের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যায়, ধনার সামনে দিয়েই। ধনা সে সব দেখে। আর যাত্রার ঢং-এ মস্ত একটা হাসি দিয়ে চত্বরকে কাঁপিয়ে তোলে। তারপর একটা পা ওপরে তুলে, এক পায়ের ওপর ভর রেখে শরীর ঘুরিয়ে ওয়ার্ড-বয়টির উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে—পাগলা খেপ্—এ—ছে—এ···

ধনার এই কিত্তি দেখে ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের চৈতালি দিদিমনি হি-হি হাসে।

ধনা তখন সেদিকে এগিয়ে যায়। দিদিগো গলা কেমন? তখন দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ হাসে।

চৈতালি বলে, তা ভালো, কিন্তু তুমি ওকে মারলে কেন?

—কাকে?

—ঐ যে বলাই।

—ও—

যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি, এমনই নিরুত্তাপ ধনা। উত্তরটিও সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ।

চৈতালিও ছাড়ে না সহজে, কি গো বল···

—শাল্‌লা হারামির বাচ্চা সব—রামপরবেশের মুখে জল ঢেলে দেয়—রুটি হাফিস করে দেয়—

পকেট থেকে জর্দা পান বের করে ধনা মুখে ভরে। তারপর মোড়কের শালপাতাটি নোংরা ফেলার চৌবাচ্চায় ফেলে আসে। চৈতালি ধনার পেছনে লাগে—ও ধনু, তুমি এই সকালবেলাতেই মদ খেয়েছ?

নির্বিকার ধনা এড়িয়ে গিয়ে বলে, দিদি তুমি ডাক্তার হবে? তমার বাবা ত ডাক্তার—

এসব তথ্য রোগীদের থেকে আগেই জানা হয়ে যায় ধনার। চৈতালির বাবা বীরভূমের দুবরাজপুরে থাকে। মেডিক্যাল অফিসার। এখানে মহিলা কলেজের ছাত্রী চৈতালি। সে বলে, হ্যাঁ ডাক্তার হব।

—ভালো খুব ভাল্‌লো

—ও ধনু—

—কি

—এই বিস্কুটগুলো তুমি নাও।

চৈতালি তার বরাদ্দ হাসপাতালের দেওয়া আট-খানা বিস্কুট ধনার দিকে এগিয়ে ধরে।

এখানে বলাইরা ঝাড়তে পারে নি। ধনা জানে চৈতালি দিদিমণি হাসপাতালের দেওয়া খাবার খায় না। সেই বিস্কুটগুলি হাতে নিয়ে টি. বি. ওয়ার্ডে যায়। বসে থেকে রামপরবেশকে খাওয়ায়।

জানালার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলাই টিটকিরি কাটে, শালা যেন বাপকে খাবায়—হুঁঃ—

এদিকে অফিসে আর এক দফা চেঁচামেচি। রোগী-এন্ট্রি ফাইল উধাও। ধনা শোনে সব। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঘাড় নিচু করে দাঁড়ায়। ওয়ার্ড ইনচার্জ বলে, ও ধনু, বাবা—ফাইলটা—হা হা হাসে ধনা। পাগলি খেপ্—এ—ছে—...

—তা হোক, আগে ফাইলটা দে।

আলমারির মাথার ওপর থেকে ফাইলটি এনে টেবিলে আছড়ে ফেলে দেয় ধনা। আবার ছোটে টি. বি. ওয়ার্ডে।

## দুই

মাঝ বরাবর শহরকে চিরে ফাঁক করে খাড়া দক্ষিণে কাঁসাই-এর দিকে চলে

গেছে জল নিকাশির ড্রেন। তারই আশেপাশে দ্বারিবাঁধ নিমতলার চককে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক ঝুপড়ি পল্লী। কারো গোছানো ঘর, ছিটেবেড়ায় ঘেরা। মাথার ওপর খড়ের চাল। দু' একজন এমনও আছে—যারা মাথায় চাপিয়েছে টালি-টিন।

এখানে সব ডোম আর মেথরেরা থাকে। সকাল হবার আগেই 'ডিব্বাগাড়ি' ঠেলে ঠেলে ছেলে মেয়েরা চলে খাটা-পায়খানা সাফ করতে। মল ভরে ভরে চলে যাবে শহরের একেবারে বাইরে জুগনিপোতায়। তারপর নদীর জলে সাফাসুফো হয়ে ফিরে আসবে। কেউ বা দেবে রাস্তা ঝাড়ু। নর্দমা সাফাই স্যানেটারি পায়খানার ট্যাঙ্কি সাফাই, জঞ্জালের লরিচালক, কুলি কামিন -সব এদের থেকেই। এরা সব মিউনিসিপালিটির কর্মী। আর এদেরই কেউ কেউ যোগাড় করেছে সরকারি সদর হাসপাতালে একখান মস্ত চাকরি। এদেরই ঘরের বৌ-ঝিরা কেউ কেউ আয়ার কাজ জুটিয়েছে। কেউ আছে লাশ ঘরে মুদ্দা সাফাই-এ। কেউ জমাদার। আর কেউ কেউ ওয়ার্ড বয়।

ধনা ডোম সই-এর খাতায় ওয়ার্ড-বয়। কিন্তু নানারকম কাজ কম্মো করে সে। চোলাই-ভাটিতে গিয়ে হামলা করে, উঠা উঠা এসব, লিয়ে যা হেই সে পাস্‌সে—হাসপাত্তাল চত্বরে ইসব চলবেনি। প্রয়োজনে দু'দশটা ঘুসি ফুসিও চালিয়ে দেয়। তাকে সমঝে চলে এরা। কিচেনে মাংস কম এলে, কিম্বা পাঁঠার বদলে পাঁঠি-মাংস সাপ্লাই এলে, দিন দুপুরেই ওষুধ পাচার হলে, লেবার-রুম থেকে সদ্যজাত শিশুকে কুত্তায় টেনে নিয়ে গেলে, রোগিনীর ইজ্জতহানি হলে—হ্যাঁ, সেখানেও ধনা হাজির গিয়ে। সবসময় সব সমাধান করতে পারে না। কারণ গভীর। কিন্তু হৈ হট্টগোল হামলা সুপারের তড়পানি, কণ্ট্রাক্টরের লাল চোখ—এসব লেগেই থাকে। বেপরোয়া ধনা ছুটে যায় অন্য কাজে বা টি. বি. ওয়ার্ডে। অ্যাক্সিডেন্টে ঠ্যাং কেটে যাওয়া, পোড়া, বিষ খাওয়া, সাপে কাটা, কলেরার সিরিয়াস রোগী সব দূর দূরান্ত থেকে এসে জোটে। রিক্সা-এ্যাম্বুলেন্স থেকে তাদের টেনে নামিয়ে, এমারজেন্সিতে দেখিয়ে, আউট ডোরের খাতায় নাম এণ্ট্রি করে, ওয়ার্ডে বেডের ক্রাইসিস মিটিয়ে সব ব্যবস্থা করা—এ সবে ধনা মস্ত সহায়। যারা জানেনা ভিন্ন কথা, কিন্তু যারা জানে, তারা মাল খেতে দু' একটা আধুলি কয়েন মায় দু' পাঁচ টাকার মস্ত একটা নোট ধনার হাতে ধরিয়ে দাও, ধনা তোমায় দেবতা মেনে সেবা করবে। বদলে তুমি বড়ো ঘরের পো পোতা বৌ ঝি মালিক—হাস-পাতালের দুধ মেশানো জল বা সস্তার বিস্কুট বা শুকনো বাসি ডাব বা বাসি

পাঁউরুটি, ট্রের ওপর সাজানো নোংরা ঝোল ভাত মাছ মাংস ডিম—যেগুলো তুমি খাওনা ঘেন্নায় বা অন্যকারণে, সেগুলো ধনাকে দাও। ধনা সে সব কাজে লাগাবে। ছুটে যাবে টি. বি. ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও। মেডেক্যাল ওয়ার্ডে, যেখানে লাশের মতোই মেঝের ওপর গাদাগাদি সব রোগী—তাদের সেবায়। বদলে মদের গন্ধ ভর্তি ধনার শরীরটি তোমার নাককে সহ্য করতে হবে। আর বাইরের বটতলার চক থেকে তোমার প্রিয় খাদ্য কমপ্লান হরলিক্স বিস্কুট এবং অবশ্যই ওষুধটিও ধনাকে আনতে দাও ধনা এনে দেবে। এই নিয়েই ধনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

সেদিন সকালে ডিউটিতে আসবার সময়, হঠাৎ নিমতলার চকে তাকে দেখেই মগজটা কেমন চিড়বিড়িয়ে উঠলো ধনার।

—শালী হারামির বাচ্চা খান্‌কি মাগী—

চেঁচাতে চেঁচাতে তার দিকে তেড়ে যেতেই, পিছন থেকে এক রিক্সাআলা ধনার ঘাড়ের ওপরের চুল ধরে কষিয়ে দিল থ্যাপ্‌ড়া নাকের ওপর দু'চারটা।

ধনা আর বাড়াবাড়ি করেনি। বরং তড়পাতে তড়পাতে পরে গান গাইতে গাইতে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে এসেছে। এসেই ছুটেছে টি বি ওয়ার্ডে। ···অনেক জমানো ব্যথা বেদনা কি করে গান হল জানিনা···

ওই মেয়েটি ধনার বউ। ধনার ঘর ছেড়ে, ধনার সঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মহাতাবপুরের রিক্সায়ালাটির সাথে থাকে। মিউনিসিপালিটির রাস্তায় ঝাড় দেয়।

এমনিতে সব ঠিক ঠাক। ধনা তার জীবনের এই ইতিহাসটুকু জানাতে কারোর কাছে চোখের জল ফেলেনি, নাকের সিকনি ঝরায় নি। একজনের খোরাকি কমে যাওয়ায় মাল খাওয়া বেড়ে গেছে মাত্র। কোনো কৌতূহলী জিজ্ঞাসু হলে ধনা এড়িয়ে গেছে। কোনো নার্সদিদিমনি বা বেপাড়ার যুবতী আয়া এ নিয়ে ঠাট্টা ফাজলামি মারাতে এলে ধনাও একটা ঠ্যাং-এর উপর শরীরের ভর রেখে অন্য ঠ্যাং ওপরে তুলে শরীরকে গোল পাক খাইয়ে হো-হো হেসেছে—তুই তুমি আপনি আমার বউ হবেন গো···

—এই ধনা শোন শোন

পগার পার। ধনা আর সে চত্বরে নেই। টি বি ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও। বরং পুরোনো ইয়ার দোস্ত দু'একজন এই সব ব্যথা বেদনার কথা নিয়ে সহানুভূতি জানাতে এলে, দু'এক হাত হয়েও গেছে তাদের সঙ্গে ধনার।

ধনা আসে ওয়ার্ডে।

নার্স দিদিমণি জিজ্ঞেস করে, কি ধনু, বাবা তোর এতো দেরি আজ !

ধনা সে সবের উত্তর না দিয়ে যাত্রার ঢং-এ রাজার হাসি দিয়ে সোজা টি বি ওয়ার্ডে।

সেখানে আর এক কাণ্ড ! ধনা গিয়ে দেখে, রামপরবেশ বে-পাত্তা। তার গন্ধও নেই ধারে কাছে।

—এ খেপীদিদি, বিহারীবাচ্চা কাই গইল বা—

—কি ? কি কউ ? হাঁফাতে হাঁফাতে এক অসুস্থা সাঁওতাল বৃদ্ধা ধনার প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করে।

ধনা বলে, রামপরবেশ ?

—নাই।

এক দৌড়ে ধনা ওয়ার্ড ইন্‌চার্জের কাছে। দিদিমণি টি বি ওয়ার্ডে রামপরবেশ নাই।

—নেই কি রে !

—হুঁ দেখলম নাই।

—দেখ দেখ বাবা ধনু, আবার ঝামেলা বাধিয়েছে।

—কি দেখব ফের ? শালা পোঁদ ঘসটাতে ঘসটাতে সেই ইস্টিসান চত্বর।

—যা দেখ।

—যাই, কেউ খুঁজতে আইলে বলবে, ধনা নাই, সে কাজে গেছে।

ধনার গম্ভীর ভঙ্গি দেখে নার্স মুখে রুমাল চাপা দেয়। হাঁসলেই দিদিমণির দেড় ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে বারান্দায় চৈতালি দিদিমণি। ও ধনু কোথায় যাও ?

—দিদিমণি ভালো আছ ত ?

—তুমি ?

—শুবে যাও।

—শোনো না এদিকে—

—না গ তমার বর ধরতে ইস্টিসানে যাই।

—শোনো শোনো—বরটা কেমন ? ও ধনু—

—পাগ্‌লি খেপ্‌—এ—ছে—এ। এক দৌড়ে ধনা ছাতিম তলা ডিঙিয়ে ওপাশের লাল পাকা পেরিয়ে গেছে।

ইস্টিসান চত্বরে রেল লাইনের পাশে লাল মাটির ওপর যে কৃষ্ণচূড়া গাছটির

তলায় বসে থাকে রামপরবেশ, ধনা দেখে, আজ সেখানে নেই। বদলে টাটকা তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে এক যুবতী। মাটির কলসীর মুখে খেজুর পাতা আর শাদা ফেনা। তালের রসের তাড়ি! চার গেলাস টপাটপ মেরে দিয়ে ধনা রামপরবেশকে খুঁজতে থাকে।—শাল্‌লা বিহারী কা বাচ্চা কাই গইল বা?...চেঁচায় ধনা।

অবশেষে প্লাটফর্ম চত্বরে শুয়ে থাকতে দেখে। শাল্‌লা পাথ্‌থার হাবা আর ইস্টিসানের বাতাসে ঘুম্‌মে গেছে।

রামপরবেশের উদোম তপড়ানো পাছায় লাল কালোয় মেশামেশি ঘা—বেডসোর। দীর্ঘ দু-তিন বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই অবস্থা। সেখান থেকে নেংটি খসে যাওয়ায় মাছি ভন্ ভন্ করছে। নেংটি টেনে ঢাকা দিয়ে দেয় ধনা। তারপর গুঁতো মেরে জাগিয়ে তোলে রামপরবেশকে। জিজ্ঞেস করে, লাগা? লাগা?

ভয়ে, উদ্বেগে শঙ্কায় জড়সড় জবু থবু অসাড় রামপরবেশ বিড় বিড় করে—যাতা, যাতা—যেন, অন্যায় করে ধরা পড়ে গেছে. এমনই আড়ষ্ট। কাতরতা চোখে মুখে।

এতোখানি পথ পাছা আর দু'হাতের ওপর ভর দিয়েই রামপরবেশ পালিয়ে আসে। ফলে ঘা ক্রমশ বেড়ে যায়। ধনার নিয়মিত মলম লেপাতেও সে ঘা তাই বাড়ে বই কমে না।

রামপরবেশ তার যাবতীয় অসুস্থতা নিয়ে কেনই বা বার বার ইস্টিসানে পালিয়ে আসে, তা জানেনা ধনা। কেনই বা অন্য কোথাও না গিয়ে এইখানেই পালিয়ে আসে তাও জানেনা ধনা। এ নিয়ে হাজার প্রশ্ন তৈরি হতে পারে; সেই সূত্রে বেওয়ারিশ রামপরবেশের একখানা জীবনের মস্ত ইতিহাস আগ্নেয়গিরির মতো হঠাৎই ভুঁই ফুড়ে লাভার স্রোত উগরিয়ে দিতে পারে—সে সবের ধার ধারে না ধনা। আকণ্ঠ মদের ওপর নিমতলার চকের উত্তেজনা, টি বি ওয়ার্ডে রামপরবেশহীন খালি বেড, চৈতালি দিদিমণির মিষ্টি হাসি, হাসপাতাল টু ইস্টিসান হিন্দিগানের কলি, টকমিষ্টি ঝাঁঝালো তাড়ির আমেজ, রামপরবেশের অসুস্থতা পালিয়ে আসা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা—সব মিলিয়ে এক ঘোরের মধ্যে টলতে টলতে রামপরবেশকে দু'হাতের মধ্যে তুলে নেয় ধনা। তারপর রিক্সা স্ট্যাণ্ডে আসে। চল্ বে হাস্‌পাত্তাল—

রিক্সার পা-দানিতে রামপরবেশকে বসিয়ে দিয়ে নিজে সীটে বসে। তারপর নিজের পাগুলো তুলে দেয় রামপরবেশের কাঁধে। ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের চুলহীন

মাথাটি ধরে রাখে যত্নে দু'হাতে। এতোসব, যাতে আর রিক্সা থেকে লাফিয়ে না পালিয়ে যেতে পারে রামপরবেশ।

রিক্সা থেকে লাফিয়ে পালাবার কোনো সাধ বা সাধ্য যে নেই জড় রামপরবেশের, সে বোধ ধনার নেই।

এইভাবে দুটি প্রাণীকে বয়ে নিয়ে একখানা রিক্সা শহরের যাবতীয় বড় বড় বাড়ির পাশ দিয়ে সরকারি পিচ রাস্তা মাড়িয়ে এগিয়ে যায় হাসপাতালের দিকে।

এই দৃশ্য অনেকেরই হাসির খোরাক। অনেক কৌতূহলী ট্যারা চোখে তাকিয়ে দেখে।

ধনা নির্বিকার।

রামপরবেশকে কোলে করে নিয়ে যায় বেডে। ও দিকে রামপরবেশকে দেখতে পেয়েই আর এক কাণ্ড!

অনেক ভোরে, যখন সবে কাক পক্ষীরা জাগতে শুরু করেছে, তখন না কি এক অসুস্থ ল্যাট্রিনের ভিতর। নিদ্রাহীন রামপরবেশ সামলাতে না পেরে দরজার মুখেই সেরে ফেলেছে। প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা তা জমাদারের কানে তুলে অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়েছে। ফিনাইল এবং পাটের ঝাড়ু হাতে জমাদার এসব কাণ্ডকারবারে রেগে খুন। রামপরবেশকে মারবে বলে শাসিয়ে গেছে সে। তাই হৈ-হল্লা।

অসুস্থ মানুষের ভিড়ে, অসুস্থ গুমোট পরিবেশে এই সব দু'একটা দুর্ঘটনা বেশ আলোড়ন আনে হাসপাতাল চত্বরে। তাই প্রত্যেকেরই মুখে মুখে ঘোরে ফেরে এই সব অনাসৃষ্টির কথা।

ধনা সব শোনে। মন দিয়ে শোনে। ধনা রাগতে জানে। কাঁদতে জানে না।

প্রথমটায় হাসে। গোটা চত্বরকে কাঁপিয়ে চেঁচায়—পাগ্‌লা খেপ্‌—এ—ছে—এ—

পরমুহূর্তেই গম্ভীর।

ঠিক সেই সময় ছাতিমতলা পেরিয়ে ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের সামনে জমাদারটি হাজির।

এক মুহূর্তেই হৈ-হট্টগোল চেঁচামেচি লোক জড়ো অনেক কাণ্ড। ধনা জমাদারকে আধমরা করে ছেড়েছে। তার অপরাধ, কেবল ক্রোধের মাথায় রামপরবেশকে মারবে বলে ফেলেছে।

অসহায় জমাদার যখন ধনার চাকরি খাওয়ার কথা ঘোষণা করে তড়পিয়েই চলেছে, তখন অন্যমনস্ক ধনা বলে, শালা মারবি কুথায় ওর আঁ—শরীলে মারবার জায়গা আছে? পরক্ষণেই হেসে উঠেছে—পাগ্‌লা খেপ্‌—এ—ছে—এ—

লোকেরা যখন তদন্ত আর সমালোচনায় ব্যস্ত, ধনা তখন চৈতালি দিদিমণির কাছে বিস্কুট সংগ্রহে ব্যস্ত। এবং এক হাট লোকের ওপর দিয়েই বুক ফুলিয়ে পাছা দুলিয়ে দৈত্যের হা—হা হাসি দিয়ে সোজা আবার টি বি ওয়ার্ডে।

ধনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধনারই। জন্মাবার পর থেকেই। সম্পদের সম্ভারে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এতোই নিটোল যে বাইরের কোনো ক্রিয়াকর্ম তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। শূন্য থাকলে তো ভরাবে, ভরাই যদি থাকে তবে আর ভয়াবে কোথায়! ধনার গুণ-অগুণ সবগুলিই তাই অপরিবর্তনীয়। যারা দেখেছে, তারা সেটা জানে। একটা কাণ্ডকারবারে সে আমূল সংশোধিত হয়ে যাবে এমন ধারণা করাটাই ভুল।

এতো বড়ো গণ্ডগোল বাঁধানোর পর ও নির্লজ্জ ধনা ওদিকের ওয়ার্ডে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক নিচুতলার মহিলা স্টাফের ওপর চড় তুলেছে!

টি. বি. ওয়ার্ডের ওপাশে মর্গ ও লাশ স্টোর। বিকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মাঝে মধ্যে! মহিলার অপরাধ, জানালার ঠিক ওপারেই কিছু নোংরা গজ-প্লাস্টার ধনা তাকে পরিষ্কার করতে বলেছিল। সে করেনি।

ধনা বলবার কে?

কিন্তু, আইন কানুনের প্রশ্ন শিক্ষিত ভদ্র আমলাদের জন্য। ধনা সে সবের ধার ধারে না। তোমাকে করতে বলেছি, তুমি করনি, আমার কাছে তুমি দোষী। ধনার ভাবখানা এই রকম।

মহিলাটি সে সব তো করেই নি, উপরন্তু জানালাগুলিও বন্ধ করেনি। টি বি ওয়ার্ডে, যেখানে উন্মুক্ত নির্মল হাওয়া জরুরি, সেখানে পচা মড়া ও যাবতীয় নোংরার দুর্গন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে—এ ধনার মগজ মেনে নেয়নি।

পুরুষ পুরুষের গায়ে হাত তুলেছে, কিম্বা মহিলা পুরুষের গায়ে হাত তুলেছে, তাতে ঝামেলা মিটমাট হওয়া যতো সহজ, পুরুষ মহিলার গায়ে হাত তুলেছে, এটি মেনে নেওয়া ততো সহজ নয়। ধনা দোষী এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

কিন্তু সবমিলিয়ে যা দাঁড়াল, তাকেই বলে মিটমাট। এবারও জয়ী ধনা। পরক্ষণেই মহিলাটির কাছে গিয়ে বলল, মোর দোষ হয়ে গেছে। পান খাবি? হা লে—

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পানের খিলি বের করে, খপাৎ করে মেয়েমানুষের হাত ধরে, সেই নরম হাতের ভিতর পান গুঁজে দিয়েছে।

বদলে মহিলাটি মুখটাকে ভিন্নরকম কায়দার মধ্যে ধরে রেখে, ধনাকে ঠেলা দিয়েছে—যা মড়া যা—ভাগ—

নিজের পাছায় চাপড় মারতে মারতে আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে জটলার ভিতর হাজির ধনা। তার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে শরীরকে বোঁ পাক খাইয়ে চেঁচিয়ে ছাতিমগাছের পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিয়েছে। পাগ্‌লি খেপ্‌ এ—ছে—এ—

## তিন

ধনার মনটা খুশিতে ফুরফুরিয়ে পাতলা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে বেড়াতে চাইছে। সকালে উঠেই দেখে, দুনিয়াটি কেমন বদলে গেছে। রিক্সা স্ট্যাণ্ডে এখনো সে আসেনি। রাস্তার ওপর ঝাড়ু হাতে এখনো সে আসেনি। সবে বাসস্টপগুলিতে দু'একটা মাত্র চায়ের দোকান খুলেছে। কোথাও বা কয়লার কাঁচা ধোঁয়া চত্বরকে মাতিয়ে রেখেছে। দু'একটি লোক দূর পাল্লার বাস ধরতে রিক্সা চড়ে স্টপের দিকে এগিয়ে আসছে। মিউনিসিপালিটির আলোগুলি নেভেনি এখনো। ভোরের ধোঁয়াশা ছড়িয়ে চারদিকে।

—শাল্‌লা রাতে আঁধার, মান্‌ষে মায়ের গভ্‌ভে ঢুকে আর দিনের ব্যালা বাত্‌তি জ্বলে—অবাক হয়ে বিড়বিড় করে ধনা।

দিনের বেলা বাতি জ্বলা উচিত নয়, সুতরাং একটি ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে একটা বাল্‌ব লক্ষ্য করে ছোঁড়ে। বিফল হয়ে আনমনা ধনা গান ধরে পরপর—হোমারিয়া হোমারিয়া—রাম্মা হো হো হো—ম্যায় নেহি মাখন খায়ো—। ভাটির দিকে এগিয়ে যায়—গান চলে—রঙ দে চুনারিয়া—আ-আ—অ্যায়সে লাগি লগন মীরা হো গেয়ী মগন……

আজ টাটকা মহুয়া গুনে গুনে দু'টি বোতল পেটে ভরে ধনা ডিউটিতে চলে।

কাল রাতে রামপরবেশকে বেশ সুস্থ দেখেই এসেছে। রাতে আসার সময় হাত দুটি জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, আসতে দেয়নি। ধনা বুঝিয়েছে, লাগা? লাগা?

বদলে, আঙুল উঁচিয়ে কেবলই ইস্টিসান দেখিয়েছে। ধনা বলেছে, না, না, লাগবে, কষ্ট হবে, কাশি বাড়বে, তুই ঘুমা। ইঙ্গিতে নিজের চোখ বন্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছে ধনা। তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে।

হেসেছে রামপরবেশ। ইস্টিশানের কথা ভুলে কেবল ধনার দিকে তাকিয়েই হেসেছে।

···হাসছে হাসছে হাসছে···কেবলই হেসে চলেছে···সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় বসে, পাশে ধনা···ত্বনিয়ার দুটি শত্তুর মুখোমুখি হয়ে এক পবিত্র সম্পর্কের স্বাদ পেয়ে চলেছে···স্বপ্ন ভেসে যেতেই উঠে পড়েছে ধনা ঘুম থেকে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? কী মজা!

হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে ধনা শোনে, সেই পাখিটা ডেকে চলেছে। ঢিল মেরে তাকে ওড়ানোর চেষ্টা করে না। বরং বিড় বিড় করে, ডাক শাল্‌লা ডাক চেঁচিয়েই যা—থমকে দাঁড়িয়ে গাছের দিকে তাকায়—এই পাখিটারে কোকিল কয়? পাতার পর পাতা ডিঙিয়ে গভীর অন্ধকারে চোখ চানায়।

তারপর ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডে, ওয়ার্ড ইন্‌চার্জের কাছে যাওয়ার আগে একবার চৈতালি দিদিমণিকে দেখে যায়।

ও দিদি, আছেন কেমন?

চৈতালি নিরুত্তর। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্য দিকে। গম্ভীর। কেবল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

ধনা ঘাবড়ে গিয়ে, পরক্ষণেই ঘোরটা কাটিয়ে নিয়ে একখানা হাসি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, পাগলি খেপ্‌-এ-ছে-এ—

চৈতালি মুখ ফেরায়। অন্যরকম। যেন কিছু ভাবছে।

ধনা অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে। ও দিদিমণি, তুমি ডাক্তার হবে?

ওদিকে ইনচার্জ ডাকে, ধন শোন্—ফাইলটা?

ধনা উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা ঠেলে ওদিকে যায়। আলমারি থেকে ফাইল বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েই সটাং টি. বি. ওয়ার্ডে।

শালা রামপরবেশ ঝামেলা পাকিয়েছে আজ ফের—বেড ফাঁকা—সেই ইস্টিসান চত্বর···

ধনা আবার অফিসে আসে। ও দিদি রামপরবেশ নাই—সেই ইস্টিসান, আমি যাই, কেউ খুঁজতে এলে বলবে, ধনু কাজে গেছে—ধনা পিছু ফিরে হাঁটা দেয়।

—ও ধনু, ধনুরে, ধনা, এদিকে আয়, শোন্

ধনা প্রথমে এড়িয়ে গেলেও এতো ডাকে থমকে দাঁড়ায়। ফিরে আসে। দিদিমণি চোখ রাঙায়—এ-এ-ই—

—কি হইছে জলদি বল

—কেন ? এত তাড়াহুড়োর কি ?

—আমি যাব যে—

—কোথায় ?

—ইস্টিসানে—

—না।

—কেন গ অ দিদি রামপরবেশ যে—

হো-হো হাসে দিদিমণি। যেন জানালার কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।—রামপরবেশের লাশ মুদ্দা ঘরে—

অবহেলায়, যেন বাতাসে কথাটি ভাসিয়ে দেয় নার্স দিদিমণি। এমনই নিরুত্তাপ। কেবল দেড় ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে থাকে।

—উঁ? অ্যাঁ—কি! ব্যস্ত ধনা এখন চেয়ারে বসে। মাথায় হাত। চোখগুলি মেঝেতে আটকানো।

—এই ধনা

ধনা নিরুত্তর।

—ওরে হলটা কি ? ফাইল দে—

ধনা চোখ তোলে, লাল—কি ?

—ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের ডিসচার্জ ফাইলটা—

ধনা দাঁড়ায়।

হাঁটতে থাকে।

দিদিমণি বিরক্ত হয়। মুখ খারাপ করে—শালার হয়েছে কি ? ফাইল না দিয়েই—

গেটের সামনে গিয়ে বাঁয়ে চোখ ফেরায় ধনা। চৈতালি দিদিমণি দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হয়।

নিশ্চুপ ধনা হাঁটতে থাকে।

মাতাল খামখেয়ালি ধনাকে চৈতালির চিনতে কষ্ট হয়। সে ঘরে ঢোকে।

ধনা আবার ফিরে আসে। ওয়ার্ড ইনচার্জের কাছে যায়।—ও দিদি আমি আসছি।

—কেন ? কোথায় ?

—এই একটু ওই দিকে। ধনার পা টলে না। অন্য পাঁচটা ওয়ার্ডবয়ের মতোই ধনা ঘোরে ফেরে।



[library stamp]
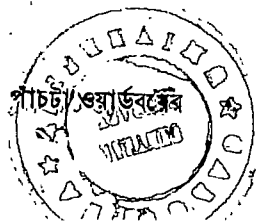
অনুমতি চায়। লাল নয়, বরং বিনয়ী সে টলটলে চোখে হাজার যোজন আকৃতি ভেসে থাকে।

—ফাইলটা দে—

ধনা প্রতিবাদ করে না। ফাইল খুঁজে বের করে টেবিলে আস্তে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর বেওয়ারিশ রামপরবেশের লাশটার ডেথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে মর্গে যায়। সেখানের যাবতীয় ঝামেলা মিটিয়ে নিয়ে স্টোরে। এতোসব কাণ্ডকারবারকে ঘিরে আর আর ধনাকে জড়িয়ে কোনো অঘটন ঘটে না।

ডিউটিতে ছুটি নিয়ে, দু' তিনজনকে যোগাড় করে রামপরবেশের মৃতদেহটি বাইরে আনে।

চৈতালির কাছে গিয়ে বলে, ও দিদি কুড়িটা টাকা দিবে? ধার? চৈতালি বুঝতে পেরে দেয়। এতো সহজে টাকা পেয়ে গিয়ে ধনা কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। চৈতালি বলে, হবে তো এতে?

—হুঁ মোর কাছে কিছু আছে—

আকাশে ভেসে থাকে ধনার চোখ।

একটার পর একটা কাজ সারে।

সবাই এ সব দেখে। কৌতূহলীরা উঁকি মেরে আর অবাক হয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে। ধনার শত্তুরেরা টিটকিরি কাটে—শালার থোবড়াটা খ্যাখ্—শক্ পেয়ে মিইয়ে গেছে—

ধনা চেঁচিয়ে ওঠে না, চুপ্ বে—

ধনা চেঁচিয়ে ওঠে না, পাগ্‌লা খেপ্—এ—ছে—এ—অপরাধীকে জব্দ করে, তার বিশেষ কায়দায় শারীরিক কসরৎ করে ধনা এখন আনন্দ প্রকাশ করে না।

সেদিন হাসপাতালে ধনা ডোমকে জড়িয়ে কতকগুলি দুর্ঘটনা এবং অথবা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। এদিক ওদিকের সারা হাসপাতাল দুনিয়ার সমঝদারেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একটি বেওয়ারিশ লাশের জন্য ঝামেলায় ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়িয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে খাট কিনে ধূপে ফুলে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে সৎকার করবার জন্য কে কবে ফের মাথা ঘামায়?

ধনা ডোম কাঁদছে। ছাতিমতলায় বসে, কোকিলের ডাক ছাপিয়ে হাউ হাউ করে কেবল কেঁদেই চলেছে ধনা ডোম বেওয়ারিশ রামপরবেশের দুর্গন্ধময় লাশটাকে জড়িয়ে ধরে।

খাটিয়ার পায়ের দিকটায়, যেখানে ছ'ফুট মৃত রামপরবেশের খাড়া পা দু'খানি খাট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে—সেখানে এক দোস্ত পা-টিকে মুচড়ে ভিতরে ঠেলার চেষ্টা করেই চলেছে।

মুখ তোলে ধনা। তাকায়।

আকাশে তখন রোদের তাপ বাড়ছে।

ধনা বিড় বিড় করে রামপরবেশের শুকনো চোখদুটোর ওপর নিজের ভেজা স্থির চোখগুলি মেলে ধরে—লাগা? লাগা?

# জিপসিদের কথা ও কলি

পবিত্রকুমার সরকার

দৃশ্যটা একবার কল্পনা করুন। কোন দূর পাহাড়ের পায়ের তলায় বা কোন গহন বনপ্রান্তে তাঁবু খাটানো রয়েছে। সন্ধ্যায় তাঁবুর ঠিক মাঝখানটায় জ্বালানো হল অগ্নিকুণ্ড। সেই আগুনকে বেড় দিয়ে অস্থায়ী আস্তানার সব কটি মানুষ নাচে গানে মশগুল হয়ে উঠল। তাঁদের ধ্বনিময় সুর ও স্বরের ব্যঞ্জনা দূর লোকালয়কেও স্পর্শ করল। তারপর কখন গান থেমে যায়। নিভে যায় আগুন। জাঁকিয়ে রাত নামে। সুরের রেশ কিন্তু সহজে মিলিয়ে যায় না।

আজ বিশ শতাব্দী শেষ হওয়ায় মুখেও ইউরোপ এশিয়ার নানান দেশের জিপসি পাড়া থেকে ভেসে আসে সুর, গানের কলি। ওদের জীবন যেমন ভাসমান, তেমনি ভাসমান ওদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি। জিপসিদের কথা ও কলির লিখিত রূপ খুবই কম। মুখে মুখেই ঘোরে কাহিনী গান গল্প ও গাঁথা।

যাযাবর মানুষদের নানান জাত। একদল ভবঘুরে যাযাবর দুনিয়াজোড়া জিপসি নামেই পরিচিত। ইংলণ্ডে আসার আগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফরাসী-ভূমিতে তাদের বোহেমিয়ান ও ঈজিপসিয়ান বলেই পরিচয় ছিল। তখন ধারণা ছিল জিপসিরা বুঝি ঈজিপসিয়ান বা মিশরের আদিবাসী। ঈজিপসিয়ান থেকেই জিপসি কথাটি এসেছে।

পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছে। এখন সকলেই জানেন যে জিপসিদের আদি-ভূমি ভারতবর্ষ। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ওরা উত্তর-পশ্চিম ভারত ছেড়ে দেশান্তর যাত্রা করেছিল। সেই থেকেই ভাসমান যাযাবর জীবন। ইউরোপে জিপসিদের আনাগোনা চোখে পড়ে দশম শতাব্দী থেকে।

ফির দৌসির শাহনামায় আছে, পঞ্চম শতকে পারস্যরাজ বৈরাম গৌর ভারতীয় নৃপতির কাছ থেকে বারো হাজার নারী পুরুষ গাইয়ে-বাজিয়ে উপঢৌকন হিসেবে পান। তারা 'লুরি' নামে পরিচিত হল। আজও পারস্যে (বর্তমান ইরান) জিপসিদের নাম লুলি বা লুরি। পরবর্তীকালে বাইজেন-টাইন সাম্রাজ্যেও এই ঘরছাড়া মানুষদের 'সিগানুর' অর্থাৎ বাজিয়ের দল

আখ্যা দেওয়া হয়। আজ ইউরোপে জিপসিদের চলতি কথায় 'সিগা' বলা হয়ে থাকে।

ইউরোপে এসেই জিপসিরা পাকাপাকি ভবঘুরে হয়ে যায়। ডাইনিবিদ্যা, ভাগ্যগণনা, ভোজবাজি, ভাল্লুক নাচ, সুর কেটে ছড়া পড়া, তুকতাক, শেকড় বাকল বিক্রি ইত্যাদি পেশায় জড়িয়ে যেতে দেখা যায়। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ বাদ দিলে সমাজের সবচেয়ে নিচু ও খাটনির কাজগুলোতে এদের লাগানো হয়। ফারসী দেশে গাড়ি মেরামতের মিস্ত্রি বলতে জিপসিরাই। ইস্তাম্বুলে ধাঙর মেথর ও জহ্লাদের কাজে এদের লাগানো হয়। বুদাপেস্টের রাজপথে জিপসি ফুলওয়ালির দেখা পাবেন। কিন্তু এর বাইরেও পরিচয় আছে।

ইউরোপের নানান লোক কাহিনী, মিথ, রূপকথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গী প্রভৃতিতে জিপসিদের অবদান কম নয়। অথচ সেই পরিচয়টা প্রায়শই চাপা পড়ে থাকে। এই ছিন্নমূল মানুষরাও যে ইউরোপীয়দের শিল্প ও সংস্কৃতিতে অনেক কিছু দিয়েছে, সে স্বীকৃতি কোথায় ?

হাঙ্গেরির কাফে বারগুলো জমিয়ে রাখে জিপসি শিল্পীরা। রোমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াতেও একই অবস্থা। ইউরোপে জিপসি লোকসঙ্গীতের রেকর্ড খুবই জনপ্রিয়। পণ্ডিতরা যে যাই বলুন, একটা সময় ইউরোপীয় লোকসঙ্গীতে নতুন জীবন দিয়েছে জিপসিরা।

ইউরোপের দেশে দেশে জাজ, গীটার আর ভায়োলিন বাজিয়েদের মধ্যে জিপসিদের বেশ নাম ডাক। ফরাসী দেশের গীটার বাজিয়ে জাঙ্গো রাইন-হার্টের তো একদা জগতজোড়া নাম ছিল—এখন যেমন রয়েছে মনিতা স্ত প্লাতারের। হাঙ্গেরীয় জাজ শিল্পী পেজেরেরও যথেষ্ট নাম। এক সময় ইংলণ্ডের বিশ্বখ্যাত জিপসি নাচিয়ে ছিলেন কারমেন আমায়া। হাল আমলে সোভিয়েত দেশের কয়েকটি জিপসি শিল্পীদল বেশ নাম করেছে। সোভিয়েত উৎসব উপলক্ষে একটি জিপসি নাচের দল তো কয়েকমাস আগেই কলকাতায় অনুষ্ঠান করে গেল। বছর তিনেক আগে সোভিয়েতের জিপসি শিল্পীত্রয়ী—ভ্যালেন্টিনা, ভ্যালরি ও অ্যাঞ্জেলিকা—মা, বাবা ও মেয়ে—কলকাতার আসর মাতিয়ে দিয়ে যান।

[ দুই ]

অনেক অতি প্রচলিত জিপসি ছড়ার সুর দেশ দেশান্তরে ঘুম পাড়ানি গান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ঃ—

Tintery, mintery, cutery corn এরই অনুরূপ লৌকিক ছড়া আমরা বাংলায় পাই :— ইকড়ি মিকড়ি চামচিকড়ি

চামে কাটে মজুমদার।

ইউরোপের আরেকটি অতি প্রচলিত ছেলে ভুলানো ছড়ার রূপান্তর তুলে ধরছি। জিপসি গানের সুরে শোনা যেত :

Ekkeri (ickery), akkery, ukery an,
Fillisi, Follasy Nicholas john,
Queebee Quabee—Irishman
Stini—Stani—buck

লক্ষ্যণীয় : Ek বা yek—এক।
Akkery—একবারি।
follasy-র অর্থ মহিলার দস্তানা।
Nicholas=na (kalas)—না খেলা।
John—go on-এর রূপান্তর।
Queebee—Quabee—কেকাভি।
কেকাভি—কেটলিজাতীয় পাত্র।

Irishman-এর বোধহয় কোন অর্থ নেই, স্বরসঙ্গতির জন্য ব্যবহার হয়েছে। Stini—Stani এর অর্থ আমি জানি না। Buck ( ইং )— জন্তু বিশেষ।

ছড়াটি হেঁয়ালি জাতীয়। ব্যবহৃত শব্দগুলো অধিকাংশই ভারতীয়। অবশ্য ইউরোপীয় শব্দের কিছু মিশেল রয়েছে। ছড়াটির হালের রূপান্তর :—

Hickery dickory dock
The rat run up the clock
The clock struck one
And down he run
Hickery dickory dock

জিপসিদের ভাষা-সংস্কৃতি সাহিত্যের উৎসসন্ধানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন স্পেনীয় পণ্ডিত ও গবেষক জর্জ বরো। তিনিই প্রথম জিপসিদের রোমানি ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন। তাদের জীবন ও সাহিত্য, ছড়া ও গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন।

জর্জ বরো-র গবেষণা থেকেই জানতে পারি রোমানি ভাষা আসলে ভারতীয় আর্যভাষার রূপান্তর। রোমানি ভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, সিন্ধি শব্দ

মিশে রয়েছে। পরবর্তীকালে এই ভাষার শব্দভাণ্ডারে এসেছে আরবি তুর্কী গ্রীক শব্দ। বর্তমানে অবশ্য এই ভাষারীতির মধ্যে স্লাভনিক উপাদানের প্রাবল্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য. "ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে আর্মেনিয়ায় ও তুর্কীতে এবং সিরিয়ায়, যে জিপ্‌সি ( Gypsy ) বা যাযাবরী ভাষা চলিত আছে তাহাও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যে পড়ে। এই যাযাবরদের পূর্বপুরুষ খ্রীস্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পথে দল বাঁধিয়া বিনির্গত হইয়াছিল। তাই আধুনিক উত্তর-পশ্চিম আর্যভাষার সঙ্গে জিপসী ভাষাগুলির সম্পর্ক নিকটতর মনে হয়। এশিয়া-ইউরোপের অনেক ভাষার বহু শব্দ জিপসিতে ঢুকিয়া গিয়াছে এবং ক্বচিৎ ব্যাকরণের ধাচও বদলাইয়াছে" (ভাষার ইতিবৃত্ত)।

জিপসিদের রোমানি ভাষার একটি ছড়া তুলে ধরলে দেখা যাবে, অনেক সময় ভারতীয়দের পক্ষে এই ভাষা বুঝতেও অসুবিধা হয় না।

Pani pani sikova
Dikh the upre, dikh tele !
Buti pani, Sikova
Bati pal yakh the dikhol
Te akana nudarel

Pani ( পানি )—জল। Dikh ( দেখ্‌ )—দেখো। Upre ( উপ্‌রে ) —উপরে। Tele ( তেলে )—তলে। Yakh ( আঁখ )—চোখ।

ছড়াটির ইংরেজি রূপ :—

Water, water, hasten
Look up, look down
Much water hasten
( May ) as much come into the eye
Which booked evil on thee
And may it now perish.

অর্থ : জল প্রবাহে স্নান করলে 'শয়তান' ধ্বংস হবে। শয়তানের মানে রোগব্যাধি।

জিপসিরা প্রায় সব দেশে অবজ্ঞা ও গঞ্জনার শিকার হয়েছে। বলদর্পী শাসকরা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে মৃত্যু ও হত্যা। তাই জিপসি গানে

ও গাথায় বিষাদ ও বেদনার রেশ পাই। কিন্তু সবশেষে দেখি দুঃখজয়ী আনন্দ যা তাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য। এবার একটি রুশীয় জিপসি ছড়ার স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি যার মধ্যে তাদের জীবনধারার পরিচয় রয়েছে।

বয়ে চলে ভোলগা
অরণ্য ফেলে দীর্ঘশ্বাস
ঐ পথে কার পদচিহ্ন ?
হায়, হায়, হায়,
আমার সাধের ঘোড়াটি গিয়েছে কোথায় ?
ঠিকানা আমার পোস্টঅফিস
—এক বড় পোস্ট অফিস
লোকে বলে
আমার অনেক টাকা কড়ি !
হায়, হায়, হায়,
আমার সাধের ঘোড়াটি গিয়েছে কোথায় ?
আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল
জাতভাইদের সঙ্গে মিলেছি আবার।
হায়, হায়, হায়,
আমার সাধের ঘোড়াটি গিয়েছে কোথায় ?
দাও, দাও, দাও,
পানপাত্র তুলে দাও হাতে
জোরে, আরো জোরে মদ ঢাল তাতে।

ঘোড়া হারানোর দুঃখের পালা শেষ হওয়ার পর উদ্দাম নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে ওরা গায় ঃ—

স্ত্রীলোকগুলো প্রতিদিন যায় গ্রামে
দু-হাত ভরে নিয়ে আসে টাকা
সৈন্য আর মরদ চাষাগুলো
বদমাশ সব পাকা !
বাবা গো, তেজী ঘোড়াটা দাও না তুমি বেচে
মেয়েটিকে রাখ আমাদের কাছে
সৈন্য আর মরদ চাষগুলো
বদমাশ সব পাকা !

প্রচলিত জিপসি উপকথাগুলো বেশ রসাত্মক ও উপভোগ্য। একটি জার্মান জিপসিকাহিনী বলি।

ঘোড়া দেখলে জিপসিদের খুব লোভ হয়। বিশেষ করে ভাল জাতের ঘোড়া হলে তো কথাই নেই।

একবার এক গাঁয়ের পাশ দিয়ে এক জিপসি যাচ্ছিল। এক বড়লোকের বাগানে একটা কালো রঙয়ের সুন্দর ঘোড়া আপন মনে চরছিল। ঘোড়াটি দেখে জিপসি যুবকের লোভ হল।

খামারবাড়ির দরজা খোলা ছিল। ধারে কাছে ঘোড়াটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই সুযোগে জিপসি ঘোড়াটির কাছে গিয়ে একটা চিনির ঢেলা ছুড়ে দিল।

জিপসিটি খামারের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। ঘোড়াটি চিনির ঢেলা খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং তার গা চাটতে লাগল। জিপসি যুবক আর দেরি না করে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল এবং তাকে ছুটিয়ে দিল।

এর কিছু পরে খামারবাড়ির লোকজন এসে মনিবের ঘোড়া খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথাও ঘোড়াটির খোঁজ পাওয়া গেল না।

ঘোড়াটি হারিয়ে খামার মালিকের মন খুবই খারাপ। তিনি চাকর-বাকরদের বকাঝকা করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত সেটিকে না পেয়ে তিনি আবার একটা ভাল জাতের ঘোড়া কিনতে একদিন হাটে এলেন।

তিনি মনমত ঘোড়া বাজারে পেলেন না। মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন চমৎকার এক ঘোড়ায় চেপে এক জিপসি বাজারের কাছ দিয়ে ঘুরছে।

মনিব তার ঘোড়া চিনলেন। তিনি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার পথ আটকে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বললেন, "ওরে শয়তান, ঘোড়াচোর জিপসি, দাঁড়া, তোর মজা দেখাচ্ছি।"

বাবু লাঠি বের করে বেধড়ক জিপসিকে পেটাতে লাগলেন। বাজারে ভিড় জমে গেল। জিপসি যুবক কাতর স্বরে বলল, "বাবু, এ আপনার ঘোড়া? আমি বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘোড়াটি আমার কাছে ছুটে এল। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। চুরি করলাম কোথায়?"

"চুপ কর, শয়তান, তোকে আজ চাবকেই খতম করব", বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে এলোপাথাড়ি জিপসিকে পিটতে লাগলেন।

"আজ তোকে নরকে পাঠাব। আমার ঘোড়া চুরি।"

জিপসি যুবক মার খেতে খেতে বলল, "নরকেই যদি পাঠাতে চান, একটু তাড়াতাড়ি সে ব্যবস্থা করুন। দু হাতে বেত বা লাঠি নিয়ে আমাকে আরো জোরে জোরে মারুন।"

বাবু দু হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরার অবকাশে জিপসি যুবকটি মাথা হেলিয়ে দিয়ে ঘোড়ার পিঠে গা গলিয়ে দিল। ঘোটকীর পেটে একটু হাত বোলাতেই সে নিমেষে দ্রুত ছুটে বেরিয়ে গেল। বাবুর উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে সে ছোট্ট একটি মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, "নরকেই চললাম।"

এবার ট্রান্সিলভানিয়া অঞ্চলের একটি প্রচলিত জিপসি উপকথা শোনাই।

একবার ছায়াঘেরা এক সবুজ ঘাসের দেশে এক পুচুভেশ নারী এল। সেই প্রান্তরে একটি গাছের নিচে ছায়ায় প্রশান্ত ঘুমে মগ্ন ছিল সুদর্শন এক যুবক।

যুবকটির চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে ঐ নারী স্বগতোক্তি করল, "এমন এক সুপুরুষকে পতি রূপে পেলে সুন্দর সুন্দর পুত্র-কন্যা পেতাম। আমি আমার সম্প্রদায়কে সেই পুত্র-কন্যা উপহার দিতে পারতাম।"

ঐ নারীর স্বামী পেছনে এসে তার কথাগুলো শুনল। লোকটি ভাবল, হ্যাঁ, তার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। সে তার পত্নীকে বলল, "ঠিক আছে। তুমি দশ বছর ঐ যুবকের সঙ্গে থাক। তবে শর্ত একটা, দশ বছর বাদে যে পুত্র কন্যা জন্মাবে আমি তাদের নিয়ে যাব।"

স্বামীর কথায় সম্মতি জানাল সে। যুবকটির ঘুম ভাঙল। জিপসি পুরুষ সোনাদানা ও নানান উপাচার সহ তার স্ত্রীকে দশবছরের জন্য সেই যুবকটির হাতে অর্পণ করল। যুবকটি সানন্দে সেই 'দান' গ্রহণ করল।

যুবকটির সঙ্গে দশ বছর সহবাসকালে জিপসি রমণী প্রতি বছরই একটি করে পুত্রসন্তান জন্ম দিল। এরপর তার সেই পুচুভেশ স্বামী সন্তান নিতে এল। তার স্ত্রী বলল, "আমার তো কোন মেয়ে হয় নি। দশটাই ছেলে। ছেলেগুলোকে আমার কাছেই রাখব। মেয়ে হলে তোমায় দিতাম।"

পুচুভেশ স্ত্রীকেও হারাল। সন্তানও পেল না। দুঃখে বেদনায় বুক চাপড়াতে লাগল। তখন তার দশ ছেলে হাসতে হাসতে বলল :

"Kuku, Kukaya
Ada Kin jirka.
( Kuku / Kukaya—কুকুর )

অর্থাৎ "আমরা আমাদের কুকুর বলেই পরিচয় দেব।" জিপসিদের একটা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ওরা সারমেয় বংশযাত।

ঐ উপকথা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে জিপসিদের মধ্যে সম্প্রদানের চল ছিল। স্বাধীন যৌন জীবনে বাধা ছিল না! জিপসিদের সঙ্গে নানান জাতি উপজাতির মিশ্রণ হয়েছে। মায়ের কাছে মেয়ের চেয়ে ছেলের কদর বেশি ছিল। সব চেয়ে বড় কথা প্রেমের কোন স্থান-কাল-পাত্র ভেদ নেই।

[ তিন ]

ইউরোপের কাব্য সাহিত্যে জিপসিদের নিয়ে অজস্র লেখা হয়েছে। লেখাগুলির প্রধান ভিত্তি রোমান্টিকতা ও অনুকম্পাবোধ। ইউরোপীয় সাহিত্য জিপসিদের বহু মিথ বিনা উল্লেখেই গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে রাইম বা ছেলেভুলানো ছড়ায় জিপসিপ্রভাব দিনের আলোর মত সত্য।

ভিক্টর হুগোর নতোরদাসে এসমারালাদা একটি জিপসি চরিত্র। ওয়ার্ডসওয়ার্থ জিপসিদের 'wild outcasts of society' আখ্যা দিয়েছেন। কীটসের 'মেগ মেরিলিজ' জিপসি বালিকাকে নিয়ে লেখা চমৎকার কবিতা। বোদঁলেয়ার জিপসিদের নিয়ে সনেট লিখেছেন। ইংরেজ নাট্যকার বেন জনসন জিপসিদের পোশাক-পরিচ্ছদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। উপন্যাস ও গল্পে জিপসিদের বোধ হয় সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন স্ক্যাণ্ডানেভিয়ান কথাসাহিত্যিক সেলমা লাগারলোফ (১৮৫৮-১৯৪০)। লাগারলোফ ১৯০৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর 'গোস্তা বার্লিং' উপন্যাসে জিপসিদের চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে।

স্পেনের পণ্ডিত বরো যেমন তাঁর 'রোমানি লাভো লিল' (রোমানি ভাষার অভিধান) রচনা করে জিপসিদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রামাণ্য উৎস সৃষ্টি করে গিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবেই স্পেনের সেরা কবি ও নাট্যকার ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা তাঁর কাব্যে এই ছিন্নমূল মানুষগুলোকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। জিপসিদের নিয়ে একসঙ্গে অন্তত নটি কবিতা তিনি লেখেন। পুরনো জিপসি-গাঁথাগুলো অসাধারণ শিল্পরূপ লাভ করল তাঁর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়।

আন্দুলেশীয় গ্রাম্য পরিবেশে লোরকা বেড়ে ওঠেন। তাঁর পার্শ্ব পরিবেশ ঘিরে ছিল জিপসিরা। তাদের গান-নাচ তাঁকে আকর্ষণ করত। জিপসি গীতিকবিতা আর রোমান্সের জগৎ তাঁর 'রোমান্সেরো গিতানো'র বড় অবলম্বন হয়ে দাঁড়াল। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত এই কাব্যগ্রন্থ রাতারাতি তাঁকে দেশজোড়া নাম এনে দিল। তাঁর কলমে জিপসিরা পেল সামাজিক প্রতিষ্ঠা। লোরকার জীবনের দীর্ঘতম ও সবচেয়ে বিখ্যাত যে গীতিকবিতা 'ব্যালর্ড অব দ্য

স্প্যানীশ সিভিল গার্ড' তার বিষয়বস্তু হল জিপসিদের জীবন ও তাদের ওপর ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কো বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ। পরিবেশ রচনায় ও কাব্যের নাটকীয় বিস্তারে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় মেলে এতে।

কবিতার কয়েকটি ছত্র তুলে ধরছি :—

ও যাযাবরের শহর
নিশান স্ট্রিট—কর্নারে পতপত উড়ছে।
তোমাদের বাড়ির সবুজ আলো নিবিয়ে দাও
সিভিল গারড আসছে।
ও যাযাবরের শহর
তোমায় যে একবার দেখেছে, সে কীভাবে
ভুলবে তোমায়?
সমুদ্র থেকে সরাসরি ওকে বিদায় দাও
সঙ্গে চিরুনি দিও না।

(যাযাবরের শহর॥ লোরকার কবিতা। অনুবাদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও অমিতাভ দাশগুপ্ত)

ফ্যাসিস্ট বাহিনীর তোপের মুখে পৃথিবীর প্রথম প্রতিবাদী কবি যিনি প্রাণ দিয়েছিলেন. তিনিই ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা। ছিন্নমূল জিপসিদের ওপর স্পেনীয় সিভিল গার্ডদের রক্তাক্ত আক্রমণের কাহিনী লিখে তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের দুঃখ-বেদনায় শরিক হয়েছেন।

# আশা আর আত্মজিজ্ঞাসার আয়ু

কোনো নিয়তসৃজনশীল কবির আয়ুর কাল যখন দীর্ঘতর হয়ে ওঠে, তখন খরতর হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে তাঁর দায়।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের বাংলা কবিতায় মণীন্দ্র রায়ের মত এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা তাদের সৃজনের দীর্ঘ আয়ুর প্রতি সুবিচারে যত্নবান। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মহামারী, যুদ্ধ, রাজনৈতিক নানা বিকার প্রভৃতির ভেতর দিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে চলা আর চলতে চলতে মনের আগুন আর মুখের ভাষাকে আগলে রাখতে পারা খুব কম কথা নয়! কেননা সময়তো ক্রমাগতই বাঁক নেয়। মাত্র কয়েক বছরেই আবেগের ভিৎ টলে যায়, পরিচিত আশায় এসে লাগে সংশয়ের ধোঁয়া। তখন হাল ছেড়ে না দিয়ে, বা পুরণো আশার প্রায় তামাদি কথাগুলোই ফটো রেকর্ডের মত না বাজিয়ে, শিরদাঁড়া সটান রেখে নিয়ত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির মোকাবেলার উপযুক্ত ভাষা আর ভঙ্গি খুঁজে নেয়াতেই তো কোনো সৃজনকর্মীর বা কবি বা শিল্পীর সার্থকতা।

সেই প্রয়াসেরই সৌজন্যে মণীন্দ্র রায় আজ আমাদের হাতে তুলে দেন 'ভাসান', মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠার সংহত প্রতিমাপুঞ্জের ভেতরে যেখানে ধরা পড়ে কালপ্রবাহের বর্তমান পর্যায়টিতে তাঁর অবস্থানের নিরুপায় বাস্তবতা ও নাছোড় স্বপ্নের ছবি।

চল্লিশের দশকে আরো অনেকের সঙ্গে যাত্রা শুরু করেছিলেন তিনি। সেই সময়কার দেশ মাটি মানুষ আর পৃথিবী তাঁদের যে ভবিষ্যৎ স্বপ্নে অধীর করেছিল, তা আরো অনেকেরই মত তাঁরও ছড়িয়ে গেছে সমস্ত রক্তে, সম্পূর্ণ চেতনায়। অথচ সময় তো বদলে গেছে, বদলে গেছে সেই দেশ মানুষ পৃথিবীর ছবিও। নিজেদের বাসনা ও ইচ্ছার ন্যায়ের প্রবাহ থেকে সময়ের সে সম্ভাবনা পূর্ণ বিকশিত মহীরূহ হয়ে ওঠে নি আজো। বহুদিন ধরেই তাই মানুষের কথা বলতে বলতে যন্ত্রণা আর হাহাকার। নিজের ভালোবাসাগুলো ফলবান হয়ে উঠতে দেখার এষণা।

১৯৫১-তে হয়তো কঠিন ছিল না একথা বলা ;

দূর অতিদূর
কেবলই নিকট হয় ; গারদের অন্ধ গড়খাই
খুলে যায় ; আসে হাওয়া আসে
শ্বাসরুদ্ধ ঘরে ঘরে, মৃত্যুর বিবরে, স্তরে স্তরে
রুদ্র এক হাওয়া আসে মুক্তির নিঃশ্বাসে ॥
হাওয়া পাই । ('অন্যপথ', 'অন্যপথ')

কিন্তু তার সাড়ে দিন দশক পরে কে বা আশা করবে তেমন সহজে এমন উচ্চারণ? সময় তো তাঁকে জানিয়ে দিয়ে গেছে, তেমন অনায়াস আর নয় মুক্তির হাওয়ায় অবগাহনের স্বপ্ন। আজ আর সেই নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে সংকোচ নেই তাঁর, যখন 'দাঁড়িয়ে থাকার মাটি / ভেঙে পরছে চাপচাপ / এ কী কুটিল সময়! / অন্ধকারে ঢেউএর জিহ্বা / টেনে নিচ্ছে / আজ এবং কাল / টেনে নিচ্ছে / ভালোমন্দের ধারণা।

('হা আমার পুত্রকন্যা')

'মানুষের গোপনতম বন্ধু / তার আয়না, / তার দ্বিতীয় মুখ / কারণ তা ভাবায়, বাহবা দেয় / কিন্তু এখন চিড়ধরা ও / তীর্যক সর্পিল রেখায় / এক একটি মুখের পাশে / শত শত ভগ্নাংশ।' ('মাটির উপর হাঁটলে')

'যেন এক বাইসন-অন্ধকার / ঘাড় বেঁকিয়ে ঢুকে পড়ছে / রক্তের মধ্যে; / তার হিংস্রতার নিঃশ্বাসে / জেগে উঠছে শুধু প্রতিহিংসা, / আর ক্ষুরের তলায় থেঁতলে যাচ্ছে হৃদয় / বাঁকানো শিঙে অন্ধ হচ্ছে দশদিক...। ('মাটির উপর হাঁটলে')

যদি ইতিহাসের কাছে তাঁর দীক্ষা না নেয়া হতো কোনোদিন, তাহলে হয়ত নিস্পৃহ উদাসীনতার সিনিসিজম মারফৎ কোনো বোধিতে পৌছোবার কথা ভাবতে পারতেন। কিন্তু যাঁদের পক্ষে তা আর সম্ভব নয়, তাদের তো সেই পুরণো আশা আর প্রতিজ্ঞা আর স্বপ্নের নিরিখে নিজের বর্তমান অবস্থানটিকে চিনে নেয়ার জন্য প্রাণপাত আত্মসমীক্ষা চালিয়ে যেতেই হয়। তখন, সেই আত্মসমীক্ষণের নির্মমতায় কখনো কখনো সংশয়ের দংশনও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

'অনেক, অনেকদিন পর / মঞ্চের উপর অনেক আসা-যাওয়ার পর, / এক ইঞ্চিও এগোল না যখন সময়, / ভবিষ্যৎ ঝুলে রইল / দ্রাক্ষাফলের শূন্যে / আমাদের ভ্রুকুটি হারানো করোটির উপর / জেগে উঠল তখন / ভ্রুকুটিতম এক

সন্দেহ—/ তবে কি ওরা ছায়া? ঐ যারা এল, আর গেল? ঐসব প্রতিশ্রুতি আর প্রতিজ্ঞা?" ('একটি জিহ্বার জন্য')

কিংবা

'আজ শুধু এই/ফণাতোলা চিহ্ন,'কেন,/শুধু এই দংশনের সাপ/জড়িয়ে ধরছে পা থেকে মাথা,/ভাঙছে হাড়গোড়,/পিষে ফেলছে অতীত ভবিষ্যৎ,'কেন এই/সুজলাং সুফলাং/আমাদের এই দেশ/জন্ম দিচ্ছে শুধু নিস্পৃহ দর্শক/যেন তৃতীয় পক্ষ, নাটক দেখছে,'যেন কিছু করার নেই। ('বাজুক, বেজে উঠুক')

শুধু নিজের আর নিজের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই তো, তিনি অনুভব করেন পরাক্রমশীল সেই সংকট, যা মানুষকে ক্রমান্বয়ে ঠেলতে থাকে অনিবার্য বিমানবিকতার দিকে।

'ভূগোল ছড়ানো সময়ের এই কারুকলা / খেদিয়ে তুলেছে মানুষকে বধ্যভূমিতে, / তার হৃদয় থেকে নিষ্কাশিত করেছে / ভালোবাসা আর অনুকম্পা, / যেন এক একটা স্টীলের ফ্রেম / ইলেকট্রনিক চালিত / পূর্ব-নির্ধারিত এবং ইচ্ছাহীন, / কিন্তু ভয়ানকরকম প্রতিশোধপরায়ণ / শিকল পরার নিস্ফল আক্রোশে / কামড়ে ধরে যা নিজেরই হাত।'

('মানুষের ভালোবাসা')

এইসব বিপন্নতা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি যে উদাসীন সিনিক-নিরপেক্ষতার ভেতরে আশ্রয় খোঁজেন না, তার কারণ তো মানুষের প্রতি তাঁর নাছোড় ভালোবাসার বোধ, যা তাঁর রক্তের ভেতর একদিন চারিয়ে দিয়ে গিয়েছিল আমাদেরই মাত্র কয়েক দশক আগেকার ইতিহাসের এক কালপর্ব। তাই আজো এমন উচ্চারণে কোথাও দ্বিধা লাগে না :

'সারা জীবন আমি খুঁজেছি/মানুষ আর মানুষের ভালোবাসা।//

চারিদিকে আজ এমন জটিলতা, এত তর্ক,/সবাইকে পায়ের তলায় ফেলার/মরীয়া একরোখা এই জেহাদ/আমারও মনে টেনে বার করে / সারি সারি সজারুর কাঁটা; / তবু, বিশ্বাস করো,/আমি বিপন্ন, কোণঠাসা,/যুদ্ধ তবু আমার থেমে যায় নি।"

('মানুষের ভালোবাসা')

চারিদিকে অনিবার্য বিপন্নতার পদধ্বনি, আর তার ভেতরে নিজেকে। মানুষকে জাগিয়ে রাখার নাছোড়—এই যুদ্ধ, অনুভবের পেশী আর পৌরুষময়তাই কবি ভাসান মারফৎ আমাদের পৌঁছে দেন জীবনসায়াহ্নে তাঁর আত্মপরিচয়ের ছবি হিসেবে। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ তিনকেই ছুঁয়ে

থাকতে চান তিনি, ছুঁয়ে থাকতে চান ব্যক্তিকে এবং দেশ আর পৃথিবীকেও। ফলে এখানেও প্রায়ই দীর্ঘ হয়ে ওঠে কবিতাগুলি। সেই বিস্তারের ভেতরে যেভাবে অজস্র প্রসঙ্গ উঠে আসে, ভূগোলের ত্রিভুবনময় ছবি, আর সমস্ত প্রসঙ্গ জুড়ে আশা, আশাভঙ্গ আর যন্ত্রণা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে পৌরুষের ব্যঞ্জনা, তাতে একে তো খানিকটা মহাকাব্যিক বলবার লোভ জাগতেই পারে।

একসময় যা কিছুর ওপর ভরসা করে বিশ্বাসের শিকড়ে জল সিঞ্চন করতে চাইতেন তাঁরা, আজও মনে পড়ে যায় সেসবের কথা :

"এখনো ছাখো আমার মনে পড়ে যায় সেইসব চোখের কথা/যা হিজল-দীঘির জলের মতো নীলাভ-সবুজ/এত স্বচ্ছ যেন অন্তস্থল পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত,/ হয়তো বা সে কোনো চাষী বউ-এর চোখে,/নদী থেকে জল তুলে যখন সে দেখে/আকাশে চোখ তুলে/বেলা আর কতো বাকী।/

মনে পড়ে যায় আমার / সেসব চোখের কথাও, / ঘাটশিলা আর দুমকার কালোমানুষ, / অরণ্য আর পাথরে বেড়ে মন যাদের / হিংসা আর প্রেমের সঙ্গে একতারে বাঁধা।" ('মানুষের ভালোবাসা')

আজ তাই তো প্রতিকূল সময়ের এই নিরন্তর যন্ত্রণার ভেতর নিরন্তর পুড়তে পুড়তে জীবনসায়াহ্নেও তিনি উপহার দিতে পারেন প্রজ্ঞাবান এক প্রত্যয়, আমাদের জন্য :

'আমি শুধু চাই বোঝাতে— / এই ন যযৌ রাজ্যেও / ঘটছে কিছু, ঘটেই চলেছে, / নিচ্ছে জন্মও, নিচ্ছে বই কি, / শোনো তার কান্না, / তার শাঁখের আওয়াজ, / তাকে স্নান করাও, / তুলে নাও রক্তপঙ্ক থেকে / ওম্ দাও বুকের কাছে, / লালন করো, /

এই তোমার দায় তুমি বুঝে নাও।"

('বাজুক, বেজে উঠুক')

ফলে, যখন ছুঁড়ে দেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে, তার নিরপেক্ষ বিকলাঙ্গ-তার কথা মনে রেখে, নিম্নোধৃত পংক্তিগুলিতে কোনো প্রশ্ন, তখন তা আমাদের কাছে অমোঘ আর মর্মান্তিক হয়ে ওঠে :

কেন তোমাদের হৃদয় / বলীয়ান হবে না ধমনীর লোহিত কণায় / যা সূর্যোদয়ের মতো / জাগিয়ে তুলবে তোমাদের / আশ্চর্য এক নতুন জীবনে, / যা শুধু মানুষেরই জন্যে, / নির্বাচিত বীজের জন্যে, / কেন মাটির অন্ধকারে / নির্বাসিত ?"

('বাজুক, বেজে উঠুক')

চল্লিশের দশকে ইতিহাসের সৌজন্যে পাওয়া অন্বয়, সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে দেখার স্বপ্ন এভাবে অনেক অপব্যয় ক্ষতি আর ভুলভ্রান্তির পরেও তাঁর সঞ্চয়ে রেখে যায় আবেগের এক সত্য, যার জোরে সমকালীন নানা বিকারের ভেতরে থেকেও তিনি ছুঁয়ে দিতে চান চিরায়ত মানবিক মহণীয়-তাকে। এভাবে তাঁকে বলতে শুনি ঃ

"নগরীর কলরোলের বাইরে / প্রপিতামহ এক বিপুল গাছের নিচে / আমি এক ছেনী হাতে মানুষ / পাথরে লোহার দাঁতে দিনে দিনে কুঁদে বার করি"

('মানুষের ভালোবাসা')

আজ যখন ধীরে ধীরে সত্তর বছরের দিকে এগিয়ে চলে তাঁর বয়স, অস্তায়মান সবিতার কাছে যেতে যেতে যখন অনুভবের ভেতর অনিবার্য হয়ে ওঠে 'ভাসান', তখন তাঁর কাছে ফেলে আসা যে জীবনের ছবি জেগে ওঠে তাতে ব্যক্তিগতের চেয়েও ঢের বেশি প্রাধান্য পায় দেশ আর পৃথিবীর মাটি মানুষের আবহ। আসন্ন বিদায়লগ্নের অনুভবের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিজের যে ছবি আঁকেন, তাতে আমরা টের পাই তাঁর অস্তিত্বের সমগ্রতায় মাটি মানুষের টান কতখানি নাড়ির ঃ

"আমার চোখের সামনে হাজার বছরের দর্পণ,
শতকে শতকে অগণিত পুত্রকন্যা, পর্দার পর পর্দার রঙ বদল।
ঢাক তো ফিরেই যাবে, তবু ছত্রিশ নাড়ির টান, বর্ষার ছাতিম
শিউলির শরৎ, তামার থালায় প্রতিপদের চাঁদ, ভালোবাসা,
একেই রক্তে নিয়েছি, ফিরিয়ে দিতে পেরেছি কতোটুকু কে জানে!"

('ভাসান')

'মাটির উপর হাঁটলে', 'মানুষের ভালোবাসা', 'বাজুক, বেজে উঠুক' 'একটি জিহ্বায় জন্য' কবিতাকটি বড়। দীর্ঘ কবিতা রচনায় তাঁর সক্ষমতা তো সাধারণ ভাবেই স্বীকৃত। কিন্তু এ বয়সেও যেভাবে সে আঙ্গিকটির ওপরে দখল এমন কায়েম রাখতে পেরেছেন তা বিশেষভাবে বলবার মত। দীর্ঘতা প্রায়ই রূপকের যে আশ্রয় দাবি করে, দাবি করে বাচ্যের সমান্তরাল আর একটি স্তরের, তাকে তাঁর স্বভাব অনুযায়ী এখানেও আমল দেন নি মণীন্দ্র রায়। উপমা উৎপ্রেক্ষা আর সমাসোক্তি ছাড়া ভাষাকে কবিতার অবয়ব দেয়া যেহেতু প্রায় অসম্ভব, তাই অপ্রতুল হলেও অন্তত কিছুটা কাজে লাগাতে চেয়েছেন তাদের।

স্বভাবানুযায়ী এখানেও কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে রূপরস গন্ধ অবয়ব আর প্রবাহময় সময়স্রোতের ভেতর তাঁর চলার অভিজ্ঞতারই ধারাভাষ্য। তাই,

ভাষা এখানে যেন খানিকটা বর্ণনানির্ভর, যাতে প্রত্যক্ষ জীবনের ছবি ধরা দেয় প্রবহমান চিত্রকল্পে। যেহেতু সে বর্ণনাকে চিত্রকল্পের সফলতা দিতে পারেন তিনি, তাই জীবনের নানা প্রসঙ্গের উষ্ণতাও যেন ছুঁয়ে যায় আমাদের। অনিবার্যভাবেই গ্রীক নাটকের প্রাজ্ঞ কোরাসদের কথা মনে পড়ে যায়।

যেসব কবিতা আকারে তেমন বড় নয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে তারাও এখানে পেতে চায় দীর্ঘ কবিতার ব্যঞ্জনা। সচেতন পাঠকের নজর নিশ্চয় এই সত্য এড়িয়ে যাবে না যে, একমাত্রিক লিরিক প্রবণতা এখানেও তাঁর কবিত্ব-ভাবের বৈশিষ্ট্য নয়। সময় ও পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে মিশিয়ে এই জীবনের নানা সংকটকে মুখোমুখি সটান মোকাবেলার ভেতর বেঁচে থাকার যে অভিজ্ঞতা, তার বহুকৌণিকতাই 'ভাসান'-এও তাকে জাগিয়ে রাখে নিজস্ব শিল্পস্বভাবে। এখানে, তাঁর উচ্চ পংক্তিপ্রবাহের ভেতর দিয়ে হাঁটলে আমাদেরও বেঁচে থাকার এক মহণীয়তার বোধ নন্দিত করে। এই প্রজন্মের সচেতন পাঠকের কাছে 'ভাসান' গৃহীত হোক অভিজ্ঞ এক মানুষের আন্তরিক ও উষ্ণতাময় অভিজ্ঞতার দলিল হিসেবে, মানুষ আর মানুষের পৃথিবীর জন্য ভালোবাসা যাঁর শেষ পর্যন্ত অটুট থেকে যায়ঃ

"সারা জীবন আমি খুঁজেছি
মানুষ আর
মানুষের ভালোবাসা।"

এমন একটি কাব্যগ্রন্থের উপযুক্ত মুদ্রণপারিপাট্য ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারে 'সারস্বত' যে যত্নের পরিচয় রেখেছেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পূর্ণেন্দু পত্রীকেও, তাঁর সুনামের উপযুক্ত প্রচ্ছদটির জন্য।

শুভ বসু

ভাসান। মণীন্দ্র রায়। সারস্বত লাইব্রেরি। ১০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## কৈশোরক

রবীন্দ্রনাথের ১২৫-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিশু ও কিশোরদের উপযোগী রবীন্দ্র-রচনার সংকলন গ্রন্থ। সংকলনটিতে আছে কবিতা গল্প নাটক প্রবন্ধ ডায়ারি ও চিঠিপত্র। শ্রীলীলা মজুমদার-সম্পাদিত সুদৃশ্য রবীন্দ্রগ্রন্থটি ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি উত্তম উপহার। মূল্য ৪০.০০ টাকা।

## খাপছাড়া

'সহজ-কথায় লিখতে আমায় কহ হে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।'

ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত সরস কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—কতকগুলি কবিতার রস ছোটো ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি সম্ভোগ করতে না পারলেও সেগুলির ধ্বনি তাদেরও আনন্দ দেবে।
প্রতিটি কবিতার সঙ্গে কবি-অঙ্কিত শতাধিক স্কেচ এবং রঙিন-চিত্রের রস সকলেই উপভোগ করতে পারবেন। মূল্য ৫০.০০

## ভগ্নহৃদয়

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত শতবর্ষপূর্বে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে, অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপি-চিত্র-সংবলিত। মূল্য ২৫.০০

---

## আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

'লোকে বলে রম্য রচনা। আমি বলি মনোজাত মনসিজ। ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের যে রম্যরচনাগুলি প্রকাশিত হবার কালে পাঠকদের সংপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারই কয়েকটির সংকলন-গ্রন্থ। মূল্য ২৮.০০

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয়ঃ ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা-১৭
বিক্রয়কেন্দ্রঃ ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

# পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
## প্রকাশিত গ্রন্থ

**প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ**

একখণ্ডে ৭৪টি নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ সংকলন। তৎসহ লেখকপুত্র অমৃত রায় লিখিত জীবন পরিচয়। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই, রয়াল সাইজ। মূল্য ৭৫ টাকা।

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ**

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৮৬টি কবিতার সংগ্রহ। তৎসহ কবিকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়। রয়াল সাইজ। ৪২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ টাকা।

**ডঃ বিজিতকুমার দত্ত প্রণীত**
**বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

সার্ধ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য ২ টাকা।

**আকাদেমি পত্রিকা ১**

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : অন্নদাশংকর রায়। মূল্য ১০ টাকা।

**প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা**

মূল্য ১০ টাকা।

**প্রাপ্তিস্থান**

১) কলকাতা তথ্যকেন্দ্র,
(বেলা ২টা থেকে ৭টা)
২) ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল কাউণ্টার, ৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ (বেলা ১২টা থেকে ৬টা)
৩) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
৪) মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
৫) দে বুক ষ্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৯৭৭/৮৯

# আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এই প্রবণতা রুখতে পারে সুসম আঞ্চলিক বিকাশ সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে, ঘামে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবলমাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর······

**:: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ::**

আই সি এ ৯১৭/৮৯

# আপনিই পারেন আগুন ঠেকাতে

অবজ্ঞা আর অবহেলা থেকে আগুন লাগতে পারে। কয়েকটি ব্যাপারে একটু সতর্ক হলেই কিন্তু বিপদ এড়ানো যায়।

* লক্ষ্য রাখবেন বাড়ির বিজলী তারে যেন কোনও খুঁত না থাকে।
  কাছাকাছি দমকল অফিসের টেলিফোন নম্বর জেনে রাখবেন।
* সিগারেট বা দেশলাই ফেলবার আগে নিভিয়ে দিন।
* বিছানায় ধূমপান করবেন না।
* অস্থায়ী মণ্ডপে বিদ্যুতের কাজে সতর্কতামূলক নিয়ম মেনে চলুন।
* পেট্রোল বা অন্য কোনও সহজদাহ্য পদার্থ বাড়িতে রাখবেন না।
* আগুন লাগলে আতঙ্কিত হবেন না। বিচলিত না হয়ে অবিলম্বে টেলিফোনে অথবা লোক পাঠিয়ে দমকলকে খবর দিন। ঘটনাস্থলের সঠিক অবস্থান এবং আপনার টেলিফোন নম্বর জানাতে ভুলবেন না।
* দমকল বাহিনীর প্রয়োজন ও পরামর্শমত তাদের সাহায্য করুন।

আগুন থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় দমকল বাহিনীকে নির্বিঘ্নে তাঁদের কাজ করতে দিন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৯৭৭/৮৯

## চার পাই
## ভাই ভাই
### শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। ১০·০০

জর্জ ওরওয়েলের 'এ্যানিম্যাল ফার্ম'-এর ঝরঝরে সাবলীন অনুবাদ। জীবজন্তু পশুপাখি নিয়ে গোটা গোটা মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা ছোটদের জন্যে লেখা এই বই। বড়রাও পড়তে পারে, এবং আশ্চর্য, বড়রা মজা পাবে আরোও বেশি। হযবরল আরকি! আর বিক্রি? সারাদুনিয়ার ৪২টি ভাষায় আজ পর্যন্ত, বেশি নয়, ২ কোটি কপি বিক্রীত—আর এটি কোনও বিকৃত পরিসংখ্যান নয়। নিকলাস পার্সনস-এর দ্য বুক অফ লিটারেরি লিষ্ট-পৃ ১১৯-২০ দেখলেই হবে। প্রচ্ছদ আর অলংকরণ? দমবন্ধ করা দুর্ধর্ষ দেবব্রত ঘোষ-কৃত। এই সেই বই—যা আজি কেনা চাই!

## বিস্মৃত প্রতিভা
## বিলুপ্ত পটভূমি
### শৈলেনকুমার দত্ত। ১৫·০০ টাকা

অতীতের ধূলি ধূসরিত অন্ধকার থেকে সযত্ন-সঙ্গোপনে তুলে আনা আলোক-কণিকা। বঙ্গ সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট এবং আলোকিত করে তুলতে যাঁরা জীবনপাত করেছেন, তেমন কিছু বিস্মৃত প্রতিভা এবং সেই সময়কার বিলুপ্ত পটভূমির মনোজ্ঞ আলোচনা। ঝকঝকে ভাষায় লেখা জ্বলজ্বলে অধ্যায়।

সূচনাতেই প্রহরায় আছেন সভ্যতার সেনাপতি বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, তারপরই মধুজীবনের মালাকার গৌরদাস বসাক। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রতিষ্ঠাতা গৌরমোহন আঢ্য, ফার্স্ট বুকের প্যারীচরণ আর হোমিওপ্যাথির রাজেন্দ্র দত্ত। বর্ণ-পরিচয়েরও আগের বই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা' আর স্বর্ণ-কুমারী দেবীর সখি সমিতি। তারও পরে ছুছুন্দরীবধ কাব্য নিয়ে জগবন্ধু ভদ্র এবং অনেক রচনার পরে অপেক্ষা করছেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন তাঁর তিন বিদুষী কন্যাকে নিয়ে! মোট পঁচিশটি রচনা-পঁচিশটি রত্ন।

আনন্দধারা প্রকাশনী। ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

# কলিকাতা
# তারিখ
# অভিধান

## দিব্যেন্দু সিংহ। ৫০'০০টা

তিনশ বছরের কল্লোলিনী কলকাতা। তার সমাজ-শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের পরম গর্বের। একদিনে নয়, কালে কালে তিলে তিলে বহু জন্ম-মৃত্যুতে, প্রাণপাত-পরিশ্রমে, সংস্কার আন্দোলনে গড়ে ওঠা এই তিলোত্তমা নগরীর প্রতিটি দিনে কোন কোন সালে কী ঘটেছিল, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ।

'কলকাতা নিয়ে যারা চর্চা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে তাদের বইগুলোর মধ্যে শ্রীদিব্যেন্দু সিংহের বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করবে নিজস্ব অধিকারের দাবীতে।'

—**নিশীথরঞ্জন রায় ( ভূমিকা )**

"বইটি একদিকে যেমন কলকাতার সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতাকে একটি সূত্রে বাঁধার প্রয়াস, তেমনি অগনিত অজ্ঞাত তথ্যের আকর-গ্রন্থ। ··· নির্দেশিকা অংশে 'কলকাতায় প্রথম', 'পত্র-পত্রিকা' 'প্রতিষ্ঠান' 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন এবং কলকাতার ব্যক্তিত্ব'—শুধু নির্দেশ-পঞ্জী নয়, উল্লেখ্য সংযোজন।"

—**সন্তোষকুমার অধিকারী।**

"অসামান্য, অবিশ্বাস্য তোমার বই—'কলিকাতা তারিখ অভিধান'। আমি অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। এ তোমার বিদ্যার পরিচয় শুধু নয়, এ তোমার পরিশ্রমের বাহবা নয়, এ তোমার সাধনার বিরাট প্রকাশ।"

—**বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।**

আনন্দধারা প্রকাশনী। ৭৯/১বি মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯

# পরিচয়

৫৮ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ ফাল্গুন ১৩৯৫

প্রবন্ধ



গল্প



অনুবাদ কবিতা



কবিতাগুচ্ছ



কবিতা



পুস্তক পরিচয়



প্রচ্ছদ

পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী

শিশির মজুমদার

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হল। ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারী তাঁর জন্ম। বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই তাঁর কথা জানেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁকে নিয়ে শতবর্ষে কেন তেমন মূল্যায়ণ হল না! অসাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন এই বাঙালী মণীষী তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত লিখে রেখেছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় রবিবাসরীয়তে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের উৎসাহে তা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা আজ চল্লিশ বছর আগের কথা। ঢাকা মিউজিয়াম, যেখানে তাঁর ৫৯ বছরের জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটি কেটেছিল এবং, বলা যেতে পারে, যার তিনি যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা, সেখান থেকে ১৯৬৬ সালে অধ্যাপক এ, বি, এম, হবিবুল্লাহ সম্পাদিত 'নলিনীকান্ত ভট্টশালী কমেমরেশন ভলিয়ুম' প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সেই ঢাকা মিউজিয়াম বাংলাদেশের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে পরিণত। এই ন্যাশনাল মিউজিয়াম, নলিনীকান্তর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি তাঁর একটি জীবনীগ্রন্থও প্রকাশ করছেন। কিন্তু এপারে আমরা তাঁকে নিয়ে কতটুকু আলোচনা করেছি?

নলিনীকান্ত সৃজনশীল সাহিত্যরচনাও যে করেছেন তা আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। তাঁর রচনাগুলি যদি আজ একত্রে পাওয়া যেত, তবে মূল্যায়ণের সুবিধে হতো অনেক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়ে ওঠেনি। কমেমরেশান ভলিয়ুমে সংগৃহীত তাঁর রচনাগুলির তালিকা দেখলে সত্যি বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তাঁর জীবনী পড়ে জানা যায় যে তিনি সোনার চামচ মুখে নিয়ে ঢাকার মুন্সীগঞ্জের নয়ানন্দ গ্রামে জন্মান নি। শৈশবেই তিনি পিতৃহারা। কাকা অক্ষয় ভট্টশালীর কাছেই মানুষ। পরিবারকে তিনি আর্থিক সহায়তা দেবার জন্য প্রাইভেট টুইশন করতেন অল্প বয়সেই। এম. এ. পাশ করার পর তিনি কিছুদিনের জন্য বালুরঘাট ও ইচ্ছাপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া

কলেজে ইতিহাস পড়িয়েছিলেন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও ইতিহাসে কিছুকাল অধ্যাপনাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকা মিউজিয়াম। স্যার আশুতোষ মুখার্জীর পরামর্শে তিনি ১৯১৪ সালে নবগঠিত ঢাকা মিউজিয়ামে অধ্যক্ষ (কিউরেটর) হিসেবে যোগ দেন। সুদীর্ঘ ৩৩ বছর একাদিক্রমে সেই মিউজিয়ামে কাজ করে তাঁরই অঙ্গনে ১৯৪৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

আজ বাংলাদেশের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে গেলে তার ঐশ্বর্য ও বৈভব দেখলে মুগ্ধ হ'তে হয়। সেদিনের সেই ঢাকা মিউজিয়ামের সম্পদ নিয়েই বাংলাদেশের ন্যাশনাল মিউজিয়াম। যদিও নলিনীকান্তের পরে ড. এনামুল হক পর্যন্ত মিউজিয়াম নানাভাবে সুসজ্জিত। কিন্তু নলিনীকান্ত যখন ঢাকা মিউজিয়ামে আসেন, তখন "the museum was only hapazard collection of sculptures, inscriptions. coins and a few zoological specimens, loosly stacked in a 3-roomed store in the old secreteriat building. It had no regular income and the staff consisted only of himself and two bearers." সেখানে নলিনীকান্ত বেতনও পেতেন সামান্য ও অনিয়মিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'he had found his mission and with singular devotion and energy he transformed this mefassil museum into an institution of all-India fame.[১] ইতিহাসের এম. এ. নলিনীকান্ত পূর্ববাংলার বিভিন্ন এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরে সংগ্রহ করেছেন অমূল্য প্রত্নরত্নগুলি। এইভাবে তিনি ঢাকা মিউজিয়ামকে ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্রে পরিণত করেন। সে যুগে 'মিউজোলজি' বিদ্যাশৃংখলা হিসেবে পরিগণিত হয়নি। ঢাকায় এই বিষয়ে কোন আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সুযোগই ছিল না। কিন্তু নলিনীকান্ত তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্কতা দিয়ে ঢাকা মিউজিয়ামকে সজ্জিত করেন। অথচ "the museum could never afford to give him a clerk and for many years it had no typewriter. He had therefore to be his own clerk, draftsman, accountant, photographer and indexer. He classified the objects, treated them f r repair and preservation, prepared a complete photographic record of the collection and wrote reports and pubished notices to the significant acquisitions. He lived with his family in a

dilapidated house within the Museum compound[২]।" নলিনীকান্ত একাকী রাতের পর রাত জেগে কাজ করেছেন মিউজিয়মের ছোট্ট অফিস ঘরে। তিনি মিউজিয়াম গড়ে তোলায় এমনভাবেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে তা ছেড়ে অন্য কোথাও মোটা অঙ্কের মাইনেতে যাওয়া কল্পনাও করতে পারেননি। মাত্র ২০০ টাকার বেতনে তিনি মিউজিয়ামের কাজে যোগ দেন আর তেত্রিশ বছরে তাঁর বেতন বেড়েছিল মাত্র ৬০ টাকা। আজকের দিনে তাই, নলিনীকান্তর আদর্শটি অনেক বেশি করে প্রচারিত হওয়া দরকার। যাঁরা ভাবেন ভাল বেতনে ভাল কাজ হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে নলিনীকান্ত এক যোগ্য প্রতিবাদ।

মিউজিয়ামে যোগ দেবার আগেই নলিনীকান্ত পূর্বভারতের ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণামূলক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখে বিদ্বৎসভায় পরিচিতি পান। তিনি বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসের প্রতি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তাঁর পূর্বে ঐতিহাসিকরা মৌর্য ও গুপ্তবংশের ইতিহাস নিয়েই ছিলেন মগ্ন। কিন্তু নলিনীকান্ত নানাভাবে বাংলার অজ্ঞাত-পূর্ব ইতিহাসকে তুলে ধরায় ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯১২ সালে (অর্থাৎ যে বছর তিনি ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন) king Laksmansena of Bengal and his era এবং newly discovered Beleba copper plate-এর আলোচনা প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে A forgotten kingdom of East Bengal গবেষণা নিবন্ধটির জন্য স্যার আশুতোষের নজর কাড়েন। তাঁরই আনুকূল্যে নিবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। ফলে মাত্র ২৫ বছর বয়সেই বিদ্বৎসভায় নলিনীকান্তের পরিচিতি আসে। পরবর্তীর ইংরেজিতে ৬০টি গবেষণা নিবন্ধ তাঁর প্রকাশিত। তাঁর এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১১টি। এর মধ্যে একটি নাটক, একটি গল্প সংগ্রহ ও একটি কাব্যগ্রন্থও রয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশ তাঁর এক বিরাট কীর্তি। বাংলায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৩ পর্যন্ত তার সংখ্যা ১১৫টি। বিষয়-বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। যেমন : বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎপরবর্তী বাংলা উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মৃত্যুকল্পনা, বাংলাসাহিত্যে ছোট গল্প, বঙ্কিমচন্দ্র, বাঙলা সাহিত্যে দৃশ্যকাব্য, ময়নামতীর গান, ভারতে মূর্তিপূজার আদিযুগ, বাঙলার ইতিহাস, মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা, প্রাচীন ভারতের আগ্নেয়াস্ত্র, প্রত্নানুসন্ধানের সুখদুঃখ, চণ্ডীদাসের পদাবলী, মনসাদেবীর ইতিবৃত্ত, বঙ্গের সুলতানী আমল, চিত্তরঞ্জন

স্মরণে, স্বাধীন ত্রিপুরা, বঙ্গীয় স্থাপত্য শিল্প, দনুজমর্দন ও রাজা গণেশ, প্রাচীন বঙ্গের দারু ভাস্কর্য, বাঙ্গালার দেবমন্দির, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন, অদ্ভুতাচার্যের পরিচয়, সেরশাহের সিংহাসন আরোহণ বৎসর, কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্যের তুলনা, নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, ঢাকানগরীর জন্মকথা, বঙ্গের কৌলীন্য প্রথা, বাঙ্গালি রাজ গোবিন্দচন্দ্র,রাজা গণেশ প্রভৃতি। ঢাকা মিউজিয়ামের বাৎসরিক রিপোরট ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও নলিনীকান্ত একাকী ঘুরে ঘুরে কত যে তালপাতার পুথি সংগ্রহ করেন অদ্যাবধি ঢাকা মিউজিয়ামে ক্যাটালগবিহীন ভাবে যা পড়ে আছে। তিনি বাংলায় মুসমানী শাসনের ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৯২২ সালে Coins & Chronology of Early Independent Sultans of Bengal গবেষণাপত্রটি জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রিফিক পুরস্কার পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বাংলা সাহিত্য ও লিপিতত্ত্ব বিষয়ে বেশ কয়েকবছর অধ্যাপকও ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন বাংলার ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন তখন নলিনীকান্ত সম্পাদকমণ্ডলীর সচিব হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মতপার্থক্যের দরুণ তিনি এই প্রকল্প থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মর্যাদাপূর্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য কোনরকম আপোষ করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি নলিনীকান্ত ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সদস্য ছিলেন তিনি। কৃষ্ণনগরে পরিষদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিনি ছিলেন ইতিহাস শাখার সভাপতি। ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর বিশিষ্ট অবদান হিন্দু ও বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায়। তাঁর 'Iconography of Buddhist of Brahmmical Sculptures in the Dacca Museum" গবেষণাপত্রটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হলে সারাবিশ্বে ভারতের মূর্তিতত্ত্ববিদ্যায় তিনি একজন অথরিটি হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন।

এমন গুরুগম্ভীর বিষয়ে যাঁর গবেষণা তাঁর কাছে সরস-সৃজনীমূলক সাহিত্য-রচনা অপ্রত্যাশিত। অথচ ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'হাসি ও অশ্রু' গল্পসংগ্রহটি বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক রেনহার্ড ওয়্যানার ( Reinhard Wagner ) ১৯২৬ সালে বার্লিন থেকে প্রকাশিত বাংলা ছোটগল্প সংগ্রহে নলিনীকান্তের দুটি ছোট্ট গল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। নলিনীকান্তের দূরদৃষ্টিতে

অপরিচিত শরৎচন্দ্রের বিরল প্রতিভা প্রতিভাত হয়। তাছাড়া, কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের সম্পাদনা তাঁর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নলিনীকান্তের স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন যে সরস বাগবৈদগ্ধ্যে সুনিপুণ ছিলেন নলিনীকান্ত। ভাষাবিষয়েও তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। সর্বোপরি তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত এবং সুগভীর দায়িত্বশীল। কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কয়েকদিন আগে তাঁর প্রথম কন্যার স্বামী মারা গেলে নলিনীকান্ত নিজে তাঁর কন্যাকে ঢাকায় নিজ বাড়িতে রেখে নীরবে সাহিত্য সম্মেলনের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অন্তরের গভীর শোকের কথা কাউকে তিনি জানতেও দেননি। সম্মেলনের শেষে ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। নলিনীকান্ত ছিলেন এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। কোথাও তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার্থে আপোষ করেন নি। প্রচারবিমুখ দৃঢ়তেজা এই মানুষটি যেন মেঘে ঢাকা তারা।*[৩]

---

১. ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী কমেমকেশন ভলিউম, এডিটেড বাই এ. বি. ম হবিবুল্লাহ, ঢাকা মিউজিয়াম, ১৯৬৬

২. ঐ

৩. রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৯ জুন ১৯৪৭ থেকে আগস্ট ৩, ১৯৩৭ ধারাবাহিক নলিনীকান্তের আত্মজীবনীটির কপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন অশোক উপাধ্যায়।

# দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতি

তড়িৎ চৌধুরী

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাট্যজগতের এক বিশিষ্ট কমিটেড নাট্যকার। তিনি আজীবন কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তাঁর সমাজচেতনতা। অকৃত্রিম বস্তুনিষ্ঠার প্রভাবে মত-প্রকাশে তিনি সর্বদাই স্বচ্ছ ও অকুণ্ঠ। কিন্তু তাঁর দৃটিভঙ্গি কখনই সংকীর্ণ নয়। সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুনির্দিষ্ট, জীবনকে তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে, আর তাই তাঁর নাটকে কেবল সমস্যা আর তার সমাধানই নেই, রয়েছে আদর্শ-সমাজ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কল্পনা ও স্বপ্ন। যুক্তি ও বুদ্ধির ছোঁয়ায় তাঁর নাটক শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠে জীবনবাদী ও আশাবাদী। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

কালীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মরণোত্তর সন্তান দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০৮ সালের ৫ জুলাই ঢাকা জেলার আদাবাড়ি গ্রামে। তাঁর শিল্পী-মনের বিকাশের পেছনে অন্যতম প্রেরণাদাত্রী ছিলেন মা বিধুমুখী দেবী। দিগিন্দ্রচন্দ্র ১৯২৮ সালে রাজদিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আসেন এবং ছাত্রআন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় সংগঠকরূপে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তা-ই পরবর্তীকালে 'গণনাট্য সঙ্ঘে' আরও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৩০-৩২ সালে গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন, বিক্রমপুরের তিনটি ইউনিয়নে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন, এবং সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন 'বিক্রমপুর সত্যাগ্রহ সংবাদ'-এর সম্পাদকরূপে। গ্রেফতারী পরোয়াণা জারি হলে তিনি ফেরার হন, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়ান, মানুষের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেন, এই সময় বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন চরিত্র এবং বিভিন্ন মুখের মিছিল তাঁকে লোকচরিত্রাভিজ্ঞ করে তোলে। শেষপর্যন্ত তিনি গ্রেফতার হন এবং ৩২-৩৩ সালে দেড়বছর কারাদণ্ড লাভ করেন। দমদম জেল থেকে বেরিয়ে যোগ দেন ইংরেজী দৈনিক 'এড্‌ভান্স' পত্রিকায়। 'ফ্রি ইণ্ডিয়া, এবং 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া'য় কিছুদিন সাংবাদিকতার পর ১৯৩৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে 'শ্রীসঞ্জয়' ছদ্মনামে তিনি

বাংলায় রণসাহিত্যের প্রচলন করেন এবং 'রণবিশারদ' নামে পরিচিত হন। ধ্বংসের মধ্য দিয়েও যে এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হচ্ছে, এই বিশ্বাসই তাঁর রচিত রণ-সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

'গণনাট্য সঙ্ঘে'র জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, গণনাট্য সঙ্ঘ প্রথম থেকে তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহ দেখায়নি। পঞ্চাশের মনন্তরের ওপর রচিত 'অভিযান (১৯৪৩) পরে 'দীপশিখা' ('৪৩) নামে পরিবর্ধিত পূর্ণাঙ্গ নাটকটি 'নবান্নে'র পূর্বে লেখা হলেও 'গণনাট্য সঙ্ঘ' এটি মঞ্চস্থ করেনি। "যুদ্ধই মনুষ্যসৃষ্ট মন্বন্তরের জন্য দায়ী'—নাট্যকারের এই বক্তব্য 'সঙ্ঘ' পরিবর্তনের অনুরোধ জানালে নাট্যকার সত্যকে চাপা দিতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে নাটকটি সঙ্ঘ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। অবশ্য 'নবান্ন' অভিনয়ের পূর্বেই ( ২২ অক্টোবর, ১৯৪৩ ) নাটকটি মঞ্চস্থ হলেও এটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। একইভাবে তাঁর 'তরঙ্গ' (১৯৪৫) এবং 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭)র প্রথম অভিনয়েও 'সঙ্ঘ' উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকায় কোনসময়েই তিনি সঙ্ঘ ত্যাগের কথা ভাবেননি।

তাঁর নাট্যজীবনের পথ প্রথম থেকেই বন্ধুর। তিনি নাটক লিখেছেন, বাঁধা পেয়েছেন, কাঁচিকাটা নাটক কখনো অনুমতি পেয়েছে, কখনো পায়নি। কিন্তু ১৯৫৩ সালে তাঁর জীবনে গুরুতর সংকট দেখা দিল, যখন 'গোলটেবিল' একাঙ্কিকা রচনার জন্য 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। সংবাদপত্র জগতকে ব্যঙ্গ করে রচিত এই নাটিকা তাঁর কর্মচ্যুতির প্রত্যক্ষ কারণ হলেও মুখ্য কারণ হচ্ছে কর্মচারী ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্ব দান।

পরবর্তীকালে 'শিশুসাথী' ( ৫৮-৬২ ) এবং 'যুগান্তর' ( ৬৩-৬৯ ) পত্রিকায় কাজ করার পর '৭৩ সালে তিনি যোগ দেন 'দৈনিক কালান্তর' পত্রিকায়। বিভিন্ন সময়ে কৃষক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হলেও, বুর্জোয়া কাগজে লিখে জীবিকার্জন করতে হয় বলে, যদি কোন লেখা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হয়, এই আশঙ্কায় তিনি এতদিন পর্যন্ত পার্টির সভ্যপদ গ্রহণে বিরত ছিলেন। কিন্তু 'কালান্তর' পত্রিকায় যোগদানের পর তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির আজীবন সদস্যরূপে পরিগণিত হন।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও একজন উদ্যোগী সংগঠকরূপে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় '৪৪-এ প্রতিষ্ঠিত "প্রোগ্রেসিভ আর্ট থিয়েটার', ৫০-৫১-এ "অশনিচক্র', '৫৬-তে 'নাট্যকার সঙ্ঘ' এবং '৫৬-তেই 'নাটকমহল' প্রতিষ্ঠায়।

আবার নাট্যের প্রয়োজন কখনো কলম ও মঞ্চকে একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি নেমে এসেছেন রাস্তায়। '৬২-র নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে অন্যদের সঙ্গে তিনিও প্রতিবাদের কণ্ঠ মিলিয়েছেন। '৬৬-র পুরসভা ট্যাক্সের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ ছিল সুতীব্র। জাতীয় নাট্যশালার দাবীতে আজও তিনি সোচ্চার। অন্যদিকে 'পশ্চিমবঙ্গ নাট্য উন্নয়ন সমিতি'র ('৭০) তিনি সক্রিয় সদস্য এবং জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মঞ্চ-রূপ দেওয়ার জন্য '৭০-এ প্রতিষ্ঠা করেন 'ভারতীয় গণসংস্কৃতি সঙ্ঘ'।

নাট্যজগতে আপসহীন এবং অননুকরণীয় সেবার জন্য ১৯৮৫-তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে 'দীনবন্ধু পুরস্কার' দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। 'দুরন্ত পদ্মা' ('৭১), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ওপর রচিত যাত্রা-নাটকের জন্য '৭৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সুধাংশুবালা স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানান। গোর্কি-র 'মা'র অনুবাদের জন্য '৬৮ সালে তাঁকে দেওয়া হয় সোভিয়েত দেশ পুরস্কার। এবং ১৯৮২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নাট্যজগতে তাঁর অবদানের জন্য গোর্কি সদনে জাতীয় সম্বর্ধনা জানানো হয়।

* *

নাট্যজীবনের শুরু থেকেই দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক বাস্তবতার পথে পথ হেঁটেছেন। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হলেও, মানবতাবাদ কেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। একপেশে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিহার করে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টির উদার মতবাদকেই বেছে নিয়েছেন।

নবনাট্য আন্দোলনের একটি অন্যতম বিষয় হল সর্বহারার মানবিকতাবাদ। দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় মানবিকতা-র সংজ্ঞাকে আরও তীক্ষ্ণ করে সামনের দিকে নিয়ে এলেন। তাঁর মতে মানবিকতা দু' ভাগে বিভক্ত। বুর্জোয়া মানবতা এবং প্রলেতারিয় মানবতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালেই বুর্জোয়া মানবিকতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত জীবনের শেষ পর্বে এসে এই মানবিকতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হয়েছিলেন। (নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা)। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথনির্দেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে একমাত্র শ্রেণীশোষণহীন সমাজ-তান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই এই সংকটের অবসান হতে পারে। এই চেতনার মূলে কাজ করেছিল যে নতুন মূল্যবোধ তাকেই বলা হয় 'প্রলেটারিয়ান হিউম্যানিজম্'।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের নাটকীয় রূপ দিয়েছেন নবনাট্যের তিন প্রধান—বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী এবং দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবনা ও কথনে এঁদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবুও দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বকীয়তা এখানেই যে একমাত্র তাঁর নাটকেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের স্বর শোনা গেছে। 'নবান্ন' (বিজন ভট্টাচার্য), 'ছেঁড়া তার' ও 'দুঃখীর ইমান' (তুলসী লাহিড়ী) এবং 'দীপশিখা' (দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়)—মন্বন্তরের ওপর রচিত এই নাটকগুলিতে 'নবান্ন'র বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত—গোটা গ্রাম ও শহর জীবন তুলসী লাহিড়ীর নাটকে কেবল দুটি পরিবারের মধ্যে যে নাট্যসংঘাত, 'দীপশিখা'য় নাটকীয় পরিসর আরও সংকুচিত এবং নাট্যরস আরও ঘনীভূত হয়েছে। যুদ্ধের পটভূমিকায় পঞ্চাশের মন্বন্তর, চাষীর হাহাকার তথা মহাজনের অর্থলালসার মধ্যেও মানবিকতার পরিচয় 'দীপশিখা' নাটকে ফুটে উঠেছে। এই 'অন্ধকার' নাটকে দুর্দশা ও দুর্ভোগ, প্রতিরোধ ও সহাবস্থান শেষপর্যন্ত আশার আলো দেখায়। রাজনৈতিক সচেতনতা ও মানবিকতার সংমিশ্রণে মানুষ যে কেবল পুতুল নয়, নিজ ভাগ্যের স্রষ্টাও তা-ই নাট্যকার গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্বন্তর সকল প্রকার মারণাস্ত্র নিয়ে যেভাবে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেখানে মানবিকতাকে রক্ষার জন্য মানুষের প্রয়াস,—করুণা ও ভয়জাগানো এই দৃশ্যগুলো আমাদের হতবাক করে রাখে। মানুষের অসহায়তা আরও তীব্র হয়েছে, যখন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত একই জায়গায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

'তরঙ্গ' ('৪৬, পরিবর্ধিত '৫৪) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিকায় রচিত একটি তথ্যাশ্রয়ী নাটক। স্বাধীনতা কেবল কংগ্রেসের একার প্রচেষ্টার ফসল নয়, এর পেছনে যে অন্যদেরও অবদান ছিল সেই ঐতিহাসিক সত্যই এই নাটকের বিশাল পটভূমিকায় নাট্যকার ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। নাট্যকার স্বয়ং জানিয়েছেন, 'তরঙ্গ' নাটক 'কলকাতায় রশিদ আলি দিবসে গণঅভ্যুত্থান, ১৯৪৬ সালের ২৯ জুলাই এর ঐতিহাসিক ধর্মঘট, করাচীতে নৌবিদ্রোহ ও তার সমর্থনে বোম্বাইতে শ্রমিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য করেই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত'। এরই সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে নাট্যকারের অভিজ্ঞতা। বস্তুতঃ, নাট্যকারের ছাত্রজীবনে বিক্রমপুরের তিনটি ইউনিয়নে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন, গ্রামে গ্রামে ফেরার অবস্থায় পালিয়ে বেড়ানো, সত্যাগ্রহ বুলেটিন প্রকাশ, স্বদেশী আন্দোলন থেকে বামপন্থী আন্দোলনের দিকে মোড় ঘোরা প্রভৃতি ঘটনার আদলেই তৈরী হয়েছে 'অমর' চরিত্রটি।

সংঘাতমুখর, অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন এই নাটকটি তুলে ধরেছে প্রকৃত গণআন্দোলনের চিত্র। নাটকের শুরু থেকেই পূর্ববঙ্গের সুদূর পল্লীজীবনে দুই বিরোধী পক্ষের সংঘাত ফুটে উঠেছে। একদিকে জমিদার বিপিন ঘোষ, পুলিশ, ইউনিয়ন বোর্ডের -ভাবশালী সদস্য, উঠতি ব্যবসায়ী রজ্জব ব্যাপারী এবং দালাল বঙ্গ চক্রবর্তী প্রভৃতির অত্যাচারের প্রতিরোধে গ্রামের সমস্ত অত্যাচারিত মানুষেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং এদের সঙ্গে রয়েছে ছোট ভূঞা শশী ঘোষ, ছেলে অমর, মহিউদ্দিন অমরের বন্ধু ও গোপাল মিস্ত্রী। নাটকের পর্দা উঠেছে বিপিন ঘোষের বিরুদ্ধে 'তোলা বন্ধ' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, যেখানে প্রথম দল জুলুম বজায় রাখতে চায়, দ্বিতীয় দল চায় এর প্রতিকার। জনতার অর্থনৈতিক সংগ্রামকে চাপা দেওয়ার জন্যই অমরকে চক্রান্ত করে জেলে পাঠানো হয়, এবং 'ঐক্য' নষ্ট করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধকে জাগিয়ে তোলা হয়। সংঘর্ষ এবং অন্তর্ঘাতের ফলে 'তোলা বন্ধ' আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়। এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত আরও ঘনীভূত হয়, যখন গোপালের মেয়ে মঞ্জরীকে কেন্দ্র করে পারিবারিক ও সামাজিক সংঘাত গড়ে ওঠে। এভাবে ব্যক্তি-সমাজ-দেশ-কাল-এর সংমিশ্রণে এক বিরাট প্রেক্ষাপটে নাটকটি উপস্থাপিত হয়। আন্দোলনে নতুন স্রোত দেখা দেয়, জেল থেকে অমর বেরিয়ে আসার পর, অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবার যুক্ত হয় রাজনীতির সঙ্গে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলনে পরিণত হয়। কায়েমী স্বার্থের দমননীতির বিরুদ্ধে গোটা কৃষকসমাজ তথা সাধারণ মানুষ জোট বাঁধে। কংগ্রেসী নেতা শশীবাবু এইবার আর অহিংসার বাণী দিয়ে জনতার রুদ্ররূপ তথা বৈপ্লবিক চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেন না, জনতা 'বামপন্থী' অমরের প্রেরণায় ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন থেকে সক্রিয় প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়; জনতার বিক্ষোভে পুলিশ ভীত হয়ে পালিয়ে যায়, সজাগ জনতা বন্দী অমরকে মুক্ত করে। ঘরের মেয়েরাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সৈন্য আসে, গুলিতে গোপাল মিস্ত্রী আহত হয়, জেলে নন্দ নিহত হয়, তবুও গোপাল হতাশ হয় না, গোপাল শেষ সংগ্রামের আহ্বান জানায়, চূড়ান্ত জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে,—'তাই অইব, তাই অইব, অমর, অয়ত আমাগই জিত অইছে। আমারে একবার ঐপারে লইয়া যাইতে পার, ঐ পারে?'...

রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত পিতা-ও পুত্রের সংঘাতের মাধ্যমে নাট্যকার নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। শশীর স্বদেশপ্রেম অকৃত্রিম,

তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী কিন্তু অমরের মতে তা তপোবনের ধর্ম। দেশের অগণিত মানুষকে অন্ধকারে রেখে মুষ্টিমেয় নেতার চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। 'যে-অস্ত্রে সংগ্রাম শুরু হয় সেই অস্ত্রেই সংগ্রাম শেষ হয় না', অমর পথ পরিবর্তন করে জনতার পাশে এসে দাঁড়ায়। নাট্যকার শশীবাবুর দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কিন্তু নাটকের শেষের দিকে তিনি গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন এবং অমর ও গোপাল প্রাধান্য লাভ করে। গোপালের সারল্য, বুদ্ধিমত্তা ও সাহসই তাকে জনতার নেতা বানিয়েছে। নাটকীয় ঘটনা ও ভারতের তৎকালীন ইতিহাসের প্রতি অনুগত্যের জন্যই, নাট্যকার শশীবাবুদের সরিয়ে নায়কের আসনে বসিয়েছেন প্রকৃত জননেতাকে ; কারণ '৪৬-'৪৭ সালে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেশের বিভক্ত স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। এই নাটকটি তাই প্রকৃত অর্থে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক দলিল হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এখনেই যে গণবিক্ষোভ শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেবার আগেই নেমে এল মাউন্টব্যাটেন ও র‍্যাড্‌ক্লিফের ছুরি, জাগ্রত জনতার স্বপ্নকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিল।

'উদ্বাস্তু-ট্রিলজি'র প্রথম নাটক 'বাস্তুভিটা' ('৪৭)। 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই শহীদবৃন্দের স্মরণে' উৎসর্গীকৃত। বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত হয়েও যেসব ব্যক্তি বাস্তুভিটা ত্যাগ করেননি, তাদের নিয়েই 'বাস্তুভিটা' রচিত। দেশভাগের ক্ষতের ওপর সান্ত্বনার প্রলেপ দেওয়াই নাট্যকারের উদ্দেশ্য—আর সেজন্যেই তিনি যেমন জাতিগত বিভেদ দূর করার চেষ্টা করেছেন, তেমনি দেখিয়েছেন সৎ-অসৎ মানুষ দু'দিকেই রয়েছে। শচীন, সোনা মোল্লার ছেলেরা, কিংবা ইয়াসিন মিঞার মত লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ায়। সাধারণ মানুষেরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এর শিকার হয়। এই নাটকে কলকাতাবাসী শচীন 'দেশে' যায় বাস্তুভিটা বিক্রি করার জন্য। মহেন্দ্র-মাষ্টারের স্ত্রী মানদাকে সে দেশত্যাগের জন্য প্রলোভিত করে। নিরাপত্তার আশ্রয়প্রার্থী মানদা সেই চিরন্তন নারী যে স্বামী-সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল ; তাই শচীনকে অ-সৎ জেনেও সে শচীনকে প্রশ্রয় দেয়, যদি এর বিনিময়ে কলকাতায় গিয়ে আশ্রয়টুকুও জোটে। মানদা বা কমলাকে হাত করতে পারলেও শচীন কিছুতেই মহেন্দ্র মাষ্টারকে করায়ত্ত করতে পারে না। নানাভাবে নির্যাতিত হয়েও মহেন্দ্র মাষ্টার এবং আমীন মুন্সীর বন্ধুত্বে ফাটল ধরে না, তিনি দেশত্যাগের কথা চিন্তাও করেন না। কিন্তু স্থানীয় লীগ নেতা সোনা মোল্লা কর্তৃক অপদস্থ হয়ে তিনি দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত

নেন। সোনা মোল্লা অমানুষ নন, কিন্তু হিন্দুদের দ্বারা ছোটবেলা থেকে অপমানিত হয়ে তিনি পাল্টে যান, তিনি চাননা হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে যাক কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যও তিনি এগিয়ে আসেন না। সোনা মোল্লার নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াসিন মিঞা গ্রামে দাঙ্গার আবহ সৃষ্টি করে এবং গঞ্জে লুটপাট চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।' অবস্থা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সোনা মোল্লা তৎপর হন, কিছু নাটকীয় ঘটনার পর তিনি হিন্দুদের বিশেষ করে মহেন্দ্র মাষ্টারকে নিরাপত্তা দেন এবং মহেন্দ্র মাষ্টারও এবার দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন।

সোনা মোল্লার সক্রিয়তা যতটা মানবিকতার খাতিরে, তার চাইতে বেশি ইয়াসিন মিঞার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ের জন্য। তিনি জানেন, যদি হিন্দুদের বিশ্বাস উৎপাদন না করা যায় এবং সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ না করা যায় তাহলে ইয়াসিনের জয় হবে এবং তিনি হবেন ক্ষমতাচ্যুত। এজন্যেই সময়ের দাবীতে তিনি সাময়িকভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ব্যবস্থা করেন। বস্তুতঃ, সোনা মোল্লা নন, নাট্যকারের আদর্শ চরিত্র আমীন মুন্সী। তাঁর বিচারে,—'পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান। এতদিন যাঁরা উজীরী করেচেন তাঁরাই তো পাকিস্তানের মালেক হবেন, গরীবের তাতে কি'? দাঙ্গা রোধ করতে গিয়ে রক্তাক্ত হওয়ার পরও তিনি বলতে পারেন,—'ও কিছু নয়। আমাদের যা পাওনা ছিল তাই পেয়েছি—ভুলের মাশুল দিতে হবে বই কি।' তবুও আমীন মুন্সীর চরিত্র আদর্শের সীমারেখা অতিক্র মকরে বাস্তবের মাটিতে নেমে আসতে পারেনি। বরং মহেন্দ্র মাষ্টারের চরিত্র টাইপ চরিত্র হলেও তার মধ্যেই ধূলোমাটির স্পর্শ পাওয়া গেছে। তাঁর বিশ্বাস এভাবে ব্যক্ত হয়েছে, 'পাকিস্তান হোক, গোরস্থান হোক, এখানেই আমাদের থাকতে হবে। গরীবের আবার যাবার জায়গা আছে নাকি'!

ট্রিলজি-র দ্বিতীয় রচনা 'পূর্ণগ্রাস'। জমিদারের বস্তি উচ্ছেদ এবং বস্তির বাসিন্দাদের প্রতিরোধ ও সংঘাত এই নাটিকার বিষয়বস্তু। মৃত্যু ও আশা-জড়িত দরিদ্র মানুষেরাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র, শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে বিষাদ নেমে আসে এবং এই বিষাদের মধ্য দিয়েই নাট্যকার প্রগতির সংগীত শুনিয়ে যান। বামপন্থী যুবক সোমেনের মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ধ্বংসের বীজ। এই রাহুগ্রস্ত সমাজে মানুষ পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়, মেনে নিতে হয় বস্তিবাসী ও শ্রমজীবীর জীবন, ধনী আরও ধনী হয়, আইন-রক্ষক

হয় ধনীর রক্ষক, দুধের শিশুকেও হত্যা করা হয়। এই দুঃখ ও বিষাদের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে নতুন ইতিহাস, মানুষের বিপ্লবী চেতনাই গ্রহণের অন্ধকার দূর করবে, জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হবে নতুন পৃথিবী। এই বিশ্বাসের ফসল 'মাটিও মানুষ' উপন্যাসের পরিবর্তিত রূপ ট্রিলজির শেষ নাটক 'নয়া শিবির' ( রচনা '৬৪, প্রকাশ '৮২ )।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং স্থানীয় কৃষকদের প্রতিক্রিয়া ও সংঘাতকে কেন্দ্র করেই 'নয়া শিবিরে'র নাটকীয় দ্বন্দ্ব। আর এ থেকে উত্তরণের নির্দেশ রয়েছে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা। স্বপ্নের রূপকার রাখাল নাটকের অন্তিমে যখন বাসনার কাছে কাতর মিনতি জানায়, 'আমার স্বপ্নকে তুই ভেঙ্গে দিসনি বাসনা। তোকে পাশে পেলে এই ছেঁড়া তাঁবু জোড়া দিয়েই আমি আবার নয়া শিবির গড়বো—এপার ওপারের মাঝখানে যে কাঁটার বেড়া তা ভেঙে দিয়ে নতুন জীবনের নয়া শিবির। কাছে আয়।'—তখন রাখালের আর্তি, তার স্বপ্ন, নতুন পৃথিবী গড়ার প্রতিজ্ঞা, সব মিলেমিশে ভালবাসার জয়গান ঘোষিত হয়। রাখাল-বাসনা-বলাই'র ত্রিভুজ প্রেমের মধ্যে যে যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা, তার আড়ালেই রয়েছে ক্যান্সারের বীজ, যা ধীরে ধীরে গোটা সমাজ-দেহকেই গ্রাস করছে। '...আগুনে পুড়ে শুধু তোরাই মরছিস না, মরছে সারা দেশেরই লোক। মাঝেমাঝে আমারও রক্ত আগুন হয়ে ওঠে, হাত দুটো নিশপিশ করে, মনে হয় এক ঘুষিতে শয়তানের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে দুনিয়াটার চেহারাটা পাল্টে দিই...', কিন্তু রাখাল জানে 'পাল্টাবো বললেই তো পাল্টানো যায় না' কারণ তা 'একটা কব্জির কাজ নয়'। কিন্তু তবুও সে হতাশ হয় না, সে জানে রাত যতই অন্ধকার হোক, একসময় প্রভাত হবেই। তাই সে গৌরাঙ্গকে বলে, 'ছাখ্, ছাখ গৌরাঙ্গ, এমন স্বপ্নই দেখতে থাক। দেখবি দুনিয়াটা তোর কাছে কেমন বদলে গেছে, মানুষ তোর কত আপন হয়ে উঠেছে, সবার দুঃখের সঙ্গে তোর দুঃখ মিশে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর আকাশ-ছোঁয়া ঢেউ তুলছে। অশান্ত হাওয়ার সঙ্গে কোলাকুলি করবে সেই বেদনার ঢেউ, আঘাতে আঘাতে জন্ম দেবে এক নতুন পৃথিবীকে'। রাখালের আলোকোজ্জ্বল সংলাপ স্পর্শ করে অনেককেই, এমনকি বৃদ্ধ কানাই-মোক্তারও পরশ-পাথরের ছোঁয়ায় জেগে ওঠেন, 'এই পুরাণ শিবিরে আর চলবো না, এমন নয়াশিবির গড়তে অইব যেইখানে পাবি নয়া জীবন।...আমি য্যান দেখতে পাইতেছি—এই ছিড়া তাম্বু থেইকাই একদিন গজাইয়া উঠবো নতুন বালাখানা। হেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আমি মরতে চাই'।

কিন্তু নাট্যকার জানেন নয়াশিবির গড়ার পথে রয়েছে অজস্র বাধা। শোষক কেষ্ট মণ্ডলরা মরেও মরে না, ধর্মদাস-নিশি প্রভৃতি দালালেরও অভাব হয়না। আর তাই 'বাস্তুভিটা' রচনার পর 'মশাল' ('৫৪) নাটকে তাঁকে আবার মানবতার সঙ্গীত গাইতে হয়। 'মশাল' সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কাহিনী। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি জয়লাভ করতে হয়, তাহলে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। একতার মাধ্যমেই মতি-শোভনলাল-জালাল-রাখাল-বিশ্বনাথ-মহেন্দ্রর একসূত্রে বদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন, যে ঐক্যবদ্ধ শক্তির চাপে মিঃ জ্যাকসন-এর মত চটকলের মালিক, কেষ্ট মণ্ডলের মত জোতদার, কালীনাথের মত কালোবাজারীরা একইসঙ্গে ধ্বংস হবে, আর তখনই নতুন ভারতের জন্ম হবে। শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা পরিহার করে কেমন করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়, নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল সেইদিকে। স্বাধীনোত্তর ভারতে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য মালিকশ্রেণী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ন্যায় সুযোগকে কেমন করে কাজে লাগায়, শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তা নাট্যকার এই নাটকে তুলে ধরেছেন। এবং তখনকারে দ্বিধাবিভক্ত শ্রমিকদের ঐক্যপ্রচেষ্টাও মিছিলের বেশি ঐক্যরূপ ধারণ করতে পারেনি। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হিসেবে নাট্যকার অর্থনৈতিক কারণ তথা মালিকশ্রেণীর অতিরিক্ত মুনাফা-লোভকে দায়ী করেছেন, তা একটি কারণ হতে পারে, এক ও অন্যতম নয়। এবং দাঙ্গা প্রতিরোধে মতি-শঙ্কর-জালাল-শোভনলালের যে প্রয়াস, তা যেন কতিপয় শ্রমিকের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস। শেষপর্যন্ত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শোভনলালের মৃতদেহ নিয়ে যে 'শান্তিমিছিল' বেরোয়, সেখানে শঙ্করের রাজনৈতিক বক্তব্য সত্ত্বেও ( 'এসো মতি, শোভনলালকে ছুঁয়ে আমরা সবাই শপথ করি—যারা ঘর পোড়ায়; মায়ের কোল শূন্য করে, মানুষের বুকে ছুরি মারে, গুলী চালায়—স্বার্থের জন্য গরীবের তাজা রক্তে হাত রাঙায় সেই রক্তশোষা দুষমনদের বিরুদ্ধে হবে আমাদের শেষ লড়াই'। ), নাট্যকার সামগ্রিক রাজনৈতিক পটভূমিকার চিত্র অঙ্কনে অক্ষমতা দেখিয়েছেন। বস্তুতঃ শ্রমিকদের মধ্যে আরও বেশি রাজনৈতিক সচেতনতা থাকলে ও আরও বড় পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত হলে এটি আরও মহৎ নাটক রূপে পরিণত হত।

তথাকথিত উচ্চবিত্ত শ্রেণীর শোষণে নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষ কেমন করে সমাজবাদের আশ্রয় নেয়, তা-ই 'মোকাবিলা' ( রচনা '৪৯, প্রকাশ '৫০ ) নাটকের বিষয়বস্তু। গাণিতিক বৈপরীত্যের মত এই নাটকের দ্বন্দ্ব 'সৎ'

বিশ্বনাথ এবং অসৎ ভুঁইফোঁড় কালীনাথের পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, নাট্যকার শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে কাহিনীকে যুক্ত করে, মালিক-কর্মচারীর সংঘাতকে আরও বড় পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের দ্বন্দ্বরূপে। ভাবে-ভাষায় ও গঠন-স্বাচ্ছন্দ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন এই নাটকে নাট্যকার ব্যক্তি-পরিবারের মাধ্যমে একটি বিশেষ শ্রেণী. সমাজ ও রাষ্ট্রের সংঘাত অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'মোকাবিলা' তাই মেহনতী মানুষের জীবনের চিত্রই নয়, তাদের সংগ্রামের কাহিনীও, যে সংগ্রামের শেষ আজও হয়নি।

সামাজিক সমস্যামূলক নাটকেই দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি স্বচ্ছন্দ ও সুঠাম। রাজনৈতিক সচেতনতা ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির সংমিশ্রণে রচিত এই ধরণের নাটকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মতবাদের আলোকে তাঁর সামাজিক সচেতনতার প্রমাণ ফুটে উঠেছে। সমাজতন্ত্রের পটভূমিকায় রচিত 'অন্তরাল' (রচনা '৪১ প্রকাশ '৪৫) দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক। প্রথম নাটকটি থেকেই তিনি যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান সমাজতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ এবং সামাজিক সমস্যার মূল্যায়ণ। কানীন সন্তানের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে প্রশ্ন, যা মহাভারতের যুগের সময় থেকে চিরকালই চিন্তাশীল মানুষকে নাড়া দিয়েছে, সেই সমস্যাকে মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকার বিচার করতে চেয়েছেন। বস্তুত, সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাট্যকার কানীন সন্তানের সমস্যাটিকে ধরতে চেয়েছেন বলে, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী রণেশ, সমাজবাদী ঝর্ণা-অবিনাশ, শ্রমিক আন্দোলন প্রভৃতি এই নাটকে এসেছে। যদিও রণেশ-ঝর্ণা-অবিনাশের প্রেম-দ্বন্দ্ব শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যেতে পারেনি। বিশেষতঃ পুলিশের বন্দুকের সামনে অবিনাশের এগিয়ে যাওয়া প্রায় আত্মহত্যার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের প্রয়োজনে অবিনাশকে যেভাবে হত্যা করা হয়, সেটা অনেকটাই আরোপিত। এরই পাশে মাধবী-ভবতোষের দাম্পত্য সম্পর্ক, ভবতোষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, স্ত্রী-কন্যাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত, পুনরায় 'সত্য'র নিকট তার আত্মসমর্পণ নাট্যকার চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার স্ত্রী মাধবীর দ্বিধা-সংকোচ ও মানসিক সংঘাত এবং সর্বোপরি তার রহস্যময় আচরণ পরিস্ফুটনে নাট্যকার সফল হয়েছেন।

'অন্তরাল' নাটকের বিবাহবিহীন দম্পতির সমস্যা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নাট্যকা র তুলে ধরতে চেয়েছেন 'কেউ দায়ী নয়' নাটকে। 'কেউ দায়ী নয়'

একাঙ্করূপে যে নাট্যসম্ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, তাকেই তিনি আরও ব্যাপক-ভাবে ধরেছেন পূর্ণাঙ্গ নাটকটিতে। এবার অবৈধ সন্তানের সমস্যা নয়, সমাজ-সম্মত বিবাহ-সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অনুসন্ধান করেছেন। নর-নারীর প্রেম সম্পর্কের মধ্যেও যে বিচ্ছেদের বীজ থাকে তা মৃত্যুরই নামান্তর। এর জন্য দায়ী কে—ক্ষণিকের উত্তেজনা না পুরুষশাসিত সমাজ! নাট্যকার এজন্য দায়ী করেছেন সমাজ তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই 'আমাদের মধ্যে যদি অর্থনৈতিক দুর্দশা দারিদ্র্য এবং দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বাসা বাঁধে যদি পরনির্ভরতাই সমাজের একটা বিশেষরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তবে নিষ্পাপ সরল জীবনেও স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পতনের স্পর্শ লাগে। এই নাটকের নায়িকা শিক্ষিতা তরুণী সুধাই তার প্রমাণ' (বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়)।

বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সম্মিলনে যে সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করা যেতে পারে, তা-ই 'জীবনস্রোত' নাটকের বিষয়বস্তু। সমাজবাদের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও গভীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে 'অধ্যাত্মবাদ-নির্ভর ভাববাদ ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদে'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। এই নাটকে 'খারাপ' বলে যেমন কোনকিছুকে বর্জন করেন নি, তেমনি শুদ্ধ 'ভাল' বলেও তিনি কোনকিছুকে গ্রহণ করেননি। আধুনিক জীবনে ধর্ম ও বস্তুবাদকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত, তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নাট্যকার সংযমী ও নিরপেক্ষ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন এবং উপসংহারের ভার দর্শক-পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ধর্ম ও বস্তুবাদের নাট্যসংঘাতে একদিকে তেজসানন্দ-গীতা-যূথিকা অন্যদিকে তাপস-জিতেন্দ্রর মধ্যে নাট্যকার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন জিতেন্দ্র ও গীতার মিলনের মাধ্যমে। অনাথ-আশ্রমকে কেন্দ্র করে নারীব্যবসা, ধর্মের আড়ালে কুৎসাপ্রচার ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি ফুটে উঠেছে অঘোরানন্দ-রায়বাহাদুর ও এলিজা চরিত্রের মাধ্যমে। তাপস ঐতিহাসিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, গীতা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগতা, লাঞ্ছিতা ও ধর্মপ্রাণা নারী। দুয়ের মধ্যে অনুরাগ গড়ে ওঠে ও তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে চায়। গীতার সনাতন বিবাহ পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ ও জিতেন্দ্রর এতে অসম্মতি প্রকাশ এই নিয়ে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। শেষপর্যন্ত তেজসানন্দের মধ্যস্থতায় গীতা ও জিতেন্দ্রর মিলন হয়। তাপস—যূথিকা এবং জিতেন্দ্র ও গীতার মধ্যে মিলন দেখিয়ে নাট্যকার কি এই ইঙ্গিতই করতে চান যে ধর্ম ও বস্তুবাদের সমন্বয়ের পথেই একদিন জন্ম নেবে নতুন সমাজ!

মদ্যপান নিবারণের ওপর রচিত ফরমায়েসী নাটক 'অমৃত-সমান' ( '৬৯ ), মানুষের অন্তরের 'সু' ও 'কু' র দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষকে পাপের খেসারৎ দিতে হয় এবং যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়েই মানুষ নবজন্ম লাভ করে। মানুষ যত অতলে তলিয়ে যাক না কেন, ঘোর পাপীও কখনো মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। নাট্যকার বিশ্বাস করেন, কেবল নেতারাই নন, মানুষই আত্মজ্ঞান ও পারস্পরিক ভালবাসার মাধ্যমে, এই দুর্ভাগা দেশকে সোনার দেশে পরিণত করতে পারে।

'অমৃত সমানে'র ভৈরবের মত বীরেশ্বরও এক স্বপ্নময় জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি তৈরী করতে চেয়েছিলেন স্বর্গের সিঁড়ি, কিন্তু তাঁর সব স্বপ্নই ধূলিসাৎ হয়েছিল। 'স্বর্গের সিঁড়ি' ( '৮২ ) জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর্যের অপসারণ দিয়ে শুরু হয়েছে, নাটকের অন্তিমে এই ভাস্কর্যই আবার প্রতীকীরূপ ধরে ফিরে এসেছে। বাস্তব জগতে একজন শিল্পীর সংগ্রাম এবং অন্তরের তাগিদ ও কর্তব্যের দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু। স্থপতি বীরেশ্বর শিল্প ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এক আদর্শ উপনগরী তৈরী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে যায় এবং তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন, কারণ শিল্পীর জগৎ এবং সাংসারিক চাহিদা দু'য়ের মেলাবন্ধন প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

॥ ২ ॥

দিগিন বন্দ্যোপোধ্যায়ের নাটকের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে তাঁর রচিত সমস্ত নাটকের বিচার প্রায় অসম্ভব। সাহিত্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জের এই ক্লান্তিহীন শ্রমিক সত্তরের বেশি পূর্ণাঙ্গ-একাঙ্ক ও কিশোর নাটক, যাত্রা, উপন্যাস, প্রবন্ধ সমালোচনা লিখে গেছেন, যার সবগুলো সমমানের নয়। কিন্তু তাঁর রচনার বৈচিত্র্য যে কোন মানুষকে অভিভূত করে। তাঁর একাঙ্ক নাটকে যে বিষয়-বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা এরকম—দেশভাগ এবং নিম্নবিত্তের জীবন ও দ্বন্দ্ব মধ্যবিত্ত জীবনের কপটতা ও অসারতা, হঠাৎ-ধনী সম্প্রদায়, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, সংগ্রামী শিল্পী জীবন, মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ, সমাজ ব্যঙ্গ ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গ, কৌতুকরস এবং তথ্যধর্মী নাটক।

নিম্নবিত্ত জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে 'এপিঠ-ওপিঠ' ( '৪৯ ) ও 'অপচয়' ( '৫৭ ) একাঙ্কিকায়। দেশভাগের পর একবোনের সংসারে ছোটবোনের আশ্রয়গ্রহণ হৃদয়জ্বালা কলহ ও পুনর্মিলনে দারিদ্র হয়ে দাঁড়ায় অন্যতম সেতু। 'অপচয়' বাস্তহারা তরুণ-তরুণীর ট্র্যাজেডির কাহিনী। তরুণী

সন্ধ্যার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে মিলন কাপুরুষ অপবাদ মাথা পেতে গ্রহণ করে, কারণ সে কালরোগে আক্রান্ত, সন্ধ্যাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে প্রেমের জয়ঘোষণা করে।

মধ্যবিত্ত জীবনের অহংকারের আড়ালে তার অসহায়তা ফুটে উঠেছে 'আগ্নেয়গিরি' ( '৫২ ) এবং 'কিন্তু এবং স্থতরাং' একাঙ্কিকায়।

হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনিক সম্প্রদায়ের চিত্র এবং 'জেনারেশন গ্যাপ'-এর প্রতিচ্ছবি 'পাকা দেখা' ( '৫৮ )। মানুষের চাইতে মাটির পুতুলের যেখানে দাম বেশি এবং মানুষের বিচার হয় স্বার্থের মাপকাটিতে, সেই ব্যবস্থাকে নাট্যকার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করেছেন।

কাকদ্বীপ-সোনারপুর-লালগঞ্জ-চন্দনপিঁড়ি অঞ্চলের কৃষকদের 'তেভাগা সংগ্রাম'কে কেন্দ্র করে 'বোধন' ('৪৮) রচিত। মাত্র তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে কৃষকদের লড়াই, প্রতিপক্ষের চরিত্র, সংগ্রাম-মৃত্যু, জয়ের শপথ নাট্যকার অত্যন্ত মুন্সীয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। চন্দনপিঁড়িতে শহীদ হয়েছিল অহল্যা, এখানে শহীদ হয়েছে তুলালের স্ত্রী দুর্গা। যে পুরাণের দুর্গার মতই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এবং নিজের মৃত্যু দিয়েই চাষীদের লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে। 'রক্ত রাঙা সিঁথি ('৮১) ভূমিহীনদের জমি বণ্টন ও সংগ্রামের কাহিনী। বোধনের মতই এখানেও ফুটে উঠেছে চাষীদের ঐক্য, যেখানে পথ দেখিয়েছে কৃষকনেতা পূর্ণেন্দু ও চাষীকন্যা স্থবর্ণ। দুর্গা আত্ম-বিসর্জন দিয়ে চাষীদের উদ্দীপ্ত করেছিল, আর এই নাটকে চাষীকন্যা স্থবর্ণ পূর্ণেন্দুর রক্ত সিঁথিতে পরে শপথ নেয় সংগ্রামের, রক্তের ঋণ শোধের প্রতিজ্ঞায় চাষীদের ইস্পাতকঠিন শপথ ও ঐক্য মহান হয়ে ওঠে।

জরুরী অবস্থাকালীন দেশের চিত্র তথা শ্রমিক ও জাগ্রত জনতার ঐক্য রূপলাভ করেছে 'বাঁধ ভেঙে দাও' ( '৭৫ ) একাঙ্কিকায়। সমকালীন চিত্রমূলক এই প্রচারধর্মী নাটকে নাট্যকার নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে পারেন নি। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত 'মেঘের আড়ালে সূর্যে'র ( '৭১ ) চাইতে 'মুখর রাত্রি' ( '৭৮ ) নাটকীয়তার দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। বিপথগামী অনিমেষকে ঘরে ফিরিয়ে আনেন পুলিশ অফিসার পিতা প্রভাকর। এক ঘুমভাঙা রাতে পিতা-পুত্র ও মায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই একাঙ্কিকার বিষয়বস্তু। পিতা চেষ্টা করেন ছেলেকে মায়া থেকে বাস্তবে নিয়ে আসার, আর ছেলে এখনও ঘুরে বেড়ায় স্বপ্নের দেশে, কল্পনায় দেখে অসমাপ্ত বিপ্লবের স্বপ্ন।

একজন শিল্পী ভোগের পথ বেয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে কেমন করে জনসংগ্রামের নায়ক হয়ে ওঠে, ধর্ম-সংগীতের পরিবর্তে জনতার গানে কেমন করে পুনর্জীবন পায়, তা-ই 'পুনর্জীবন' ('৪৮)-এর বিষয়বস্তু।

চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের পটভূমিকায় রচিত 'সীমান্তের ডাক' (৬২) নাটকে কোন বিদ্বেষ নয়, নাট্যকার বলেছেন দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের কথা। 'যুদ্ধের শেষ কি কোনদিনই হবে না? দুনিয়ায় শান্তি কি কখনই আসবে না?'—এই মানবীয় প্রশ্নেই নাটকের পরিসমাপ্তি হয়েছে।

'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' ('৫৭) ও 'দস্তুরমত প্রহসন' (১৩৭৩) ব্যঙ্গ নাটিকায় নাট্যকার যথাক্রমে মিশ্র অর্থনীতি ও ভারতীয় গণতন্ত্রের দুমুখো রূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে তুলে ধরেছেন। 'গোলটেবিলে' সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতদাররূপে 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

'সেই অগ্নিগর্ভ দিন' ('৮৪) ডকুমেণ্টারি থিয়েটারের আদর্শে রচিত। ১৯৬২ সালে কিউবার বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যে ক্যারিবিয়ান সংকট দেখা দিয়েছিল এবং পৃথিবী পারমাণবিক যুদ্ধের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছেছিল, তখন মানবজাতির অস্তিত্বকে রক্ষার জন্য শান্তির স্বপক্ষে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, ১৯৬২ সালের ২৭শে অক্টোবর হোয়াইট হাউসের ডিম্বাকৃতি হলের সেই নাটকীয় ঘটনার নেপথ্যচিত্রই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

* * *

দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর সাহিত্যগুণ। তাঁর নাটক কেবল অভিনয়ের নোটস্ নয়, উত্তম সাহিত্যও। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও দ্বন্দ্ব, সংলাপ ও চরিত্রের বিবর্তন, ঘটনার গতিময়তা, কাব্যময় ও প্রতীকী ভাষার ব্যবহার, প্রবচনের ব্যবহার ও গ্রামজীবনের বর্ণনা—সব মিলিয়ে, তাঁর নাটকের সাহিত্যগুণ অনস্বীকার্য।

মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার তিনি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ যে জীবন তিনি তাঁর নাটকে তুলে ধরেছেন, নিঃসন্দেহে সেগুলিকে ভাল নাটকের মর্যাদা দেওয়া যায়। কিন্তু কালজয়ী হতে হলে যে মহত্তর গুণের সমাবেশ প্রয়োজন, প্রয়োজন সমসাময়িকতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, তাঁর অধিকাংশ নাটকে তা একান্তভাবে অনুপস্থিত। তবে এক্ষেত্রে মহাকালই সেরা বিচারক।

ইবসেনের মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং গোর্কির নিম্নতর শ্রেণী তাঁর ওপর যে প্রভাব

বিস্তার করেছে, তার সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি এমন কোন 'স্বতন্ত্র' পথের ইঙ্গিত দিতে পারেন নি, যে পথে বাংলা নাট্যশালা আরেকবার স্বগৌরবে ভূষিত হতে পারে।

তিনি বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নন। আপসমূলকভাবে তিনি নতুনপথের অনুসারী। সমাজবাদী রাজনীতির প্রভাব, আপাত-সংস্কারপন্থী মন, নাট্যকার-সুলভ নিরপেক্ষা, সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজ তাঁর নাট্যজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক। এইসঙ্গে আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও যে বৈপ্লবিক আধুনিকতার প্রয়োজন ছিল, সেদিকে তাঁর নজর ছিল কম। পূর্ণাঙ্গ নাটকে এইদৃষ্টি সম্পূর্ণই অনুপস্থিত, একাঙ্ক নাটকে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদাহরণ আছে, যদিও এখানে তিনি পুরোন আঙ্গিককে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন নি।

কারণ, তাঁর লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর দর্শকের কাছে পৌছনোর। একইসঙ্গে থিয়েটার ও যাত্রার দর্শককে ধরার জন্য তিনি বিভিন্ন নাটকে ব্যাপক নির্দেশ দেন। চিন্তার অগ্রগতির মধ্যে হয়তো এজন্যেই তিনি যাত্রাসুলভ মেলোড্রামার ব্যবহার করেন, আধুনিক হয়েও 'স্বগত'র ব্যবহার করেন, এমনকি চল্লিশোত্তর যুগের নাটকার হয়ে বিভিন্ন নাটকের পরিচিতিমূলক লেবেল এঁটে দেন। কন্‌টেন্টের আধুনিকতার মধ্যে ফর্ম-এর প্রাচীনপন্থা তাঁর ভাবনাচিন্তার রাশ টেনে ধরেছে। তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র মোকাবিলার বিশ্বনাথ, জীবনস্রোতের তেজসানন্দ, অন্তরালের ভবতোষের ন্যায় তিনিও প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে দোলায়মান, যার জন্য তিনি বেছে নেন মধ্যপন্থা।

এছাড়া 'কমিটেড' হলেও রাজনীতির চাইতে মানবনীতিই তাঁর ওপর বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। কোন বিশেষ মত ও পথে বিশ্বাসের চাইতে মানবনীতিই নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর নাটকের পারণতি। সুতরাং বলা যায়, তাঁর মতবাদ পরিবর্তনপ্রয়াসী, কিন্তু একের ধ্বংস ও অপরের প্রতিষ্ঠার বদলে তিনি চান হৃদয়ের পরিবর্তন, আকাঙ্ক্ষা করেন সমন্বয়ের, ভারতীয় জীবনের উপযোগী এক নতুন সমাজের। জীবনস্রোতের 'ইউটোপিয়া'ই হয়তো একদিন সত্য রূপ নেবে, সেদিনই হবে তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ণ।

# ত্রিনয়নে তির্যক

লোকনাথ ভট্টাচার্য

## এক ঃ প্রেতপুরীতে সংসার

অনেকদিন বাদে এলাম, কিন্তু এখনো তোমার দরজায় সেই একই অন্ধকার। ভিতরের দানবেরা নিশ্চয় ফিসফিস করছে—প্রলাপোক্তি, কটূক্তি, ব্যঙ্গোক্তির শেষ নেই তাদের।

সে-ভাষা আমার এত জানা, এও তা এখনো লিস্টে আছে এই শরীরের অলিতে-গলিতে, যে ঢুকতে আমার ভয়, যে-আমি এসেছি আজ এত বাক্স-পেঁটরা নিয়ে; এত খেলনা শিশুর, এত হাসি, এত সূর্যালোক। যদি ঢুকি তো ধুলো ঝেড়ে কোথায় বসাব এদের, কোন্ সংসার পাতব এই প্রেতপুরীতে!

ভয়টা ছিল পথের, তা দিয়ে ফিরে এসেছে আমার রাত্রে, আগুন-নিশ্বাসে, উল্টেপাল্টে দিয়েছে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত, রকমারি উপহার, এই আশা-হতাশায় সুসজ্জিত মন আমার, এত ধন এই পৃথিবীর।

কে জানে, হয়তো এই ভয়ে এতক্ষণে তারাও জড়োসড়ো, তাদের চোখের নিচে জমেছে কালি, হাত-পায়ে বাত ধরেছে। বা শুকনো পাতাই হয়তো, অন্ধকারের চিতাগ্নিতে আহুতি হতে প্রস্তুত।

অতএব, এই দ্বিধার ক্ষণে, খুলে কি দেখব একবার, কে কেমন আছে, এখনো খেলা করছে কিনা রঙ, রয়েছে কি নদীর স্পর্শ হাঁটু মুড়ে নিশ্চিন্তে বসার ভঙ্গীতে? অথবা দুই ভয়ই যদি সত্য হয়, যদি ভিতরও যা, বাহিরও তাই, ঘর ও বাক্সে একই হাহাকার, শ্মশানের হাওয়া, তবে ছুটব কি কোনো সুধার সরোবরের তীরে? কিন্তু কোন ঠিকানায়?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার ভিতরে নেই, এই বাইরেও নেই, নেই শরতের মেঘ ও রৌদ্রে এত কপট এই আকাশেও। এরা কেউ যেন জানে না, শোনেনি কখনো, বুঝতেই পারে না আমার ভয়ের কথা—এই দেবদারু

বৃক্ষের সারি, কাঁকরে বিছানো রাস্তা, দূরে চলে-যাওয়া গরুর গাড়ীর ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ। অথচ এদেরই সান্নিধ্যে একদিন কেটেছে কত ঋতুর পর ঋতুর সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত-রাত্রি, কতবার এসেছি ছুটে-ছুটে অনাথ বালক এদেরই পদপ্রান্তে নিশ্বাস নিতে, চুপি-চুপি বলতে আমার কত ক্ষণের বৃত্তান্ত। পালিয়েও যাই একদিন, স্বপ্ন চেয়ে, একটি ফুৎকার চেয়ে দূরদূরান্তের দিগন্তের নীলিমায়—তাও কি ভুলেছে এরা?

অথবা যদি, নাই ঢুকলাম, দরজা নাই ঠেললাম, শুধু যে-মমতায় একদিন বিছিয়েছি তোরঙ্গে দেশদেশান্তের উপহার, ঘর সাজানোর এত সামগ্রী, সেই একই আসক্তিতে চৌকাঠ ছুঁয়ে আলগোছে আজ রেখে দিই বাক্সপত্র, ঢাকনা না খুলেই, পরে পাড়ি দিই হাল্কা শরীরে মনে হয় সেই চেনা পথেই, নয়তো উল্টোদিকের অন্য অচেনা পথে?

কৌতূহলের বড-বড় চোখ খুলে দানবেরা হয়তো বেরোবে তবে, আস্তে-আস্তে তুলবে তোরঙ্গের ঢাকনা? এবং দেখবে হয়তো সেখানেও চোখের নিচে কালি, বা সত্যিই তখনো অক্ষত সাতরঙা কোনো সূর্যালোক? সেই অত অভীপ্সার এলোমেলো হাওয়া, অত প্রেমের আকুলিবিকুলি?

ঘরে কী আছে, বা বাক্সে কী নেই? আমি কি দাঁড়িয়েই থাকব, না সামনে বা পিছনে যাব?

উত্তর যেহেতু আমার নেই, আশপাশও সব এত ষড়যন্ত্রকারীর দল, কেউ রা'টি কাড়ে না, তুমিই কিছু বলো তবে, যে তোমারই দরজা এই, যে-তোমারই এই ঘর।

## দুই : বাক্সবন্দী ভ্রমর

ঠেলে মেলে ফেলে দিল তো আমায়, দিল আবার! যে-আমি চুপটি ক'রে বসতে আসি এই আঙিনায়, নিথর হ্রদের সামনে হাওয়াহীন স্তব্ধতায়, যে-আমার কোনো নালিশ ছিল না কারুর কাছে। এখন কোন্ রাজদ্বারে যাব আমি এই অন্যায়ের প্রতিবিধান চাইতে, যা ঘটবেই, ঘ'টে চলেছেই, অতর্কিতে, অসহায়ের মুখ থেঁৎলে দিয়ে গোবরের স্তূপ!

অতএব প্রতিবারই এক নতুন অন্ধকূপ, এবারও আরেকটি, হুহুঃ—শব্দে পড়া, পড়ে চলা কোন অতলে। সাজানো সংসারের স্বপ্ন রেকাবিতে, আরো একবার, তছনছ হয়ে নাচে, ঝরে পড়া শুকনো পাতায়-পাতায়, কনকনে-শীতের জনহীন অরণ্য।

এই ঝলকায় কোনো মুখ, কারুর হাসির হঠাৎ থেমে-যাওয়া খিলখিল ঝংকার, এই কোন্ পিশাচের ভ্যাংচানির একটু আভাসমাত্র, অসির ঝনঝনানিতে শতছিন্ন কুচি সব। যেন রব উঠতে থাকে কানে, উঠেই চলে, সে বলে মর্ মর্ মর্, পালা পালা!

কোথায় পালাব? যুদ্ধ করব এই মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে? আদিখ্যেতার দেখছি শেষ নেই আমার মহামান্য প্রতিপক্ষটির।

এবং তলায় কী অপেক্ষা করে আছে এবার? এবড়ো-খেবড়ো কোন্ কঠিন প্রস্তর-শয্যা? কত নিম্নে রয়েছে সেই করাল প্রেমিক?

হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে, প্রাণের পাখি খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়বে শূন্যে, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে, গহ্বরের হাঙরমুখো হাঁ-এর উদ্দেশে। পরে ছিদ্রের অন্তরাল পেরিয়ে মিশে যাবে আরো উপরের হাওয়াহীন স্তব্ধতার নিশ্বাসে, শেষে ক্রমশই আরো-আরো উপরে উঠতে-উঠতে, আকাশের শিখরে। সেই যেখানে আমার দেবতাদের কোল চলে, হাট-করা উন্মুক্ত দরবারে বসেছেন মহারাজ।

বহু নিম্নের এই অলক্ষ্যে পড়ে থাকবে কঙ্কাল, দলিত-গলিত কিছু নাড়ী-ভুঁড়ি, যা হবে না খাদ্য কোনো শকুনের।

নাকি আজ পর্যন্ত প্রতিবারই যা হয়েছে, এবারও হবে তাই? হুমড়ি খেয়ে পড়ব পাহাড়প্রমাণ কোন্ বিচালির গাদায়, যা আমার পতনের পরে, স্প্রিং-এর সমুদ্রের মতো দুলতে থাকবে দশ মিনিট ধরে, শেষ হবে স্থির, অচিরেই আবার নির্বিকার?

আমিও তখন শিরায়-ধমনীতে আবার জড়ো করতে বসব অতীতের সব সৌধের স্মৃতির সঞ্জীবনী, আমার প্রিয়ার নাম, হঠাৎ শক্তির সঞ্চার বিদ্যুতে-বিদ্যুতে আগুন জ্বালবে আবার রোমরাজির অঙ্কুরে-অঙ্কুরে?

এবং তখন আবার খুঁজব সিঁড়ি, পা রাখার কোনো ইটের কণা, আঁকড়ে ধরার মতো দেয়াল ফুঁড়ে মাথা তোলা অশ্বত্থের আগাছা? পরে শৌখিন পর্বতারোহীর তাক-লাগানো একই খেলটি আবার?

কত দিন-রাত্রি ধরে সেই কসরৎ, অবশেষে পৌঁছনো হাঙরের হাঁ-তে?

আপাতত অবশ্য অবতরণই মহামহিম, উত্তরণের অভিলাষ বাক্সবন্দী ভ্রমর।

মর্ মর্ মর্, পালা পালা পালা।

ঝরা পাতার তাণ্ডব-নৃত্য কাছে-দূরে। আমার হাতে শুধু এখনো রেকাবি, সাজানো সংসারের উপচার—আশ্চর্য, অলৌকিকভাবে এখনো অক্ষত।

তিন : মাদল

নিসর্গের বদল হ'য়ে গেছে। বাঁ হাতে প'ড়ে রয় জনপদ, বসন্তের কোকিলের কান্না, স্বপ্নের অনেক রক্ত জমজমাট। কিছুক্ষণ আগেও যা ছিল চেতনার একমাত্র সুরভি।

এবার ডান হাত। এবং চোখ নিবদ্ধ সেইদিকেই, নতুন স্মৃতির সঞ্চয়ে পাড়ি। পেরিয়ে তাসা পথ পাঁচশো মাইল বেগে পিছনে অন্তর্হিত হয়— যেখানে শূন্যের গোলকের বিকট হাঁ, শুধু অন্ধকার। মেঘের পর মেঘ, ঘূর্ণি জাগল ব'লে। তবু সব এত দূর ইতিমধ্যেই সে চোখও যায় না, যেতে চায় না।

বাঁক নিয়েই জনপদের বদলে মরু এবার, নেড়া পাহাড়ের আরম্ভের আভাস, যা শীঘ্রই সন্ত্রাসের সঙিন ওঁচাবে, আকাশে-আকাশে। তপ্ত হাওয়ায় উত্থিত ধূলি আচ্ছন্ন করবে দৃষ্টি, অন্য ঘূর্ণিতে। দিগন্ত হ'তে দিগন্তে বিছানো বিরাটের বাহু সবল বন্ধনে বাঁধবে আর্ত পালির ধুক-ধুক কম্পমান বুক, আশা-হতাশা নাচবে আলেয়ার বেগনি আলোয়-আলোয়।

অনেক দূরে, অস্পষ্ট ধ্বনিতে, বেজে উঠবে মাদল। প্রাণখোলা সে-হাসি, যেন বজ্র নির্ঘোষ, কার বিদ্রূপের, না শুধুই খেলার ?

খেলার কথা যদি ওঠেই পথিক তো তো কি তোমারও কিছু কম ? বাঁ হাত বা ডান হাত, উভয়েই অভিশাপের অঙ্গুলি তুলতে পারে তোমার দিকে, বলতে পারে তুমিই, হ্যাঁ-হ্যাঁ তুমিই পাষাণহৃদয়, অত্যাচারীদের দলের চক্রবর্তী মহারাজ। এমন নিঃশেষে মুছে দেওয়া অতীত, স্বপ্নকে উপুড় ক'রে যথেচ্ছ দেওয়া, বা প্রিয়ার মুখে আলকাতরার আঁচড় টেনে চলা, হেন কীর্তি তুমি ভিন্ন অন্য কোন্ নৃশংসের ?

মাদল তো বাজবেই, আজ নয় তো কাল, সকালে কিম্বা সন্ধ্যায়। তোমার বুক ধুক-ধুক পাখি ? এ-আদিখ্যেতা নিজেই করছ নিজেকে।

পাহাড়ের খাদ বা রাত্রির হুমকি, এখনো অবশ্য তাদের আসার দেরী আছে। উঁচু-নিচু ঢিবিরই সূত্রপাত সব, ঘূর্ণির আগমনী গান। ধূলি সত্ত্বেও দৃষ্টি, চলে, বিশেষ কোনো নিমেষে হয়তো আবছা, তবু পরেই আবার পরিষ্কার, অন্তত সামনের বেশ খানিকটা পথ পর্যন্ত। এবং, বেলা দশটাও বাজেনি হয়তো।

সন্ধ্যায় পৌঁছনোর আগে দিনের অনেকখানি এখনো প'ড়ে আছে।

তবু তা শেষ হবে ত্বরিত পায়ে-পায়ের চলায়, যা দেখতে চেয়েছ, অথবা চাওনি, তা তুমি দেখবেই। যদিও আত্মহননের কাঙাল, এসবের কিছুরই দরকার

তোমার ছিল না। বাঁ হাতে বা ডান হাতে, সামনে বা পিছনে, ঊর্ধ্বে-অধে, কত কিছুই থাকতে বা না থাকতে পারে, জনপদ বা মরু বা হুমকি, তাতে হঠাৎ এত কী এসে গেল তোমার ?

তোমার তো ঘরটা ছিল, যেখানে তুমি ছিলে, ছিল প্রিয়ার উন্মুক্ত, উজাড় ক'রে দেওয়া উরু, অভ্যাসের রঙিন আচ্ছাদনে মোড়া বিদায়রাত্রির দ্যুতি-ঠিকরানো তৃপ্তি। কোকিলের কান্না জাগেনি, নেড়া পাহাড় মাথা তোলেনি।

এখন গর্জন এগিয়ে আসে, আরো আরো নিকটে, রেহাই পেতে তুমি চাওনি, পানেও না।

এইসব চুটকোচাটকা প্রসঙ্গ, অর্থ ও অর্থহীনতা, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে আকুল করবে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ, যাতে আমরা সঙ্গী বই, আমাদের কোনো মায়া-মমতাও নেই, না তোমাকে নিয়ে, না তোমার কোনো বাঁ হাত বা ডান হাত নিয়ে।

শুধু শুনছি, তোমারই মতো, দূরে, বহু দূরে, মাদল বাজে।

# লোকদীপ প্রকল্প ও চুকাই বাউরি

অশোককুমার সেনগুপ্ত

লোকদীপ প্রকল্পে চুকাই বাউরি আলো লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়। দাসপাড়া গাঁয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আটটা ঘরে সরকার আলো দান করবেন। চুকাই ঘাটের এক। এ সৌভাগ্যে চরম আহ্লাদ চুকাইয়ের। পরম ধন হাতের পাতায় উঠে আসছে এমন ফুল্ললিত। ফুলুর মুখেও সুখের ঝিকিরমিকির। মেয়ে জবা আশৈশব পঙ্গু। বাঁ পা দুবলা। অপুষ্ট, বিকৃত। কোমর বেঁকিয়ে টেনে চলে। সকাল বিকেল পোষা পাখির মত বুলি, অ বাবা কবে আলা দিবেক। অ বাবা কবে আলা দিবেক।

চুকাইয়ের নাম তালিকার শীর্ষে। মেয়ে জবার দৌলতে। তোমার মেয়ে প্রতিবন্ধী হে। প্রতিবন্ধী মানে বুঝেছ, ওই যে পা খুঁড়া বটে। তা ভগবান মেরেছে। সরকার ত মারতে পারে না। দেখলে না খুঁড়া বীরু সেলাই কল পেলেক ব্লক থেকে। তোমার নাম তাই ফাষ্টে। মেয়ের লেগে। আর ফাষ্টের লেগেই নরেশ দেবাংশী পঞ্চায়েতবাবু মেম্বার বলেছেন, মন্ত্রী আসবেন উদ্বোধন করতে। তোর নাম প্রথম। তোকে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন। একটা জামা অন্তত পরে থাকবি। আর একদম ভয় পাবি না। বলবি, আলো পেয়ে তোর খুব আনন্দ হয়েছে।

শোনা ইস্তক ভাবনা। আহ্লাদেও খোঁচা। রঙীন বেলুনটায় লম্বা স্ছঁচ ঢুকিয়ে দিল। হাওয়া ফুস্। ছোটছেলের মত ভ্যাঁ করে ফেললেই হয়। মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা সহজ কথা! রাজাটাজা চুকাই দেখেনি। রাজা উধাও। বিলকুল মন্ত্রী। রাজার উপরি। ফুলু শুনেই চোখ কপালে তুলল। কালো ক্ষয়া মুখে মাথার রুখু চুল এসেছে। বলল, ওমাগো, কি হবেক। তুমি না বলে দিলে না কেনে! অশ্বত্থতলার ছায়ায় গোবরের ঝুড়ি নামিয়ে কোমর আলগা করে পুরোন চাকাচাকা দাদটা ঘষর ঘষর করছিল সহ। চুলকানির আরামে বিকৃত মুখে বলল, ডর কিসের! মানুষই ত বটে। চুকাই কেমন করে বোঝায় সগ্‌গমত্তের মত মানুষে মানুষে কি বিষম ফারাক।

তারপর জামা! জামা কোথায় পাবে! বাউরিপাড়ার সঙ্গে জামার সম্পর্ক বিশেষ নেই। কোমরে একটুকরো থাকলেই যথেষ্ট! উদোম গা। শীতে

বৌয়ের শাড়ি জড়িয়ে নেওয়া। বড়জোর গেঞ্জি একখান। জামাকাপড় নেহাত কুটুমঘর যেতে কালে কবুষে প্রয়োজন হয়। বছর দুয়েক আগে রায়বাবুদের দান একটা পুরোন পাঞ্জাবি ছিল বটে। তা কবেই সেটা জানি। জামা ধার করতে হবে। মনে পড়ে যায় মেঘাকে গতকালই না নীল শার্ট পরে হেঁটে যেতে দেখল। দাদারও একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি আছে। কিন্তু দাদা কি দেবে।

চুকাইয়ের বয়স বছর পঁয়ত্রিশ। বয়সের তুলনায় একটু বেশি দেখায়। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য অভাব নিঃশব্দে চুরি করে। লম্বাটে গড়ন। গায়ের রঙ কালো। রোগা হলেও একটা তেজী ভাব আছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। পরিশ্রমী। খাড়া নাক। একমাথা চুল। বাপ নেই। মা আছে। দাদার পক্ষে। চুকাই ষষ্ঠ সন্তান। ওতেই চুকে বুকে গেল এমন একটা ধান্দা ছিল বোধহয়। ষষ্ঠী ঠাকরুণ তারপরও অবাঞ্ছিত কৃপা করেন আরও দুটি। এখন জীবিত তিন। বোন রয়েছে নাকুরে। দু'ভাই গাঁয়ে। ভিন্ন। ঘরের ব্যবধান সামান্য। কিন্তু মধ্যিখানে অদৃশ্য বহমান দুরন্ত নদী। বাহিরের ঘরে বিদ্যুত আসার নামে মাঝের নদী ফুঁসছে—ফুলছে।

বাগ্দী বাউরি পাড়ায় সাকুল্যে পঞ্চাশ ঘর। মাত্র আটঘর আলো পাবে। এই আটঘরের নির্বাচন নিয়ে কম ঝামেলা হয়নি। পঞ্চায়েতবাবু পার্টিমেম্বার প্রধান তুমুল বিতর্ক। গাঁয়েও ক'দিন উল্টোপাল্টা কথা, গুজব। এর হচ্ছে ওর হচ্ছে না। শেষতক্ নাম ঘোষণা। একদিকে বিয়াল্লিশ অন্য দিকে আট। মানুষ বড় ঈর্ষাকাতর।

পঞ্চায়েত প্রধান গোলক সাহা ফুটবল গ্রাউণ্ডে মিটিং করল, 'বন্ধুগণ, প্রত্যেকের ঘরেই আলো যাবে। আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।' ধৈর্যের চরম অভাব মানুষের। গোলক সাহা গলা উঁচু করে বলল, আমি জানি আমাদের বিপক্ষ দল, আমাদের শত্রু দেশের শত্রু জাতির শত্রু গণতন্ত্রের শত্রু, আপনাদের উত্তেজিত করছে। এই ইস্যু নিয়ে তারা বিভক্ত করতে চাইছে আমাদের। কিন্তু আমাদের ঐক্য অটুট থাকবে। আসুন আমরা সমবেতভাবে তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করি। আমরা এক অভিন্ন আমরা—।

চুকাই উবু হয়ে বসে শুনেছে। হাততালি দিয়েছে। শ্লোগানে গলা মিলিয়েছে। একা সে নয়—সকলেই। তাতে ফারাক ঘোচে না। স্বার্থে ঘা লাগলেই সাপের মত ফোঁসফোঁসানি। ছোবলও সঙ্গে। বিষ উদ্গীরণ। পঞ্চায়েতের কঠিন শাসন বলে নিঃশব্দ। গোলক সাহার পার্টি সুখেন দাসের

পার্টিকে কুড়ুল চোটা করে গাছের মত পেড়ে ফেলেছে। বাগ্দী বাউরিপাড়া গোলক সাহার পতাকার বাহক। স্বখেনের পতাকাবাহক শূণ্যের দিকে ছুটছে। যাবতীয় রস তো গোলক সাহারই সঞ্চারিত করা কুক্ষিগত। ব্যাঙ্ক লোন, সারলোন, বলদ লোন ইস্তক অনুদান ইত্যাদি ইত্যাদি।

চুকাই যেদিক থেকে আসবে সেদিকে ছোটার মতবাদী। সাধন বলেছে, শালা উরাও ভদ্দরলুক ইরাও। একবার ই পতাকা ধরব, একবার উ পতাকা। আমাদের নিজের পতাকা কুন্থটই লয়। চুকাই বলেছে, ই—স্বনের কথাট টেনে বললি!

কিন্তু জামা একটা কিভাবে সংগ্রহ করা যাবে? মেঘার কাছে যাবে? মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারবে? চুকাইয়ের আর কোন কাজ নেই, ভাবনা নেই। উঠোনের দক্ষিণে কুলের ছায়ায় বসে মাথা চুলকায়। বেঁটে খাট্ ঝাঁকড়া কুলগাছটা ঘন ছায়া ফেলে রেখেছে। মুরগী চরছে ছাইগাদায়। বোশেখের তাপ ওগারান, দিনের লম্বা বিকেল। আকাশ সহস্র সূর্যময় হয়েছিল। একটা একটা করে গোটাচ্ছে। বাতাস তবু লকলকে অগ্নিশিখা। গা চাটছে তপ্ত জিভে। গাছগাছালিতে আধা ঝোড়ো দাপটের শব্দ। ফুলু ঘরে নেই।

জবা পাশে এসে বাপের পিঠে হাত রাখল। আবার পাখি বুলি, অ বাবা কবে আলা দিবেক। অ বাবা কবে আলা দিবেক!

ঝাঁ করে রাগ উঠে যায়। দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে চুকাই, চুপ কর্। খালি কথা। কতবার বলব এখুনও সাতদিন বাকি আছেক।

জবা বকুনি সইতে পারে না। লাবণ্যময় বড় আয়তনের মুখখানার টানা চোখজোড়া ছলছল করে ওঠে। পাতলা ঠোঁট ফোলে। প্যাকাটি শরীর। কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম মুখখানার। বিধাতা পুরুষ যেন সম্পূর্ণ শিল্পদক্ষতা ফুটিয়ে তুলেছেন মুখে। চোখ নাক চিবুক কপাল ভ্রূরেখা দেবীপ্রতিম। বড় মায়াময়। গর্জন তেলের মত লাবণ্যের স্পষ্ট চিকণতা।

অভিমানী মেয়ে। দ্রুত ঘাড় ফেরায় চুকাই। এমনিতে মেজাজ তার বড়ই শীতল। মেয়ের উপর স্নেহও বেশি। বলে, তুকে কুছু বলবার জো নাই। সস্নেহ চোখে তাকায়। ঘুরে বসে মাথার রুখু চুলে হাত রাখে, দিবেক। যখুন ঘরে লাইন টেনেছেক তখুন আলা দিবেক।

জবার মাথা নিচু। বাবার স্নেহধারা যেন তাকে আরও অভিমানী করে।

—হাঁারে, খিদে লেগেছেক?

না।—জবা মাথা নাড়া দেয়।

—মা এসে রাঁধবেক।

জবার গায়ে সবুজ ফ্রক। অপুষ্ট শরীরে মিশে আছে। গলার কাছে ছেঁড়া। সেই পূজোয় কেনা। আর একটা দেওয়া গেল না। বার বছর বয়স হল। শরীরের ধর্ম ফুটছে। আলগা গায়ে ত রাখা যায় না।

—বাবা দিনের বিলাতেও আলো জ্বালতে পারব, বল।

—হুঁ। তেবে লাইন থাকলে। পেরাইই থাকে না।

জবার অভিমান ঘুচে গিয়েছে। হাসি হাসি মুখ। কিন্তু দিনের বেলা আলো জ্বালা। হুঁ, মেয়ে মিথ্যে বলেনি। চুকাই ভাবে, ঘরের যা অবস্থা। ঘর মানে ছুঁড়ে। মাটির দেওয়াল বটে। খড়ের ছাউনি। দরজার কপাট বলতে টিনের আগল। জানলা নেই। ঘুলঘুলি পর্যন্ত না। বর্ষার সময় ঘরের মধ্যে পাতা উনুন জ্বেলে ভাতের হাঁড়ি ফুটুতে হয়। ফলে দেওয়াল খড়ের চাল কাল্যে বর্ণে একেবারে রঞ্জিত হয়ে আছে। বছরে বছরে সে নিকষ অন্ধকারের বিশাল ধারক। দিনের বেলাতেও ঘরের দ্রব্য হাতড়াতে হয়। লম্ফ জ্বালাতে হয়। আসলে ঘর তো শীত এবং বর্ষার ক'দিন মাত্র রাতে দেহটির আশ্রয়।

—অ বাবা ইঁদুর দুটোর কি হবেক। উরা কমকিন যাবেক বল।

জবার ধারণা একজোড়া ইঁদুর আছে ঘরে। মা বাপ। ওদের ছেলেটিও নেই। ফুলু শোনে আর হাসে। বলে বিটির কথা শুন। উ চিনে রেখেছেক। ছেলেপিলে নাই, তাও জানে। হ্যাঁ গ আমার ত মনে হয় ঢেক ক'টা আছেক। সিদিন দুটো রুটি খেয়ে দিলেক। আলু ক'টা সরিণ নিয়ে গেল। দু'টিতে এত ঝামেলা করতে পারে।

চুকাই বলল, উদের ভালই হবেক। আলোতে দেখতে পাবেক, কুথা খাওয়ার জানর রইছেক।

জবার ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

ফুলি এসে পড়ল, বাপ বিটিতে এত হাসি হবেক কিসের লেগে। আখা জ্বেলে ভাতের হাঁড়িট ত চাপাতে পারতে। বিলা যেছেক।

উদ্বোধনের দিন গাঁয়ে যেন উৎসব। চরম ব্যস্ত পঞ্চায়েত বাবুগণ। গাঁয়ের মানুষও উৎসাহী। মন্ত্রী দর্শন ভাগ্য কম কথা নয়। তিনি একা নন, আসনে সাঙ্গপাঙ্গ। ডি. এম. এ ডি এম থেকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। বাউরিপাড়ায় পাশের ডাঙায় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। আটটা তক্তপোষ

ঘেঁষাঘেঁষি। তার উপব টেবিল চেয়ার। মাথায় ত্রিপল। ডাঙা জমিটা জলাভাবে বন্ধ্যা। গোটাকয়েক শুকনো খেজুরের গাছ আছে। ঝাট পড়ল ডাঙায়। মাইক বেজে উঠল বিকেল থেকেই।

ফটিক একটা শার্ট দিয়েছে চুকাইকে। চমৎকার ফিট করেছে তার গায়ে। ধুতি দিয়েছে নব। তবে কি না দোকানী ওই একবারই বলেছিল, আর বলছেচ না বলুক। চুকাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সন্ধ্যে একটু গড়ানর পর মাটির সড়কে দেখা গেল মন্ত্রীর গাড়ির মিছিল আসছে। অন্ধকার চিরে পর পর তীব্র সার্চলাইটের আলো। এক দুই তিন চার। বারখানা গাড়ি। গাড়ির মিছিল দৃশ্য বটে একখানা। দাসপাড়া একা নয়, মাঠ থৈ থৈ করছে মানুষে। ওদিকে বুঙা, হরিশপুর, পাঁচটা সাঁওতালপাড়া ভেঙে এসেছে নানান বয়সের মানুষ। গাড়ি দেখামাত্র উত্তেজনা দেখা দিল মানুষের। মাইকে এমনি ঘোষণা শোনা গেল, আপনারা বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এসে পড়েছেন। এক্ষুনি সভার কাজ সুরু হবে। মাথার উপর তারা ফুটে আছে। মঞ্চে টিউব আলো জ্বলছে। মাঠের দিকে ছড়িয়েছে কিছুটা আলো।

মঞ্চের উপর সাজান পরপর আটখানা চেয়ারই অধিকার হয়ে গেল। ধুতি পাঞ্জাবি, প্যান্ট শার্ট। ভারী মুখে স্বচ্ছলতার লাবণ্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সব। মেলে না দাসপুর কি আশপাশের সঙ্গে। কোন জন মন্ত্রী। কে জানে! সুরু হল, একের এক বক্তৃতা। শব্দের ফুলঝুরি। কেন্দ্র, গণতন্ত্র, সংগ্রাম, দেশ উন্নয়ন, দারিদ্র দুরীকরণ, সাম্য, সকলের জন্য গৃহ এবং অন্ন, ভোট, সহযোগিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। চুকাই সব শুনল। বোঝার দরকার নেই। চুকাই জানে, ফটিক, তারক, পদ, মেঘা, কেউ বোঝেনি। বাবুরা বলবেন, তারা শুনবে। সে আলো কখন জলবে, তারই প্রতীক্ষায়।

চুকাই উঠোনে এসে দাঁড়াতেই জবা চেঁচিয়ে উঠল, ও বাবা দেখ। দেখ আলো জ্বলেছেক। কি আলো গ। দেখ। দেখ।

ফুলু উঠোনে। ওদিকে দাদার ছেলে দুটো হাঁ করে দেখছে। জবা বসে আছে ঘরের মধ্যে। আলোর কথা বলতে হয় না। টিনের আগল পেরিয়ে উঠোনে পড়ে আছে। দ্রুতপায়ে চুকাই ঘরে ঢুকল। ঝকঝক করছে সারা ঘরখানা। মুহূর্তের চমক। তারপরই চুকাই টের পেল কালো দেওয়ালটা যেন দগদগে ঘায়ের মত বিদ্রূপ করছে তাকে। খড়োচালে ঝুল। মাকড়সার জালের এখানে ওখানে কালচে আচ্ছাদন। মেঝেটা উঁচু নিচু। কুলুঙ্গিতে

লম্ফ। ঘরের কোণে ডাঁই করা ছেঁড়া কাঁথা। ত্যাবড়ান কালিপড়া এলুমনিয়ামের হাঁড়ি। থালা বাটি। মাটির হাঁড়াহাঁড়ি। অন্ধকার অগোছাল বিকৃত এসব গৃহসামগ্রীর কুৎসিত রূপ ধরা পড়ে না। আলো টের পাইয়ে দিচ্ছে। আলো যেন হা হা করে হাসছে। চোখ টেরিয়ে বলছে, দেখ হে তুমার ঘর। ঘরের রূপ দেখ। সামগ্রীর রূপ দেখ।

দেখে চুকাইয়ের আলোর হর্ষ লোপাট। বুকের মধ্যে কষ্টের মোচড়ানি দেয়া দু'বেলার অন্নসংস্থানের উপার্জনের অঙ্গে টান। সামগ্রী জুটবে কোথায়! রূপ খুলবে কি! কিন্তু এত কুৎসিত তার ঘরখানা। ছেঁড়া কাঁথা, হাঁড়িকুড়ি, ঘরের মধ্যে এত বিচ্ছিরি হয়ে চালো দাঁত মেলে পড়ে থাকে! জবাকে দেখে। মেয়েটার মুখে হাসি। পা ছড়িয়ে বসে আছে। ঘামছে। কপালে নাকের উপর চিবুকে চকচক করছে ঘামের বিন্দুরা।

চুকাই বলল, বাইরে আয়।

জবা বাপের মুখ দেখে। কি যেন ভাবে। তারপর ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে বলে—না। ঘরে থাকব।

খাওয়া দাওয়ার পরও জবার জেদ, আলো জ্বলবেক। আমি ঘরে শুব।

বৈশাখী দিন ঝড় জল আনেনি। দিনটা তাপের শীর্ষে দোল। খেয়ে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু আগুনটা ফেলে গিয়েছে মাটির পৃথিবীতে। বাতাস সে আগুনের শক্তি ক্ষয় করে যাচ্ছে। একটু রাত হলে হয়ত ঠাণ্ডা পরিমণ্ডল তৈরী হবে। ঘরে শুলে তো সেদ্ধ হতে হবে।

ফুলু বলল,—ন'। ঘরে শুতে হবেক না। মরে যাবি সিদ্ধ হয়ে। আলো জ্বললে ঘুম হবে নাই।

টিনের আগলটা টেনে উঠোনে চট বিছিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা হল। বিড়ি গোটা কয় শেষ হল উত্তেজনায়। একসময় বলল চুকাই, ঘুমুলি?

উহুঁ।—ফুলি কাৎ হল তার দিকে মুখ করে।

—আলা আসাতে একদম ভাল লাগছেক নাই!

—ঠিক বলেছ! ঘরটা কি দেখাছেক গো!

—তুরও ভাল লাগছেক নাই? তুরও?

—হুঁ। কালিঝুলি। একট জিনিষ নাই। ছিঁড়া কাঁথা কানা ভাঙা হাঁড়ি।

—কি করা যাবেক! খাটালি নাই। লুকের ঘরে মুনিষ খাটা। ভিটেটুকুন ছাড়া মাটি নাই। ভাগ্যিস্ তু গেরস্তঘরে কাজ করছিস। দু'বিলা হাঁড়িই চাপে না। তা জিনিষ। কিন্তুক এমুন কে জানত! কুনুদিন ত দেখি নাই।

—আলাতে আমারও ঘরের লেগে খুবি কষ্ট হচ্ছে গো!

—এমন জানলে কুন শালা লিত।

—দিয়ালগলা আমি নিকাপুছা করব। মেঝেতে মাটি দুব। ঝুল ঝাড়ব।

ছিঁড়া কাঁথা পালটাবি কি করে? নতুন হাঁড়ি কিনার পয়সা কুথা? তা-বাদে এমন শুক্তি ঘর। শালা কুন্নদিন জানতম নাই এমন শুক্তি—। আলা—। চুকাই কথা শেষ করে না। কষ্ট যেন বাক্য শ্রোতের সামনে পাথরের বাঁধ দিয়ে দেয়।

অস্বস্তিটা থেকেই যায় চুকাইয়ের। কাজ জোটে না এর মধ্যে। ঘরে পড়ে থাকা। কিংবা গোবিন্দ ফটিকদের কাছে বসা। সেই ঘর। জবা দিনেও আলো রাখে। সে আলোর অসুখের কথাটা কাউকে বলে না।—ফুলুকে নিয়ে রাত্রিবেলায় ঘরের মধ্যে অন্ধকারে সে যৌনসঙ্গ করে। আলো ফুলুর জন্য জ্বালানতে সে অনুভব করে এ ঘরের সঙ্গে মানান নই। রূপহীনা যৌবন-হীনা। শীতল হয়ে পড়ে। ফুলুর আলোটা নেবায়। অন্ধকার আবার তাকে পুরোন মানুষটি করে দেয়। ফুলু বলে, আলা তুমি একদম সহ্যি করতে পারছ না।

কিন্তু তিনদিনের দিন আলোটা আর জ্বলে না। সব ঘরেই আলো জ্বলছে। জবা চেঁচাতে থাকে, অ বাবা আমাদের কেনে জ্বলছেক নাই। অ বাবা।

অন্ধকার ঘর। যেন আবার স্বস্তি দেয়। তবে সকালেই জবার জেদে নরেশ মণ্ডলকে ডেকে আনতে হয়। ইলেট্রিক কাজ করে। দেখে শুনে বলে, পাঁচটাকা লাগবে। বাল্ব ফিউজ। দেখে দেওয়ার দরুণ আমার মজুরি দু' টাকা। মোট সাত।

জবার জেদেই বাল্ব কিনতে হল। সাত টাকা ধার দিল গোপাল মুদী। সুদবন্ধকী কারবার করে। টাকায় দশপয়সা করে মাসিক সুদ। মূল না দাও, সুদ দাও।

সুদের যন্ত্রণা। মাস মাস পাঁচ টাকা দিতে হবে আলোর জন্য বিদ্যুত দফতরকে। তারপর আবার বাল্ব গেলে সাত টাকা। চুকাই ভাবতেই ফোঁড় পায় কাঁটার।

ফুলু বলে,—তুমার যি কি হল! কাজ কম্ম পেছ নাই। ঘরে বসে থাকছ।

—আলা ত লয়। একট বাঁশ। ভেবেছিস—?

—হুঁ। মেয়েটর কিন্তু সুখ হন্‌ছে।

—তুর। তুর সুখ হন্‌ছে।

—মাস মাস টাকা লাগবেক। রুজগার নাই। হ্যাঁ গ আলাকে দিলেক, পঞ্চায়েত।

—সরকার। সরকার দিন্‌ছেক। শালা।

—তা আলা না দিয়ে কাজ দিতে ত পারত।

চুকাই সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, জানিস আমার ত মনে হয়, আলা লয়। একট সুচ ফুটিন দিনছেক। দেবাংশীবাবু বললেক, কি হে চুকাই, কেমন আলো জ্বালছ। অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়েছি। তা তুই বল ফুলু আলা ভাল না আঁধার ভাল। তুই বল—।

—আঁধারই ভাল গো। ঘর দেখতে হয় না। মুখ দেখতে হয় না।

—ঠিক। ঠিক। এতকাল জানতম আলাই ভাল।

চুকাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ফুলু বলে, সুদের পয়সা লাগবেক। তা বাদে আলো জ্বালার লেগে পাঁচ টাকা মাস মাস। তা বাদে আবার গেলে আবার ধার, আবার সুদ—।

—জবার কিন্তুক খুবি সুখ। মেয়েটর কত আনন্দ গো।

—হুঁ। লাভ ওটুকুন। উর ত সুখ হচ্ছেক।

—যদি পা'ট উর ঠিক হত। শরীলটু একড়ুং ভাল হত।

কন্যার সুখের অনুভূতিটুকু তাদের সব ভাবনা মুছে দেয়।

নীরব হয়ে যায় পুরুষরমণী। অযুত দীনতার উৎপাদক জীবনধারায় আলো নামে যন্ত্রণার সংযোজন অজস্র সূচিকাবিদ্ধতার সঙ্গে বাড়তি আর একটা হয়ে দিবি মিশে যাবে। মুনিষ-জীবনের সহ্যশক্তি যে অবিশ্বাস্য।

জর্জ ম্যাকবেথ

## ছুরি-ঘর

সেখানে ছিলাম আমি। তুমি দেখলে বুঝতে
সমস্ত হাসপাতাল কেন নির্দয় মনে হয়
উদ্বিগ্ন শ্লেটের মত তারা তাকিয়ে ছিল আমার দিকে

এক ধর্মীয় সুযোগের চুলবাঁধুনি জাল তাদের মাথায়
ঘাতকের ইচ্ছা আর মৃত্যুর পরোয়ানা
তাদের বারান্দা দিয়ে ক্লোরফিলের মত বয়ে যায় রক্ত

জানি, কখনো তা সুস্থ করে। দীপনযন্ত্রকে
কখনো অনুজ্জ্বল করে শঙ্খনিনাদে
আর ভেঙে ফেলে যকৃতের ঘড়ি। আশারা জন্ম নেয় অপরাধ থেকে

হাস্যকর চর্বিময় এই ভুল জমিতে যখন
তোমার মাতৃসমা কেউ নষ্ট হয়, বুকের ভেতরে
এক জঙ্গল। খড়ি-মাখা অজগর পাক খায়।

সিলভিয়া কাণ্টারিস

## দূর ভবিষ্যের জন্য

প্রিয় উত্তরসূরী
যেহেতু তুমি এই ধারকপাত্র খুলতে ভয় পেয়েছ
নিশ্চিত বাস করছো কোন দীর্ঘ দূরত্বে
কোন অকল্পনীয় ভবিষ্যের

আর আমি পৃথিবীর এমন একটা সময় থেকে লিখছি
তোমার বিশ্ব যখন শুরু হয়নি
আমরা একে আধুনিক মানুষের যুগ বলি
( ক্রোম্যাগননের একটু পরের যুগ )
এর ভেতর কিছু নিদর্শন পাবে
আমাদের অস্তিত্বের ঃ
হলুদ সিল্কের একটি থান
স্বাভাবিক প্রত্যঙ্গ আর গঠন-সমেত
অজ্ঞাত পরিচয় একটি শিশুর ভাস্কর্য
একটি বেহালা ;
কিছু লাইলাক বীজ ;
সোলমনের গান।
এই নির্বাচন বিজ্ঞানসম্মত নয় কিছুটা খাপছাড়া,
তলিয়ে যাওয়া জাহাজের ভেসে ওঠা ভাঙা টুকরো আর
ফেনিল বুজকুড়ি যেন আমাদের সভ্যতার
আশা করি ওগুলো তোমার ভাল লাগবে
এমন অনেক কিছুই ছিল যা আমরা পছন্দ করিনি
আর সেসব ছাড়াও আমরা টিঁকে যেতে পারতাম।
ঈশ্বরদের খুঁজতে যেওনা
আমার আশা, এই পৃথিবী আবার নির্মলতার দিকে
নুনজীর্ণ মাটিতে বুনে দাও লাইলাক বীজ
আর যদি তারা জন্মায় এবং পুষ্পিত হয় আর যদি তুমি পারো
বর্ষাস্নাত তার গন্ধ নিও।

অ্যাডাম ফিলিপ্‌স

**স্থায়ী বাসগৃহ**

হালফিল কার্পেট-মোড়া এই মেঝে
টেবিলে জেবড়ে আছে তেলা মানচিত্র
আমাদের সঘন পারিপাট্য

যে এক পরিচিত ভাষা, হঠাৎ যার
নাম হয়েছে গৃহ, দেয়াল জুড়ে
মোমের নম্রতা, আমাদের শ্বাস

আছড়ে পড়ে জানালায়, অবস্থান নিতে
ঘষ্‌টে যায় ঘরের লম্বতলে ; আমাদের যত্ন রাখবে না
কোন কিছু, শুধু আমাদেরই বাস্তহারা করে।

অ্যালিস কাভোনাস

**১১৩৩ পার্ক অ্যাভিন্যু**

প্রতিটি দরোজা ছিল বন্ধ।
আলোর বিরুদ্ধে অন্ধরা ছিল শক্ত করে বাঁধা,
সন্তান ছাড়া সেখানের সমস্ত শিশুকে
তারা পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল

মা ছিলেন শায়িতা
বাড়ির ভেতর দিকের একটা ঘরে
এই জেনে ওতে আর কিছু হবে না,
একটানা ধূমপানরতা,
সাজগোজের পত্রিকায় চোখ বোলাতে বোলাতে
শুনেছিলেন
বাতানুকূল যন্ত্রের গুঞ্জন

জ্যেষ্ঠা কন্যার দায়িত্ব পড়েছিল
তা ঘুরিয়ে দিতে
তার টেনিস শুভ্রতায় কিছুটা ঘেমে,
সে খুলে দেয় সমস্ত অন্ধদের
তার মা-র মৃত্যুর দিনে

পিটার ডিডস্‌ব্যুরি

## কলকাতায়

এই হল কলকাতা
যেখানে রাত্রি সর্বদাই নীল
ভোর চলে যায় বন্দুকের গুলির মতো
মনে করো আছো কোন উঁচু বাড়ির শাদা এক কক্ষে
যেখানে চাঁদের আলো ছিটিয়ে পড়ে তোমার পলকা মুখে
এবং তোমার প্রেমিক, নিশ্চয় যে কলকাতাবাসী।
জেনো যে কলকাতায়
রাত্রির সমস্ত মাত্রা ও দশা কলকাতার
আর উঁচু শাদা বাক্সগুলো ঘিরে সকাল
কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে, ফাঁস যেন
পাখির গানের জন্য যেখানে কলকাতাবাসী অপেক্ষায় থাকে।
কলকাতায় অন্ধকার মালখানা ও নিচুতলার খুপরিতে
রোগা ক্যালকাটা পুলিশেরা
কবিদের মতো ভালোভালো মুখরোচক গল্প শোনায়
বিনিময়ে কলকাতার মেঝে থেকে তারা কলকাত্তাই পদ্য ফিরে পায়
যখন বৃষ্টি পড়ে কলকাতায়, তারা ছাতা খোলে
কিন্তু তা কেবলমাত্র ছাতার নিচে প্রেম করতে পাবার জন্য
অথবা ভেবে নিতে যে অন্যান্য কলকাতাবাসী তাই করছে।*

---

জর্জ ম্যাকবেথ

বহু আলোচিত কবি জর্জ ম্যাকবেথ বি-বি-সি-তে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন। তাঁর কবিতায় দেশ ও দিনাতিপাতের ছাপ পরিস্ফুট। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তার কাব্যগ্রন্থ 'দি ক্লেভার গার্ডেন'। এখানে জর্জ একই শিরোনামে অনেকগুলি করে কবিতা লিখেছেন। অনুদিত কবিতাটির নাম 'দি স্ক্যালপেল হোস'-১২, অর্থাৎ এই পর্যায়ের দ্বাদশতম কবিতা।

সিল্‌ভিয়া কাণ্টারিস

সিলভিয়া পেশায় অধ্যাপিকা। ফরাসী জানেন, স্যুররিয়ালিজম বিষয়ে পি, এইচ-ডি গবেষণাপত্র লিখেছেন। তাঁর নির্বাচিত কবিতা 'স্টকিং আপ'

বেরিয়েছে ১৯৮১-তে। তাঁর কবিতায় আছে সেই অধিবাস্তবতার ছোঁয়া— হয়ত-বা নস্টালজিয়ার মেদুরতায় যা পাঠককে বাঁধতে চায়, নরম স্বরে।

## অ্যাডাম ফিলিপ্‌স

তরুণ কবি ফিলিপ্‌স অক্সফোর্ডের সেণ্ট জন কলেজ থেকে ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। জন্ম, কারডিফ। বিমূর্ততা, নাগরিক সুখদুঃখের ছবি — তাঁর কবিতার সম্পদ বলা যায়।

## অ্যালিস কাভোনাস

শ্রীমতী কাভোনাস নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে আসেন ১৯৭৯ সালে। বহু ইংরাজি পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে; স্থান পেয়েছেন একাধিক সংকলনে। অ্যালিসের বাচনভঙ্গির তির্যকতা লক্ষণীয়।

## পিটার ডিডস্‌ব্যুরি

জন্ম চারের দশকে। জীবন ও জীবিকা সমস্তটাই 'হাল'-এ। ডগলাস ডান সম্পাদিত 'হাল কবিতা সংগ্রহে' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর কবিতা। গ্রন্থের মধ্যে বহু আলোচিত 'দি বুচার্স অব হাল'। * এখানে অনূদিত কবিতাটির প্রকৃত নাম 'ইন বেলজিয়াম'। সাযুজ্যবোধে 'বেলজিয়াম'-এর বদলে এখানে 'কলকাতা' ব্যবহার করা হয়েছে।

—অনুবাদ অনীক রুদ্র

# ছিন্ন অলৌকিক

প্রণব দত্ত

'বাবু, এ কুকুর অছি কি ব্যাঘ্র অছি?'

দর্শকদের একজনের এ কথা কটা গোটা গোটা করে উচ্চারন করল আদিত্য। আর উইণ্ডো মিররে নিজের হাসিমুখ প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনে একটা পরিতৃপ্তি বোধ করল।

আয়নার কাঁচে নিখুত ছাটা গোঁফ, ব্যাক ব্রাশ করা চুল আর হলুদ জামার উপর টাইয়ের একাংশ।

স্পিডোমিটারের কাঁটাটা ঘুরে যাচ্ছে ষাট, সত্তর আবার ষাট। সকাল নটায় গাড়ী ছেড়ে এখন ঘড়িতে একটা। কালো পিচের রাস্তার সঙ্গে ধানক্ষেত, জড়াজড়ি করা বাড়িঘর সরে সরে যাচ্ছে। জামার ভেতরে কুলকুল ঘামের অনুভব পাচ্ছে আদিত্য। গরমে ফাটা মাটির ভাপ উঠছে।

শংকর এবারও ফাষ্ট প্রাইজটা এনেছে। 'ওবিডিয়েণ্ট লাইক এ ম্যান। ব্যাদার মোর ছ্যান ছ্যাট।' বলরুমের চারধারে দর্শকদের মুহুর্মুহু হাততালি। উপরের ঝাড়বাতি থেকে আলো ঠিকরে পড়া মঞ্চ, আদিত্য, শংকরের বংশ তালিকার বর্ণনা দেয়। বক্তৃতার ঢঙে।

গাড়িটা একটা বাম্প করে জার্ক খেল। আর আদিত্যর মাথাটা দেয়ালে ঠুকে গেল। ছবিগুলো ছত্রখান হয়ে আবার গুটিয়ে আসছে।

জানলার কাঁচে আদিত্য দেখল শংকর জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে শুখা বাজা মাঠঘাটের দিকে তাকিয়ে ঘ্যা ঘ্যা করে হাঁফাচ্ছে। 'এ্যাডাপটেবিলিটি ইজ এর টাফ জব'। আমেরিকা থেকে প্লেনের এয়াকণ্ডিসানড্ কেজে যখন কলকাতায় এল তখন ও এই এতোটুকুন। এসির অভাবে আর দুদিন পর বাথরুমের ঠাণ্ডায় গড়াগড়ি খাবে। একহাতে ষ্টিয়ারিং ধরে অন্যহাতে শংকরকে প্যাট করে আদিত্য। তারপর গাড়ি ছোটায়। স্পিডোমিটারের দিকে লক্ষই করে না।

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই শিউবচন ছুটে এসে দরজা খুলে ধরল। শংকর রেলিং টপকে সামনের সিটে এসে আদিত্যর পিছু পিছু নেমে এল।
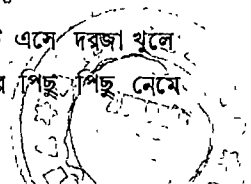
'ক্যারিয়ারের মাল নামা। ভেতরের বাস্কেটে ফল আর টুকিটাকি আছে। তারপর গ্যারেজ কর।'

শিউবচন আদিত্যর মুখ দেখেই বুঝতে পারে শংকর এবারও কিস্তি-মাত করে এসেছে।

শংকর আদিত্যর পিছনে হাঁটে। থ্যাবড়ানো মুখে সামনে দিয়ে চোয়ালটা একটু এগিয়ে দাঁতের পাটিজোড়া উঁচোনা, তার ফাঁকে নাক। নাকের ছিদ্রটা চোখের নীচ দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলেই নাক ডাকার শব্দ হয়। এটার ফলে লাংসে ফাংগাস জমে। ব্রিদিং ট্রাবল করে। এ কলকাতার ওয়েদারে এ্যাডজাস্ট করা ইজ এ্য হার্ড থিং। গরমে যেন লু বইছে। স্টেটস-এ বারো বছর বাঁচলে এখানে সাত-আটেই দফা রফা। একটা সামার কেটেছে। আদিত্যর এক্সপেরিমেণ্ট।

বড় রাস্তার একটা গলি ভেতরে পেঁচানো তিনতলা বাড়ি। মাঝখানে স্বল্প পরিসর উঠোন। হাওয়াগুলো যেন মাঝখানে আটকে থাকে।

গাড়ির হর্ণের শব্দেই স্বাতী বুঝতে পারল আদিত্য ফিরেছে। এ দীর্ঘ ছ-মাস এ বাড়িতে বসবাসের ফলে স্বাতী বিভিন্ন শব্দের দ্যোতনা, তারতম্য বেশ শিখে গেছে। এই যেমন দরজা নক করার ঢং শুনে আদিত্যর মেজাজটা যেন চোখের সামনেই দেখতে পেল স্বাতী। লোডশেডিং। কলিং বেল বাজবে না।

দরজা খুলতেই স্বাতী-আদিত্যর চোখাচুখি হল দু-মুহূর্ত। হাসল দু-জনাই। শংকর তরতর করে দু-পা এগিয়ে আবার নেমে এল।

'এনাদার ভিক্‌টরি ফর শংকর, এই নিয়ে চারবারে, চারবার। আনবিট্‌ন শোয়ার ইন ক্যালকাটা, অলমোষ্ট ইন ইণ্ডিয়া। (কারণ সাউথে এখনও ডগ শো হয় নি। নেক্ট এপ্রিলে কেরলে আছে)।'

আদিত্য শংকরের মুখটা দুহাতে তুলল।

'এ্যাঃ মাগো, এ মুখে কি করে চুমো দেয় গো।' এরকম একটা কথা স্বাতীর মনে বুজকুড়ি কেটে শরীর রি রি ক'রে উঠল।

বলল, 'কাল থেকে কেবল ঘর বার করছি। একদিন দেরী করলে কেন। জান না চিন্তা হয় কেমন।'

আদিত্য হো হো করে হাসল। বালবের আলোয় অলোকিত সিঁড়িঘরে শব্দটা গমগম করে বাজল। উপরের খিলানে পায়রার বক্‌বকম্‌।

স্বাতী বলল, 'কেমন শুকনো লাগছে। খুব ধকল গেছে, না? নাও নাও হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা বসাচ্ছি।'

আদিত্য স্বাতীর চলে যাওয়াটা দেখল। উঠতি ঘরের ছেলে আর পড়তি ঘরের মেয়ে। আইডিয়াল ম্যাচিং। কে বলেছিল কথাটা—স্বপন দা। এখন স্টেটস্‌এ সেটেলড্‌। নিজেকে কি উঠতি ঘরের ছেলে বলবে ও। কলকাতায় তিনতলা বাড়ী। একদিন অ্যাবসেন্ট থাকলে চেম্বারে মক্কেলদের গিজগিজ ভীড়। উঁকি মেরে দেখল আদিত্য, নিচের চেম্বারে সুনীল লাইট জ্বালিয়েছে। তিনদিন হাইকোর্ট অ্যাটেণ্ড। কাল থেকে আবার ব্রীফ।

রান্নাঘরে স্বাতী টুকটাক কাজ সারছে। চাকর, রঁাধুনী সব আছে যদিও। স্বাতী নিজের হাতে আদিত্যর দেখাশোনা করবে। ছ-মাস বিয়ের পর লেকগার্ডেনস্‌-এ ওদের বাড়িতে একবারই গিয়েছে আদিত্য। দু কামরার ভাড়া বাড়িতে স্বাতীর বাবার পেন্সনে সংসার। নিজেকে মহৎ মনে হলেও ও বাড়িতে হাঁফ ধরে যায়। ওবিডিয়েন্ট লোক দারুন পছন্দ আদিত্যর। যত্ন-আত্তির ত্রুটি হয় না ও বাড়িতে। রাস্তায় গাড়ী থামতেই শ্বশুর, শাশুড়ি, শালীদের ছোটাছুটি। গাড়ীর ধুলোর আস্তরনে আঙুল দিয়ে নাম লিখছে বাচ্চারা। এগলিতে কচিৎ-কখনও গাড়ি ঢোকে। ছোট গলি। পচা ড্রেনের গায়ে ঝোঁকানো রাঙচিতা, লঙ্কাজবা গাছ।

ডিভানে হেলান দিয়ে আয়েস করে সিগারেট ধরালো আদিত্য। টানা পাঁচশো কিলোমিটার ড্রাইভ করেছে নিজে।

এঘরে সাবেক আমলের ফার্ণিচারে ঠাসা। উপরে মা, বাবা, দাদুর অয়েলপেইন্টিং। মা এখন বড়দার কাছে স্টেটসে। দেয়ালে একটা টিকটিকি ডাকল।

সিগারেটের ধোঁয়া সারা ঘরে ভেঙে ভেঙে ছড়াচ্ছে। শংকর বিশাল গর্দান এলিয়ে ওর পায়ের কাছে। থ্যাবড়ানো মুখটা মাটিতে শুইয়ে হাঁফাচ্ছে। বড় ধকল গেছে বেচারার। আদিত্য আনমনে হাত বোলায়। আর তখনই নজরে পড়ে টেবিলের ওপর বইটা উল্টে রাখা। বার্ণাড শ-এর। 'ম্যান এণ্ড সুপারম্যান', আদিত্য বইটা হাতে নিয়ে দেখে চার পৃষ্ঠায় ভাঁজ দিয়ে চিহ্ন করা।

আদিত্য বসেই গলা চড়ায়, 'স্বাতী কেমন লাগছে বইটা।'

রান্নাঘর থেকে শব্দ এল, 'আসছি।'

আদিত্যই, স্বাতীকে পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। ক্লাসিকাল সাহিত্যের রিডিং হ্যাবিট গ্রো করলে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে। স্বাতীর বাড়িতে পড়ার চল একটা ছিল না। সবাই প্রায় গানের ভক্ত। সারা ঘর জোড়া

তানপুরা, তবলা, হারমোনিয়াম। স্বাতীর বাবা একজন বড় ওস্তাদের শিষ্য ছিলেন।

স্বাতী টেবিলে খাবার রেখে ডিভানে আদিত্যর পাশে বসল।

'কেমন ঘুরলে বল।'

আদিত্য স্বাতীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল। ওর শরীর দিয়ে আসা একটা হাল্কা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছিল। কপালে তেলতেলে ঘামের সাথে ঝুরো চুল লেগে আছে। হলুদ রঙের শাড়িতে স্বাতীকে সুন্দরীই বলা চলে। এ বাড়িতে এসেই শরীরটা খোলতাই হয়েছে। আদিত্য মাঝে মধ্যেই বলে থাকে। বেশ গর্ব পায়।

আদিত্য বইটা হাতে নাড়াচাড়া করে 'কেমন লাগলো বইটা?'

'ধুর, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না। অন্য কোন হালকা বই এনে দিও। সিনেমার, টিনেমার।'

আদিত্য বলল, 'সেটাতো দেখেই বুঝেছি। চার পাতায় ভাঁজ। তোমাদের কোন ব্যাপারে সিরিয়াসনেস নেই। বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক সব। আর কি সৃষ্টি।'

স্বাতী শব্দ করে হেসে আদিত্যর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। 'তুমি কাছে থাকলেই আমার সব। নাও চাটা যে জুড়িয়ে গেল।' আদিত্যর বুকে স্বাতীর মাথা। হাল্কা সেন্টের গন্ধভরা বাতাস। শংকর আলতোভাবে ডাকল 'ভ্রাউ।'

আদিত্য একদৃষ্টে শংকরকে দেখে। দেহে হালকা চাপড় মারে। তারপর বলে, 'বুলডগ নামের অর্থ বোঝ!'

স্বাতী চাইছিল আদিত্য ওঁকে আদর করুক। পনেরদিন পর দেখা। সকাল থেকেই সেজেছে ও। আর এখন চারধারে যখন নিস্তব্ধ রাত। ঘরময় হালকা ধূপের ঘ্রাণ। এত কাছাকাছি দুজন। অথচ কোথায় সুর কাটছিল দ্রুত। স্বাতী দেখল ওকে বুকে নিয়েই হাত নামিয়ে আদিত্য শংকরের লোমের ফাঁকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আর বীভৎস জন্তুটা থ্যাবড়ানো, মুখ, হলুদ চোখে আদর খাচ্ছে।

আদিত্য বলল, 'ইংলণ্ডে রাজারা তেজী ষাঁড়ের সাথে এদের লড়াই লাগাতো! আর শংকরের জাতভায়ের এত তেজ, ষণ্ড ষাঁড় পর্যন্ত ল্যাজ গুটিয়ে পালাত। তাই থেকে বুলডগ।' আদিত্য উঠল। দুবার আয়নার সামনে চুলে চিরুণী বোলাল অহেতুক। বলল, 'বেচারার খুব কষ্ট গো।

গ্রমকাল আসছে। এবার ভাবছি একটা ঘরকে অন্ততঃ এসি করাবো।

কত কথা জমা ছিল বুকজোড়া। ভেবেছিল আবেগে আপ্লুত হবে। খাটে রাতে শুয়ে স্বাতী দেখল আদিত্য শংকরকে নিয়ে বহু রাত অব্দি আদিখ্যেতা করছে।

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। নানান টুকরো শব্দে ভরে আছে বাতাস। নাইট ল্যাম্পের নিলাভ আলোয় নাইলনের মশারীটা সমুদ্রের ঢেউএর মত দুলছে। ধু-ধু বালিয়াড়িতে হাওয়ার নানান ভাঁজ। কারুকাজ। ওপাশে প্রসারিত দিগন্ত। নরম জ্যোৎস্না ঠিকরে যায়, ছড়িয়ে যায়। আর উন্মুক্ত মরুভূমির মধ্যে দিয়ে নিসঙ্গ ক্যারাভানের পিছু পিছু ঘুমের অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল স্বাতী।

সকালে পার্কে শংকরকে কিছুটা ছোটাতে যায় আদিত্য। দেহে মেদ জমছে। এই ব্রিডের কুকুরদের গায়ে মেদ জমা খারাপ। এসময়টা স্বাতী ব্যালকনিতে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখে কাগজের হকার, দুধওয়ালা, কারখানার নানান লোকজনের যাওয়া আসা। এখান থেকে বাড়ির ফাঁক গলে একচিলতে আকাশ দেখা যায়। আদিত্য এসে দুঘণ্টা চেমবারে বসবে। তারপর কোর্টে যাবে। সমস্ত দিন নিঃসঙ্গ দ্বীপ। অখণ্ড অবসর। শংকর সারা ঘর দাপিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

স্বাতীর চোখের সামনে দিয়ে নানান ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি সরে যায়। বাবার গলা সাধা, রান্নাঘরে মায়ের টুকটাক কাজ সারা, দেশের বাড়ির গোয়ালে কাঁচা গোবরের গন্ধ, উঠোনময় ঝরা সজনে পাতা। লম্বা নিস্তব্ধ করিডোর। কড়ি বরগার গায়ে মাকড়সার জাল অলৌকিকভাবে দোলে হাওয়ায়।

গোটা ঘরে স্বাতীর দিন-রাত্রি, মাস। সূর্য নিজস্ব অয়নে অবিরত পাক খায়। ভোর, সকাল, দিন, রাত্রি। সারাদিন আদিত্য কুকুর সম্বন্ধে নানান বই পড়ে চলে। ব্রিডিং বংশ তালিকা, নানান খুঁটিনাটি তথ্য।

বাপের বাড়ির কথা বললে আদিত্য এড়িয়ে যায়। বলে, 'তুমি যাও না। প্লিজ, ডোণ্ট মাইণ্ড; দেখছ তো একদিন না থাকলে মক্কেলরা ছেঁকে ধরে। তার উপর সারা ঘরে শংকর একা। একা রাখা ঠিক নয়। এ্যাডাপটেবিলিটি ইজ দ্য মেইন থিং। হিংস্র হয়ে যেতে পারে। আর বুলডগ হিংস্র হলে ডেনজারাস। মেরে ফেলতে হয়। ওদের লকড্ জ। একবার কামড়ালে কিছু করার নেই। ও নিজেও ছাড়াতে পারবে না। ভেরি মাচ ডেঞ্জারাস। তাই

যথাসম্ভব কুল বিহেভ করা দরকার।' স্বাতীর গা জ্বালা করে। শংকরও বোঝে, না হলে ওভাবে তাকাবে কেন। একদিন ইচ্ছে করেই সময়মত খেতে দেয়নি স্বাতী; এমনভাবে তাকিয়েছিল শংকর যে স্বাতীর একথা মনে এলে এখনও শরীর হিম হয়ে যায়।

আজ মর্ণিং ওয়াক থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুততায় নানা কাজ সারল আদিত্য। তারপর ডাইনিং টেবিলে খেতে বসলে স্বাতী বলল, 'পারলে আজ দুপুরের দিকে গাড়িটা পাঠিও তো।'

'কেন? কোথাও বেরোবে?'

'ভাবছি একবার লাইব্রেরি যাব। ওসব হাইথট মাথায় ঢোকে না। নিজের পছন্দমত বই আনব।'

আদিত্য কোন কথা বলে না। আনমনে খেয়ে ওঠে। আজকাল স্বাতীর ভেতর চঞ্চলতা বেড়ে চলেছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য এড়ায় নি আদিত্যর। নিজের ভেতর নানান প্রশ্ন, উত্তরের কাটাকুটি খেলে। তারপর আড়চোখে স্বাতীকে দেখে। ওর খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত একভাবে পাশে বসে থাকে। এ ব্যবহারটা আদিত্যর খারাপ লাগে না। তবুও কখনও উচ্ছ্বাস দেখায় নি কোনদিন। কোন ব্যাপারে বেশি প্রশংসা বা বেশি নিন্দা করার স্বভাব নয় আদিত্যর। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা শব্দ, গাড়ির হর্ণ, মানুষের ব্যস্ত আনাগোনার শব্দে ভরে আছে চারধার। সামনে বাড়ি ওঠার ফলে রোদ ঢোকে না পারতপক্ষে। বেশ শীতল শীতল ভাব। একটা ভ্যাপসা, চাপা পুরোণো গন্ধ ভরা থাকে। পুরোনো কড়িবরগা, ঘর, আসবাব। গ্যারেজে লাল টুকটুকে মারুতি। ফ্রিজ, ভিসিয়ার। দুটো যুগের অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকে তেতলা নিস্তব্ধ বাড়িটা।

ড্রেস আপ হয়ে বেরোবার পথে স্বাতীকে আলতো একটা চুমো খেল আদিত্য, বলল, 'ঠিক আছে দুটো নাগাদ গাড়ি পাঠাব।' একই ঢঙে আদর পেল শংকরও। আদিত্য বলল, 'ও ভাল কথা। ভাবছি সামনের সানডেতে শংকরের ভিক্টরিটা সেলিব্রেট করব। শিউবচনকে সব বলা আছে। মেণ্টালি প্রিপেয়ারড থেক।' একথাটা বলে স্বাতীর দিকে সরাসরি তাকাল আদিত্য। যেন ওর ভাঙাচোরা লক্ষ্য করল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে একসময় আদিত্য বাইরের ব্যস্ত পৃথিবীতে মিলিয়ে গেল।

সারাদিনের অখণ্ড অবসর। নিঃসঙ্গ মাঝে মাঝে ভীষণ মর্মান্তিক হয়ে ওঠে স্বাতীর কাছে। টিকটিক করে ঘড়ির কাঁটাঘুরে যায় একঘেয়ে। সামনের

গলি দিয়ে কখন কে যায় মুখস্ত স্বাতীর। কখন জানলার ফাঁক গলে জাফরিকাটা রোদটা মেঝের কোন কোণায় খেলা করে সব মুখস্ত স্বাতীর।

ব্যালকনিতে বুক লাগিয়ে আজ অনেকদিন পর থর থর করে কেঁদে উঠল স্বাতী। একা। চারধারে বিজবিজে বিবর্ণ সময়। শ্যাওলা জড়ানো চাতাল। মাঝখানের পরিসরে যুগ যুগ ধরে থমকানো ভ্যাপসা গন্ধের বাতাস। স্বাতী ভীষণভাবে অনুভব করে ও ভীষণ একা। বাইরে ব্যস্ত পৃথিবী।

তারপর পার্টির কথাটা আবার ভাবল স্বাতী। নেকস্ট সানডে। মানুষটাকে মাঝে মাঝে কেমন অচেনা মনে হয়। যত আদত্যিকে কাছে টানতে চায় স্বাতী তত কোথায় যেন গোলমাল বেড়ে যায়।

আজ স্বাতী কি মনে করে করিডোরের দরজা খোলে, থ্যাবড়ানো মুখ নিয়ে টক্ টক্ করে সারা মেঝেয় ঘুরে বেড়াচ্ছে শংকর। দরজার শব্দে শংকর জুলজুল তাকায়। কেমন অবজ্ঞা মেশানো দৃষ্টি। সারা শরীর হিম হয়ে আসে স্বাতীর। তবুও জোর করে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ায় স্বাতী। চোখে চোখ। শংকর আস্তে ডাকল 'ব্রাউ'। স্বাতী মনে জোর করে। তারপর একসময় দেখে শংকর ঠাণ্ডা চোয়ালে ওর পা চাটছে। চারধারের সব প্রেক্ষাপট যেন ঝাপসা হয়ে আসে। স্বাতীর শরীর মনের কেন্দ্রে এক শিরশির ভয়। তারপর একসময় ছিটকে এসে কারিডোরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর ব্যালকনিতে নির্নিমেশে চেয়ে থাকে নীচে। কার্ণিশে একটা কাক শব্দ করে ডাকে কা কা। নীচে অন্তহীন জনস্রোত।

আজ দুটো নাগাদ বাইরে বেরয় স্বাতী। গাড়ি নিয়ে রাস্তায় এলোমেলো ঘোরে। ঝকঝকে রোদ বাইরে। সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে পোস্টার দেখে স্বাতী। ময়দানে এলোমেলো খেলা দেখে। শিয়ালদা জানঘটে গাড়ি ঢুকিয়ে অহেতুক সময় কাটায়। চারধারে ব্যাস্ত জীবন, ব্যাস্ত রাজপথ।

ড্রাইভার বিরক্ত হয় না। কোন প্রশ্নও করে না। তারপর একসময় লাইব্রেরি ঘুরে ফেরে স্বাতী আজকের আনা বইটা, আদিত্য না ফেরা পর্যন্ত সারাদিন পড়ে। 'হাউ টু ট্রিট উইথ এ রয়্যাল ডগ।'

রোজদিন আদিত্য বেরিয়ে গেলে স্বাতী যেন একটা খেলা পেয়ে যায়। কুকুরের সব বিহেবিয়ার যে মানুষ কিভাবে এত সুন্দর বিশ্লেষণ করে। এখন আর শংকরকে অত ভয়াবহ লাগে না। বরং শংকর অনেকটা পছন্দ করে ফেলে।

এরপর আদিত্য একদিন অদ্ভুতভাবে লক্ষ করে, যে স্বাতী শংকরের সামনে

কেমন অস্বস্তিতে থাকত, সেই কিনা অবলীলায় খাবার খাওয়াচ্ছে শংকরকে। আর ও থ্যাবড়ানো বীভৎস মুখে অদূরে চোখ করে রয়েছে। স্বাতী লোমে সুড়সুড়ি দেয়। করিডোরে নিয়ে হাঁটায়। আদিত্য দেখেও না, দেখার ভান করে। কেবল ভেতরে এক তীব্র যন্ত্রণা হয়। জ্বালা করে। 'শংকর এ রিনাউণ্ড শোয়ার অফ দিস এরিয়া।' আদিত্যর পেট। যত সাধারণ মানুষ, দর্শক ভয় পায় বুল ডগের বীভৎস মুখ দেখে আদিত্য যেন নেশার আমেজ পায়, আর সেই শংকর এখন স্বাতীর ন্যাওটা হয়ে উঠছে। এটা অবাকের নয় কি। পড়তি ঘরের মেয়ে। বদান্যতা। স্বাতী ভয়ে কুঁকড়ে উঠলেই স্বাভাবিক হত। আদিত্যর ভেতরে যত যন্ত্রনা বাড়ে তত স্বাতীর সামনে শংকরের আলোচনা এড়িয়ে যায়।

তারপর সকালে টেবিলে বসে কাজ করার সময় আদিত্যর বিছানার তোষকের ফাঁকে বেরিয়ে থাকা একটা বইয়ের দিকে নজর যায়। আজকাল আদিত্যর চোখ যেন সারাঘরে সন্ধানীর মত ঘোরে কি খোঁজে ও বলতে পারবে না। কীসের এক ভেতরে তাগিদ। স্বাতীর ভেতরে চালেঞ্জ বাড়ছে। সেদিন হাসতে হাসতেই বলেছে, একটা এনগেজমেণ্ট দরকার। এভাবে ভাল্লাগে না।

ঘরময় বৈভব, স্বচ্ছলতা, ভিসিআর, টেলিফোন কি নেই। তার মাঝেই কিনা পড়তি ঘরের মেয়ে তুমি বলছ এ কথা। আদিত্য কারোর ঔদ্ধত্যকে বরদাস্ত করে না। যেমন সেদিন থেকেই একটা দুশ্চিন্তার ঘুনপোকা মাথার কোষে কেটে চলেছে কুর্‌কুর্‌। স্বাতীর দিকে হেসেছে, আদর করেছে। গল্প করেছে তবুও।

আদিত্য বইটাকে টেনে বের করে। আর নিমেষে একটা বিজবিজে যন্ত্রণা যেন পায়ের পাতা থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসে।

'হাউ টু ট্রিট উইথ এ্যা রয়্যাল ডগ।' বই-এর নামটাকে গোটা গোটা করে উচ্চারণ করল আদিত্য। তারপর সবে ধরানো সিগারেটটাকেই কি মনে করে অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিল।

আজ বেরোবার সময় আদিত্য বলল, 'স্বাতী, শংকরকে তুমি কমপ্যানি দেবে না। ওর ব্যবহার পাল্টে যেতে পারে। ওর একটা ডিসিপ্লিন আছে। মনে রাখবে ওর পেছনে যা খরচা হয় অনায়াসে একটা লোক পোষা যায়।'

কথাটা বলে দ্রুত তার সঙ্গে বেরিয়ে গেল আদিত্য। আর স্বাতী যেন মরুভূমির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে একা। চারধারে ধু ধু বালিয়াড়ি। সেতু ভেঙে পড়ছে যেন ঝপাঝপ। তারপর দীর্ঘ ছমাস এ বাড়ীতে বসবাসের

পর আজ প্রথম স্বাতীর মনে হল পাশাপাশি থাকলেও বহু কিছু অপরিচিত থেকে যায়। চারধারের পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল হঠাৎ। স্বাতী চেয়ারে ভর রাখে।

আদিত্য আজকাল কাজ নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত হয়েছে। সারাদিন মক্কেলদের ভিড়। শংকরকে অবশ্য খুব একটা কাছ ছাড়া করে না আদিত্য। স্বাতীকে এর মধ্যে নিজেই বলেছিল, 'যাও না দুচারদিন বাপের বাড়ি ঘুরে এস না। একঘেয়েমি কাটবে।' স্বাতী হেসে বলেছে, 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে ভাল্লাগে? বোঝ না।' এই সংলাপগুলো শুনলে অবশ্যই মনে হতে পারে দাম্পত্য-সুখ হাওয়ায় ভাসছে। কিন্তু শব্দহীনতা যেন আরও ভয়াবহ, সারা ঘর জুড়ে একটা হিমশীতল অনুভব। জাফরির মত একচিলতে রোদ এঘর ওঘরে লুকোচুরি খেলে সারাদিন, ভ্যাপসা গন্ধ ওঠে। সারা করিডোরে কেবল শংকরের গলার চেইনটার শব্দ ভেসে বেড়ায়। আর ব্যালকনিতে বুক চেপে স্বাতী চোখ রাখে একটুকরো আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে একটা দুটো চিল দেখা দেয় দুমুহূর্ত। আর স্বাতীর বুকের মধ্যেটা কেমন রিনরিন করে ওঠে। আজ সকাল থেকে বাড়িতে পার্টির তোড়জোড় হচ্ছে। শিউবচন গেটের ধারটাতে সাজাচ্ছে। ডেকরেটারের লোকেরা এসে সামনের লনটা ডেকরেট করছে। শংকরকেও সাজানোর ভার আদিত্যর। একটা মঞ্চ করা আছে, ওখানে শংকর বসবে। স্বাতীকে কোন কাজ দেয়া হয়নি।

ও ওপরে দাঁড়িয়েই দেখছিল নানান লোকজনের কাজ, যাওয়া আসা, আর বুকের ভিতরে একটা শিরশির চাপা ভয় ছিল। মদ খেলে আদিত্য বড় ডেসট্রাকটিভ হয়ে যায়। জিনিষ উল্টে ফেলে। তখন ভীষণ একা হয়ে যায় স্বাতী। সামনে যেন এক অজানা, অচেনা পুরুষ! দীর্ঘ এতদিন বসবাসে যার সঙ্গে কোন মেলবন্ধন অনুভব করে না ও।

আজ বিকাল থেকেই গোটা বাড়িটা যেন গমগম করে উঠল। সামিয়ানার নীচে সাজানো মঞ্চ। আলোর বন্যা। ওয়েটাররা ধোপদুরস্ত পোশাকে ছোটাছুটি করে বেড়ায়। একটা মিষ্টি গন্ধ, পুরোনো বাড়ির হাওয়ায় মিশে ছড়িয়ে আছে। কলকল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে মিসেস ডাট, ভাটিয়া ইত্যাদি। চারধারে স্বাচ্ছন্দ। সারা বাড়িময় মৌচাকের মত জমে জমে আছে জটলা। সকলেই প্রতিষ্ঠিত, যে যার পেশায় চূড়ামণি। রাস্তা জুড়ে সারসার গাড়ি।

কাল থেকে নানাভাবে মনকে তৈরী করেছে স্বাতী। ওকে পারতেই হবে।

আজ অনেকক্ষণের চেষ্টায় দারুণ সেজেছে। হালকা নিল রঙের সিফন জর্জেটের দামি শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। সারামুখে নিখুঁত প্রসাধন। ও নীচে নেমে আজ নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। উড়িয়ে দেয় হাওয়ায়। সকলে স্বাতীকে ঘিরে ধরে, হাউ নাইস হ্যাণ্ডসাম। ইটস এ সারপ্রাইজ টু আস। সকলেই যেন ওর সঙ্গ পাবার জন্য ব্যাস্ত।

তারপর একসময় স্বাতী কলকল করে ভেসে বেড়াতে লাগল চারধার। বোতলের টুকটাক শব্দ। উপরের আলোয় গোটা বাড়িতে মাত্রা দিল যেন। চারধারে মোহময় বাতাস, উগ্র সেন্টের ঘ্রাণ, স্বাতী একসময় অনুভব করে ও মিশে যাচ্ছে দ্রুত। চারধারে হলুদ কুয়াশার আবর্ত। ধূসর অন্তহীন পথ। চুপচাপ ঝরে যায় হলুদ পাতা। জোনাকির মত জ্বলে জ্বলে ঘুরে বেড়ায় স্বাতী।

আদিত্যের আজ পার্টিতে যেন বারবার সুর কেটে যাচ্ছে কোথাও। ও অদ্ভুত ভাবে লক্ষ করল, যে স্বাতী এসব পার্টিতে আড়ষ্ট হয়ে থাকত, লিকারের ঝাঁঝালো গন্ধে কাঠ হয়ে থাকত, আজ অবলীলায় মক্ষিরাণীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভীষণ প্রগলভ হয়ে উঠেছে। ওর চারধারে জটলা। আদিত্য হঠাৎ লক্ষ করল মি. রায়ের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে অবলীলায় সিপ করল ওয়াইনে। আদিত্যর সারা শরীর ঘামে। ভেতরে তীব্র ক্ষরণ। কি যেন এক ঝাঁঝালো ক্রোধ ভাঙে সারা শরীরে। তারপর একসময় পাগলের মত ড্রিঙ্ক করতে থাকে।

ক্রমে রাত বাড়ে। ঘরের বাতাসে ঝাঁঝালো অ্যালকোহলের ঘ্রাণ। অতিথিরা অনেকে চলে গেছে। এখনও যারা আছে চাকরদের কাঁধে ভর রেখে গাড়িতে উঠবে। স্বাতী আগে উপরে উঠে আসে। নিঃসঙ্গ ঘরগুলো ওকে হা করে গিলে নেয় যেন। স্বাতী ব্যালকনিতে ভর রেখে ফোঁফায় হঠাৎ, দাঁড়াতে যায়, মাথা টাল খেয়ে যায়। সারা শরীরে কেমন অস্বস্তিকর অনুভূতি। হাওয়ায় ভয়, আলোতে ভয়, শ্যাওলা জড়ানো চারধার। ধূসর অয়েলপেইন্টিংসএর উপর মাকড়সার জালগুলো দোলে। অলৌকিক যেন। স্বাতী ভয়ে চোখ বোঁজে।

# বড় সুন্দর তুমি রহ কিছুকাল স্থির, বিচ্ছিন্নতা

পথিক বসু

প্রথম পর্ব

১.

শেষ কথা কে বলবে? মেফিস্তোফিলিস আর ফাউস্তের মধ্যে বাজী হয়েছিল, মেফিস্তোফিলিস এনে দেবে ভোগউপভোগসম্ভোগ, ফাউস্ত খুঁজে যাবে মনপ্রাণ আত্মা: ভোগসুখে যদি কোনদিন আবর্তিত হয়ে ফাউস্ত বলতে পারে সে ভোগ সে সময় বড়ই সুন্দর—যেন আর কিছুটাকাল অচল থাকে সে সময়, তাহলে ফাউস্তের আত্মাকে অধিকার করে নেবে মেফিস্তোফিলিস।

শেষ কথা কে বলবে? গোথে দেখালেন মেফিস্তো থেকে সাব্লাইম করে উঠলেন ফাউস্ত, দৃপ্তস্পন্দিত ফাউস্ত বিশ্বের রূপ সৌন্দর্য দেখে বলে উঠলেন: বড় সুন্দর তুমি রহ কিছুকাল স্থির। সে সময় পরার্থের, মেফিস্তোফিলিস তখন উর্ধায়িত।

সে এক মহাকাব্যের কথা। আর এই লেখা আজকের সমাজের কথা। সমাজের একটা বিশিষ্টতার কথা। বিচ্ছিন্নতা।

খুব আশ্চর্য লাগে যখন বিচ্ছিন্নতার কার্যকারণ বিচার করতে বসি। বিচ্ছিন্নতা, যার অর্থ হল আত্মবিচ্ছিন্নতা, নিজের থেকে নিজের দূরত্ব: সে বিচ্ছিন্নতা যখন প্রদাহকারী, সমাজ সামাজিকতায় ক্যানসার এইডস এবং আরো কথা বিচ্ছিন্নতা যখন শোষকবর্গের সুনিপুণ সিদ্ধান্ত তখন একটা ঘুরপাক টের পাই—মানুষ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে অসুস্থ হচ্ছে অথচ ততটা অসুস্থ হচ্ছে না যার ফলে কিনা শ্রমবিমুখ কি উৎপাদনবিমুখ অসুস্থতায় নেমে যাচ্ছে। সমাজ কিভাবে এতটা নিয়ন্ত্রণ করছে? বিচ্ছিন্ন করছে মানুষের থেকে মানুষকে নিজের থেকে নিজেকে কিন্তু উৎপাদনের নিগড় থেকে নয়—কিভাবে এই সমাজব্যবস্থা বজায় রাখছে সমাজ?

যুক্তির কথা বলি। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা পুঁজিবাদী সমাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কারণ দু'দশটা বিপ্লব হয়ে গেছে (যদিও বিপ্লবোত্তর সেসব দেশের মানুষেরা কতটা অবিচ্ছিন্ন তা সন্দেহের!), শোষণ বাড়লে শোষিত মানুষ এক হয়ে উঠতে পারে হয়ত সেটা গুণগতভাবে revolt থেকে revelution-এর

দিকেও চলে যেতে পারে, এদিকে শোষণ না বাড়ালে পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষয়ক্ষতি, অর্থাৎ শোষণ বাড়াতে হবে, কিন্তু মানুষকে এক করতে দেয়া চলবে না, সুতরাং ধনবাদী সমাজ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় : মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে।

এখন কথা হচ্ছে কতটা বিচ্ছিন্ন? বিচ্ছিন্ন হতে হতে একসময় মানুষের মানসিক বিচ্ছিন্নতা-রোগ দেখা দেয়, জন্ম নেয় নিউরোসিস, সাইকোসিস ; আর নিউরোটিক ব্যাপারটা একটু দানা বাঁধলে এমন বিকৃতির জন্ম হবে যা মানুষকে সমাজের বোঝা হিসেবে টেনে নিয়ে যাবে—সেটা নিশ্চয়ই সমাজ চাইবে না। সমাজ চাইবে একদল হৃষ্টপুষ্ট বিশ্বস্ত মানুষ যারা কাজ করবে বুদ্ধি বাতলাবে বিদ্রোহ দমন করবে কিন্তু কিছুতেই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে না, সামগ্রিক হবে না। তাহলে সমস্যা কি একটা থাকে না? কতটা বিচ্ছিন্ন রাখলে মানুষ এতটা সুসভ্য হবে এই ডায়ালেকটিক্যাল গতিবিধি কি সমাজ গণনা করতে চাইবে না? ভাববে না?

অবশ্যই ভাববে। কারণ এটাই ধনবাদ বিকাশের জীয়নকাঠি। আর ভাবছেও নিশ্চয় কারণ ধনবাদ কোনভাবে মরে নি বরং আরো যেন সুন্দর ফুটফুটে অষ্টবক্র শতায়ু শৈশব উপভোগ করছে।

প্রশ্নটা তাই করতে হচ্ছে ধনবাদ কিভাবে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচ্ছিন্নতায় নেশাতুর রাখছে মানুষকে যারা মেফিস্তোর কাছে বিশ্বস্ত, পরার্থবোধে নির্বাসিত, কবুল করে ফেলছে : বড় সুন্দর তুমি···।

২.

প্রথমে সমস্যাকে দর্শনগতভাবে দেখি। দর্শন হিসেবে যাঁর মতবাদ এই সমাজে, সুপ্রযুক্ত হতে পারবে তিনি হলেন সার্ত, সার্তর ক্রিটিক থেকে বিচ্ছিন্নতার আদিগন্ত অষ্টসমুদ্রের সর্জনস্রোতসংঘাতকে বুঝে নিই।

সার্ত-মতে প্রকৃতি আর মানুষের ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ে সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির লজিক হল না-দেওয়া, কৃপণতা ; প্রকৃতি মানুষকে বিনা আয়াসে কিছু পেতে দেবে না, এই কার্পণ্য প্রকৃতির মৌল বিশেষত্ব। অন্যদিকে মানুষের লজিক হল লড়াই করে নেয়া, সভ্যতার প্রথম জীবন থেকে মানুষ প্রকৃতির বাধা পেয়ে আসছে, প্রকৃতির কার্পণ্য বুঝতে পেরেছে এবং বুঝেছে লড়াই ছাড়া প্রকৃতি থেকে এককণা খাদ্যশস্য আদায় করা সম্ভব নয়। এই বোধ আজকের মানুষের মধ্যে তৈরী করছে প্রাক্সিস প্রবণতা এবং প্রকৃতির

কৃপণতাও তার মানসে ঠাঁই গেড়ে নিয়েছে, সহজ কথা ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায় ; সে দেখছে প্রকৃতি সহজে কিছু দেয় না এবং এটাকে সে সার্বজনীন সত্য হিসেবে নিয়ে ফেলেছে ঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধতা ধীরে ধীরে অন্য মানুষদের বিরোধিতায় চলে এসেছে, এখন সে ধরেই নিচ্ছে সব মানুষই alien, প্রত্যেকেই কৃপণতার কুণকে নিয়ে চলছে।

সার্ত বলছেন মানুষের মনে যুগপৎ প্রাক্সিস এবং না-পাবার ভয় সবসময় একটা দ্বন্দ্ব বাধিয়ে বসে আছে। যার তিনটে ফল পাওয়া যায়—যদি প্রাক্সিস বোধের জয় হয় তাহলে তার মধ্যে বৈপ্লবিক প্রবণতা বাড়ে, যদি না-পাবার ভয় বাড়ে তাহলে আগ্রাসন বাড়তে পারে এবং দুটোর মধ্যে স্থিতাবস্থা থাকলে প্রাকিটকোইনার্টনেশ পর্ব চলে। সাধারণত সংখ্যাগুরু মানুষেরা একটা সমাজে সমাজটার আকার ও নামের সাদৃশ্য অনুসারে নিয়ন্ত্রিত পথে চলে যার অর্থই হল প্রাক্টিকোইনার্টনেশের জালে ধরা পড়া। প্রাক্টিকোইনার্টনেশ সর্বতোই অদ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া যেখানে সবকিছুকে ধামাচাপা দেয়া অথবা এড়িয়ে যাবার প্রচেষ্টা দেখা যায়, সেটা নির্ভর করে, সার্ত লিখছেন ঃ On the multiplicity of individuals coexisting in the field of scarcity.

এই কথাকটা এবার সামাজিক সমস্যার মধ্যে ফেলে দিই। আজকের শোষণনির্ভর সমাজ চলতে গেলে কি এরকম একটা প্রাক্টিকোইনার্টনেশ থাকা প্রয়োজন নয়? যেখানে সবাই কাজ করবে খাটবে কিন্তু প্রাক্সিসের প্রতি থাকবে অবিমিশ্র নিরুৎসাহ, যা চলছে চলুক, এমন বোধ থাকা কি অর্থনৈতিক শোষণের চক্র মজবুত রাখার পক্ষে সুপ্রযুক্ত হবে না? প্রথমে সেরকম একটা যৌক্তিক কল্পনা করেছিলাম, এখন কি কল্পনার যৌক্তিকতা পাই না?

প্রাক্টিকোইনার্টনেশ হল involved alienation-এর ব্যাপার। নিজের কর্মনৈপুণ্য সম্বন্ধে অসচেতনতা হচ্ছে প্রাক্টিকোইনার্টনেশ, যার কবলে পড়ে মানুষ কাজ করবে ঠিকই, তার দায়দায়িত্ব পালন করবে ঠিকই, কিন্তু একবারো খতিয়ে দেখবে না তার কাজ কার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘটছে। এটি মার্কসীয় শ্রমবিভাজনের চেয়ে কিন্তু আরেকটু গভীরে, শ্রমবিভাজন-এর কারণ হবে, ফল হিসেবে এর গম্যতা আরেকটু গভীরেই। শ্রমবিভাজন পদ্ধতিতে এক শ্রমিক অন্য পেশার শ্রমিকের কাজ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে কিন্তু প্রাক্টিকোইনার্টনেশের প্রভাবে শ্রমিক তার পেশা সম্বন্ধেই অজ্ঞান থাকে। এবং এটাই চেয়ে থাকে সমাজ। এত সুন্দর involved alienation শোষণব্যবস্থাকে পোক্ত করবে এ কি কম বড় কথা।

আজকের সমাজে involved alienation-এর দার্শনিক সংলাপ হল এই। বিচ্ছিন্নতা কেন হবে তার মূলে আঘাত হানার জন্য তাই আমাদের দরকার সার্ত-নির্ভরতা: কার্পণ্য ও প্রাক্সিসের নিত্য হানাহানি স্পষ্টতা উপলব্ধি করা।

৩.

এবার দেখব সমাজ কিভাবে নিজেকে অগ্রসর করার সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে চলেছে। এই জ্ঞানে আমরা দুদিক বিবেচনা করব। প্রথমে দেখব সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষের সচলতা কি করে ঘটাচ্ছে, দ্বিতীয়ে দেখব বিচ্ছিন্ন মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাস্তব সমাজে সত্যিই কতটা ভয়াবহ। এই কাজ হবে সম্পূর্ণই রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রকরণ দিয়ে, যা ঘটছে আজকের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতিতে তার বিবরণ দিয়ে এই অধ্যায় বোঝা হবে, বোঝবার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম দেখি আজকের সমাজের বিশিষ্টতা ইত্যাদি। তিনটে বিষয় বর্তমানে নিরেট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিষয় তিনটেতে জোর দিতে চেয়েছিলেন ধনবাদী তাত্ত্বিকেরা, আজ ব্যাপারটা মোটামুটি তাদের কব্জায়। বিষয়গুলি যথাক্রমে:

বাজার
জনসাধারণ
আমলাতন্ত্র

বাজার সংগঠনের চূড়ান্ত রূপ হল যখন প্রতিটি দ্রব্য বা পণ্য স্বয়ংচল এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে চকিতে দাম (price) স্তরে নেমে আসে: তা সে পদার্থ হোক কি মানুষ হোক—চটজলদি তাকে দামের পর্যায়ে নামিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিনিময়ে আনা আজকের বাজারের সবচেয়ে সাফল্য। সত্য অবশ্যই কম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসার এই চূড়ান্ত পর্যায়ে আনার শ্রেষ্ঠ কারুকৃত।

জনসাধারণ অর্থাৎ মার্কসীয় revolutionary people নয়, জনসাধারণ অর্থাৎ বিকট mass (এই বিষয়টা কিছু পরে পরিস্কার হবে), এদের মধ্যে সঙ্গতি রাখা হয়, এদের সংস্কার-আচার-আচরণ-বেশ-ভূষা-খাদ্যে একটা ঊর্দ্ধি-পরিহিত-সংহতি আরোপ করানো হয় এবং সেটা তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবার মত মানসিক জায়গায় পৌছে যায় অর্থাৎ transcedental power of

ind:vidual বলে কিছু থাকে না : এই জনসাধারণ গোষ্ঠী তৈরী করা আজকের ধনবাদী সমাজের দ্বিতীয় সার্থক লক্ষ্য।

বিষয়টা আরেকটু বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে। মার্কস revolutionary people এর কল্পনা করেছিলেন, মূলত দু'ধরণের গুণসম্পন্ন মানুষ এই পর্যায়ে আসতে পারেন : যারা সত্যিই সর্বহারা যাদের শৃঙ্খল ছাড়া সত্যিই হারাবার কিছু নেই এবং যারা অনুভূতির দৃষ্টিতে এই শৃঙ্খলায়িত সর্বহারার মিছিল দেখতে পান, মনে করেন মানুষ হিসেবে মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসেবে এ মিছিল-বিদ্রোহ-বিপ্লবে অংশ নেয়া যৌক্তিক পদক্ষেপ, তাঁরা। আর বর্তমান ধনবাদ যে mass এর কল্পনা করে সেটা একেবারে এর বিপরীত। এতে খেটে খাওয়া শ্রমজীবি মানুষ আছেন, মানবিক দৃষ্টিবান পাতিবুর্জোয়া পরিবারের মানুষ আছেন, ধনীর সন্তানেরা আছে তবে তারা বিপ্লবী হয়ে থাকছে না, থাকতে পারছে না (থাকতে না দেয়া নিশ্চিত ধনবাদের কৃতিত্ব) : তারা সবাই এক, এক রুচিতে অভ্যস্ত একই সুপাররিন কি নির্মা, ব্যবহারে বিধ্বস্ত : তফাৎ এই যে তাদের মধ্য থেকে উঠে আসা প্রশ্ন নিয়ে তারা এক হচ্ছে না, তারা সুনীল গাভাসকার প্রকাশ পাড়ুকোন উষা পিটির দৌড় দেখে এক হচ্ছে, স্বাধীনতা যে চল্লিশ বছর আগেই হয়ে গেছে সেটা বুঝে নিচ্ছে। এ ধরণের mass তৈরী করা বুর্জোয়াসভ্যতার বিশেষত্ব। প্রথম বিশ্বে এ রকম mass যে তৈরী করা হচ্ছে সেটা বুঝে ফেলেছিলেন মার্কুস, বিস্মিত মার্কুস প্রশ্ন করে ফেলেছিলেন বিপ্লব কিভাবে সম্ভব যখন কিনা 'শোষিত হচ্ছি' এমন বোধটাই ফিকে হয়ে আসছে—আগে বুঝতে হবে আমি বঞ্চিত তবে তো সেই মাত্রিক সংগঠনে নির্ভরতা, নাই যদি বুঝলাম আমার প্রতি অত্যাচার—তবে কিসের সংগঠন? কিসের বিপ্লব?

এবার একথা ভাবার সময় এসে গেছে। তৃতীয় বিশ্বেও এ ধরণের প্রচেষ্টা চলছে, জনগণের মানসিকতাকে জনসাধারণ্য মানসে পৌছে দেবার গবেষণা-পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে (যার ন্যূনতম একটা দৃষ্টান্ত পাই 'ব্যারিকেড' নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায়, প্রবন্ধের নাম—জ্ঞানান্ধ অন্ধত্ব : এ এক সমাজ)।

ব্যুরোক্রাসি আজকের ধনবাদী সমাজের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যারা সরাসরি যুক্ত তাদের ফেলে দেয়া হল mass গোষ্ঠীতে, যারা সরাসরি যুক্ত নয় তাদের কোন একটা নতুন বিপ্লববোধহীন পরিবেশে ফেলে দেবার কথা ভাবতে হয়, এবার—কারণ অতীতে এরকম ঘর থেকেই মার্কস-লনিন-সার্তরা বেরিয়ে এসেছিলেন, তাই উইলিয়াম হোয়াইট একটা

নতুন প্রকোষ্ঠ বানালেন, প্রকোষ্ঠের মানুষগুলো...are not the workers nor are they the white-collar people in usual clerk sense of the word. These people only work for the Organization. The ones I am talking about belong to it as well. They are the ones of our middle class who have left home, spiritually as well as physically, to take the vows of organization life, and it is they who are the mind and soul of our great self-perpetuating institutions (Whyte W H: The Organization Man: Penguin: 1961) এবং প্রকোষ্ঠের নাম ব্যুরোক্রাসী যারা mass man তৈরী করছে, তৈরী করছে organization man, প্রয়োজন মত প্রয়োজনের প্রয়োজনে।

আজকের সমাজে বাজার জনসাধারণ ও ব্যুরোক্রাসী একটা মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলে তৈরী করে সম্পর্কহীনতা—দ্বিমাত্রিক সম্পর্কহীনতা—নিজের থেকে, সমাজের অপরাপর মানুষ থেকে। যেমন ধরা যাক জনসাধারণী মানসিকতা: এখানে পরাক্রান্ত বুর্জোয়াসভ্যতা কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কলের পুতুল মানুষেরা হাঁটে চলে খায় কথা বলে; যতক্ষণ সে উৎপাদন যজ্ঞে ততক্ষণ যন্ত্রের গতিবিধির ওপর সচল তার মন, অন্যদিকে মন দেবার সময় তার নেই, যখন তার চিত্তবিনোদনের সময় তখন তাকে কব্জা করে রেখেছে দূরদর্শন রেডিও ইত্যাদি বুর্জোয়াসভ্যতা-প্রচারী-মাধ্যম—তার মর্জিমত জ্ঞান সে পাচ্ছে না, প্রভু আরোপিত শিক্ষা তাকে গেলান হচ্ছে, স্বাভাবিক তার মানসিকতা ধনতন্ত্রমুখী হয়ে যাচ্ছে—নিজের দিকে তাকিয়ে সে কিছু ভাবতে পারছে না, দূরদর্শিত ভাবনায় সে ডাবরের চ্যবনপ্রাস সেবনে বুদ্ধিমান হতে চাইছে। এর ফলে সর্বপ্রথম ঘটবে তার সাথে তার সম্পর্কহীনতা—সে প্রকৃতে কি চাইত সেটা সে নিজে টের পাচ্ছে না, দূরদর্শন বা রেডিও তার চাওয়াকে কণ্ডিশন করে নিয়েছে। এই আত্মবিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে আরোপিত হয় তার সমাজ মনস্কতায়। কথা সেই একই, সে যে ভাববার বিন্দুমাত্র সময় পাচ্ছে না, ফলে অন্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়া অথবা হওয়াটা যে ঔচিত্যের সেটা ভাবতে সে বেমালুম ভুলে গেছে; হয়তো কখনো ঋত্বিকবাবু (যদিও ব্যাঙ্গে) বলতে পারতেন: ভাব, ভাবা প্রাক্‌টিশ কর।

দ্বৈতবিচ্ছিন্নতা ঘটে বাজার যত নৈর্ব্যক্তিক, যত স্বয়ংক্রিয় হয়। প্রথমত উৎপাদক আর ক্রেতার কোন সংযোগ আধুনিক বাজারে থাকে না, এমনকি

নিত্য ব্যবহার্য পণ্য আহারেও এই দুই গোষ্ঠী এক জায়গায় মেলে না— মহাজনের খপ্পরে পুষে যাচ্ছে যুগপৎ উৎপাদক ও ক্রেতা। এইভাবে বাজার স্বয়ংচল হয়ে অবশেষে যখন কম্পিউটারের কবলে পড়ে তখন গাণিতিক মডেল সত্য হয়ে প্রকৃত মানুষের সম্পর্ককে লোপাট করে দেয় ঃ ফলে মানুষের সমাজ-মনস্কতা। বিমূর্ত জি ডি পি জি এন পি'র কব্জায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় ভোগে আর সেটাই ঘটিয়ে চলে আত্মবিচ্ছিন্নতা। কারণ mass man তৈরী করার আবশ্যিক শর্ত হল জনসাধারণের রুচিকে নিয়ন্ত্রণে আনা—তা সেই জনসাধারণী রুচি এবং নিয়ন্ত্রিত রুচি যখন একটা স্বয়ংক্রিয় বাজারে পৌছয় তখন নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রকৃত চাহিদার কথা মনে রেখে ক্রয়বিক্রয় হয়ে ওঠে না। উদাহরণস্বরূপ কাঁচা ছোলাবাদামের যা খাদ্যগুণ সেটা কমপ্লান-প্রোটিনেক্সে নেই এবং দাম দশগুণ শস্তাও ঃ কিন্তু organization man অর্থাৎ আমরা কল্পিত আঠেরোটা ভিটামিন আর দশটা মিনারেলের খোঁজে লম্বা লাইন দিই আঠাশ পঞ্চাশ প্লাস এল টি এক্সট্রা ফ্যামিলি হেলথ ফুডের জন্য ঃ চাহিদা নিয়ন্ত্রিত, নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক কার্যত নেই। ফলে বিজ্ঞাপনে নির্ভরযোগ্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের রুচিশিক্ষাবুদ্ধি, মুখোমুখি হচ্ছি আত্মবিচ্ছিন্নতার।

এবং ব্যুরোক্রাসি? সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যুরোক্রাসি? যারা mass man করছে organization man করছে market করছে, তারা?

মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শস্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

৪

এখন কথা হচ্ছে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বলছি, সমাজ যে দ্বি-মাত্রিক বিচ্ছিন্নতা চালু রেখেছে, সেটা যেমন খেটে খাওয়া মানুষকে আঘাত দিচ্ছে তেমনি আঘাত দেবে শোষক মনোভাবাপন্ন মানুষকে। প্রথম দলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ, দ্বিতীয় জনের সেখানে কি ঘটছে?

বিষয়টা গবেষণাসাপেক্ষ। চল্লিশের দশকে থিওডোর আডোর্ণো Authoritarian personality নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছিলেন শোষক-জনের আত্মবিচ্ছিন্নতা ফ্রয়েডীয় স্যাডিজমের জন্ম দেয়, যখন তারা দেখে

তাদের অধীনস্থ মানুষের উপস্থিতি আছে তখন তারা আত্মবিচ্ছিন্নতাজনিত হতাশাকে স্থানাপন্ন করে শোষণ মারফৎ; গড়ে ওঠে authoritarian personality—মোদ্দা কথা প্রভুত্ব করার মত অধীন পেলে আত্মমানবিকতা (যা বিচ্ছিন্নতার কবলে লোপ পেয়ে গেছে) লিবিডোকে লোপ পাইয়ে ক্রোধ ঘৃণা মারফৎ প্রকাশ করায়, জন্ম নেয় শোষক-ব্যক্তিত্ব।

আবার বলছি বিষয়টা গবেষণাসাপেক্ষ। আডোর্ণোর মত বহুলাংশে গ্রহণযোগ্য হলেও সর্বতোস্বীকার্য নয়, বড় কারণ হল শোষণ-মানসিকতা যেমন ব্যক্তিক তেমনি সামাজিক-অর্থনৈতিক চক্র দ্বারা নিদারুণ প্রভাবিত—সেই প্রভাবটা খুব স্পষ্টভাবে আডোর্ণোর পথে পাওয়া যায় নি।

তবে বাহ্যিকভাবে যা দেখা যাচ্ছে তাতে এই প্রকল্প এই মুহূর্তে মেনে নেওয়ার যৌক্তিকতা পাচ্ছি। যখন দেখছি আজকের ধনতন্ত্র বাজার জনসাধারণী মানসিকতা আর ব্যুরোক্রাসির জাল বিছিয়ে আপামর মানুষকে বিচ্ছিন্নতায় ভাসিয়ে দিচ্ছে, যখন শোষণ শোষণ হয়ে থাকছে এবং একশ্রেণীর মানুষ নিদারুণ আত্মবিচ্ছিন্ন হয়েও যখন শোষণ করছে—তখন বুঝে নিতে পারি শোষক মানুষেরা সম্ভবত কোন একটি পর্বে পৌঁছে আত্মবিচ্ছিন্নতাকে স্যাডিজমের দিকে ঠেলে দিয়েছে—মানতে আপত্তি নেই, আপাততঃ।

অতঃপর দেখতে হচ্ছে শোষিতের আত্মবিচ্ছিন্নতা কিভাবে কতভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। সাধারণত যেটা ঘটে সেটা হল involvement, তার কথা কিছু পরে। অসাধারণত যেটা ঘটে তা হচ্ছে non-involvement। যখন চাপ খুব বেশী পড়ে কিংবা আত্মবিচ্ছিন্নতায় আত্ম'র অবদমন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না তখন আসে যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ—হ্যামলেট পর্ব এবং সেটা ধীরে ধীরে মানুষকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে নেয়ঃ পরিবেশের যে কোন উত্থানপতনে নিঃসাড় থেকে যায় যে মানুষ, তখনকার পরিণাম হল হল মনোরোগ—নিউরোটিসম্। যদিও সমাজ সুকৌশলে আত্মার অবদমনকে ধীরে ধীরে কব্জায় এনে ফেলে, তাহলেও এরকম একটা-দুটো বিচ্যুতি ঘটে থাকে, উন্মাদের সংখ্যা বাড়েও তাই, বর্তমান মার্কিন ভূস্বর্গে এধরণের উদাসীন মনোরোগীর সংখ্যা গণনার পর্যায়ে চলেও এসেছে।

সাধারণত অবশ্য উল্টোটা ঘটে। অংশগ্রহণ। মানুষের প্রবল জীবনী-শক্তি, ডারুইনীয় survival for the fittest সেই মানুষ, মননশীল মানুষ

আত্মদূরত্বের মধ্যেও বাঁচতে চায়—অংশ নিতে চায় সমাজকর্মকাণ্ডে এবং বিকৃতির মধ্যে অংশ নেয়—বিচ্ছিন্নতার এই ভয়ারহতাই আজ বাস্তব।

ফ্রয়েড একধরণের defence mechanism এর কথা বলেছিলেন, যারা মানুষের ক্ষতিকর নয়, মানসিক অসুস্থতা নয় কিন্তু পরিপূর্ণ ইগোর বিকাশও নয়। ফ্রয়েড বলতেন ইগো বিকাশে বাধা পেলেই যে মানুষ উন্মাদ হয়ে যাবে তা ঠিক নয়—সে প্রথমদিকে একটা আড়াল গড়ে নিতে চাইবে যাতে বিকৃতিটা বোঝা যায় এবং বিকৃতিটা প্রকাশিত হয়ে যায় যার ফলে ক্ষতির মুখে সে পড়ে না। যেমন exhibitionism। এটি এমনি এক defence mechanism যেখানে আমি এই করেছি' আমি এই বলেছি' ইত্যাদি আমিত্বময় মনস্তত্ব জাগ্রত : নিঃসন্দেহে এই আত্মপ্রচার ইগোর সমপ্রচার নয় তবে মানসিক উন্মাদনাও নয়। ফ্রয়েড এটাই মনে করতেন এবং বর্তমান আলোচনায় যখন বিচ্ছিন্নতা আঘাত হেনে বসেছে যখন আত্মবিচ্ছিন্ন কি আত্মহীনমন্যতা বোধ না এলেও একধরণের শিরশিরে-লম্বা-সংস্কার জবুথবু বোধে আচ্ছন্ন হচ্ছি, তখন অমনি একটা ফ্রয়েডীয় আড়াল-দেয়াল হয়ত বা গড়তে বাধ্য হচ্ছি আমরা, বিশশতকের মানুষ; সেটা আমার বিচারে অক্ষতিকর তো কখনোই নয় বরং সাংঘাতিক ক্ষতিকর। এটাই বিশশতকের নিউরোসিস।

প্রথম যেটা ঘটে তা হচ্ছে এড়িয়ে যাওয়া। মনোদার্শনিক অ্যালফ্রেড অ্যাড়লার এই মানসিকতার নাম দিয়েছিলেন avoiding-type personality; অ্যাডলার বলেছিলেন সমস্যার সম্মুখীন হলে অনেকেরই আপন অক্ষমতার জন্য এড়িয়ে যাবার একটা প্রবণতা স্পষ্ট থাকে তবে সেটা মানসিক অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে না (যেমন ফ্রয়েডও বলতেন)। কিন্তু এরিখ ফ্রম যখন আত্ম-বিচ্ছিন্নতা যিশশতকের ধনবাদী সমাজ আর শ্রমিকশ্রেণীর মনস্তত্ব পুংখানুপুংখে গবেষণা করতে এলেন তখন বললেন এই এড়ানো মানসিকতা মারাত্মক একটা উন্মাদনা : নাম তার eccape from freedom।

এই ভয়াবহতার প্রথমটা হচ্ছে কুমীরের হাঁ-মুখে দোয়েল পাখীর ওড়াউড়ি। Organitation manদের একটা আপাত মুক্তির পরিবেশে ছেড়ে দেয়া; তাদের জন্য রুটিন দশটা-পাঁচটার বাঁধন থাকছে না, তাদের একেকটা জব-লোড (job-load) দেয়া আছে, যখন ইচ্ছা নির্দিষ্ট পিরিওডের মধ্যে সে কাজ খতম করতে পারলে তোমার ছুটি এরকম একটা আপাত মুক্তির পরিবেশ বানানো হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কতিপয়

সমাজতাত্ত্বিকেরা দেখেছেন শনিরবি ছুটির দিন করার চেয়ে সপ্তাহে রবি ও বুধ বা বিষ্যুদে অর্থাৎ তিনদিন কাজ একদিন ছুটি এরকম একটা অর্ডারে উৎপাদন শৃঙ্খল চালু থাকলে কাজের গতি অনেক বাড়বে, রাষ্ট্রযন্ত্রও সবল হবে অনেক। এই আপাত বন্ধনহীন ছুটির আবহাওয়া কিরকম বিপজ্জনক সেটা এবার বোঝার চেষ্টা করি।

আপাতমুক্তির কুপ্রভাব যথাক্রমে (ক) মানুষটা যথাবিহিত শ্রম নিংড়ে দিচ্ছে এবং সেটা সে দিচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, নিজেকে শক্ত করার অভিপ্রায়ে। ধরা যাক্ আমি একটা কাজ ধীরেসুস্থে উত্তেজনাহীন গতিতে পাঁচটার মধ্যে শেষ করতে পারি, যখনি বলে দেয়া হচ্ছে কাজটা শেষ হবার সাথে সাথেই আমার ছুটি—তখনি আমার মধ্যে একটা উত্তেজনাপূর্ণ গতির সৃষ্টি হচ্ছে; আমি তুলনামূলক কম সময়ে অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছি—এই কাজে যে উদ্বেগ জন্ম নিচ্ছে সেটা আমার সুস্থ মানসিকতাকে ব্যাহত করবে, চাইলেও আমি আমার 'মুক্ত' সময়ে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারব না, একটা টেনশনাল ভূত আমাকে তাড়া করে সরবে। (খ) মুক্ত সময়টা তো মুক্ত নয়, সিনেমাটিভিখেলারমাঠে দর্শক হওয়া···অর্থাৎ পুনরায় mass man এর চক্করে বদ্ধ হওয়া। (গ) উৎপাদন চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে অন্যান্যদের সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে শ্রমজীবি মানুষ। আটঘণ্টা থাকাকালীন এক শ্রমিকের সাথে আরেক শ্রমিকের যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত সেটার যখন সংক্ষেপ করা হচ্ছে এবং অল্প সময়ে পর্যাপ্ত কাজ যখন তুলে দিতে হচ্ছে তখন দুর্ভাগ্যজনক পরিণামে আসে অন্যান্য মানুষ থেকে এক মানুষের ক্রমিক বিচ্ছিন্নতা; তার কুপ্রভাব হল অন্যের সাথে নিজেকে না জড়ানো, অন্যের দুঃখসুখে অংশগ্রহণ না করা, ফলাফল শোচনীয় পরবিমুখতা। (ঘ) সবর্তো একটা dispassionate involvement পরিলক্ষিত হয় মানুষের মধ্যে ঃ তার মুক্ত সময়টা ছিনিয়ে আনতে সে উৎপাদন চক্রের প্রতি অনুৎসাহ দেখিয়ে থাকে—ধরি মাছ না ছুঁই পানি—এ মানসিকতার প্রাদুর্ভাবে শাসক-শ্রেণীর আত্মবিস্তার ও কর্তৃত্ব তরান্বিত হয়; মানুষ যদি উৎপাদন প্রথায় নিজেকে গভীর ভাবে না জড়াতে পারে তাহলে সেই প্রথা বদলাবার কি ভেঙে ফেলার সক্ষমতা সে কিভাবে পাবে? সম্প্রতি ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কশিল্পে এই প্রবণতা ধরা পড়েছে, এ বছরের দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবৃত্তান্তে ম্যানেজমেণ্ট ব্যাঙ্ক-কর্মচারীর এই dispassionate involvement প্রত্যক্ষ করে বেশ কিছু কদর্য শর্ত চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রত্যেক পর্বে দেখা যাচ্ছে এড়ানো মানসিকতা থাকলেও উৎপাদনে অংশ নিতেই হচ্ছে কিন্তু 'নিজেকে বেশী জড়াব না' এরকম মানসিকতায়, ভাল'র বিপরীতে, মন্দ ডেকে আনছে।

দ্বিতীয় যা ঘটে অর্থাৎ ভয়াবহতার দ্বিতীয়টা হল effectiveness of work process। প্রথমটা যদি organisation man এর হয়, দ্বিতীয়টা তাহলে mass man এর জন্য। আট ঘণ্টার শ্রম আট ঘণ্টাতেই থাকছে (কখনো বা বেড়েছে), উৎপাদনের সাথে যারা প্রত্যক্ষে জড়িত তারা রুটিন সময় ও রুটিনমাফিক কাজ মেনে চলতে বাধ্য—অর্থাৎ তাদের প্রথমোক্ত free time-এর সুযোগ দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু বিনোদনের ঢালাও সুযোগ দেয়া হচ্ছে ইনষ্টিটিউশানের মধ্যেই। যেমন ভিডিও গেম আমদানী করা হয়েছে, অটোমেশনের জন্য শ্রম যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব করা হয়েছে, অথচ আট ঘণ্টার শ্রম আটেই ঘোরাফেরা করছে। পাশ্চাত্যের শ্রমিকেরা এখন কারখানার মধ্যে বিলাসবাহুল্যে তৃতীয়-ছাগ-তনয় বরাদ্দ ভোগ পেয়ে অভ্যস্ত—শ্রমের দমফাটা হাতুড়ীর শব্দ এখন সচল কম্পিউটারের নীরব শুভ্র-নিষ্কলঙ্ক-হিমাঙ্কে ফুটন্ত। ক্ষতি? আরো বিশদে বলতে হবে?

৫.

কৌতুহলের অভিমুখ সবার। যা বললাম লিখলাম যা সবটাই যেন অচলতার কাব্য, সবটাই যেন অসুস্থ-উন্মাদনা-অচলতার ইঙ্গিতবহ—কিন্তু সত্যিই কি তাই?

না। যদিও প্রতিটি পর্ব প্রতিটি অধ্যায় প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর অসুস্থতার কথা লিখে রেখেছে তবু পুঁজিবাদ এই অসুস্থতার একটা 'সুস্থ' গঠনপ্রণালী বানিয়ে নিয়েছে, জ্ঞানের এ এক নির্মম পরিহাসই বটে। ভীষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ, বিচ্ছিন্নতা কাটাতে গিয়ে নিজেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে আরো বদ্ধ হচ্ছে মানুষ—সবটাই সত্যি কিন্তু সমাজ তাকে প্রথামত সর্পিল শোষণের প্রাসোর্দ্ধে যেতে দিচ্ছে না—সানন্দ স্বীকৃতিও জানাচ্ছে হতভাগ্য মানুষ, সে অম্লানই বলছে: বড় সুন্দর তুমি…।

ফ্রয়েড একধরণের ভ্রান্ত চৈতন্যের কথা বলেছিলেন। ফ্রয়েড বলেছিলেন সাধারণত আমরা আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের সমর্থনে কল্পিত এক ব্যক্তিত্ববান আত্মকে প্রতিষ্ঠা করি, যেটা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত চেতনা (false consciousness): যেমন প্রত্যেকটা কাজে আমরা স্বপক্ষের একটা যুক্তি

খাড়া করার চেষ্টা করি ; ঝগড়া করছি কি মারপিট করছি কি মিথ্যাকথা বলছি কি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছি...প্রত্যেকটা কাজে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা যুক্তি খাড়া করেই মাঠে নামি ও সেইমত কাজ করি। ফ্রয়েড এই পরিস্থিতি জনিত চেতনার নাম রেখেছিলেন ভ্রান্ত চৈতন্য।

এ ভ্রান্ত চৈতন্য আজকের মানুষের ( যে মানুষের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমরা অনুসন্ধিৎসু। মধ্যে ঠাসবুনোন করছে পুঁজিবাদী সভ্যতা. পুঁজিবাদী সভ্যতাই মানুষের মনে এই চৈতন্য ইনজেক্ট করে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার ঃ আমি যে বিচ্ছিন্ন সেটা বুঝতে দেবে না আমার ভ্রান্ত চৈতন্য, যদিও আমি বিচ্ছিন্ন এবং আমি বিচ্ছিন্ন।

যে ভ্রান্ত চৈতন্য 'আমি'র কোন অংশে নিয়ে ?

গর্ব ( pride ) সেই অংশ। অতীতে হিটলারের নাজিবাদ তুলেছিল বিশুদ্ধ আর্য রক্তের গর্ব, আজকের ধনতন্ত্র মহান মাতৃভূমি-পিতৃভূমির গর্বে আমাদের ফুটন্ত করে তোলে, যুদ্ধবিগ্রহে আমাদের অগ্রগতি নিয়ে গর্ব দেখায় আমাদের রাষ্ট্র প্রয়োজনে তুচারটে শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ বানায়...আমরা গর্বিত হই।

গর্ব আমাদের প্রকৃত আমিত্বের অন্তরায়, আমার সৎ চিন্তা চেতনাকে ক্ষইয়ে দিতে পারে গর্ব। সবচেয়ে বড় কথা গর্ব বিচ্ছিন্নতার ঝাঁঝ মেরে দিতে পারে—আমি যে বিচ্ছিন্ন আমি যে ভঙ্গুর সেটা ভুলিয়ে দিতে পারে গর্ব। এখন আমার অসহায়তা ফুটিয়ে তুলতে পারে ( যদি আমার অসহায়ত্ব আমি বুঝে ফেলি তাহলে অসহায়তার উর্দ্ধে যাবার প্রেরণাও পেয়ে যাব আমি ), কিন্তু ঘটা করে শঙ্খউলুধ্বনি মারফৎ রামায়ণ মহাভারত ? অমিয় চক্রবর্তীকে একটু অদলবদল করে বলি—বিশুদ্ধ আর্য্যামি আর কত সইবে ?

৬.

এতক্ষণের আলোচনা এবার একটু গুটিয়ে আনি। আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজ সুন্দর যে পদ্ধতিতে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়ে মানুষকে সংগঠিত করতে দিচ্ছে না তার ধারাকানুন বিবেচনা এখন শেষ। প্রথমেই প্রশ্ন রেখেছিলাম বিচ্ছিন্ন তবু সচল কেন, একেবারে শেষে এসে দেখলাম ভ্রান্ত চৈতন্যের injection দিয়ে গর্ব অহমিকায় ভরপুর করে তারা মানুষকে সচল রাখছে এবং সচল মানুষ প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্খলকে আরো মসৃণ ও আরো অভঙ্গুরতার দিকে নিয়ে চলেছে, পরম্পরার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শেষ। এই প্রতিটি

ধার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদাহরণ সহযোগে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এমনকি দেশ ভারতবর্ষের মধ্যেও এই প্রতিভাস সম্ভব, তবে তা এখানকার বিবেচ্য নয় ( অন্য কোথাও তার দীর্ঘ আলোচনা করব )।

এখন দেখার চেষ্টা করব সমাজ-আরোপিত বিচ্ছিন্নতায় ভয়ালতা। বিষয়টা টটোলজীতে যেন না পড়ে। এতক্ষণ দেখাতে চেয়েছি মাস-মার্কেট-ব্যুরোক্রাসিতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানুষের ভ্রান্ত সচলতার কথাকাহন. এবার আরো গভীরে যাবার চেষ্টা করব; মাস-মার্কেট-ব্যুরোক্রাসীর অভ্যন্তরে যাব, বিচ্ছিন্ন মানুষের গভীরে যাব—দেখব বিচ্ছিন্নতা কতটা দগদগে, কতখানি ইমিউনিটিনাশী।

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য )

## বিপুল চক্রবর্তীর কবিতা

### তর্পণ

এই স্নান
আমার অপ্রিয়

ত্যাখো, আমার পিতার স্পর্শ
ধুয়ে যাচ্ছে
ত্যাখো, আমার পিতার গন্ধ
স'রে যাচ্ছে

সরে যাচ্ছে
ক্রমাগত দূরে

### ডাক

একদিন নক্ষত্রেরা ডেকে নেবে তাকে
প্রতীক্ষায়
তাই সে রাত্রি জাগে—

সেই উন্মাদিনী
নদীর কিনারে ব'সে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে নক্ষত্রের পদধ্বনি শোনে

এ শহর জানেনা আমার ডাকনাম
বাঁকুড়া স্টেশন থেকে, একদিন, ট্রেন ছাড়তেই
অসংখ্য চাকার শব্দে ঝম্‌ঝম্ বেজে উঠেছিলো : ক'লকাতা

তারপর হাওড়া-পুল, মনুমেন্ট, সারিসারি ছুটতে-থাকা আলো

পেরিয়ে অন্ধ গলি, ক'লকাতা ক্রমে ক্রমে নিজেকে দেখালো।

আজ, এই জিনসের শহর ছেড়ে আবার আবার
বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়ার কাছে মাথা-নিচু ফিরে যেতে চাই

পিছনে পাতাল রেল, স্টেডিয়াম, ছুটতে-থাকা লাল নীল আলো।
আমার সবুজ রক্তে ক'লকাতা আরো বুঝি নিজেকে সাজালো।

জন্ম

এখানে আমার জন্ম, তবু
আমি যশোদার, আমি বন্ধু সুদামার

তবে, কেন এ শহরে ফিরে আসা
সেই নীল কথা, বন্দিনী শহর শুধু জানে

শিকড়

প্রশ্ন উঠলো শিকড়ের এবং মাটির

আমি দেখেছি পাখির ঠোঁটে উড়ে যেতে
বিশাল অশ্বত্থ, বট
সবুজ ধানের দেশ
ডানায় ডানায়

শিকড়ের প্রশ্ন থাক

অন্ধকারে ফুটে উঠছে
ফুল

ছাখো

## চিতায় না হোমে

শুভ বসু

শিখাগুলি ঠিকঠাক প্রাণ পায় চিতায়, না হোমে ?

না-কি এই দুই
আজকে এ শতাব্দীর শেষ পাদে যখন ফাটল
পাহাড়কে বামনের লালাঝরা সমকামিতায়

বেঁধে ফেলে, রোগা ঢ্যাঙা কালপুরুষের
দিকে থুথু ছুঁড়ে দেয়,—

একাকার হয়ে যায়!

বেদীতে আমিষস্বাদ নেই বলে বেদীকেই দাউদাউ চিতা
রচনার ঝুঁকি নেয় নিজের মর্জিতে!
শহরে নগরে তার পোষা এক দৈত্যের মত মৃত্যুর
তাণ্ডবে ওঠে চারদিক থেকে হাজার হাজার আর্তি
পোড়া মাংসের গন্ধে যা ঘোর নারকীয়, যেন কল্কী
আত্মমহিমা প্রচারে এখন পুরোপুরি মেতে উঠেছেন।

এভাবে তাহলে মিটে যাবে সেই শতাব্দী, যার
বাঁকে বাঁকে ছিল বিস্ময়, যার সুকৃতিফলে
নীহারিকাটিরও গোপনতা সরে গিয়েছিল, মহানীলিমার
আবরণ টুটে সবখানি প্রায় দেখা দিচ্ছিল স্পষ্ট।

শিখাগুলি ঠিকঠাক প্রাণ পায় চিতায় না হোমে?

নাকি এই দুই
একাকার হয়ে যায় পোড়া মাংসের ঘ্রাণে পাড়ায় পাড়ায়
বাতাস ঘুলিয়ে উঠলে মানুষের তৃপ্তিমাঙা ঘুম
যখন আচমকা ভাঙে, যখন সে স্খলিত সংবিত

ফিরে পেয়ে নিজেকে জাগায়, অতি ব্যগ্রতায় ছুটে যেতে চায়
মানুষের কান্না, আর্তি, ভয়ার্ত চিৎকার
খুঁজে খুঁজে উপসম দিতে ; যে আগুন চিতার উল্লাস
তাকে রুখে দিতে চায় সংগঠনমহিমায়, ঘিরে ঘিরে নেয়

যেমন নিষাদদল লোলুপ ন্যগ্রধে, আর বশ করে
নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিতে চায়
যেন তা যজ্ঞেরই কাজে লাগে, সমিধের কাছে
পরম মর্যাদা ফিরে পায়।

## ঘুঙুর

অমরেশ বিশ্বাস

যেখানে রাত্রির বুকে মেহেদি-রাঙানো কারো হাত
নিশ্চুপ এঘরে শুনি রুমঝুম রুমঝুম স্বপনে হঠাৎ
কবিতারই চলাফেরা শব্দ দিয়ে নির্জনতা চাটে
ঘুঙুর বাজে না আর কথা ছোঁড়ে মগজে সপাটে।

আগুনই তো সর্বভুক রক্ত কবে খেয়েছে আগুন
কবিতার বাড়ি খেয়ে কেউ কেউ হয়ে গেছে খুন
ব্যাপক তল্লাশি চাই পণ্ডিতেরা চোখে পরে ঠুলি
ঘুঙুরের ছাপ ছাখে কানে বাঁধা শব্দের কাঁচুলি।

## দুটি কবিতা

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

### ওখানে যাবো না

ওখানে যাবো না আর
নদীতট
ওই বৃক্ষতল
ছায়াময় নিঃসাড় আঙিনা
দগ্ধায় হৃদয় বড়
উদয়াস্ত তোমার স্মরণ
কুরে খায় হাড়মাস
বাসা বাঁধে স্বপ্নের মৌমাছি

তাই দূরে যাওয়া
দূরে যেতে চাওয়া
প্রিয়
তোমাকে ভুলবো বলে ভুলে যেতে চাই

ওখানে যাবো না

প্রত্যেকে তোমার

সহিষ্ণু হলে না কেন
স্থিতপ্রাজ্ঞ সুস্থির বিনয়ী
নম্র হতে চেয়ে
হলে দীন
পথের ভিখারী
ভালোবাসা ওভাবে মেলে না

বরং অপেক্ষা করো
দৃঢ় হও
লোভে নয়
ধ্যানে মৌনে প্রত্যয়ে নিবিড়
মৃত্তিকার কাছে যাও
বৃক্ষের নিকটে শেখো
আত্মদান
প্রত্যাশাবিহীন

বুকে হাত রাখো
ছাখো
তুমিও তোমার নও
প্রত্যেকে তোমার

## অভিশাপের শর্ত

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অসময়ে পাতা ঝরলে থেমে যাবে সমস্ত স্পন্দন
আমার পাপের দণ্ডে সূর্য যেন টুকরো হয় চোখের ওপর ।

গভীর রাত্রির চেয়ে শিল্পায়ত কোনো নক্ষত্রের
বিভোর ঔদাস্যে যদি উঠে আসে দ্রুত কালসাপ
রক্তকণিকায় যেন নেমে আসে খরা ।

তুমি যদি দীর্ঘ শাদা শিকড়ে জমাট
রুপোলি বুদ্বুদ যেন ছাই হয়ে ঝরে যায় অনবধানেই।

আমার পাপেই হবে পরাজয় শব্দহীন, অবিমৃষ্য বাঁচা
আমারই পাপের ফলে আঁচলের জলবিন্দু বন্ধ্যা হয়ে যাবে
তুপায়ে বিলগ্ন হওয়া মাটি।

## ঘুঁটে ও হামিদের নানী

কমলেশ পাল

আমাদের ঘুঁটে চাই উনুন জ্বালাতে
সে ঘুঁটে জোগান দেয় হামিদের নানী।
হামিদ ফেরার। তাকে থানাবাবু খোঁজে মাঝে মাঝে।
হেঁসোর একটি কোপে আমিনুল্লা চৌধুরীর হাত
কেটে সে পালিয়ে গেছে। ধানের বখরা নিয়ে আগে
এরকম রক্তপাত হয়নিকো আমাদের গাঁয়ে।
হামিদের কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন
নানী বলবে : শত্তুর! শত্তুর!

নানীর কোমরে বাত, ঝুঁকে গেছে হাড়ের কাঠামো
মাথায় শনের মতো রুখুশুখু নিঃতেল চুলের
নুড়ি নিয়ে ঝুড়ি কাঁখে ঘোরে মাঠে চৌপর দিন ;
যখনই গোবর ছ্যাখে খুঁটে তোলে ক্ষুধার্ত আঙুলে।

রোদ্দুর ঝিমিয়ে এলে নানী দেয় ঘুঁটে।
গোরের পাঁচিল জুড়ে তার শীর্ণ পাঁচ আঙুলের
জেদী ছাপ ফুটে ওঠে অতি ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটির মতো
অজস্র চরের মতো তাল্‌তাল গোবরের ঘৃণা ও আক্রোশ
ছুঁড়ে দেয় বিরুদ্ধ দেওয়ালে—
পড়ন্ত আলোয় যেন চুল তার শিখা হয়ে ওড়ে—
'শত্তুর! শত্তুর!' প্রতিটি নিঃশ্বাসে তার
নিপাতের বীজমন্ত্র ঝ'রে পড়ে সম্ভবা মাটিতে।

শত্তুর হামিদ ? নাকি হামিদের বিরুদ্ধবাদীরা ?
উত্তর সহজ নয়। কেবল রাত্রির সন্নিপাতে
আমাদের সময়ের পরিপুষ্ট দ্রোহহীন গালে
অজস্র ঘুঁটের চড় মেরে যায় হামিদের নানী।

## স্বপ্ন ও সেফ্‌টিপিন

রমেন আচার্য

খস্‌খসে চামড়ার আলিঙ্গন থেকে মুক্তিপাওয়ার জন্য
আঙুলহীন সাপ কি ভাবে খোলে তার খোলস, আর
সেফ্‌টিপিন !

শক্ত, প্রায় নিরেট গোলাপ কুঁড়ি তার শরীর থেকে
আলগোছে ছাড়াচ্ছে যে পাপড়ি তাতে কিন্তু কোন
রক্ত লেগে নেই !
আমি চাই এরকম রক্তপাতহীন অস্ত্রোপচার শিখতে। আর
সাঁতার শিখবো স্থচ স্থতোর কাছ থেকে। যে সারা জীবন
কাপড়ের ঢেউয়ে ডুব-সাঁতার দিতে দিতে এগিয়ে গেছে
পারমানবিক সভ্যতার দিকে।

কিন্তু তার আগে বহু ব্যবহৃত খোলস ছাড়া দরকার।
আঙুলহীন সাপ কি শক্ত বাকলে ঘষে ছেঁড়ে
তার জীর্ণতা !
সে কি কুঁকড়ে মুচড়ে তার প্রাত্যহিকতার খস্‌খসে খোলস ছিঁড়ে
রোদ্দুরে ঝিলিক দেওয়া নবীন ফণা তুলে বলে 'স্থপ্রভাত' !

কিন্তু সেফ্‌টিপিন ? যা অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য আমরা
সাধ করে জীবনযাত্রার মধ্যে এনেছি, যা
জীবন ও সংস্কারের পথে দাঁত কামড়ে বসে আছে,
তাকে ?

ক্যালেণ্ডারের মত নির্দয়ভাবে নিজেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে
নববর্ষের আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানি না। চাই না

ব্যথিত সূচ হতে। যে সূচ সমস্ত জীবন ধরে বুনে চলেছে ফুল,
কিন্তু সুতো ছাড়া! যে পেছনে
সুতোর মত কোন পথ-চিহ্ন রেখে আসেনি। এমন কি
তার প্রথম ফোঁড়ের জন্ম বিন্দুকেও সে চিরকালের জন্য
হারিয়ে এসেছে এক আকাশ নক্ষত্রের মধ্যে।

## মৌ-এর জন্য দু-টুকরো

অভীক মজুমদার

১.

লাল বল ধাওয়া করা ছাদ পরিক্রমা শেষে
একা বিকেলের কোণে পেয়ে গেছি প্রথম যৌবন,
টাট্‌কা রক্তের মত শিরায় ছুঁয়েছে খ্যাপা মহিষের
টগ্‌বগে শ্বাস
ভেবেছি অনেক কিছু দিয়ে যাব, রঙিন বেলুন নয় শুধু
ভেবেছি জবুথবু ন্যাতানো বইয়ের পাতা, অক্ষর বমন নয়
স্নাত এক বাংলাদেশ দেব তোর হাতে ঠিক অনায়াসে তুলে।
আজ শুধু দেখতে পাচ্ছি
শিশুহাতে দিয়েছি কেবল
মুখর স্নো-এর কৌটো, সুগন্ধি পাউডারের স্নেহ;

২

চোখের জলের মুঠো খুলে দিলে ভেসে ওঠে মৎস্যগন্ধী শোক।
এখনো তো তোর
হাতে দিব্যি মানিয়ে যায় ঝুমঝুমি, খেলনাবাটি, পুতুলের ডগডগে
চোখ। কিম্বা
এমনই হয়, ছোট দেখতে ভালো লাগে তোকে। এদিকে মাথায়
হয়ত তোরও

ফুঁসছে লাভার পাহাড়, আঙুলের ভোঁতা শব ছুঁয়ে দেখছে

আতরমাখানো ঐ

দুরুদুরু চিঠি, বিষফুলে ভরে গেছে স্বপ্নের মাদুর উঠোন।

আমারও এমনই

হতো, তাহলে কি স্থিতিজাড্য একে বলে ইশ্‌কুলের ক্লাশে ?

তাহলে তুইও

পাবি যথারীতি দলামোচড়া বর্ণমালার অধিকার, আমার মতই

কিছু ক্ষয়াটে

কবিতা লিখে অসহায় মাথা নাড়বি, উড়ে যাবে নিঃসঙ্গ ফানুস—

## দ্বন্দ্বময় জীবনের শিল্পিত রূপ

বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে ছোটগল্পের সন্দেহাতীত আধিপত্য নিয়ে আজ আর কেউই বোধহয় প্রশ্ন তুলবেন না। মূলত বিদেশী অনুপ্রেরণায়, জীবনের বিদ্যুৎ-ক্ষণিক মুহূর্তগুলির শিল্পায়ত রূপকে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ছোটগল্পের ভূমিকা যথার্থ। পাশাপাশি বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল সামাজিক বর্ণমালা। সেই রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, বিভিন্ন অগ্রজ লেখকদের হাত ধরে সামাজিক বাস্তবতার সেই ধারাটিই ক্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে। আজকে তার আঙ্গিক ও বিষয়কে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলেছে, তবু গৌরবময় সেই ঐতিহ্য এখনো অটুট আছে।

আশার কথা, একেবারে হাল-আমলের লেখকরাও, এই ধারাটিকে নতুন নতুন ভাবে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। আজকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি এই সময়ের দুজন তরুণ গল্পকারকে, যাঁদের চিন্তার ভরকেন্দ্রে আছে এই ঐতিহ্য, অথচ নিজস্ব স্বকীয়তার লক্ষণগুলি ইতোমধ্যেই ফুটে উঠতে শুরু করেছে তাঁদের গল্পে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর গল্পের মেজাজটি, তাঁর বলার ভঙ্গি একেবারেই নতুন, কিন্তু তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যে লুকিয়ে আছে আবহমান আমাদের স্বদেশ, জমি এবং লোভী ও হাভাতে মানুষের সহাবস্থান। এমনকী গল্পগ্রন্থের 'ভূমিসূত্র' নামের মধ্যেও পাওয়া যাবে এমনই ইঙ্গিত। আবার সৈকত রক্ষিতের বলার ভঙ্গিটি মনে পড়ায় পূর্বতন অনেক লেখককেই, কিন্তু তারই মাঝে মাঝে দু-একটি আশ্চর্য নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে বদলে যায় তাঁর বিষয়বস্তু। আমাদের অতি প্রাচীন গ্রাম-সমাজকেই সৈকত যেন দেখতে চান নতুনভাবে, খুঁজতে চান হাজারো অবদমন ও অভাবের মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকার আদিম সূত্রগুলিকে। জীবনকে আবিষ্কারের কাজে স্বপ্নময় নির্মম, নিরাসক্ত, কিন্তু সৈকত সেখানে দরদী ও সহানুভূতিতে উজ্জ্বল। এই দুজনের মিলটি হল, নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় দুজনেই যথাসম্ভব সৎ থাকতে চেয়েছেন।

নিজের সীমার বাইরের বিষয় নিয়ে গল্প লেখার মতো নষ্টবুদ্ধি তাঁদের আচ্ছন্ন করেনি। এটাই তাঁদের শক্তি ও কিছু-অংশে দুর্বলতারও কারণ।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর 'ভূমিসূত্র' গল্পগ্রন্থে গল্পের সংখ্যা দশ। সবকটি গল্পই গড়ে উঠেছে গ্রামকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এই গ্রামীণ সমাজ শোষণে ক্লান্ত বা সুজলা সুফলা—সাহিত্যের যে দুটি মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে, তার থেকে অনেক দূরে। বরং স্বপ্নময়ের গল্পে আমরা এমন একটি পরিবেশ পাই, যেখানে গ্রাম-সমাজের সর্বগ্রাসী ভাঙনের ছবিটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতি তলানিতে এসে ঠেকেছে, সামন্ততন্ত্রের গোদা পায়ের লাথিতে জমি থেকে ছিটকে যাচ্ছে মানুষ। তিরিশ বছর আগে জমিকে কেন্দ্র করে গ্রামে যে স্থিতিশীলতা ছিল, তা আজকে ভেঙে-চুরে তছনছ হয়ে গেছে। আর এই ফাঁকে মাথা চাড়া দিচ্ছে একদল নব্য ক্ষমতাবান মধ্যবিত্ত শ্রেণী, দালালি বা পঞ্চায়েতী কাজ-কারবারে যাদের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা দুই-ই জমেছে। স্বপ্নময়ের গল্পে বিবদমান এই দুটি শ্রেণীকেই, তাদের সীমাবদ্ধতা সমেত, তুলে ধরা হয়েছে। 'রত্নাকরের পাপের ভাগ', 'কল' 'ভূমির নিত্যতা সূত্র', 'ভর', 'তথ্যচিত্র' ইত্যাদি গল্পে ফুটে উঠে এই বিপরীত জীবনধারা। মূলকেন্দ্রে থাকে নব্য ধনীদের জীবন। তিনকড়িবাবু, রতিকান্ত, রক্ষিতবাবু ইত্যাদি মানুষগুলোর কৃত্রিম জীবনকে ছোট ছোট আঁচড়ে দারুণভাবে এঁকেছেন স্বপ্নময়। কিন্তু সবসময়েই তাদের সংলগ্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে সেই সব মানুষগুলো, যাদের শ্রম-রক্তে গঠিত হয়েছে সুখের ইমারৎ।

কিন্তু তারা কখনোই অচেতন নয়। এটাই স্বপ্নময়ের গল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। কেষ্ট, সুবল অথবা নয়নতারারা কখনোই তাদের নিজেদের অবস্থান ও চলমান দ্বন্দ্বটি সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। বেশ বোঝা যায়, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই স্বপ্নময় গল্প লিখতে এসেছেন। হয়তো এইসব মানুষগুলো তাঁর পাঠক নয়, তবু এর মাধ্যমে শহুরে পাঠকেরাও নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে পারে। এই বিষয়টি সবচেয়ে ভালভাবে এসেছে 'কল' গল্পে। বাবুদের বাড়ির মাহিন্দার সুবল, প্রবল রাগে বাবুদের বাড়ির পোষা ইঁদুরদের বিষ খাওয়ায়। কিন্তু পাকেচক্রে সেই বিষাক্ত ইঁদুর খেয়েই মৃত্যু হয় ওর স্ত্রীর। সুবল ডাক্তারের কাছে যাবে, নাকি টাকার জন্য বাবুদের কাছে যাবে, ভাবতে ভাবতে দাঁড়িয়ে পড়ে। "একেবারে কলে পড়ে গেছে সে। কলে কি এখন পড়েছে. কলে তো আটকানোই ছিল।" কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে, ভাবতে পারে তাঁর দুর্ভোগের

কারণগুলিকে। বছরে মাত্র দুশো টাকার মাহিন্দার সুবল ভাবে, "এ কল থেকে বেরুতে হলে বাবুদেরও কলে ফেলতে হবে।"

এই সচেতনতার মাত্রাটি স্বপ্নময়ের গল্পে প্রথম থেকেই হাজির ছিল। এখানে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে সরাসরি গদ্যভাষা। টান টান ভঙ্গিতে তীক্ষ্ম ভাষায় স্বপ্নময় এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছেন, যেখানে এই সচেতনতাটিও তীব্রতা পেয়ে যায়। গদ্যচর্চার দুঃসময়ে স্বপ্নময়ের আবির্ভাব আমাদের আশাকে উস্‌কে দেয়।

আবার এই তীক্ষ্ণতাকে বিষয়বস্তুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৈকত রক্ষিতের গল্পগ্রন্থ 'জন্মভূমি বধ্যভূমি'-তে। সৈকতের ভাষা অনেক প্রথাসিদ্ধ। আধুনিক গ্রাম-সমাজের যে প্রেক্ষিতটিকে আমরা আগে আলোচনা করেছি এখানে তাকে মেনেই সৈকত ধরতে চান প্রবহমান জীবনধারাকে। স্বপ্নময় যেমন দ্বন্দ্বটিকে লক্ষ্য করেছেন বাবুদের জীবনকে ধরে, সৈকত কিন্তু একই দ্বন্দ্বকে ধরতে চান হাভাতে মানুষগুলোর জীবনের মাঝে। এখানে গল্প আছে মোট আটটি। গল্পগুলিতে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া সন্নিহিত অঞ্চলের জীবনকে রক্ত-মাংস সমেতই তুলে এনেছেন সৈকত। এখানে ডায়ালেক্টের ব্যবহার ও ভাষার প্রয়োগ গল্পগুলির প্রকাশভঙ্গিতে অনিবার্য মনে হয়। অস্থানিক, রাঙামাটি, কসাই, চুন, লক্ষ্মণ সহিস—একের পর এক গল্পে সেই অঞ্চলের জীবনধারাটি উঠে আসে। বিচিত্র সব মানুষের মিছিল, বিচিত্র তাদের পেশা, মানসিক প্রতিক্রিয়া। তীব্রতা নয়, সৈকতের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মানবিক-দৃষ্টিভঙ্গি। শেষপর্যন্ত যখন বিষয় ও আঙ্গিককে ছাড়িয়ে এই দরদী প্রাণকেই বেশি বোঝা যায়, তখন তাঁর অকৃত্রিমতা নিয়ে সন্দেহ থাকে না। এ-প্রসঙ্গে বলা যায় 'রাঙামাটি' গল্পটির কথা। সাঁওতালদের গ্রাম রাঙামাটিতে বনমালীর স্ত্রী সঞ্চারানী পাকে-চক্রে ও ষড়যন্ত্রে সাব্যস্ত হয় ডাইন হিসেবে। দরিদ্র বাস্তবতার এটি আদিম সূত্র। কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা তর্জনী বাড়ায় ডাইনের বিরুদ্ধে, তাদের মধ্যে দুয়েকজন তার বিরুদ্ধে যায়! শেষপর্যন্ত জরিমানার বদলে যখন বনমালীর গরু অথবা বাড়িতে হাত পড়ল, তখন কালীর সহায়তায় গ্রাম ছাড়ে বনমালী। কিন্তু বড় কঠিন হয়ে থাকে এই প্রশ্নটি: "সত্যিই তো, কোনদিকে যাবে তারা? কোথায় তাদের নিজেদের বাসভূমি"। তখন লেখকের মানবিক অবস্থান আর দৃষ্টিভঙ্গিটিও গোপন থাকে না।

এইভাবেই আবার সামাজিক বাস্তবতার অন্য মাত্রা দেখা যায় 'লক্ষ্মণ সহিস' গল্পে। শহুরে শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কিভাবে পিছু হটছে গ্রামীণ ক্ষুদ্র

শিল্প, অধিকাংশ লোক আশ্রয় নিচ্ছে শহরের ফুটপাতে, এই অনিবার্য ভাঙনের ছবিটি এই গল্পে উজ্জ্বল। এই গল্পের নায়কও, খরার প্রকোপ থেকে বাঁচতে "ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে, লক্ষ্মণ, কোদাল হাতে চলে যায় শহরের দিকে।" আশ্চর্য অমোঘ ভাষায়। সৈকত এই ভাঙনকে তুলে ধরেছেন, যেখানে শহর ও গ্রামের দূরত্বটি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে দুটি বিপরীত মেরুতে চলে যায়।

কিন্তু যে অভিজ্ঞতা তাঁদের মূল সম্পদ, যার প্রতি তাঁরা দুজনেই সৎ থাকতে চেয়েছেন, কথনো কথনো সেই অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণের অভাবে গল্পের বৃত্তটিকে বেশ সীমাবদ্ধ মনে হয়েছে। হয়তো এই কারণেই কিছু-অংশে হারিয়ে যাচ্ছে বিষয়ের বৈচিত্র, অতি-কথন দোষে কিছুটা ক্লান্তি আসে। কেননা, অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ না ঘটলে তো বিষয়বস্তুরও পরিধি-বিস্তার ঘটে না। ফলে দুজনের' গল্পেই পুনরাবৃত্তি ঘটছে মাঝে মাঝেই। আশা করি, এ-বিষয়ে তাঁরা সতর্ক হবেন। অবশ্য এই ত্রুটি তাঁদের গল্পের সামগ্রিক উজ্জ্বলতাকে কথনোই ঢাকা দিতে পারেনি।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

---

ভূমিসূত্র। স্বপ্নময় চক্রবর্তী। প্রমা প্রকাশনী। দশ টাকা।

জন্মভূমি বধ্যভূমি। সৈকত রক্ষিত। শিল্প সাহিত্য। বার টাকা।

## একটি একাঙ্ক নাটক-সংকলন

রঞ্জিত রায়চৌধুরীর "জতুগৃহজাত ও অন্যান্য" একাঙ্ক সংকলনটি চতুষ্পদী। "রঙ্গনায়ক উৎসব' 'তামাশা' 'জতুগৃহজাত' এবং 'সাতগাঁয়ের সঙ' নাটিকাগুলি তাঁর সাম্প্রতিককালের রচনা। এই সংকলনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল নাট্যকারের নিজের লেখা ভূমিকাটি যা দৈর্ঘ্যে 'তামাশা'র চেয়েও কিঞ্চিৎ বড়।

"রঙ্গনায়ক উৎসব" সংকলনের প্রথম নাটক। অত্যন্ত যান্ত্রিক ভাবে চমকাশ্রয়ী একটা গল্প বলার চেষ্টা করা হয়েছে। নাট্যশিল্পের মৌলিক অথবা মিশ্র কোন ফর্ম-এর মধ্যেই একে ফেলা যায় না। অধুনা বাংলা নাটমঞ্চে বহু ব্যবহৃত চমকগুলিকে তিনি ইচ্ছামত পাশাপাশি রেখেছেন। "রঙ্গনায়ক উৎসব"-এর থিম হল যুদ্ধ। ছৌ-নাচের শিল্পী মুখোশ খুলে ফেলে একটা বড় সংলাপ বলে। তাতে থাকে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও স্বপ্নের বৃত্তান্ত। রূপাম্বরা ও রঙ্গনায়কের কথোপকথন থেকে নাটকের প্রেক্ষাপট স্বচ্ছ হয়। রাজাজ্ঞায় শিল্পীদেরও আজ যেতে হবে "রঙ্গভূমি থেকে রণাঙ্গন।" নারী প্রতিবাদ করলে নায়ক তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে "রাজ অনুগ্রহে পুষ্ট যে জীবন তোমার আমার সে জীবনে এ সমস্তই মূর্খ বাচালতা।" নারী সব ছেড়ে চলে যাবে দূরে গ্রামদেশে, নায়ক তার সঙ্গী হবে না। তারপর আলো কমে আবার বাড়লে রণাঙ্গন ফেরত যুবকের সাথে দেখা হবে আড়কাঠি যদুর। যুবক জানতে পারবে যদু গ্রামের শিশুদের নিয়ে গিয়ে জমিদারের কাছে বেচে এবং যুবকের তাড়া খেয়ে সে মঞ্চ থেকে চলে যাবে। তারপর ব্যবসায়ী আসবে। পুরুতমশায় ঢুকলে তাকে ব্যবসায়ী লুকিয়ে উৎকোচ দেবে। গ্রামের লোকদের কাছে পুরুত ব্যবসায়ীকে সস্তায় গাছ বিক্রির উমেদারী করবে। তারপর গান, নাটকের রিলিফ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ-অনুচর রঙ্গনায়ককে চিনতে পারবে। অনুচর গাইয়েদের শত্রুর চর বললে নায়ক তার প্রতিবাদ করবে নিজের জীবন বিপন্ন করে। একদিকে রাজঅনুচর, ব্যবসায়ী, পুরুত এরা খুব খারাপ, আর একদিকে যুবক, গাইয়ের দল, রঙ্গনায়ক ও রূপাম্বরা এরা সবাই দেবদুর্লভ। এত সরল জীবন কখনো হয় না, জীবন নিয়ে শিল্প তো নয়ই। যুদ্ধের সময় বাঁচার যে কত কঠিন তা তো বিংশ শতাব্দীর স্কুলের ছেলেদেরও অনুভবে আছে।

'তামাশা' পথনাটিকাটি চার চরিত্রের। এক শহুরে নায়ক শহরের মঞ্চে গরিবদের দুঃখ নিয়ে 'থেটার' করে। অভিনয় সেরে সে যখন বাড়ি যাবার পথে তখন তিনজন খেটেখাওয়া মানুষ তার সামনে এসে দাঁড়াল। তারা এই জনগণের শিল্পীর সঙ্গে একটা হিসেব-নিকেশ চাইছে। তারা নায়ককে ছাড়তে রাজি হল এক শর্তে যদি নায়ক "এরপর থেকে তোমাদের ঐ বাবুদের কেচ্ছা বেঁচে পেট চালাবে। আমাদের দুঃখ নিয়ে কারবার করবে না।" নায়ক কথা দেয় ও করে দেখাতে শুরু করে। প্রথম ব্যক্তি কান্নায় ভেঙে পড়লে নায়ক তাকে আস্তে আস্তে তুলে ধরে ও আন্তরিক স্বরে কথা বলতে থাকে। এই একটি মাত্র ঘটনার অভিঘাতে শহুরে নায়ক ডি-ক্লাসড হয়ে গেল।

"জতুগৃহজাত" কবির লড়াই দিয়ে শুরু। সেখান থেকে মহাকাব্যিক চরিত্রে হঠাৎই গমন। মঞ্চে যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন। যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণে অর্জুনের পতন নিয়ে আলোচনা শেষ করতে না করতে ভীমসেন পড়ে গেলেন। সারমেয় নিয়ে ইন্দ্র, ধর্ম ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন চলাকালীন মঞ্চে "মিথ্যে কথা" বলতে বলতে 'পোড়ামুখ'-এর প্রবেশ। পোড়ামুখকে প্রথমে কেউ চিনতে পারবে না। যুধিষ্ঠিরও না। পোড়ামুখের কাছ থেকেই জানা যাবে সে হল সেই নিষাদপুত্র যার মা ও চারভাইকে বারাণবতে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। নিষাদ পোড়ামুখের ভারতসম্রাট যুধিষ্ঠিরের কাছে দাবি যে যুধিষ্ঠিরের আজকের প্রতিষ্ঠার পিছনে সমাজের অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ছয় নিষাদের জীবনদান। আজ যে অরণ্যে পলাতক বিপ্লবী কাল সে রাজা হওয়ার পর, যারা তার জন্য আত্মত্যাগ করেছিল তাদের সে ভুলে যায়। যুধিষ্ঠির অস্বীকার করলে 'পোড়ামুখ' ব্যাসদেব তথা শিল্পীকে সাক্ষী মানেন। আবার কবিগান। পোড়ামুখ জিজ্ঞেস করে—"আজ যারা দর্শক আসনে আছেন একবারও কি তাদের মনে হয়েছে কেন নিরপরাধ একটি নিষাদ পরিবারকে জতুগৃহে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল?" আজও এখানেও কি সহায় সম্বলহীন মানুষেরা উচ্চাভিলাষী মানুষদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মিথ্যা আদর্শের শিকার হচ্ছে না?

"সাতগাঁয়ের সঙ" সাতগাঁয়ের একটি উৎসব। সাতগাঁয়ের এ উৎসবে কোন প্রতিমা নেই। নেই কোন মন্ত্র-ফুল বেলপাতা। গাঁয়ে বিত্তবান ও বিত্তহীনরা বাস করে। বিত্তহীনের দল পান্না সাপুই, দুর্যোধন, নিধিরাম, ছিদাম এদের মুখোশ পরে সঙ সাজবে। এদের নিয়ে গান বেঁধেছে। এদের সঙ্গে দারোগার আছে গোপন আঁতাত। পান্না-নিধিরামরা সঙ উৎসবটিকে বানচাল করতে চায় কিন্তু মুখোশ এঁটে এক ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিতে মধ্যরাতে

ধনীদের সব চক্রান্ত বানচাল করে দেয়! মুখোশ খুললে দেখা যায় সে "শোভন চাচা।" হিন্দুদের উৎসবে মুসলমান সক্রিয় অংশ নেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নমুনা। এমন কি শেষকালে হারাধন ও তার বউ পদ্ম—তারাও সঙের অভিনব করে! নারী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, সংলাপ, দৃশ্যসজ্জা, মধ্যরাত, বিকেলের আলো, পুকুরপাড়, গাছতলা—কি নেই এখানে!

এ আলোচনার শেষে যে কথাটা বলা অবশ্য কর্তব্য তা হল মুদ্রণ অতি অপরিচ্ছন্ন ঝকঝকে ল্যামিনেটেড মলাটের ভেতরের ছাপা, বানান ইত্যাদি ব্যাপারে একটু যত্ন নেওয়া উচিত ছিল।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

---

**একাংক সংকলন। জতুগৃহদাহ ও অন্যান্য: রঞ্জিত রায়চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান: নবগ্রন্থ কুটীর। দাম: পনের টাকা।**

# পরিচয়

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৩০ টাকা

( নিজে সংগ্রহ করলে )

বার্ষিক গ্রাহক ( চাঁদা ) ৩৫ টাকা

মনি অর্ডার / চেক / ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা :—

**পরিচয়**

৩০/৬ ঝাউতলা রোড

কলিকাতা-৭০০০১৭

মনীষা এবং পরিচয় অফিসেও গ্রাহক হওয়া যায়।

দুই তরুণ কবি

বিদ্যুৎ সেনগুপ্ত

প্রবীর দাশগুপ্ত-র

মৃত্যুতে

আমরা সন্তপ্ত

PARICHAYA FEBRUARY 1989 Reg. No. 13732
WB/EC—265


## JUST RELEASED

# GANDHI-NEHRU THROUGH MARXIST EYES

by

NARAHARI KAVIRAJ

An attempt at a re-evaluation of the thought of Gandhi and Nehru in the light of recent experience.

Price: Rs 35.00

**MANISHA GRANTHALAYA (P) LTD.**

4/3B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73


21 APR 1989

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : তিন টাকা

# পরিচয়

## পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০/৩ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময় ব্যবধান – মাসিক

৩ মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০/৩, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ ঐ

৫ সম্পাদক—অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৭

৬ পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :—

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট-১৯, ব্লক এইচ, সি, আই, টি, বিল্ডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীলকুমার বসু, ১৭/এল. মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা ২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণকুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ-চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৮৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৯। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ (মৃত) ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায়, ফ্ল্যাট ৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, (মৃত), ৪৮৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯।এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৭।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত) ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩সি পঞ্চানন তলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, কলকাতা-২০। ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬,

নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রিট, কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লি। ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬। ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বসু (মৃত) ২০০এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯।এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪০। ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দুস্থান জেনারেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি, বি, সি, রোড, জলপাইগুড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ (মৃত) ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি, ২৩, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ। ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১।এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা-২৯। ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২।১, ব্লক-ও নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট-বি-সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১।২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৬। বিশ্বা মুন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট-২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সুরেন রায়চৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২।

আমি রঞ্জন ধর এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

স্বাঃ রঞ্জন ধর

২০-৩-৮৯

৫৮ বর্ষ ৮ম সংখ্যা মার্চ ১৯৮৯ চৈত্র ১৩৯৫

সূচি

প্রবন্ধ



কবিতাগুচ্ছ



গল্প



দীর্ঘ কবিতা



চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

পুস্তক পরিচয়

অমলেন্দু সেনগুপ্ত অতীক বসু ৯৩

নাট্য প্রসঙ্গ

লখনৌতে নাট্যোৎসব মন্টু বসু ৯৭

প্রচ্ছদ

চিত্তপ্রসাদ


সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

---

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনাদপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# তেভাগার লড়াই

## সুশীল সেন

[ বাঙলার তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬-৫০) ইতিহাস যাঁদের জানা আছে, দিনাজপুরের সুশীল সেনের নাম তাঁদের কাছে অজানা নয়। আর সে-পরিচয় যাঁদের নেই, তাঁদের জন্যে এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন আছে যে, সুশীল সেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩৭-এ; দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক হন ১৯৪২-এ; আর দিনাজপুরে, বিশেষত পশ্চিম ঠাকুরগাঁ অঞ্চলে, তেভাগা আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে তাঁর ছিল নেতৃস্থানীয় ভূমিকা; অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অবনী লাহিড়ী, গুরুদাস তালুকদার, বিভূতি গুহ, অজিত রায় প্রমুখ।

ভারতের অন্য অনেক কমিউনিস্ট বিপ্লবীর মতো সুশীল সেনেরও প্রথম জীবন কেটেছিল বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে। 'অনুশীলন' দলের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল; ১৯৩৫ নাগাদ একটি 'স্বদেশী ডাকাতির' কেসে ধরা পড়ে নির্যাতনও ভোগ করেছিলেন। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নৈরাশ্যজনক পরিণতি অন্য অনেকের মতো সুশীল সেনকেও এই পর্বে আহত করেছিল; তাই তিরিশের দশকের শেষের দিকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে চলে আসেন আর অচিরেই হয়ে ওঠেন তখনকার নিষিদ্ধ পার্টির দিনাজপুর জেলা কমিটির অন্যতম সংগঠক।

আশৈশব দিনাজপুর শহরের বাসিন্দা হলেও কমিউনিস্ট সুশীল সেন তাঁর কাজের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন গ্রামকে। সুশীল সেনের স্ত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী সেন মনে করতে পারেন, চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে মুখে চোঙা আর হাতে ইস্তেহার নিয়ে সুশীল সেন ঘুরে বেড়িয়েছেন দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে। কাজ করেছেন গরিব রাজবংশী আর আদিবাসী চাষিদের সঙ্গে; চেষ্টা করে শিখে নিয়েছেন তাঁদের মুখের ভাষা। আর তাই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, ১৯৪৬-এর শেষের দিকে যখন তেভাগার দাবি উঠল, পশ্চিম ঠাকুর গাঁ অঞ্চলে সুশীল সেন-ই হয়ে উঠলেন সে-আন্দোলনের প্রধান সংগঠক। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে তখন কৃষক সংগঠনের কাজ করে যাচ্ছিলেন অবনী লাহিড়ী, গুরুদাস

তালুকদার, বিভূতি গুহ, চারু মজুমদার, সুনীল সেন, অজিত রায় এবং আরও অনেকে। তাঁদের কাজের মধ্যে ছিল কৃষক সমিতির প্রচার এবং হাটে 'তোলা' আদায় ও অন্যান্য নানা বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকদের একজোট করে তোলা।

১৯৪৭-এর ৪ জানুয়ারি রামপুর গ্রামে (থানা—আটোয়ারি; এখন বাংলাদেশে) ফুলঝরি নামে এক বর্গাদারের জমিতে ধান কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে তেভাগা আন্দোলনের সূচনা করা হয়; সাবিত্রী সেনের মুখে আমরা শুনেছি, জেলা সম্পাদক হিসাবে সুশীল সেন নিজে প্রথমে একগোছা ধান কাটেন। স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে (১৮. ২. ৪৭) সুশীল সেন তাঁর সে-সময়ের অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন এই ভাবে: "দেশের বিপ্লবী অবস্থা ও বিপ্লবী জীবনযাপনের কল্পনাই করিয়াছি এতদিন। আজ সত্যই সে জীবন শুরু হইয়াছে।"

আন্দোলনের এই পর্যায়ে সুশীল সেন একবার গ্রেপ্তার হলেও জামিনে ছাড়া পান। তারপর কিছুদিন তিনি গ্রামে আত্মগোপন করেন এবং স্বাধীনতার পরও ভাঙা দিনাজপুরের পাকিস্তান-ভুক্ত অঞ্চলে থেকে যান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যদিও তখন তেভাগা নিয়ে দোটানা মনোভাব দেখা দিয়েছে, সুশীল সেন গ্রামে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন; ফলে ১৬ আগষ্ট, ১৯৪৯ একটি গোপন মিটিং সেরে ফেরার সময় পাকিস্তান সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তেভাগা আন্দোলন তখন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও সুশীল সেন যে আশা ছাড়েন নি, স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে তার প্রমাণ রয়েছে তিনি তখনও ভেবেছেন, "এখন হইতে গ্রামে আধিয়ারের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে দিনমজুরদের নিজেদের মজুরীবৃদ্ধি ইত্যাদির আন্দোলন ও তাদের নিজেদের সংগঠন জিলাতে নতুন জিনিস হিসাবে দেখা দিবে।"

রাজশাহী জেলে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে সুশীল সেন যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিলেট জেলে পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৫২-এ মুক্তি পেয়ে তিনি চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গে; চব্বিশ পরগনার নতুন-গড়ে-ওঠা কলোনি অশোকনগরে স্কুলশিক্ষক হিসাবে শুরু হয় তাঁর জীবনের একটি নতুন অধ্যায়।

সাবিত্রী সেনের মুখে আমরা শুনেছি, রাজশাহী জেলে থাকার সময় সুশীল সেনের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তিনি যদি কৃষক সংগঠন আর করবেন না

বলে প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বুকে যক্ষ্মার কীট নিয়েও সুশীল সেন ঘৃণাভরে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া যায়, ১৯৪২-এ কমিউনিট পার্টির সদস্যা সাবিত্রী সেন দিনাজপুরের তেভাগা আন্দোলনে রাণী দাশগুপ্ত, বীণা গুহর সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন। স্বামী যখন জেলে, তিনি একা দিনাজপুরে শিশুকন্যাকে নিয়ে সামান্য টিউশন সম্বল করে দিন কাটিয়েছেন। স্বামীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিনেও তিনি রাজশাহী জেলে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসেন। দিনাজপুর ছেড়ে চলে আসার সময় দারুণ ঝুঁকি নিয়ে তিনি তাঁর পার্টি কার্ডটি ('রেড কার্ড') বুকে করে আঁকড়ে নিয়ে এসেছিলেন। শ্রীমতীসেনের কাছে আজও সযত্নে রাখা সেই কার্ডটি ( সদস্য সংখ্যা-১১২৮ ) আমরা দেখেছি। সাবিত্রী সেন আজও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ( সি. পি আই ) সদস্যা। এই সেদিনও ( ডিসেম্বর '৮৮ ) কলকাতায় পাঞ্জাব সংহতি উৎসবের মিছিলে হেঁটেছেন।

* * *

বর্তমান রচনাটি সুশীল সেন লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষ দিকে। প্রায়-জীর্ণ সেই পাণ্ডুলিপি থেকে নিজের হাতে লেখাটির অনুলিপি তৈরি করে রেখেছিলেন সাবিত্রী সেন—আমাদের হাতে তাঁর স্বহস্তকৃত সেই লিপিটিই তিনি তুলে দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় তাঁকে লেখা সুশীল সেনের মূল্যবান চিঠিগুলিও তিনি আমাদের দেখতে দিয়েছেন। কৃষক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি নিয়ে সুশীল সেনের ভাবনাচিন্তা, আশা-উদ্বেগের সাক্ষ্য এই চিঠিগুলি। এর মধ্যে তিনটি চিঠি অশোকনগর থেকে প্রকাশিত 'পটভূমি' পত্রিকায় ( অক্টোবর, '৮২ ) প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পত্রিকারই মার্চ' ৮৩ সংখ্যায় সুশীল সেনের ওপর একটি অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ রচনাও প্রকাশিত হয়। আমরা সেই লেখাটি থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

'তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী' স্মারক গ্রন্থে সুশীল সেনের একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সে-লেখার অনেককিছুই বর্তমান রচনাটিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-রচনাটির বিশেষ মূল্য এইখানে যে, সুশীল সেন এখানে তাঁর প্রথম জীবনের কথা এবং দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলন গড়ে ওঠার পটভূমিটি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়; স্বভাবত বিনয়ী, আত্মপ্রচারমুখ সুশীল সেন তাঁর নিজের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার কথা বড় করে দেখান নি। আর-একটি দিক হল, শ্রীসেন এই রচনায় কোনো বিতর্কের মধ্যে

যান নি। তেভাগা আন্দোলনের পরিণতি এবং কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা আমাদের দেশের মার্কসবাদী মহলে আজও একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে আছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত (মৃত্যু ফেব্রুয়ারি ১৯৮০) কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সুশীল সেন সম্ভবত পার্টির প্রতি আনুগত্যের কারণেই কোন বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চান নি। তবে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে তাঁর মধ্যে যে কিছু মৌলিক প্রশ্ন দেখা গিয়েছিল স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তেভাগা আন্দোলন কেবলমাত্র বর্গাদার বা আধিয়ারদের দাবিকেই বড় করে তুলে খেতমজুরদের মজুরি এবং অন্যান্য অধিকারের প্রশ্নে প্রায় উদাসীন থেকে গিয়েছিল। সুশীল সেন এই অবস্থানের সমালোচনা করে লিখেছেন: "কৃষকদের মধ্যে যারা বেশী গরীব—নিছক আধিয়ার আর দিনমজুর যারা তাদের মধ্যেই মরিয়াভাব বেশী। তারাই বেপরোয়া হইয়া আগাইতেছে। অথচ এতদিন এদের দিকে আমরা নজর দেই নাই। কোথাও এলাকায় নেতা হিসাবে আমরা এদের গড়ি নাই।" (স্ত্রীকে লেখা চিঠি, ৩১.৪৯)

লেখাটিতে কোন কোন জায়গায় পুনরাবৃত্তি থাকলেও আমরা কোন অংশ বাদ দিই নি। আর একটি কথা। পাঠক বুঝতে পারবেন, রচনাটি অসম্পূর্ণ। 'তেভাগা সংগ্রাম রজত জয়ন্তী' স্মারক গ্রন্থ থেকে সুশীল সেনের রচনার একটি অংশ আমরা বর্তমান রচনার শেষে বন্ধনীর মধ্যে জুড়ে দিয়েছি, যাতে রচনাটির মধ্যে একটা সমগ্রতা আসে। রচনাটির শেষে সংযোজিত টীকা আমাদের। ]

দিনাজপুর শহরে জিলা কংগ্রেসের অফিসে তখন[১] প্রতিদিনই সন্ধ্যায় আমাদের বৈঠক বসিত। আমরা ৬।৭ জন তরুণ কংগ্রেসকর্মী, সকলেই প্রায় এক বয়সের। একটু বেশি বয়সের ছিলেন গুরুদাসদা (কমরেড্ গুরুদাস তালুকদার)। প্রতিদিনই ঐ বৈঠকে তুমুল তর্কবিতর্ক চল্‌ত। "সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা"—। 'গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা' 'রুশবিপ্লব সমাজতন্ত্রবাদ'। আলোচনা ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হতে লাগলো রুশ বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রবাদ-এর উপর। সন্ত্রাসবাদ ও গান্ধীজির আন্দোলনের প্রভাব আমরা তখন প্রায় কাটিয়ে উঠেছি, নূতন পথে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। আমরা সকলেই সন্ত্রাসবাদী পার্টির সঙ্গেও কম বেশী যুক্ত ছিলাম। 'টাউন রবারী' মামলা[২] থেকে আমি কেবল খালাস পেয়েছি।

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে সকলেই পড়াশুনা করছি। বইপত্র সংগ্রহ চল্‌ছে।

পণ্ডিত নেহেরুর বক্তৃতাতেও প্রভাবিত হচ্ছি। আমরা ঠিক করলাম কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দিব। তাহাদের সমাজতন্ত্রবাদের দৌড় তখন পর্যন্ত ম্যাক্‌ডোনালড্, কোল, ও বার্নাডশ-কে বিশেষ ছাড়িয়ে যায় নাই। কংগ্রেস এর 'স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব'এর কাজকর্মর জন্য ছুটাছুটি করি। আর সেই সঙ্গে চলে পড়াশুনা, আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। কমিউনিস্ট পার্টির নাম শুনেছি, কিন্তু তখন পর্যন্তও কোন যোগাযোগ হয় নাই।

১৯৩৭ সাল –জেল থেকে ক্রমে রাজনৈতিকবন্দীরা ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে আসতে লাগলেন। ফিরে এলেন বিভূতি গুহ, ও আরও অনেকে। জেলে বা ক্যাম্পে থাকতেই এদের অধিকাংশই 'কমিউনিস্ট কনসোলিডেশন'এ যোগ দিয়েছেন। সবাই ফিরে এসে ভীড় করলেন কংগ্রেস অফিসে। বিভূতিবাবুর সঙ্গে আলোচনা হ'ল। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও সব খবর পাওয়া গেল। কংগ্রেস অফিসেই মুক্তরাজবন্দী ও আমাদের তরুণ কংগ্রেস কর্মীদের এক যুক্ত বৈঠক বস্‌লো। 'দত্ত-ব্র্যাড্‌লি থিসিস'[৩] এর উপর আলোচনা করলেন বিভূতি গুহ। ঐ থিসিসের ভিত্তিতে যুক্তভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত হ'ল। একটা হাতে লেখা পত্রিকাও বের করা হ'লো। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এর উপর বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হলো ঐ পত্রিকাতে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তোলা হল ছোট ছোট স্টাডি-সার্কেল।' মেয়েদের একটি ক্লাব এবং তার সঙ্গে স্টাডি সার্কেলও গড়া হ'ল আমাদের পাড়াতে (কালিতলা, দিনাজপুর)। মেয়েদের ঐ ক্লাব ও স্টাডি সার্কেলএর মাধ্যমে পরবর্তী কালে বীণা গুহ, রাণী দাসগুপ্ত, সাবিত্রী সেন ও পরে অনেকে পার্টিতে এসেছিল।

সেটা '৩৭ কি ৩৮' সাল হবে। পার্টি তখনও বে-আইনী। বিভূতি গুহ, আমি ও কালী সরকার, জিলাতে তিনজন মাত্র পার্টি সভ্যপদ পাই। কমরেড্ পাঁচু ভাদুড়ী[৪] শহরে এসে আমাদের তিনজনকে নিয়ে জিলায় প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি ইউনিট গঠন করে দিয়ে যান। দিনাজপুর জেলায় পার্টি গড়ার জন্য। বিভূতি গুহ হলেন সম্পাদক। কিছুদিন জেলায় কাজ করার পর প্রাদেশিক কমিটি বিভুতি গুহকে ক'লকাতায় নিয়ে যান প্রাদেশিক দপ্তরের কাজে। তখন থেকেই জিলা-পার্টির সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর পড়ে।

পার্টি ইউনিট গঠিত হবার পর শহরে কাজকর্ম ভালই চলতে লাগলো। '৩৮ সালে মে দিবসে চাল কলের শ্রমিকদের নিয়ে প্রথম আমরা মিছিল করলাম শহরে লাল ঝাণ্ডা হাতে। শহরে বেশ সাড়া পড়ল। এল পয়লা সেপ্টেম্বর,

সারা ভারত কিষাণ সভার ডাকে 'কৃষকের দাবী দিবস'। সেদিনও কংগ্রেস ময়দানে কৃষকদের এক সভা করলাম। অল্প কিছু কৃষক উপস্থিত ছিল।

কংগ্রেস অফিসের পাশেই আমরা কৃষক সমিতির জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে এক অফিস খুলেছি। তখন পর্যন্তও কৃষক সমিতির কোন সভ্য করা যায় নাই বা গ্রামেও কোন সমিতি হয় নাই। কৃষক সমিতির সভ্য করা নিয়েই আমরা সমস্যায় পড়লাম। কৃষকরা সমিতির দাবী সমর্থন করলেও সভ্য হ'তে রাজী হ'লো না। আমরা সকলেই শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কৃষকরা প্রথম প্রথম আমাদের বিশ্বাস করতে চাইত না।

এবার আমরা ২।৩ জনের এক একটি দল করে গ্রামের হাটে হাটে যেতে লাগলাম। প্রত্যেক দলের হাতেই কৃষকসভার দাবীসম্বলিত এক বাণ্ডিল ইস্তাহার, কিছু হাতে লেখা পোষ্টার, সমিতির রসিদ বইও একটি চোঙ। হাটের এককোণে দাঁড়িয়ে ঐ চোঙএ মুখ দিয়া দাবীগুলি পড়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা দেশী ভাষায় দাবীগুলি ব্যাখ্যা করতাম ও ইস্তাহার বিলি করতাম। কৃষকরা দল বেঁধে শুনতো যে সকল কৃষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতো ; তাদের নাম ঠিকানা জেনে নিয়ে গ্রামে গিয়ে যোগাযোগ করতাম। নাম ঠিকানাও আবার অনেকে বলতে চাইত না।

এবার স্থরু হলো গ্রামে গিয়ে ঘাঁটি কামড়ে পড়ে থাকা। এক একজন এক একটি এলাকা বেছে নিয়ে গ্রামেই পড়ে থেকে কৃষকদের সাথে কাজ করতে স্থরু করলাম। বিস্তীর্ণ এলাকাগুলি ছিল ক্ষত্রিয়ও আদীবাসী অধ্যুষিত। প্রায় সকলেই ছিল অশিক্ষিত গরীব কৃষক ও ভাগচাষী বা আধিয়ার। ভাগ চাষীর সংখ্যাই ছিল বেশী। দারিদ্র্য যে এত গভীর হ'তে পারে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ যে এত নির্ম্মম ও সর্বাত্মক হতে পারে সেটা প্রকৃতপক্ষে আমরা বুঝলাম গ্রামে গিয়ে তাদের সংস্পর্শে এসে।

জোতদাররা এক একজন ছিল হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক। একসঙ্গে কয়েকটি গ্রামের সকল জমিরই মালিক সে। আর গ্রামগুলির প্রায় সব কৃষকই ভাগচাষী। জমিদার, মহাজন, তহশীলদারের নানা রকম জুলুম তো ছিলই। তার উপরে ছিল গ্রামের হাটবাজারে ইজারাদারের জুলুম। কৃষক-মেয়েরা কয়েক আঁটি শাকপাতা হাটে বিক্রী করতে গেলেও হাটের তোলাবটি আদায়ের নামে তাদের কাছ থেকে প্রায় সবই কেড়ে নিত তারা। জিলাতে জমিদাররা বসাতো বড় বড় মেলা—নেকমড়দ, আলোয়াষাওয়া, কালীর

মেলা, ধলদীঘি প্রভৃতি নাম করা মেলা। মেলা থেকেই কৃষকরা হালের গরু বলদ কিনতো। ক্রয় বিক্রয়ের একটা রসিদ লিখে দিত জমিদারের লোকেরা আর সেজন্য তারা কৃষকদের নিকট থেকে আদায় ক'রতো 'লেখাই' বাবদ মোটা টাকা।

ভাগচাষীদের ফসল কেটে জোতদারদের খোলানেই তুলে দিতে হ'ত। সেখানেই ধান ঝাড়াই ক'রতে হ'ত ভাগচাষীকে। জোতদার ভাগচাষীর উৎপন্ন ফসলের আধাআধি ভাগ ক'রে নিজের অংশ সরিয়ে রেখে প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ থেকে এবার বিভিন্ন দফায় ধান কেড়ে নিত। ফলে ফসলের ভাগা-ভাগি যখন শেষ হ'ত তখন আমরা অনেক সময় দেখেছি ভাগচাষী প্রকৃত অর্থেই শুধু কুলোডালি নিয়েই বাড়ী ফিরেছে। একদানা ফসলও পায় নাই। কখনও কখনও হয়তো জোতদার সাদা কাগজে টিপসহি নিয়ে কর্জ্জবাবদ কিছু ধান তাকে দিয়েছে। এই কর্জ্জদেওয়া ধানের সুদ সহ তারা পরে আদায় করে নিত দ্বিগুণ বা তিনগুণ ধান।

এই সর্বাত্মক জুলুমের বিরুদ্ধেই আমরা কৃষকদের সংগঠিত করেছিলাম কৃষক সমিতির মধ্যে। গড়ে তুলেছিলাম কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী। সুরু হোল কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির নেতৃত্বে হাট বাজার ও মেলায় বে-আইনী আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন। লাঠিধারী কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনীর অভিযান চললো হাটে হাটে। মেলায় ভলান্টিয়ার বাহিনীর ক্যাম্প বসল। "তোলাবটি দেবনা" "লেখাই এর জুলুম বন্ধ কর" ধ্বনিতে কেঁপে উঠলো হাট মেলা। জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জিলার বর্ডারে "কালীর মেলায়" দুই জেলার কৃষক ভলান্টিয়ারদের যুক্ত অভিযান চলল। লেখাই এর রেট কমাতে মেলার জমিদার রাজী হলোনা। মেলা ভেঙ্গে নিয়ে পার্শ্ববর্তী এক মাঠে সমিতির মেলা বসান হোল। কৃষক সমিতির শীল দিয়ে বিনা পয়সায় 'লেখাই' রসিদ দেওয়া হল। কৃষকদের মধ্যে সেকি জয়ের আনন্দ! সেই সঙ্গে কৃষক সমিতির শক্তির কথা ছুটে চললো মেলার লোক মারফৎ দূর দুরান্তের গ্রামে। নেকসরদ, আওয়া থাওয়া মেলাতেও ভলান্টিয়ার নামল। কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধ হ'ল, জমিদারের লোকদের সঙ্গে। মামলা, মোকদ্দমা হ'ল। অনেক কর্মীর জেলও হ'ল। নবাবগঞ্জ থানার কালীর মেলায় ভলান্টিয়ার ক্যাম্প ভেঙ্গে দিল পুলিশ। মেলায় ভলান্টিয়ার মার্চ নিষিদ্ধ করে দিল। তা সত্ত্বেও ভলা-ন্টিয়ারের মিছিল মেলায় গেল। পুলিশ লাঠি চার্জ করল। প্রচুর গ্রেপ্তার করল।

তোলাবটি, লেখাই, ও আবওয়ারেড[৫] বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ই একটি অঞ্চলে ভাগচাষীরা 'নিজখোলানে' ধান তোলার দাবীও তুলেছিল ও আংশিক কার্যকরও করেছিল। যুদ্ধও মন্বন্তরের সময় আমাদের কাজ-কর্ম কিছু স্তিমিত হয়।

ভারতরক্ষা আইনে অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার ও গৃহবন্দী ক'রে রাখা হয়। যুদ্ধের প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'লে জাপ বিরোধী ও ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন এগিয়ে চলল। আবার স্বরু হ'ল গ্রামের হাটে হাটে ও মেলাতে কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনীর জাপ-বিরোধী প্রচার অভিযান ও বাছাই করা কৃষক ভলান্টিয়ারদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং। ১৯৪৫ সালের বিধান সভার নির্ব্বাচনে আমরা পার্টি থেকে কমরেড্ রূপনারায়ণকে জিলার তপশিলি জাতির সংরক্ষিত আসনটিতে প্রার্থী দেই। নির্ব্বাচনের লডাইয়ে আমরা কংগ্রেস পার্থী শ্রীভবেশ সিংকে পরাজিত করি। ভবেশ সিং ছিলেন জিলার এক বিরাট জোতদার। স্বভাবতঃই নির্ব্বাচনে লড়াইটি জোতদার এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভাগচাষীর শ্রেণী সংগ্রাম এর রূপ নেয়। গরীব চাষীরাও আমাদের সঙ্গে আসে। এই জয় জিলায় কৃষক সমিতি ও কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা আরও বাড়িয়ে তোলে।

নির্ব্বাচনে হেরে গিয়ে জোতদাররা ব্যাপকভাবে ভাগচাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা স্বরু ক'রে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ স্বরু করি আমরা। কৃষকরাও এবার বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। যুদ্ধ পরবর্ত্তী গণ-আন্দোলনের জোয়ার তখন স্তিমিত হ'য়ে এসেছে। ক'লকাতায় বীভৎসদাঙ্গা, নোয়াখালি ও অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এরই মুখে প্রাদেশিক কৃষক-সভায় নির্দ্দেশে[৬] ১৯৪৬ সালের ফসল কাটার মরসুমে আমরা তে-ভাগা সংগ্রাম স্বরু করি। জিলা কৃষকসমিতি ও পার্টির জিলা কমিটির যুক্ত বৈঠকে জিলার আন্দোলনের বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সেই অনুসারে আমরা এক একজন এক একটি এলাকায় দায়িত্ব নিয়ে নিজ এলাকায় চলে যাই। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অটোয়ারী-বালিয়াডাঙ্গি অঞ্চলটি ছিল পার্টিও কৃষক সমিতির সবচেয়ে সংগঠিত অঞ্চল। ঐ এলাকাতেই প্রথম সংগ্রাম স্বরু করা স্থির হয়। স্বরু করার দায়িত্ব আমার উপর পড়ে। দায়িত্ব নিয়ে আমি এলাকায় চলে যাই। কমরেড্ গুরুদাস তালুকদার ঐ এলাকাতেই কাজ করছিলেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির কাছ থেকেই শিখেছিলাম সমাজের গ্রামীণ সমাজের সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের কথা, যাদের বলাহয় সমাজের দুর্ব্বলতম

অংশ। আর কমিউনিষ্ট পার্টির কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছিলাম গ্রামে গিয়ে সেই সব মানুষের মধ্যে পড়ে থেকে তাদের সংগঠিত ক'রে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সামিল ক'রতে।

মুষ্টিমেয় আমরা কয়েকজন শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুন যুবক ছড়িয়ে পড়লাম জিলার দূর দূরান্তের গ্রামে গ্রামে। আমরা কেউ ছিলাম কংগ্রেস কর্ম্মী, কেউ ছিলাম সদ্য জেল ফেরৎ সন্ত্রাসবাদী। যাঁরা সন্ত্রাসবাদ ত্যাগ ক'রে জেলের মধ্যেই 'কমিউনিস্ট কম্‌সোলিডেশন' এ যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের তখন পরিচয় ছিল একটিই—আমরা কমিউনিস্ট। গ্রামে গিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলাম কাজে, আর মাটি কামড়ে পড়ে থাকলাম ঐ সব মানুষের মধ্যে দিনের পর দিন। তাদের যেদিন যা জুটতো তারই একটা ভাগ ছিল আমাদের দৈনন্দিন আহার। তাও কোন দিন জুটতো কোনদিন জুটতো না কোন দিন হয়তো জুটতো কচুসিদ্ধ বা কাউনের ভাত আর পাট-শাকের প্যালকা. (ঝোল)। রাত্রি যাপন ক'রতে হতো তাদেরই খড়বিহীন চালাঘরে বা তারই বারান্দায় যেখানে মানুষ ও পশু খুবই স্বাভাবিক ভাবে একই চালের নীচে রাত্রি কাটায়—একটা বাঁধা গরু বা একপাল ছাগলের পাশে বা সাঁওতাল কৃষকদের বাড়ী হ'লে এক পাল শুয়োরের পাশে। উত্তর বঙ্গের কঠিন শীতের রাত্রিগুলির অধিকাংশটাই কাটাতে হ'তো আগুনের পাশে বসে। এই ভাবেই আমরা তাদের আস্থা কুড়িয়েছিলাম। তাদের সংগঠিত করে কৃষক সমিতি ও পার্টি গড়েছিলাম।

১৯৩৮ সাল, পার্টি তখনও বে-আইনী। কমরেড পাঁচু ভাদুড়ী দিনাজপুর শহরে এসে বিভূতি গুহ, কালীসরকার ও আমি এই তিনজন পার্টি সভ্য নিয়ে জিলায় প্রথম পার্টি সংগঠন তৈরী ক'রে দিয়ে যান। জেলাতে কমিউনিস্ট পার্টি সেদিনের এই সামান্য ও অনাড়ম্বর সুচনার কথা চিন্তা ক'রলে আজ অবাক লাগে যে কেমন করে মাত্র ৮ বছরের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি জেলাব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল, শক্তি সঞ্চয় করল ও নিপীড়িত কৃষকদের নিয়ে এতবড় তে-ভাগা সংগ্রাম গড়ে তুললো যা সেদিন সমগ্র বাংলা দেশকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। তে-ভাগা সংগ্রামের পূর্ব্বে জিলাতে পার্টি সভ্য সংখ্যা ছিল চার হাজার, আর কৃষক সমিতির সভা সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার।

সেদিনের গ্রামাঞ্চলে অবস্থার চাপেই কৃষক সমিতিকে শুরু থেকে হ'তে হয়েছিল জঙ্গী সমিতি আর চালাতে হ'য়েছিল লাগাতর ছোটখাট প্রতিরোধ

সংগ্রাম. লাঠিধারী কৃষক ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলে। সেদিন গ্রামে আগে ঢুকতো কৃষক সমিতি তার পিছে পিছে যেন পার্টি। গ্রামে কৃষক সমিতি গঠিত হ'লেই সমিতি যে সকল জঙ্গী কর্মী-সম্মুখ সারিতে এসে পড়তো তাদের বাছাই ক'রে তাদের নিয়ে সে গ্রামে পার্টি ইউনিট গঠন করা হ'তো ও রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোত। পার্টি গড়ার একাজ সেদিন খুবই দুঃসাধ্যের ছিল। কৃষকরা সবাই ছিল নিরক্ষর। লেখাপড়া জানা শহরের মধ্যবিত্ত কমরেড এর সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। পার্টি স্কুল উপযুক্ত বইপত্র সিলেবাস কিছুই ছিলনা। পার্টির. ইংরাজি ও বাংলা সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র পত্রিকা ও পার্টি প্রকাশিত ২।১টি পুস্তিকাই ছিল আমাদের সম্বল। কৃষকসমিতি দ্রুত প্রসার লাভ করেছে, ভাল; ভাল কর্ম্মীও বার হ'চ্ছে কিন্তু তাদের শিক্ষা দিয়ে পার্টিতে আনার জন্য পার্টি সংগঠক কোথায় পাওয়া যাবে? জেলা কমিটি থেকে বার বার প্রস্তাব নিয়ে প্রাদেশিক কমিটিকে লেখা হ'লো। অন্য জেলা থেকে তাড়াতাড়ি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কমরেড এই জিলায় পাঠান। প্রাদেশিক কমিটি কয়েকজনকে পাঠালেনও—কমরেড জীবন দে (কোচবিহার) মহীবাগচি ( রংপুর ), গরিমা সেন ( সুবোধ সেন, ঢাকা ) প্রভৃতি এসে জেলার বিভিন্ন এলাকার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই হ'লনা। আবার জরুরী তাগিদ দেওয়া হ'ল। এবার প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক কমরেড ভবানী সেন এগিয়ে এলেন। সমস্যার বিস্তৃত আলোচনা ক'রে বললেন যে, যেভাবেই হোক জিলার লেখাপড়া না জানা কৃষক কর্মীদের মধ্য থেকেই আমাদের পার্টি সংগঠক তৈরী ক'রে নিতে হবে বাইরে থেকে মধ্যবিত্ত কমরেড পাঠিয়ে হবেনা। সে সম্পর্কে পরিকম্পনাও হ'ল।

এই ভাবেই জেলার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কৃষক সমিতি গড়ে উঠতে লাগলো ও কৃষকের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই আমাদের উপর এসে পড়লো ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার, জেল, জেলা থেকে বহিস্কার বা গৃহে অন্তরীনের আদেশ। ফলে পার্টিও কৃষক সমিতির কাজও বেশ ঝিমিয়ে পড়লো শহরে নজর বন্দী হ'য়ে আছি। কী করা যাবে তাও ঠিক করতে পারছিনা চল্লিশ সালের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটির সংগঠক হিসাবে অবনী লাহিড়ী জেলাতেও আসেন। আণ্ডার গ্রাউণ্ড অবস্থায় জেলাতে কাজ করতে। এবার তাঁর সঙ্গে আমরা ২।৩ জন অন্তরীন আদেশ ভঙ্গ করে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে গিয়ে কাজ করতে শুরু করলাম।

এই সময়েই আমরা পার্টি গড়ার দিকে বিশেষ নজর দেই। জেলাতে পার্টি গড়ার কাজে অবনী লাহিড়ীর অবদান ছিল অসামান্য। কৃষক সংগ্রাম গুলির মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের বহু ভাল ভাল জঙ্গীকৃষক কর্মী বের হ'য়ে এসেছে। এদের অধিকাংশই ছিল নিরক্ষর। পার্টি সংগঠক ছাড়া উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে এদের পার্টিতে সংগঠিত করা যাবে কেমন করে এটাই হ'লো সমস্যা। আর সেদিন সে সমস্যা ছিল বিরাট, জেলাতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কমরেড-এর সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। অবনী লাহিড়ীর চেষ্টায় রংপুর থেকে মর্হী বাগচি, কুচবিহার থেকে জীবন দে, নারায়ণ গঞ্জ থেকে গরিমাসেন (সুবোধসেন) প্রভৃতি কমরেডরা আমাদের জেলায় এসে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে সুরু করেন। পরে এলেন সুনীল সেন, বসন্ত চ্যাটার্জি, অরুন সেন প্রভৃতি। কিন্তু সমস্যাও মিটলোনা। পার্টি আইনসম্মত হয়েছে। কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতির দ্রুত প্রসারের সঙ্গে পার্টি গড়ার কাজ তাল রেখে তবুও এগোতে পারছেনা। জেলাকমিটি থেকে আমরা বারবার প্রস্তাব নিয়ে প্রাদেশিক কমিটিকে লিখছি, অন্য জেলা থেকে আরও মধ্যবিত্ত কমরেড পাঠাবার জন্য, যারা পার্টি সংগঠক হিসাবে কাজ করতে পারে। ভবানী সেন ছিলেন প্রাদেশিক সম্পাদক, তিনি এবার বললেন, বাইরের উপর নির্ভর করা আমাদের ছাড়তে হবে। বাইরে থেকে মধ্যবিত্ত কমরেড দিয়ে এ সমস্যা মেটানো যাবেনা। তিনি বললেন ঐ নিরক্ষর জঙ্গী কৃষক কর্মীদের মধ্য থেকেই বাছাই করে মোটামুটি রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্য থেকেই পার্টি সংগঠক আমাদের তৈরী করে নিতে হবে। আর এ ব্যাপারে কি ভাবে কাজ সুরু করতে হবে এবং কি ভাবে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে হবে তাও তিনি বলে দিলেন। আমাদের কোন কোন কমরেড বললেন, ও ভাবে কিছুই হবে না।

এবার সুরু হ'লো নূতন পথে পার্টি সংগঠক তৈরী ও পার্টি গড়ার কাজ। কৃষকসমিতির সংগঠিত এলাকাতে জঙ্গী কৃষক কর্মীদের তালিকা প্রস্তুত ক'রে সুরু হ'লো প্রতি অঞ্চলে একটি ক'রে পার্টি শিক্ষাশিবির। ভবানী সেনের পরামর্শ মতই মোটামুটি একটা সাধারণ সিলেবাসও ঠিক ক'রে নিলাম। অবনী লাহিড়ী ও আমি শিক্ষা শিবিরগুলি পরিচালনা করলাম। ক্লাসের বিষয়বস্তু ছিল খুবই সাধারণ। কংগ্রেস কি, কমিউনিস্ট পার্টি কি, ও তার নিয়ম কানুন, কৃষকসমিতি ও শ্রমিকসমিতি কি তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক কি, কমিউনিস্ট পার্টির শেষ লক্ষ্য ও আশু লক্ষ্য, রুশ বিপ্লব, সোভি-

য়েতের চাষী-মজুরের সরকার ইত্যাদি বিষয়গুলি। শিক্ষাশিবিরে আমাদের সঙ্গে একটা ক'রে পৃথিবীর মানচিত্র থাকতো ভবানীবাবুর পরামর্শমত। পৃথিবীটা কত বড়, আমাদের দেশ পৃথিবীর কোন অংশে ও কত বড়, আমাদের জেলাটা কত বড়। সোভিয়েত দেশটা কোথায়ও কত বড় এ-সম্পর্কে মানচিত্র দেখিয়ে শিক্ষা দেবার জন্য। নিরক্ষর কৃষকরা যারা এতদিন নিজেদের গ্রাম ও জেলা বা মহকুমা শহরকেই তাদের গোটা পৃথিবী মনে করত, তাদের কাছে এই ভূগোলের ক্লাসটি হ'য়ে উঠতো খুবই বিস্ময়কর। শিক্ষা শিবিরের শেষে পার্টি সভ্য হবার জন্য আহ্বান জানানো হোত। পরবর্তীকালে এদের মধ্য হতেই আবার বাছাই ক'রে আর এক দফা ক্লাস ক'রে তাদের মধ্য থেকেই এলাকায় পার্টি সংগঠক গড়ে তোলা হ'তো। গ্রামে গ্রামে এবার দ্রুত পার্টি ইউনিট গড়ে উঠলো যদিও পার্টির ভিতরে এইভাবে পার্টি সভ্যপদ দেওয়ার বিশেষত্বও ছিল। গ্রামে আগে ঢুকতো—কৃষকসমিতি আর তার কাজের সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ঢুকতো পার্টি। কৃষক পার্টি সংগঠকরাই গড়ে তুলতো। তারাই ছিল পার্টির ইউনিট সম্পাদক, লোকাল কমিটির সকল সভ্য ও সম্পাদক। পার্টির জেলা কমিটির অধিকাংশ সভ্য পার্টিতে এসে তাদের নিজের নাম লিখতে শিখেছিল। পার্টির রিপোর্ট লিখতে লিখতে ও কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিল। জেলা কমিটির সভ্য পষ্টরাম ও তাঁর স্ত্রী জয়মণি জেলা কমিটিতে হাজির হতেন একদিন আগে। ঐ একদিন তারা ব্যয় ক'রতেন তাদের রিপোর্ট লেখার জন্য। সারাদিন চেষ্টা করে হ'য়তো ৫।৬ লাইন লিখতে পারতেন। তবুও তারা লিখিত রিপোর্টই মিটিংএ পেশ ক'রতেন।

এদের মত বেশ কিছু কৃষক কমরেড্ নিজেদের যথা সর্ব্বস্ব পার্টিকে দান ক'রে পার্টির সব সময়ের কর্মীও হয়েছিলেন। নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকাতে পড়ে থেকে সংগঠনের কাজ করতেন। গ্রামের কৃষক মেয়েদের মধ্যেও পার্টি গড়ে উঠেছিল। তবে মেয়েদের আলাদা পার্টি ইউনিট ছিল না। একই ইউনিটে পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই একত্রে কাজ করতেন। এলাকায় ছোটো খাটো কৃষক সংগ্রামগুলিতে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। হাট বাজার, মেলায় লাঠিধারী ভলন্টিয়ার অভিযানেও তাঁরা লাঠি কাঁধে নিয়ে ছেলেদের মতই অংশ নিতেন। জাপবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ঐ গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে 'মহিলা আত্মরক্ষা' সমিতি গড়ে উঠেছিল। পার্টি ইউনিট মিটিং বা জি, বি মিটিংএর আলোচনায় মেয়ে কমরেডরা এবার তাঁদের

পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিও তুলতে লাগলেন। স্বামীরা স্ত্রীদের মারধোর করতো। কেউবা তাদের হাট বাজারে যেতে বা পার্টির কাজ করতে বাধা দিত, আর তার বিরুদ্ধেই ছিল নালিশ। আর ঐ নালিশগুলি বেশি করে উঠত জিলা সম্পাদক যখন পার্টি মিটিংগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। স্বামীরাও পার্টি সভ্য। তাদের সম্মুখেই অভিযোগগুলি আনতেন ও পার্টির বিচার চাইতেন।[৭]

পঞ্চাশ সালের মন্বন্তরের সময় চরম বিপদে পড়ল গরিব কৃষক ও ভাগ-চাষিরা। অনাহারে মানুষ যখন মারা যেতে সুরু করেছে, তখন দেখা গেল জোতদাররা তাদের মজুত ধান চোরাবাজারে বিক্রি করে হাতি কিনছে। অবিশ্বাস্য হলেও ফুলবাড়িতে জোতদারদের হাতির রেসও হয়ে গেল। পার্টি ও কৃষকসমিতি মজুতবিরোধী অভিযান সুরু করল। লঙ্গরখানা খোলাও রিলিফের কাজ সুরু হল। কৃষকভলান্টিয়াররা জোতদারদের মজুত করা ধানের গোলাগুলি ঘেরাও করে ধান পেড়ে এনে ন্যায্য দরে বিলি করে দিতে লাগল। চারদিকে পাহারা বসল। পতিরামের সিংকাছারীর জমিদার অসিত সিংহ রায়ের ২০।২৫ খানা ধান বোঝাই গরুর গাড়ি গোপনে রাত্রির অন্ধকারে হিলির পথ ধরে চলেছে হিলির মিলে চড়া দরে বিক্রি করতে। কৃষকসমিতির জঙ্গীকর্মী চিয়ার সাই সেখ একাই লাঠি হাতে গাড়িগুলি রুখে দেয়। তার হাঁক শুনে খাঁপুরে কৈগ্রামের কৃষকভলান্টিয়াররা এসে হাজির হয়। পতিরামের পার্টি নেতা কৃষ্ণদাস মোহান্ত এর নেতৃত্বে সকল ধান ন্যায্য দামে গ্রামের গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেয়া হয়। মামলা-মোকদ্দমা জেল-জরিমানাও ঐ সময় কম হয় নাই।

১৯৪৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষকসমিতির প্রার্থী কমরেড রূপনারায়ণ রায় কংগ্রেস প্রার্থী বিরাট জোতদার ভবেশ সিংকে পরাজিত করে। সারা জিলাব্যাপী ছিল ঐ নির্বাচন কেন্দ্র। গরিব কৃষকরা এবার নিজেদের শক্তি টের পেয়ে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। জোতদাররাও প্রতিশোধ নেবার জন্য সুরু করলো ব্যাপক ভাগ-চাষি উচ্ছেদ। ১৯৪৬ সালের শেষ দিকে ফসলকাটার সময়ই জিলাব্যাপী সুরু হয় অবিস্মরণীয় তে-ভাগা সংগ্রাম।

পার্টির জেলা কমিটি ও কৃষকসমিতির যুক্ত বৈঠক থেকে তে-ভাগার সংগ্রামের পরিকল্পনা ও নিজ নিজ দায়িত্ব স্থির করে দেয়া হয়। শুরু করার

দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। আমাদের সংগঠিত এলাকাতেই প্রথম আরম্ভ করা স্থির হয়। ধান কেটে ভাগচাষির নিজ খোলামে ধান তোলাই ছিল আন্দোলনের প্রথম স্তরের কাজ। আর কৃষকরাও বুঝেছিল যে জোতদারের বাড়িতে ধান তুলে ধানের ন্যায্য অংশ সে কোনদিনই পায় নাই তে-ভাগও হবে না। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের সভা করে নিজে খোলামে ধান তোলার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হল। কৃষক ভলান্টিয়ারদের শিবির বসল। জোতদার পুলিশের হুমকি সত্ত্বেও বিরাট উৎসবের মধ্যে এবার ধান কাটা স্থরু হল। পরদিন ২২ জন কৃষক কমরেড্ সহ আমি গ্রেপ্তার হলাম। কৃষকদের ধান কেটে নিজ খোলানে ধান তোলা বন্ধ হল না, চলতে লাগল এবং সকল এলাকতেই প্রসারিত হল। ধান চুরির মিথ্যা অজুহাতে শত শত কৃষককর্মীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হল। কিন্তু কৃষকদের প্রতিরোধের সামনে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে কৃষক মেয়ে ভলান্টিয়াররাই পুলিশকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। ৫ই জানুয়ারি এরই মধ্যে চিরির বন্দরে আমার তালপুকুরে কৃষকদের উপর পুলিশ গুলি চালাল। দিনমজুর সাঁওতাল কমরেড শিবরাম ও ভূমিহীন কৃষক সমীরুদ্দিন শহীদ হলেন। তীরবিদ্ধ হয়ে একজন পুলিশ নিহত হল। আন্দোলন এগিয়ে চলেছে ৫ই জানুয়ারির পর থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে বড় রকমের কোন সংগ্রাম সংঘর্ষ হল না। ৫ই জানুয়ারি লীগ সরকারের রাজস্ব মন্ত্রী এক বক্তৃতায় বলেন যে সরকার তে-ভাগার দাবি মেনে নিয়ে বর্গাদার আনছেন। গ্রামাঞ্চলে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। জয়ের উল্লাসে কৃষকরা মেতে উঠল।

আন্দোলন এবার নূতন মোড় নিল। স্থরু হল এবার জোতদারের বাড়ি থেকে ধানের পুঁজ ভেঙ্গে এনে নিজ খোলানে তোলার আন্দোলন। জিলাব্যাপী সংগঠিত এলাকাগুলিতে কৃষকরা নিজ শক্তিতে মাঠ এর ধান কেটে নিজ খোলানে তুলেছিল। অসংগঠিত এলাকার কৃষকরা চিরাচরিত প্রথা মত জোতদারের খামারেই ধান কেটে তুলেছিল। কাজির আইন পাশ হচ্ছে শুনে এবার তারাও নেমে পড়ল। কোথাও কৃষকসমিতির সাহায্য নিয়ে, কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দল বেঁধে জোতদারের খোলান ভেঙ্গে নিজ নিজ ধান নিজেদের খামারে নিয়ে তুলল। তারা বুঝেছিল যে আইন পাশ হলেও তারা তাদের অংশ পাবেন। ৩০টির মধ্যে ২২টি থানায় আন্দোলন বিস্তৃত হল। ২২শে

জানুয়ারি প্রকৃতই বর্গাদার বিল প্রকাশিত হল ক্যালক্যাটা গেজেটে। আমরাও মনে করলাম আন্দোলন জয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই টের পাওয়া গেল যে বর্গাদার বিল আসছে না আসছে চরম দমন পীড়ন।[৮]

পশ্চিম দিনাজপুরের খাঁপুর পতিরাম ও খাঁপুর কৈগ্রাম এবং ইটাহার, বংশীহারী কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজবংশী ছাড়াও প্রচুর সাঁওতাল, কোলকামার ভাগচাষি অংশগ্রহণ করেছিল। পতিরামের সিংকাছারীর জমিদারের সঙ্গে ঐ এলাকার কৃষক সমিতির বিরোধ দীর্ঘদিনের। জমিদার তার বড়কন্দাজদের দিয়ে কৃষকদের কিছু গরু আটক করে খোঁয়াড়ে পাঠায়। কৃষক ভলান্টিয়াররা খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় ও বরকন্দাজদের হাত থেকে গরু কেড়ে নিয়ে আসে।

২০শে ফেব্রুয়ারি খাঁপুরে কৃষকদের ওপর পুলিশ নৃশংস গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই কমরেড যশোদারাণী, কৌশল্যা কোলকাসারণী, চিয়ারসাই সেখ প্রভৃতি ২০ জন কৃষক প্রাণ হারায়। বহু আহত হয়। হাসপাতালেও দুজন মারা যায়। শেষ রাত্রে তিন গাড়ি সশস্ত্র পুলিশ কৃষক সমিতির নেতাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে গ্রামে যায়। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে যাকে হাতের কাছে পায় টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তোলে। যশোদার বাড়িতে তারা হানা দেয় তার স্বামীর খোঁজে। স্বামী ছিলেন ঐ এলাকার পার্টি নেতা। স্বামী বাড়ি ছিলেন না। পুলিশ যশোদাকে কুৎসিত গালাগালি দেয়। যশোদা রুখে দাঁড়ায়। তাকেও টেনে নিয়ে গাড়িতে ওঠাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এবার শাসিয়ে ছেড়ে দেয়। খবর পেয়ে শত শত ভলান্টিয়ার জড়ো হয়।

[তেভাগার দাবি সেদিন আদায় করা যায় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কৃষকদের রক্তে বন্যায় ঐ সংগ্রাম জুড়াইয়া দেয়। তবুও নিঃসংশয়ে ইহা বলা চলে যে, ঐ সংগ্রাম সেদিন সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট জমিদারী-জোতদারী শোষণ ও ভূমিব্যবস্থাকে আসামীর কাঠগড়ায় টানিয়া আনিয়া সমগ্র জাতির সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। আর ঐ সংগ্রাম ছিল ইদানীংকাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সর্ববৃহৎ সংগঠিত কৃষক সংগ্রাম।]

সংকলন ও সম্পাদনা: সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

## সহায়ক তথ্যসূত্র ঃ

১। এখানে ১৯৩৫-৩৭ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে।

২। ১৯৩৫ সালে অনুশীলন দলের হয়ে দিনাজপুর শহরে একটি সোনার দোকানে ডাকাতিতে সুশীল সেন যুক্ত ছিলেন। তিনি পরে ধরাও পড়েন। ওই মামলাটিকেই 'টাউন রবারি কেস' বলা হয়েছে।

৩। ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বেন ব্রাডলে এবং রজনীপাম দত্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক কী হওয়া উচিত সে-বিষয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন; তা-ই 'দত্ত ব্রাডলে তত্ত্ব' নামে পরিচিত। এই থিসিসে বলা হয়েছিল, কংগ্রেস-নেতৃত্ব যদিও "জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্ব" হয়ে উঠতে পারেনি, তবু কমিউনিস্টদের উচিত "জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে যে-পরিমাণ ঐক্য অর্জন করা গেছে তা বিনষ্ট না করে ঐক্যকে শক্তিশালী করা এবং ব্যাপকতর ফ্রন্ট গঠন"—এর জন্যে চেষ্টা করা।

৪। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। দিনাজপুর জেলা কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

৫। 'আবওয়াব' মানে অতিরিক্ত আদায়

৬। এখানে ১৯৪৬-এর মৌভোগ (খুলনা) কৃষক সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য কারো-কারো মতে, মৌভোগ সম্মেলনে (মে, ১৯৪৬) তেভাগা সংগ্রামের ডাক ছিল না—দাবি উঠেছিল, বর্গাদারদের স্বপক্ষে আইন করতে হবে। আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় কয়েক মাস পরে প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের সভায় (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) এবং জানুয়ারি ১৯৫৭-এ প্রাদেশিক কৃষক সভার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় কৃষ্ণবিনোদ রায়ের পুস্তিকা 'কৃষকের লড়াইয়ের কায়দা'।

৭। রাণী দাশগুপ্তের লেখায় আছে, এই জাতীয় কৃষক আদালতে অপরাধী ক্ষমা চেয়ে জরিমানা দিয়ে তবেই রেহাই পেত। (দ্র, 'তেভাগা সংগ্রাম রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৩)।

৮। এখানে বিল অর্থে অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার প্রকাশিত 'বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল' (১৯৪৭)-এর কথা বলা হয়েছে। মন্ত্রিসভার জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি সদস্যদের প্রবল বিরোধিতায় বিলটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত হয় নি।

# ল্যুভ্‌র—আমাদের দরজায়

দীপ্ত দাশগুপ্ত

বিকেলের রোদ এলোমেলো ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু টেবিল খোলা আকাশের নিচে, বাকিগুলি বাঁশের কঞ্চি ঘেরা খুপরিগুলিতে। কি নিবিড় একাত্ম রোদ। পৃথিবীর এমনই কয়েকটি বিকেলের আলো ধরা আছে ভ্যান্‌গগের হাতে। আমি সেই আবেগতাড়িত ভিন্‌সেণ্টের আঁকা একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। না, কোন প্রিণ্ট নয়। ল্যুভ্‌র-এর থেকে আনা সব ছবি। ভারতে থেকে এ সুযোগ ভাবাই যায় না। সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ। কোনদিন না দেখা জায়গায় কয়েকটি রঙের আঁচড়েই সাবলীল গতিতে পৌঁছে যাই। ভিন্‌সেণ্ট হয়তো একটু আগেই পল গগাঁর সঙ্গে এখানে বসে আঁবসাৎ পান করে গেছেন।

পাশেই তুলজ লত্রেকের আঁকা তাঁর মায়ের ছবি। সেই মা ছোটবেলা থেকে খর্বাকৃতি দুর্বল লত্রেককে ছায়ার মতো রেখেছেন। অদ্ভুত রঙের খেলা. রোমাণ্টিকতা ও চিরকালীন আবেগময় মুহূর্তকে ধরে রাখার কি ক্ষমতাই না ছিল ইম্প্রেশনিষ্ট আর্টিস্টদের। সবারই নিজস্ব ঘরাণা। লত্রেকের ছবিটিকে হঠাৎ প্যাস্টেলের আঁকা মনে হতে পারে। ভ্যান্‌গগের ছবিটি বিভিন্নরকম স্ট্রোকে মোটা রঙ দিয়ে আঁকা। কিন্তু লত্রেকের ছবি ছিল একই রকম ছোট ছোট স্ট্রোকে অনেকটা হালকা করে রঙে আঁকা। ভাবতে খারাপ লাগে সাঁইত্রিশ বছরের বেশী এই দু'জনকেই ধরে রাখতে পারেনি পৃথিবী। প্রদর্শনীটি আমাদের কাছে অনেক শিল্পীরই নির্বাচিত অংশ তুলে ধরলেও আবেদনে বিশেষই হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক বা সর্বজনীন। নতুন করে এই শিল্পীদের নিয়ে কিছু বলার নেই। বক্তব্য সেখানেই যেখানে তাঁদের তুলি আজও আমাদের বুকে রঙের আঁচড় কেটে দেয়।

পল গগাঁর তাহিতি সিরিজের একটি বিখ্যাত ছবি দেখলাম। উনি তো স্রেফ চটের উপরেই তেল রঙে এঁকেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রের সেই তাহিতি দ্বীপের লোকজীবন, তাদের সংস্কৃতি, প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্ক পল গগাঁর ছবির মুল বিষয়। অচেতন যান্ত্রিক জগতের সামনে এ যেন এক বিশাল

প্রতিবাদ। প্রায় দ্বিমাত্রিক রঙের ব্যবহার তাহিতি অধিবাসীদের সারল্যকে ধরে রাখার জন্য বোধ হয় অনিবার্য ছিল। জোরালো রঙ ব্যবহারের সাহস ও রেখার দৃঢ়তাই পারে তাহিতি মেয়ের বাঁশির সুর ছবিতে তুলে আনতে। ছবির প্রতি সেই বিশ্বাস আছে বলেই আগুন রঙের কুকুরও এখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে। লোক-দেবতার বন্দনায় তাহিতি নৃত্যরত অধিবাসীরা ধরা পড়ে পলগগাঁর হাতে।

মাতিসের যে কয়েকটি ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিল তার ভেতরেও এক সারল্য লক্ষ করি, অথচ স্বকীয়তায় এক ভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়। তিনি যখন বলেন 'First the sensation, then the idea', তখন একথা সব শিল্পীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে হয়। বহির্জগত ও অন্তর্জগতের মেলবন্ধন স্বরূপ খোলা জানালা আঁকেন মাতিস। জানালার সহজ উপস্থাপন ছবিটিকে ইঙ্গিতময় করে তোলে। মাতিসের ছবিগুলির পটভূমি ছিলো সরল নক্সায় ও ফুল, আয়না ইত্যাদিতে সুসজ্জিত এবং রঙের খেলায় আকর্ষণীয়। শরীরের নিম্নাংশে লালবস্ত্র পরিহিতা শায়িতা রক্ষিতার কমণীয়তা ও তার মনের সারল্য ফোটানোর জন্য অমন ছিমছাম পশ্চাদ্‌পটের সরল অলঙ্করণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মাতিসের আর একটি ছবিতে পাঠরতা রমণীকে কেন্দ্র করে যে কম্পোজিশন গড়ে ওঠে তার নান্দনিক উপস্থাপন যে কোন শিল্পরসিককে আকৃষ্ট করবে। একটি কম্পোজিশনে কিভাবে সরল অথচ অভিনব পদ্ধতিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় দেখিয়ে দিলেন মাতিস। রঙের জোরালো আবেদনে মাতিস ফুটিয়ে তুললেন মুখটির সংবেদনশীলতা। রঙ ব্যবহারের প্রাচুর্যের জন্য মাতিসকে Fauvist বা Post-impressionist বলে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার কোন কারণ নেই। কিছু সমালোচকের পেট চালানোর জন্য অবশ্য এইসব মতবাদের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কোনো শিল্পীকে ধরে একটি বিশেষ খাঁচায় পুরে দেওয়া অর্থহীন। ছবির জগতে যে সব পরিবর্তন ও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, তাতো প্রতি শিল্পীরই স্বকীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত ও জীবন থেকে শিল্প বিচ্ছিন্ন নয় বলেই সমসাময়িক শিল্পীদের ছবির ভাষায় কিছু মিল তো পাওয়া যেতেই পারে। মাতিস, দেরেই, ডুফি, সোনিয়া দেলনে, ব্রাক, মারকোয়েত ও আরও কয়েকজন শিল্পীর রঙের উজ্জ্বল ও সাহসী ব্যবহারের জন্য তৎকালীন শিল্পধারাকে (বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়) আমাদের কাছে Fauvism বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার এইরকম রঙের ব্যবহার আমরা

বহু সময়ে বহু শিল্পীর মধ্যেই দেখি। তবে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝখান থেকে প্রচলিত শিল্পভাবনার যে পরিবর্তন ফ্রান্সে তথা সারা পৃথিবীতে দেখা যায় তা সবার কাছেই লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গত প্রদর্শনীটিতে ভ্লামনিকের একটি ছবিই ছিল। ভার্মিলিয়ন (সিঁদুরে লাল) ও নীল রঙের সরাসরি ব্যবহারে প্রকৃতির এমন স্পর্শকাতর ছবি আঁকা যায় তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভ্লামনিক। ছোট স্ট্রোকের ব্যাপারই নেই। একেবারে চওড়া সবল স্ট্রোকের উপর ছবিটি দাঁড়িয়ে আছে।

আঁদ্রে দেরেই এর একটি ছবি ছিলো মাত্র (৩২½×৪০½) সে. মি ক্যানভাসের মধ্যে। নদীর ধারে প্রাসাদের মতো বড় অট্টালিকা। জীবনের প্রবহমানতাকে উজ্জ্বল আলোর মাধ্যমে ধরার যে স্বাভাবিক প্রবনতা ছবিটিতে ধরা পরেছে তা দর্শককে মুগ্ধ না করে পারে না। আলো যেন ঠিকরে পড়ছে। চোখের সামনে আর একটা জগত খুলে যায়। এতো ইলিউশন নয়, এযে রোমান্টিসিজম্। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সুন্দরকে ধরে রাখার তীব্র প্রচেষ্টা। দেরেই-এর অপর ছবিটির মেজাজই আলাদা। নদীর ধারে দুপাশে গাছ দিয়ে ঘেরা রাস্তাটিতে অদ্ভুত চাপা রোমান্টিক আলো। দেরেই, ভ্লামনিক, সেজান আরো অনেকের ছবিতে প্রতিটি objec:-এর সঙ্গে একটি স্পষ্ট আউটলাইনও লক্ষ করা যায়।

ফিনল্যাণ্ডের মেয়ে এঁকেছেন সোনিয়া দেলনে, প্রেক্ষাপটের গাঢ় নীলরঙকে মেয়েটির শরীরে প্রতিশ্রুত নীলরঙের আভাস দিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে ভারসাম্য এনেছেন। উপজাতিদের প্রবল জীবনশক্তি ও হৃৎস্পন্দন গর্গা ও দেলনের দুটি ছবিতেই নিজস্বভঙ্গিমায় ধরা পড়েছে।

দুফির ছবির ছন্দ, তাল ও অঙ্কিত মহিলাটির কৌতুহলী দৃষ্টি ছবিটিকে ক্যানভাসে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। আর দুফির হাতে তো রঙের অভাব ছিল না। সব বিপজ্জনক রঙ নিয়ে ছবিকে সার্থক করায় এই সময়ের শিল্পীদের জবাব নেই।

জর্জ ব্রাক যখন আবিষ্কার করেন ছবির জন্য সূর্যের আলো তার আর প্রয়োজন নেই কারণ নিজের ভিতরেই তিনি আলোর উৎস খুঁজে পেয়েছেন তখনই আমরা বুঝতে পারি তিনি আমাদের কোন নতুন জগৎ দেখাতে চলেছেন। তাঁর এমনই একটি প্রকৃতির ছবি এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল।

ছবিটিতে আলোর অবস্থানই প্রমাণ করে যে ছবির মূল উৎস সূর্য নয়। শিল্পীর মন, তাঁর আত্মার মূলভূমিতে রয়েছে আলোর উৎস। ছবিটির আলো উৎসারিত হয় মন বা মাটি থেকে, আকাশ থেকে নয়। মন থেকে আলোকরশ্মি বেরিয়ে যেন পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করছে। মনের আলোর বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত গাছপালা। ঘন নিবিড় কালো জল। আরো দূরে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে উঠে আসছে আলোর বর্ণচ্ছটা। পাহাড়ের চূড়াগুলি অপেক্ষাকৃত ঘন রঙে বর্ণিত। শুধু আলোই নয়, অনেক ছবিতেই পার্থিব বস্তুগুলির অবস্থান যে আকৃতি পেয়েছে সেই আকৃতি নিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর অতিবাস্তব বা আমাদের না দেখা কিছু কৃত বাস্তবের ছবি। এমনই আরো তিনটে ছবি এই প্রদর্শনীতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবির বক্তব্য বা চরিত্রগত দিক থেকে নয়, কাঠামোর দিক থেকে cubic ফর্মের একটা গুরুত্ব আছেই। মতবাদ কিভাবে বলবো? মতবাদ বললেই ছবির বিষয়গত ব্যাপারও জড়িয়ে যায়। আর সেক্ষেত্রে প্রতি শিল্পীই অনন্য বা অদ্বিতীয়। এই তিনটি ছবিতেই cubic ফর্মের দুরন্ত প্রয়োগ দেখতে পাই। আধুনিক মননশীল মনের পথ ধরে বিভিন্ন space বা জায়গাকে কৌনিক রূপ দিয়ে এবং আলোর উপযুক্ত অবস্থানের মাধ্যমে নিজের ছবির মূল বিষয়কে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেন জর্জ ব্রাক। অন্তর্গত আলো, জীবনের গতিময়তা ও মনন নির্দেশিত পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে একটি স্টীল লাইফকে জীবন দিয়েছেন তিনি।

সবুজ রঙ ঢেলে প্রকৃতিকে সাজিয়েছেন সেজান। তাঁর আঁকা ঠিক অমনই একটি ছবি এখানে রয়েছে। সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। অজস্র গাছের ঘন জঙ্গলে বিভিন্ন সবুজ রঙের খেলা। তেল রঙে বড় বড় স্ট্রোকে আঁকা। দূরে একটি ঘরের একপাশ রোদে উদ্ভাসিত। সবুজের সাহসী ব্যবহারে প্রকৃতির নিবিড় ছবি এক নতুন জগৎ খুলে দেয়। ক্যানভাস ছেড়ে হাইলাইট দিয়ে সেজান আঁকলেন একটি স্টীল লাইফ। কতকগুলি জোরালো স্ট্রোকে ফল প্লেট ও পাত্রগুলির আউটলাইন ব্যবহার করে স্টীল লাইফকে দিলেন সজীবতা ও গতিময়তা। তাঁর সবল উপস্থাপনার পিছনে ছিলো ছবির মূলকেন্দ্র অনুধাবন করার এক জটিল মনস্তত্ত্ব।

সিগ্‌নাক ছবি আঁকেন না, ছবি গাঁথেন। একই রকম খুব ছোট ছোট স্ট্রোকগুলিকে বসাতে বসাতে একটি অদ্ভুত প্রকৃতির ছবি গেঁথে ফেলেন সিগ্‌নাক। শিল্পের নান্দনিকতা কিভাবে একটি ছবির মূল বিষয় হয়ে উঠতে

পারে এই ছবিটি তারই মূর্ত প্রতীক। পরিষ্কার এবং অসাধারণ রঙ দিয়ে প্রকৃতি আলোকে উৎসবের আলোয় রূপান্তরিত করেন সিগ্‌নাক।

কত আলোড়নকারী ছবিই না ভিড় করেছে এই মডার্ণ আর্ট গ্যালারীতে। কিন্তু হায় দিল্লি, হায় আমাদের রাজধানী, তোমার বুকে আজ শিল্পরসিক খুঁজে পাওয়া দায়। কয়েকটি দর্শক ছাড়া পুরো গ্যালারী ফাঁকা। আর তার মধ্যে দিল্লির দর্শক প্রায় নেই বললেই চলে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান থেকে কিছু শিল্পী ও শিল্পরসিক ছুটে এসেছেন। অর্থই যেখানে জীবনের মুল অর্থ, শিল্পের অর্থময়তা সেখানে অর্থহীন। এ আর এমন কি অস্বাভাবিক। প্রসঙ্গত দিল্লীর নিরাপত্তা কর্মীরা ছিলেন সব সময়ের দর্শক।

যাই হোক, আবার ছবিতে ফিরে আসি। এখন আমি রেনয়া-র একটি ছবি দেখছি। সেই রেনয়া, যিনি তৎকালীন অন্য শিল্পীদের মতো প্রকৃতি ও স্টীল লাইফে নয়, তাঁর রোমান্টিক ভাবনা ঢেলে পোর্টেট, নারীসৌন্দর্য ও শিশুর সজীবতা দিয়ে তৈরী করেছেন অজস্র কম্পোজিশন। ছবির ভাষাটি ছিল অসম্ভব সংবেদনশীল। পিয়ানোটি বালিকাটির স্পর্শকাতর আঙুলের ছোঁয়া পায়। অপর বালিকার স্বরলিপির উপর কৌতূহলী দৃষ্টি, প্রেক্ষাপটে ফুলদানি, তাদের প্রোষাক সব মিলিয়ে পিয়ানোরই এক স্পর্শকাতর সুর ছবিটিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্লদ-মনের একটি ছবিই ছিল। কবি বদলেয়র মনের ছবির কাব্যময়তা বা লিরিসিজমে আকৃষ্ট হয়েছেন কেন, তার প্রমান রেখেছে এই প্রকৃতির ছবিটি। পুরো ছবিটি জুড়ে আছে জলাশয়ের কিয়দংশ। ছড়িয়ে আছে এলোমেলো জলজ ফুলপাতা। ক্যানভাসের বাইরে অবস্থিত গাছকে জলের মধ্যে ছায়ার মাধ্যমে ধরে রেখেছেন ক্লদ মনে। কম্পিত গাছের ছায়ায় জল আরো সত্যি হয়ে মনকে ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

একেবারে নতুন ধরণের স্টীললাইফ দেখলাম এডুয়ার্দ মানের। এই আর্ট গ্যালারিতে কয়েকটি ছবি দেখেই উপলব্ধি করা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে কতভাবেই না ছবি করতেন শিল্পীরা। বিষয় থেকে শুরু করে আকারে, রঙের ব্যবহারে সবাই যেন নিজস্ব যাদুকাঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এডুয়ার্দ মানের কম্পোজিশনটি অসম্ভব মজা তৈরী করেছে। একটি ঝুড়ির উপর কিছু এলোমেলো জামাকাপড় তার উপর একটি গীটার ও গীটারের উপর একটি টুপি। ছবিটি এখানেই আকর্ষণীয় যে কয়েকটি মাত্র ব্যবহার্য জিনিসের

মধ্য দিয়ে অদৃশ্য গায়কের রোমান্টিক মন ধরা দেয়। ছবিটির গোপনীয়তা (Sublimity অর্থে) মনের গভীরে এক অদ্ভুত আলোড়ন তোলে।

রঙ দিয়ে মাতিয়ে দিলেন ক্যামিলি পিসার্য়ো। ওঁর একটিই ছবি ছিলো। দূরে শস্যক্ষেত; মাঝখানে ঘড়বাড়ি। সামনে আবার ক্ষেত। তিনটি স্তর। চাপা আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে মানুষের ঈপ্সিত স্বর্গ। একটি মাত্র লোক জল দিচ্ছে ক্ষেতে। ছবিটি দেখতে দেখতে শুধু মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীকে কতখানি ভালবাসলে এমন ছবি আঁকা যায়। আলোর যাদুকর পিসায়োকে ভোলা অসম্ভব।

ফাস্টিন লাতুরের ছবিটি ছিলো একেবারে ভিন্নস্বাদের। মানুষ যখন তার রূপ সম্পর্কে উদাসীন থাকে এবং যখন সে তার প্রিয়তম কাজে লিপ্ত থাকে তখনই তাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়। লাতুর তা উপলব্ধি করে পাঠরতা রমনীর নিমগ্নতাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলেন। পুরো ছবিতে একটি শান্ত আন্তরিক আবেদন দুচোখ সরাতে দেয়না।

একদিনে তো সব ছবি দেখা যায়না। তাই দুর্নিবার আকর্ষণে পর পর কয়েকদিন ছুটে যেতে হলো। এতগুলি ভালো ছবির মধ্যে প্রচলিত শিল্প-বোধকে আঘাত করার জন্য সৃষ্ট দাদায়িস্ট শিল্পীদের ক্রিয়াকলাপের প্রদর্শন নেহাতই অর্থহীন লাগে। anti-art movement বা anti-poetry movement ইত্যাদির ঐতিহাসিক মূল্য যেটুকুই থাক্ নান্দনিক বা শিল্পগত মূল্য যে কিছুই পাইনা, একথা না বলে পারিনা এবং সত্যি কথা বলতে জীবনের ভূমি থেকে এঁরা কখনই রস সংগ্রহ করতে পারেনি। এ' এক নিরালম্ব বায়ুভূক অদ্ভুত শিল্পজগৎ। তাই এঁদের সৃষ্টি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাইনা।

ফিরে আসা যাক আমার সেই প্রিয় ছবিগুলির কথায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েই অধিকাংশ ছবি করেছেন মার্ক শাগাল। রাশিয়ায় শৈশব কাটিয়েও ফ্রান্সে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন। খুঁজে পান রঙ। আলো, চেতনার নতুন দিগন্ত। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের অস্থিরতা। আধুনিক মানুষের পাওনা না পাওয়া আশা আকাঙ্খার অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও শিল্পীর মননশীলতার ছাপ তিনটি প্রদর্শিত ছবিতেই সুস্পষ্ট। ছবির স্বার্থসিদ্ধির জন্য আলো-কে তিনি বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্নভাবে ফেলেছেন। যুদ্ধের একটি প্রতিকী ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। সমস্ত ক্যানভাস জুড়ে অস্তিত্বের সঙ্কট। মানব-জীবনের অসহায়তা ও অস্থিরতা ফুটে উঠেছে শাগালের শৈল্পনৈপুন্যে। ছবিটির

একটি বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে যে প্রতিটি বিষয়ের আকৃতি হয়েছে তার ভাবমূর্তির আকৃতি অনুযায়ী। একটু ভালো ভাবে লক্ষ করলেই বোঝা যায় ছবিটির মধ্যে একটি ঘূর্ণি রয়েছে। এ'হচ্ছে বিপন্ন অস্তিত্বের ঘূর্ণি। পশুচালিত দুটি যান উদ্দেশ্যবিহীনভাবে লাফিয়ে ওঠে। তারই একটি অসহায় মা তার শিশু সন্তানকে নিয়ে উঠতে যায়। একদিকের ঘরবাড়ি থেকে ঘূর্ণির ফলস্বরূপ অপরদিকের ঘরবাড়ি পুরো উল্টোদিকে অবস্থিত। একটি লোক রাস্তায় মৃত পড়ে আছে। ভাবতে অবাক লাগে একটি ক্যানভাসে পৃথিবীর অস্থিরতাকে তুলে ধ'রে কি অদ্ভুত সংবেদন সৃষ্টি করতে পারেন মার্ক শাগাল। অপর ছবিটিতে একজন মহিলা এক্রোব্যাটকে তিনি তার ভাবমূর্তি অনুযায়ী আকৃতি দিয়েছেন। অঙ্কিত সেই মহিলা এক্রোব্যাট সার্কাসের একজন নয়, সমস্ত সভ্যতার উপর দাঁড়িয়ে সে ব্যালান্সের খেলা দেখিয়ে যায়, তার অন্তরের অহঙ্কার বা গৌরববোধ বোঝাতে শাগালকে শূন্য থেকে আনতে হয় তার প্রেমিক, যে তার কানে প্রেম নিবেদন করে যায়। কারণ এই পৃথিবীতে তার প্রেম নেই। আধুনিক জীবনের জটিলতাকে ও নাটকীয়তাকে শাগাল তাঁর এই ছবিগুলির মধ্যে বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমান মানুষের ভিতরে তিনি যে ক্লাউনের চরিত্র আবিষ্কার করেন সেই ভাবমূর্তি দিয়েই একটি সাধারণ মানুষের পোর্ট্রেট করেছেন। মোটা ব্রাশের কাজ, কাঠের পুতুলের মতো মুখ, কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে ছবিটিতে কি অদ্ভুত ব্যাঞ্জনাই না সৃষ্টি করেছেন মার্ক শাগাল।

মারকোয়েত যে মাতিসের দ্বারা প্রভাবিত তা তিনি নিজেই বলেছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত ছবিটিতেই সেই প্রভাব দেখা যায়। তবু ছবি সাজানোর ব্যাপারে তাঁর স্বকীয়তাকে অস্বীকার করা যায়না। তাঁরই একটি প্রকৃতির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। চওড়া স্ট্রোকে চড়া রঙে ঝোপঝাড়ের ছবিটি শিল্পের অর্থময়তা পেয়েছে। ফুটে উঠেছে পরিবেশটির অগোছালো চরিত্র ও শিল্পীর সাহস।

পলগগাঁ দ্বারা উৎসাহিত ভালার্দে কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে রিয়ালিস্টিক ফর্মে বেশী ছবি করেন। আভাঁ-গার্দ থিয়েটারে তিনি যে মঞ্চসজ্জায় ব্যাপৃত থাকতেন তার ছাপ তার প্রদর্শিত ছবিটির প্রেক্ষাপটে পাই। একটিই ছবি ছিল তাঁর। ভালার্দের অন্যান্য বহু ছবির মতোই এই ছবিটিও বুর্জোয়া বিষয় নিয়ে তৈরী। আপনমনে সেলাইয়ে রত এক মহিলা। ভারী

আকর্ষণীয় করে সাজিয়েছেন ছবিটির প্রেক্ষাপট। একটি নস্টালজিক গন্ধ ছবিটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। কোনদিন না দেখা ঘরও যেন আপন বলে মনে হয়। এখানেই বোধ, হয় এই ধরনের ছবির সবচেয়ে বড় সার্থকতা, একটি সহজ সরল জীবনের ছাপ, পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলিং ও স্পর্শকাতর রঙের ব্যবহারে ভেলার্দে আমাদের কাছে উপহার দিলেন একটি শান্ত ঘরোয়া পরিবেশ।

প্রচলিত ধারণাকে তছনছ ক'রে অসীম সাহসী পিয়ের বোনার্দ তাঁর ফর্ম ও বিষয়ে অদ্ভূত নতুনত্ব এনেছেন। 'বিশ্রামরত নগ্ননারী নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায় তোয়াক্কাবিহীন ভঙ্গিমায়। চাপা হলদে আলো ছবিটিতে এক গভীর আবেদন সৃষ্টি করে। নারীর আচ্ছন্নতা পুরো ছবিতে এলোমেলো প্রেক্ষাপটে ধরে রেখেছেন বোনার্দ। ভাবতে অবাক লাগে কতভাবেই না এই সময়ের শিল্পীরা ছবি করে গেছেন।

এদগার দেগার একটিই এচিং ছিলো এই প্রদর্শনীটিতে। তাঁর বিখ্যাত ন্যুড্ ছবিগুলি এখানে প্রদর্শিত হয়নি। এই এচিংটিতে তাঁর পরিশীলিত ও শিক্ষিত মননের ছাপ স্পষ্ট। বিভিন্ন টেকনিকে সিদ্ধহস্ত দেগা একটি কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ তুলে ধরেছেন। একজন স্থূলকায় ও কৌতুকময় আকৃতির ভদ্রলোক একজন মহিলার সঙ্গে বেঞ্চে বসে আছেন, একটু দূরে আরো দু'জন আলোচনারত। দৈনন্দিন জীবন থেকে তুলে এনেছেন ছবির বিষয়। জীবন-যাপনের নিত্তনৈমিত্তিক সত্য যা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। দেগার মতন মহান শিল্পীরা সেই সত্যই আমাদের চোখের সামনে বারবার তুলে ধরেছে।

নৃত্যভঙ্গিমায় একটি ব্রোঞ্জের ন্যুড্ মূর্তি ছিলো দেগার। একপায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটির ছন্দ বা লিরিকধর্মীতা যে কোন দর্শককেই আকর্ষণ করবে। এই ছবির প্রদর্শনীতে আজও যে দু'চারটি মূর্তি প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে মাতিসের কাজটি ভীষণ মনে পড়ছে। মাতিসের মূর্তিটিতে তাঁর অঙ্কণরীতির ছাপ পাওয়া যায়। অর্ধশায়িতা ব্রোঞ্জের রমনীকে মাতিস জীবন্ত ক'রে তোলেন তাঁর ক্ষিপ্র আঙুলের চাপে। ব্রাকুসি-র স্বভাবসিদ্ধ সুন্দরের ছাপ রয়ে গেছে তাঁর মূর্তিটিতে। নিদ্রিতা রমণীর মস্তককে ব্রোঞ্জে রূপদান অকল্পনীয়। পার্থিব সৌন্দর্যকে চিরকালীন সৌন্দর্যে মিশিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা ব্রাকুমির রয়েছে তারই উদাহরণ স্বরূপ এই কাজ ধরা যেতে পারে। তাঁরই ভাষায় বলা যায়, "The greatest happiness is in the Contact of our mortal essence with the essence of eternity"। হেনরী

লরেন্সের একটি শায়িতা রমণীর ব্রোঞ্জ মূর্তি দৃষ্টি কেড়ে নিলো। মূর্তিতে দিগারের ভলিউমকে গুরুত্ব দিয়ে নারী চরিত্রটির দৃঢ়তা ও আদিমতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি, একটি মানুষের ব্রোঞ্জের আবক্ষমূর্তি তৈরী করেছেন নিয়াকোমিত্তি। একই ধাচে তৈরী হয়েছে পোষাক ও গায়ের চামড়া। উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো ভাবে এবং মূর্তি র কৌনিক আকৃতি এনে দিয়েছে একধরণের পূরাতাত্বিক গুরুত্ব। তাঁর অপর মূর্তিটি একদম ভিন্নস্বাদের। প্রায় এনগ্রেভিঙের কায়দায় সরল উপস্থাপনার পথ ধরে ব্রোঞ্জ কেটে তুলে এনেছেন একটি নারীশরীরের রূপরেখা।

জিয়াকোমিত্তির আঁকা তাঁর মারে ছবিটির উপস্থাপনা অসামান্য। আলো আঁধার মিশ্রিত ঘরে কালি ও ঝুলের ভেতরে তার মায়ের উপস্থিতি একধরণের রোমাঞ্চকর পরিবেশ গড়ে তুলেছে, সেখানে ঐতিহ্যের গন্ধ রয়ে গেছে, রয়ে গেছে অস্তিত্বের শিকড়।

ছবি নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই পিকাসোর একটা কথা খুব মনে পড়ে "Everyone wants to understand painting. But why do they not try to understand the song of the bird"। হ্যাঁ তবু ভুরু কুঁচকে ছবি দেখার অভ্যেস আমাদের যায়নি এখনো। জোয়ান মিরোর ছবি যদি অনুভব না ক'রে কেউ বুঝতে চায়, খুব মুস্কিল ব্যাপার। তিনি নিজেই বলেছেন যে ছবিকে তিনি কবিতার মতো করে গড়ে তুলতে চান সেখানে একটি স্বর বা ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। এবং তাঁর প্রদর্শিত দুটি ছবির মধ্যেই সেই লিরিকধর্মীতা ধরা পরেছে। সেখানে চোখে দেখা পৃথিবীকে নয়, অন্তর্জগতের ছন্দ ও স্বরের সত্যতাকে উপলব্ধি করা যায়। এবং সেই দিক থেকে এই দুটি ছবিই অনন্য।

রোবার্ত-মাতা আরও পরবর্তী সময়ের শিল্পী। তেলরঙকে স্প্রে করার মতো ক'রে ব্যবহার করেছেন। অদ্ভুত কম্পোজিশন। এমনিতেই ছবির আলোচনা অসম্পূর্ণ। তার উপর এই কম্পোজিশনগুলি যেহেতু visual effect-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত তখন এই সম্পর্কে কিছু বলাই নিরর্থক। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য তখনই সার্থক মনে করবো যদি কেউ ছবিগুলি দেখার জন্য উৎসাহিত বোধ করেন বা এ' সম্পর্কে কিছু জানতে আগ্রহী হন।

আর্নষ্ট ম্যাক্সের দুটি কম্পোজিশন এ'প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য ছবির মতো আমার কাছে ততটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি।

দারুণ রেখাপাত করলো আদ্রেঁ মাসোর নৃত্যরত শরীরকেন্দ্রিক কম্পোজিশন। একেবারে উৎসবের মেজাজ ধরা আছে। আলো ও শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবস্থানের মাধ্যমে ও ব্রাশের সবল স্ট্রোকে শিল্পী তাঁর মননশীল আবেগকে ক্যানভাসে রূপ দিয়েছেন। আদ্রেঁ মাসোর অপর ছবিটি একেবারে তাঁর নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। ক্যানভাসের উপর বালি দিয়ে তার উপরে তেল রঙে আঁকা। কয়েকটি ঘোড়ার এলো মেলো গতিকে বাঁধতে চেয়েছেন শিল্পী। ছবিটির দৃশ্যগত আবেদন তর্কাতীত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আর একদল মহান শিল্পী আলফ্রেড মিসলের ছবি দর্শককে আকর্ষণ করে। পিসারোর মতো আলো ছায়ার খেলা দেখিয়েছেন মিসলে। মিসলের ছবিটি ছিলো প্রকৃতি ঘেরা জলপথ। বিকেলে রোদকে মায়াবী আলোয় রূপান্তরিত করেছেন তিনি। তাঁর জলপথ যেন পৃথিবীর রোমান্টিক ভাবনাকে ছুঁয়ে থাকে। কি ভালবাসায় ব্রাশ চালিয়েছেন—দুচোখ সরানো যায় না।

পরবর্তীকালের শিল্পী গ্রিস জোয়ানের দুটি কাজই আধুনিক চোখকে আকর্ষণ করবে। বাস্তবের উপকরণগুলির কল্পনার সত্যতার অনুগামী কৌনিক বিভাজনের মাধ্যমে জায়গাকে ব্যবহার ক'রে এক নতুন দৃশ্যগত সত্যতা তৈরী করেন গ্রিস জোয়ান। আলোর উৎস ও ছবির পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্যগত সত্যতাকেই অনুকরণ করে। এমনই একটি ছবিতে আছে কিছু জার্নাল, একটি টেবিল, একটি পেয়ালা ও একখানি পাইপ। উপকরণগুলির ছবির রূপকে দৃশ্যগত সত্যতানুযায়ী কৌনিক বিভাজনের মাধ্যমে ছিঁড়ে ও জুড়ে ছবিটিকে তৈরী করেছেন গ্রিস জুয়ান। ছবিটিতে তিনি আধুনিক উচ্চবিত্তের সকালকে রূপ দিয়েছেন। অদ্ভুত আকর্ষণীয় পরিবেশনে ছবিটি হয়ে উঠেছে ব্যাঞ্জনাময়। গ্রিস জুয়ানের একই টেকনিক ও ভাবধারায় তৈরী হয়েছে তাঁর অপর ছবিটি। এখানে উচ্চবিত্তের ডিনার টেবিল দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন উপকরণ যেমন—জলের পাত্র, বাসন, কুকার ও অন্যান্য পাত্র ছড়িয়ে আছে। শুধু উপস্থাপনার গুনে সময় ও শ্রেণীকে ধরার এমন সবল ইঙ্গিতময় ছবি ভাবাই যায় না।

মানুষের রহস্যময় অন্তরকে রূপ দিয়েছেন মোদিগ্‌লিয়ানি। চরিত্রের ভাবমূর্তি দিয়ে তিনি করেছেন অজস্র পোর্ট্রেট। বহু টেকনিকে সিদ্ধহস্ত শিল্পী কিন্তু মানুষের ভাবকে (expression অর্থে) ধরার জন্য ফিরে এলেন সরল উপস্থাপনায়। শরীরের নয়, মেজাজের রঙে রঞ্জিত হলো মুখগুলি। তাঁর

এমনই তুটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছিলো। লজ্জা অপমানের লাল রঙে রঞ্জিত হলো একখানি মুখ। তিনি যেভাবে ছবি তুটির রূপদান করেছেন সেখানে চোখের মনির দৃষ্টির কাজ করেছে, শরীরের আকৃতি ও মুখের রঙ। তাই মনিতুটি সরিয়ে দিয়েছেন তিনি তুটি পোর্টেট থেকেই। সেই কারণেই মনের ভাবও যেন বেশী করে মূর্ত হয়ে ওঠে এক নৈঃশব্দ্যের আড়ালে। শিল্পীর অপর পোর্টেটটি ছিলো একজন সৌখিন ও সাজসজ্জায় সচেতন মহিলার। তার চুলবাধা দেখলেই বোঝা যায় যে সে আত্মসচেতন। সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে জীবনের ও গৌরবের উজ্জ্বল আলো। একটি বিশেষ শ্রেণীকে উপস্থাপন করছে পোর্টেটটি। মোদিগ্‌লিয়ানি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সহজ ভাষায় কঠিন কথা কিভাবে বলা যায়।

মধ্যযুগের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট জর্জ রেঁায়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক ছবি করার যে গভীর সাধনা করেছেন ও তৎকালীন জোরালো রঙ ব্যবহারের রীতিকে গ্রহণ করে যে বিশিষ্ট ছবি করেছেন, তেমনই তিনটি ছবি এখানে দেখা গেল। স্পাচুলার সফল প্রয়োগে পোর্টেটটিকি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন রেঁায়া। তিনি অপর একটি ছবিতে মানুষের ঐতিহ্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের গানকে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতির বিভিন্ন স্তর থেকে সে গান আকাশে ছড়িয়ে গেছে। সহজ সরল উপস্থাপনায় সেই গান আমাদের ছুঁয়ে যায়। রেঁায়ার আর একটি ছবি ইজিপ্টের ঘরবাড়ি ঘেরা মানবজীবনের সাধারণ দৃশ্যকে কেন্দ্র করে অঙ্কিত হয়েছে। সরল জীবনের জন্য সরল ভাষা ব্যবহার ক'রে রেঁায়া আমাদের ব্যর্থ অহঙ্কারকে আঘাত করে গেলেন।

আবেগপ্রবণ সুতীন অতৃপ্তির চরম পর্যায়ে নিজেকে বারবার আবিস্কার করেছেন এবং তাঁর রসবোধকে চিহ্নিত করেছেন একেবারে নতুন আঙ্গিকে। তাঁর একটি ছবিতে একজন লালপোষাক পরিহিত বয়ের মজাদার ও সরল উপস্থাপনার পিছনে আছে এক ধরনের করুণ বেদনার্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি। সেই ভাব তার চোখে মুখে স্পষ্ট। কারণ লোকটি অবস্থার শিকার মাত্র। সুতীনের অপর ছবিটিতে বড় বড় বাড়ির এলোমেলো উপস্থাপনের মাধ্যমে সময়ের গতি ও এই বাড়িগুলির তথা বাড়িগুলিকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ শ্রেণীর নড়বড়ে অস্তিত্ব ধরা পরে। জোরালো রঙের ব্যবহারে ছবিটি আরো

ব্যাঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। অদম্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস ছাড়া এ'ছবি করা একেবারেই অসম্ভব।

রোবার্ত দেলনের ছবিটি পুরো ভিন্ন স্বাদের। তিনি তাঁর ছবিটিতে মনন উৎসারিত আলো দিয়ে জায়গা বা spaceকে কৌনিকভাবে বিভাজন করেন এবং পরিপ্রেক্ষিতের স্বকীয় ব্যবহারে কোন বিশেষ বস্তুর অবস্থান ছাড়াই একটি কম্পোজিশনকে কিভাবে বিশ্বস্ত ও নান্দনিক ক'রে তোলা যায় তার উপযুক্ত প্রমাণ রাখলেন।

গর্গার সংস্পর্শে এসে ম্রিয়মাণ রঙগুলিকে ফেলে দিলেন মেরুসার এবং ইচ্ছেমতো রঙ ব্যবহার করে এঁকে ফেলেন একটি শিশুর সহজ সরল ছবি। অন্যান্য অকল্পনীয় ছবিগুলির পাশে এই ছবিটি একটু ম্রিয়মাণ লাগলেও এর উৎকর্ষ অস্বীকার করা যায় না।

অদিলঁ রেদোর ছবিটি এককথায় অসামান্য লেগেছে। ছবিটির ভাব ভাষা একেবারে নিজস্ব। আমাদের সেই অতি পরিচিত 'ইভ' ছবির মূল বিষয়। খুব হালকা রঙ ব্যবহার করে ইভের শরীর থেকে চেছে তুলেছেন রঙ। তার ফলে ক্যানভাসের চরিত্র ফুটে উঠেছে ইভের গায়ে। একটি ধুয়াচ্ছন্ন অথচ ত্বকের চরিত্র ধরা পরেছে ইভের শরীরে। ইভের আগমন যেন স্বর্গ ও পৃথিবীর যোগসূত্র রূপ দেখা গেল এই ক্যানভাসে, ধুসর প্রেক্ষাপটে ছবিটির সফল উপস্থাপন যে কোন শিল্পরসিককে মুগ্ধ করে।

এইভাবে ছবি দেখতে দেখতেই পৌঁছে যাই এ্যামিলি বার্নার্দের একটি ছবির সামনে। প্রকৃতি ও মানুষকে জ্যামিতিক গঠনে সাজিয়েছেন তিনি। ঘরবাড়ি, নদী, মানুষ সবকিছুর মধ্যে অন্তর্গত মিল লক্ষ করে রঙ ও রেখার উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন নিবিড় সম্পর্কের ছবি। প্রকৃতি ও মানুষের কাঠামোগত সাদৃশ্য পুরো ছবিটির মধ্যে একটি সম্পূর্ণতা এনে দেয়। বার্নার্দের এই ছবিটি দেখতে দেখতে মনে হলো, আমরা যা দেখি সেই সত্য নয়, আমাদের না দেখা সত্যই শিল্পীতে হাতে বরাবর ধরা পড়ে।

দেনিস মরিস বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর ছবিতে কাব্যময়তা ও মননশীলতা ফুটিয়ে তুলেছেন। ইতালির শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সরল ভাষায় ও নিঁখুত সজ্জার মাধ্যমে ছবির মধ্যে পরিবেশন করলেন গল্প বা কথা। দেনিস মরিসের ছবির সার্থকতা সেখানেই যেখানে বাস্তব স্বপ্নকে ছুঁয়ে থাকে। তাঁর তেমনই একটি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে

রয়েছি। একটি উন্মুক্ত বারান্দায় কয়েকজন মহিলা। আলোক উদ্ভাসিত প্রকৃতির কোলে তিনটি লোক ঘোড়া চালিয়ে ছুটে যাচ্ছে। অদ্ভুত রোমান্টিক পরিবেশ। শিল্পীর রঙ ও নাটকীয় উপস্থাপনে আমাদের না দেখা জগৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিংশ শতাব্দীর বহু সময় জুড়ে ছবি এঁকেছেন কান্দিনস্কি। প্রতিটি রঙের চরিত্রকে আলাদাভাবে অনুধাবন করে ও মানুষের অন্তর্জগতে রং ও রেখার আবেদনকে উপলব্ধির মাধ্যমে অসংখ্য বিমূর্ত ছবি এঁকেছেন কান্দিনস্কি। তাঁর সব প্রদর্শিত ছবিই visual effect-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কান্দিনস্কির ছবি সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁর নিজের ভাষায় বলতে হয়, "Colour is the keyboard, the eye the force then strikes, and the soul is that instrument with a thousand strings"।

অন্যান্য বিমূর্ত শিল্পীদের মধ্যে নিকোলাস দা স্টীলের কম্পোজিশনটি অসামান্য। অসংখ্য রঙীন স্ট্রোকে আঁকা বিমূর্ত কম্পোজিশন, পুরো ছবিটির মধ্যে রয়েছে একধরনের নৈরাজ্যের শৃঙ্খলা। দৃশ্যগত সৌন্দর্য ছবিটিকে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়।

ছবির রেখার ও আলোর বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করেন ফারনান্দ লেজার। তাঁর ছবিতে রূপ পায় আধুনিক যুগের যন্ত্রণা ও যান্ত্রিকতা। তাঁর একটি ছবি বিভিন্ন বিষয় ও আলোর বৈপরিত্যের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে অনুরূপ স্থিতিস্থাপকতা লক্ষ্য করে। সেই অনুযায়ী চাবি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সঙ্গে নগ্ন নারী শরীরের উপস্থাপন কম্পোজিশনটিকে আকর্ষণীয় ও ইঙ্গিতময় করে তুলেছে। তাঁর অপর ছবিতে ঘরের ভিতর একটি মানুষ হাতে ফুল নিয়ে অভিব্যক্তিহীন দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও সেই যান্ত্রিকতা বর্তমান। পুরো ছবিটিকে রেখা ও রঙ দ্বারা বেষ্টিত কয়েকটি টুকরোর সমন্বয় ধরা যেতে পারে। এইভাবেই হৃদয়হীনতাকে আঘাত করেছেন লিজার। প্রতিটি বিষয়কে পরিপ্রেক্ষিত ও অবলম্বন হীন রেখেও কিভাবে পুরো কম্পোজিশনে ভারসাম্য আনা যায় দেখিয়ে দিলেন লিজার। অন্তর্গত সত্য ছাড়া এই ভারসাম্য আনা অসম্ভব। এক্রোব্যাটদের নিয়ে অপর কম্পোজিশনটি গড়ে তুলেছেন শিল্পী। অনেকগুলি শরীর একে অপরের সঙ্গে অদ্ভুত কৌশলে জড়িয়ে রয়েছে। পুরো ছবিটির মধ্যে একটি ছন্দ ও সংহতি বর্তমান। শৃঙ্খলা ও ঐক্যের মধ্যে যে একধরনের সৌন্দর্য আছে। দেখিয়ে দিলেন লিজার। এবং দেখালেন

যান্ত্রিকতার একটি ইতিবাচক দিক। লিজারের ভাষা স্পষ্ট ও তাঁর ছবিতে মননশীলতার ছাপ আকৃষ্ট না করে পারে না।

অনুভূতির মূলে দাঁড়িয়ে ছবি এঁকেছেন পীয়ের বোনার্দ। মায়াবী রঙের ব্যবহারে তৈরী করেছেন একটির পর একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির ছবি। ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে তুলেছেন নগ্ন নারীদেহ ও তার সখের স্নানাগার। রয়েছে কিছু এলোমেলো জামাকাপড় ও একখানি বাথটাব। ছবিটি প্রমাণ করে মানুষ নিঃসঙ্কোচে যেখানে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে। সেখানেই তাকে প্রকৃত সুন্দর দেখায়। বোনার্দের বিশ্বাস গভীর অনুভূতির মাধ্যমেই তৈরী হয় ছবি। তাঁর অপর ছবিতে দুই মহিলাকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা যায়। বিষয় সাধারণ। কিন্তু উপস্থাপনায় হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রঙের ব্যবহার ও অন্যান্য বৈশিষ্টের মাধ্যমে একটি নিবিড় সংবেদনশীল পরিবেশ গড়ে তুলেছেন বোনার্দ। দুটি মুখ প্রমাণ করে একে অপরের কথায় কতখানি আগ্রহী। এইভাবে বোনার্দ উপহার দিলেন একটি গভীর সম্পর্কের ছবি।

পিকাসো যে কতভাবে কত ছবি করেছেন তা নতুন করে বলা অর্থহীন। আর এখানে প্রদর্শিত ছবিগুলিকে কেন্দ্র করেই এই আলোচনা। পিকাসোর অঙ্কিত মহিলার পোর্টেট তাঁর অজস্র পরীক্ষনীরিক্ষার একটি সফল সৃষ্টি। আমাদের দৃশ্যগত সত্যতাও যে আপেক্ষিক তা প্রমাণ করলেন শিল্পী। একটি মুখকে দুদিক থেকে দেখলে দুটি ভিন্ন অংশ চোখে পড়বে। এই দর্শনের দুদিকের বাস্তবতাকে একই ক্যানভাসে প্রায় দ্বিমাত্রিক রঙ ও রেখার ব্যবহারে ফুটিয়ে তুললেন পিকাসো। মুখটির মধ্যে গতিময়তাও লক্ষ্যণীয়। ছবিটির রঙের বৈশিষ্ট্য ও অলঙ্করণ প্রমাণ করে সেই মহিলার চরিত্রের সৌখিনতা। পিকাসোও তাঁর বিশাল ক্যানভাস জুড়ে এঁকেছেন পাঠরতা রমণী। কিন্তু পিকাসোর ভাষা ও বক্তব্য কিন্তু লাতুরের পাঠরতা রমণীর থেকে ভিন্নরকম। পিকাসোর ছবির মূল বিষয় বই পড়া নয়, তিনি একজন তথাকথিত সৌখিন আত্মসচেতন একজন মহিলার ভাবকে ( mood ) ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর সরল উপস্থাপনার মাধ্যমে। শিল্পী জানতেন বিষয়ই আকারকে ( torm অর্থে ) খুঁজে নেবে। পিকাসো তাঁর একটি স্টীল লাইফকে সাজিয়েছেন একেবারে নতুন আঙ্গিকে। ছবিটির একটি চরিত্র হচ্ছে এখানে কোনো কোনো জায়গায় পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার আছে আবার কোনো কোনো জায়গায় নেই। বিভিন্ন ফর্মকে একই

ছবির মধ্যে অবলীলায় ব্যবহার করেন তিনি। মোমের আলোয় উদ্ভাসিত হয় জাগের একটি দিক্। অথচ জাগের হাতলের উপরাংশ ছাড়া কোথাও পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহার নেই। অন্যদিকে সসপ্যানের উপর মোমের আলোর জ্যামিতিক পতন সত্যিই অভিনব। নীচে টেবিলটি স্পষ্ট। মোমের মায়াবী আলোয় জাগ ও সসপ্যানের উপস্থিতির মাধ্যমে ভারী সহজ সরল আন্তরিক মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন পিকাসো। আবার পিকাসোরই প্রদর্শিত দুটি ছবিতে কিউবিক ফর্মের চূড়ান্ত ব্যবহার দেখতে পাই। আরোপিত পরিপ্রেক্ষিত ও আলোর স্বকীয় ব্যবহারে বিভিন্ন বস্তুর (জলের জাগ, পাত্র ইত্যাদি) সমন্বয়ে পিকাসো উপহার দিলেন কিউবিক ফর্মে একটি অভিনব কম্পোজিশন। ছবিটির বিষয়গুলি তৈরী হয়েছে পিকাসোরই বক্তব্য অনুযায়ী "I paint things as I perceive them, not as I see them"। আর একটি কিউবিক ফর্মের ছবি মনের আলোড়ন তুললো। বিভিন্ন সাঙ্গীতিক যন্ত্রপাতিকে অন্তরে প্রতিফলিত রূপ অনুযায়ী স্বকীয় পরিপ্রেক্ষিত ও ড্রয়িং-এর মাধ্যমে একটি কম্পোজিশন উপহার দিলেন পিকাসো। পুরো ছবিতে ভেসে উঠছে সুরের ঝঙ্কার। মানুষের অন্তরের সুর কি অভিনব পদ্ধতিতে নতুন ফর্মে রূপ দিয়েছেন পিকাসো।

প্রসঙ্গত এই প্রদর্শনী ঢুকতে গেলেই চোখে পড়বে মাতিসের করা বিশাল পর্দা। পর্দাটির অলঙ্করণ অনবদ্য। যেভাবে পেরেছেন শিল্পীরা ঢেলে দিয়েছেন তাঁদের শিল্পভাবনা। এই বছর (১৯৮৯) ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত মডার্নআর্ট গ্যালারীটিকে ল্যুভর—এর কিছু ছবি উপস্থিতি দিয়ে ধন্য করে গেলো। এই কারনে উদ্যোক্তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু বক্তব্য কিছু আছে। উপযুক্তভাবে না সাজাবার জন্য ছবিগুলি সঠিক মর্যাদা পায় নি। ছবির ক্ষেত্রে দূরত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত ফরাসী শিল্পীদের ছবিটি ল্যুভর এর থেকে এখানে আনা হয়েছে। একই সময়ে দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আর একটি অসামান্য প্রদর্শনী চলছিল; তা হচ্ছে রেনেসাঁ থেকে রঁদা পর্যন্ত যুগ বিজয়ী ফরাসী স্থপতিদের প্রদর্শনী। তিয়াত্তরটি কাজ ছিল সেখানে। সে সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। আর একটা কথা বলা উচিত যে মডার্ন—আর্ট—গ্যালারীতে যে মহান শিল্পীদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছে তার বাইরে ও একই সময়ে দুর্লভ ক্ষমতা সম্পন্ন বহু শিল্পী আছেন যাঁদের ছবি এখানে নেই। যেটুকু আনা সম্ভব তাই প্রদর্শিত হয়েছে। তবু এই অনন্য চিত্রমালা দেখতে দেখতে প্রদর্শনীটির সীমাবদ্ধতার কথা ভুলে যেতে হয়।

# বড় সুন্দর তুমি রহ কিছুকাল স্থির, বিচ্ছিন্নতা

পথিক বসু

**দ্বিতীয় পর্ব**

১.

সামাজিক ক্রিয়াবিধিকে আমরা দুভাবে দেখতে পারি। একে তার অর্থনৈতিক চক্রের চলা সচলতা, দুয়ে তার সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠন। অর্থনৈতিক চক্রে সে মাস-মার্কেট-ব্যুরোক্রাসীকে এমনভাবে সাজিয়েছে যেখানে প্রবেশ করার অর্থ হল ধারাবাহিক বিচ্ছিন্ন মানুষের সৃষ্টি যারা একে অন্যের সাথে মানবিক সম্পর্ক তো ভুলছেই এমনকি ভুলছে নিজেদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক—তবে হ্যাঁ, সচল থাকতে কর্মঠ থাকছে সে মানুষেরা। গাদাগুচ্ছের কনসালটেন্সীর ক্লিনিক তাদের রাজরাজত্বের শেয়ারহোল্ডার করে কর্মক্ষম রাখছে। এখন কথা হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনে মানুষ কোন্ স্তরে পৌছচ্ছে অথবা পৌছতে পারে যেখান থেকেও বিচ্ছিন্নতা-বোধকে খেলাধুলা করাতে পারে সমাজ ?

হার্বার্ট মার্কুস তাঁর One Dimensionrl Man বইতে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণীচেতনায় কিছু নতুনত্ব খুঁজে পেলেন, তিনি দেখলেন class consciousness নেই, আসছে class—cohesion—false—integration।

বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ( মার্কুস নিজে ততোধিকই বিতর্কিত ), তবে ভাববার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক। গ্লেন টিণ্ডার তাঁর crisis of political Imagination হইতে প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌচলেন। টিণ্ডার দেখলেন এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক রাজনৈতিক চরিত্রে।

* শ্রেণী পার্থক্য ( class distinction ) প্রায় অদৃশ্য
* শ্রেণী অসন্তোষ ( class resentment ) বহুলাবেশে বিস্রস্ত
* শ্রেণী সচেতনতা ( class consciousness ) নিস্তেজিত
* শ্রেণী ক্ষমতা ( power of multitnde ) ব্যহত

ফলস্বরূপ সামাজিক—অর্থনৈতিকে ঘটছে

* ব্যবহার্য পদার্থের প্রাচুর্য—দৈহিক ভোগ বিলাসের জন্য পণ্য তখন

নর্থে ফেলছড়াগড়াগড়ি খাচ্ছে, এতে অন্তত দৈহিক প্রয়োজনজনিত অসন্তোষ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, একেবারে ফিজিক রক্ষাকারী পণ্য নিয়ে দাবীদাওয়া থাকছে না

* মিডিয়া ব্যবস্থায় সুষ্ঠু পরিচালনা—যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সাংঘাতিক অগ্রগতি হয়েছে, আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া চূড়ান্তে চলে গেছে, শোষণ নতুন পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছে
* বিকলাঙ্গে-প্রায় অভিপ্রয়ান—এর ফলে দরিদ্রদের একই জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, (ভারতবর্ষে যেমন কলকাতা বোম্বাই) —বস্তিবাসী ঝুপড়িবাসীর সংখ্যা বাড়ছে, তারা শ্রমজীবি তবে মার্কসীয় শ্রমসচেতন সংগঠনকামী শ্রমিক নয়, তারা নেমে গেছে আরো প্রাগৈতিহাসিকে (ধন্যবাদ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)— ডারুইনীয় struggle for existence এর মনস্তত্বে।

চার ও তিনের বেপরোয়া বাড়বৃদ্ধি সমাজকে নতুন দিকে নিয়ে গেছে, লাভ হয়েছে সংখ্যালঘু শোষক সম্প্রদায়ের; যদিও তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু তারা বিভাজিত সংখ্যাগরিষ্টের ওপর অবলীলায় ছড়ি ঘোরাতে সক্ষম হচ্ছে, শ্রেণী সচেতনতার হাল বাটাডানলপ ইত্যাদি (আভাসে বলব? বিলাসে বলব? নাকি ঘৃণা মিশিয়ে বলব?); খুব দুঃখের সাথে ক্রোধের সাথে বলিষ্ট সিদ্ধান্ত টানছি: শ্রেনী সচেতনতা ভেঙে যাচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে নতুন সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—গণবিভাজন (mass disintegration), শ্রেণী বিভাজন (claas disintegration) কে অবস্হত করে।

২.

গণবিভাজনী পদ্ধতিতে শেষত মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা চলে আসে (প্রথম পর্বে তার ব্যাখ্যাও হয়েছে)—কিন্তু এটা শেষের কথা, শেষের আগে যতগুলো শুরু থাকে, প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার যতগুলো পর্যায় থাকে তাদের এবার দেখার চেষ্টা করি: গণবিভাজনের আরম্ভগুলো যথাক্রমে

* মানুষের সাথে প্রকৃতির
* মানুষের সাথে তার বসতবাটিস্থানের
* মানুষের সাথে সম্পদ সম্পত্তির

* মানুষের সাথে অন্যমানুষের
* মানুষের নিজের সাথে, সবশেষে

যদিও বিনামূল্যে গাছ বিতরণ করা হচ্ছে, শহরে ছয়লাপ পোষ্টার, সংলাপ চিৎকার অরণ্যপক্ষ পালন করার পন্থাপদ্ধতি ইত্যাদিতে, শোরগোল তুলে দেয়া হচ্ছে একটা গাছ ইকুয়াল টু একটা প্রাণে ; তবু ধীরে ধীরে মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে তুলে নেয়া হচ্ছে, বৃহৎ বনস্পতির বিকল্পে বামনবনশাইয়ের পার্ভার্সান আর টবশিল্পে অরণ্যের প্রদর্শনী : বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি … । মানুষ আর প্রকৃতির লবটুলিয়া এখন প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতার কবলে আটকা পড়ে গেছে, যা হচ্ছে সেটা হল শহরের ঘেরাটোপে প্রাকৃতিক চিড়িয়াখানা। এবং এর ফল ? মানুষ খুব সহজে অচেতনেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলবে, নিজেকে সংকুচিত করে ফেলবে, আত্মবিস্তারের অচেতন সাহায্য সে পাবে না পাচ্ছে না।

বসত ছেড়ে করালীকে একদিন চলে আসতে হয়েছিল, কবি মঙ্গলাচরণ লিখেছিলেন 'কোথায় ঘরে মিলিয়ে যায় সখী তোমার তালতমাল / মরাই নেই, ধানও নেই, সবুজ ধান ভালোবাসার/ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল' —করালীদের চলে আসতে হয়েছিল প্রকৃতি ছেড়ে বসতবাটীস্থান ছেড়ে, বিচ্ছিন্নতার দ্বিতীয় সর্গে নিমজ্জিত হতে হয়েছিল। সাম্প্রতিক একই সমস্যা খানিকটা বুঝিয়েছেন প্রফুল্ল রায় তাঁর 'শিকড়' গল্পে ( গল্পপত্র' শারদীয় ১৩৯৬ ) —বেসামাল প্রচরণে শিকড়টা হারিয়ে যাচ্ছে, মানসিকতায় বিচ্ছিন্নতা বাসা বাঁধছে। ধরা যাক আমি এক জায়গার মানুষ, সেখান থেকে আমি লেখাপড়া শিখেছি মানুষ হয়েছি। এরপর চাকরীর জন্য আমাকে আরেক জায়গায় চলে যেতে হল ( এ ঘটনাটা আজ সারা বিশ্বে ঘটছে )—আমি নতুন পরিবেশে চলে এলাম। এর ফল হচ্ছে দুদিকের শূন্যতা : আমার অতীত আমার শিকড়টা থেকে যেমন অজ্ঞান হতে শুরু করলাম তেমনি আমার নতুন জায়গা থেকেও আসছে অজ্ঞানতা অনীহা, কোনদিককার সচেতনতা আমার আসছে না। নতুন জায়গার সাংস্কৃতিক সামাজিক রূপ ইত্যাদি বোঝার সময় অথবা অনুভূতি আমার কম কারণ আমি সেখানে পৌছেছি আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমার চাকরীর জন্য : স্বাভাবিক আমি সেই স্থানের যাযাবর পক্ষী বিশেষ, শিকড়টা ছড়াতে পারব না—যেমন শুকিয়ে যাচ্ছি আমি তেমনি উষর হয়ে যাচ্ছে সেই স্থানও, শিকড়ের অভাবে।

একই বিচ্ছিন্নতা সম্পদসম্পত্তিতে। পজেশন আজ আছে অতীতেও ছিল, কিন্তু আজকের পজেশনটা কি? লক বলতেন সম্পদ সেটাই যাতে one's labour is mixed, সেই সম্পদ কি আজ আছে? আজ যাদের সম্পত্তি বলে স্বীকার করছি তাদের দুটো গুণগত পরিচয় পাই। প্রথমত সেটা যেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে পাওয়া, দ্বিতীয়ত তাতে যেন আরোপিত হয় বিযুক্ত-বিস্ময়। প্রথম কথা, পজেশান কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, mass man এর জন্য। সে পণ্যের বহিঁআবরণ জমকালো বৈচিত্রমণ্ডিত হলেও মোট জনসংখ্যার একটা ন্যূনতম অংশ এই পণ্য প্রস্তুতি শিল্পে কাজ করে এবং এ ধরণের পণ্য উৎপাদনে মানুষের সংখ্যা এতই কম যে মনে হয় পণ্যটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে যেন পাওয়া, পণ্যটায় যেন মানুষের স্পর্শ থাকে না। এই নয়া ফেটিসিজমে মানুষে মানুষে সম্পর্ক পণ্য দিয়ে তো বিবেচ্য হচ্ছেই বরং মানুষের পণ্য সম্পর্কে উপরি-রহস্যময়তা জাগছে, মানবমস্তিস্কের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিস্ময় আসছে—শ্রদ্ধা বা অনুসরণ বা নিজেকে জাগিয়ে তোলার প্রবণতা উধাও হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত পজেসন বলছি যেসব পণ্যকে সেইসব নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মধ্যে হাইটেক এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে ব্যবহারকারী মানুষেরা সম্পদটির কার্যকারণ বুঝে নিতে একেবারে অজ্ঞ হয়ে পড়ছে, যারা ব্যবহার করছে তারা জানেই না কি করে সেটা তৈরী হচ্ছে কিভাবে সেটা সারানো সম্ভব অথবা পুনর্ব্যবহার সম্ভব—খুব সাধারণ ভাবে খুব সাধারণ ধাঁচের যে ইনভল্‌ভমেণ্ট থাকাটা বাঞ্চনীয় সেটাও থাকছে না—সিদ্ধান্ত এই যে বিচ্ছিন্নতা খুব আটপৌরে পোষাকের মধ্যে থেকেই বাসা বাঁধতে শুরু করেছে।

এবং সবই যখন যায় যায়—দেশ যায় গাঁ যায় বসন যায় ভূষণ যায়—তখন আরেকটু বেশী যাবার দলে নাম লেখায় মানুষ: ঘটে পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে অবনতি ঘটে, পিতাপুত্রের জেনারেশন গ্যাপ তো থাকছেই, ইণ্ট্রাজেনারেশনেও অসহজতা ঘটে যায়। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা গবেষণায় ঝড় তুলেছেন, ঝরাপাতা সম্পর্ক-তিক্ততার স্টাটিস্টিক্যাল হাত বই ইস্তক মার্কিন দেশে হার্ডকভার আটডলার পেপারব্যাক তিনডলারে বিকোচ্ছে···ঘটে কিন্তু যাচ্ছে উপদ্রব, কারণ নিশ্চয়ই আমাদের পাঠকের অজানা থাকছে না।

আর উপরোক্ত চারটে দুর্ঘটনার গুণগত উল্লম্ফন হল আত্মসম্পর্কের অবসান—নিজেকে-না-বোঝার অস্বস্থতা, যাকে মহাবিচ্ছিন্নতা বলে সময়সময়

উল্লেখ করেছি। এই মহাবিচ্ছিন্নতার মুহূর্ত দর্শন দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন জঁ্যা পল সার্ত, মনোদর্শন দিয়ে মার্কুস ( অবশ্যই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ), মনোবিকলনের সাহায্যে শ্রদ্ধেয় সিগমণ্ড ফ্রয়েড, অর্থনৈতিক দর্শন দিয়ে চিহ্নিত করেছেন শ্রদ্ধেয় কার্ল মার্কস এবং আজকের সময় আজকের সমাজ আজকের অর্থনীতি রাজনীতি সামাজিক পরিস্থিতির কদর্যতা বুঝে বুঝতে চাইব এবার আমরা।

৩.

মানুষ যখন প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বাসযোগ্য পরিস্থিতি থেকে সম্পদ-ভোগ্যতা থেকে এবং স্বজনপরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তখন প্রতিটি খণ্ডক্ষুদ্র বিচ্যুতি তার মনে তুলছে ছোট ছোট উদ্বেগের। এই উদ্বেগের সাথে অনুরণিত উদ্বেগ জমা পড়ছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয়জনিত উৎপাদন জগৎ মারফৎ—টানটান দুটো দু'দিকের উদ্বেগে প্রথম ভেঙে যাচ্ছে তার ব্যক্তিত্বের সীমারেখা ( সার্তর নসিয়া কি কাফকার ট্রায়াল এই সময়কার প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক দলিল )। যখনি বাইরে থেকে আঘাত আসছে তখন তার পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্ফটিকব্যূহে চিড় ধরছে। আঘাতের মোকাবিলা তাকে করতেই হবে ( কারণ সে মানুষ, অফুরন্ত তার জীবনশক্তি ), ওদিকে আভ্যন্তরীণ উদ্বেগের উর্দ্ধমুখী ঠেল—সে তার ব্যক্তিত্বানুগ মোকাবিলা করছে না, করতে পারছে না। ঠুনকো কাঁচের মত তার ব্যক্তিত্ব ভেঙে যাচ্ছে এবং ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে সে বাইরের আঘাতের মোকাবিলা করছে ঃ তার গোটা ব্যক্তিত্ব বলে আর কিছুই থাকছে না।

ক্রমে সে নিজেই তার এলায়েন হয়ে যাচ্ছে। এসময়কে সার্ত তাঁর 'সত্তা ও শূন্যতা'য় Look of the Other বলে উল্লেখ করেছিলেন। এরকম সময়ে সে সম্পূর্ণ অন্যের ওপর নির্ভরশীল, অন্যের ইচ্ছা অনিচ্ছা দিয়ে নিজেকে চালানো তার উদ্দেশ্য—আত্মরহিত অসহ্য এক পরিস্থিতি জন্ম নেয়। এবং অন্যের ওপর নির্ভরতা মানে অন্যের সাথে সম্পর্ক বা সুস্থ কোন মিত্র বোধ নয়, কখনোই নয়, বরং উল্টোটা, অন্যের চোখে নিজেকে কদাকার কুৎসিৎ ভেবে সংশোধিত হবার বিকৃত স্বেচ্ছাচার হ্যারা-জীনস-প্যান্ট-তেরপল—কাটা-ম্যান-জামা আর পপডিস্কোর কর্কট-মড়ক-আচ্ছন্ন-আচ্ছাদন; বহুদিন আগে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ

যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে সকল অসুখ
যুবককে মনে হয়, কোনো এক রহস্যের দূত
কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো
কোনো প্রণয়ীর কাছে ;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি
মার্চেণ্টের মারে নেই এই সব খুঁত

তখনকার বিজয় মার্চেণ্ট আজ মেটামরফোসিস করে গেছে লেডিকিলার শার্ট জেণ্টস রিফ্রেশনার কান্নার শরীর শরীরিণীতে।

অতএব আত্মবিচ্ছিন্নতা।

৪.

বিদীর্ণ বিচ্ছিন্নতার পুনশ্চ সংলাপ প্রলাপ বলে মনে হয়। আরো লেখা যায় ? আরো বাকী থাকে ? পুনরায় গোথে ?

হ্যাঁ বাকী থাকে। গোথে বলতে হয় বুঝতে হয়, সমস্যার সমস্যা বুঝতে অধিকতর সমস্যা আনতে হয়, এবার আনব সেইসব।

Mass Disintegration—গণ বিভাজন। গণবিভাজন হল, মানুষ বিচ্ছিন্ন হল, পরাক্রান্ত মানুষের কোনো রবীন্দ্রনাথ বলে উঠবেন না : মহা আকস্মিক / বাধাবন্ধ ছিন্ন করে দিক / তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি / দিব তাহে জীবন অঞ্জলি। কিন্তু বলবেন, বলবেনই, মেলাবেন তিনি, মেলাবেন…।

গণবিভাজন পাঁচদিকে ক্রিয়া করে তৈরী করে মনোবিকার। মনোবিকার সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত ছিল ইদিপাস কমপ্লেক্সের বিকলন, হর্ণির মত ছিল শিশুর অনুরাগ-না-পাওয়া (affectionless অর্থে), অ্যাডলারের মত ছিল হীনমন্যতা-বোধ, সার্তর মতে ছিল Scarcityর প্রাদুর্ভাব ও প্রাক্সিসের পিছু হঠার অব্যবস্থা। এদের সূত্রবদ্ধ করা কি অসম্ভব ? খুবই সম্ভব অবশ্যই সম্ভব। আজো মানুষ মানুষের কথা ভাবে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের বিপদে হাত বাড়ায় ; আজো দেশেদেশে পরাধীন আদর্শের উন্মোচনে কংসের কারাগার লাল হয় তবু বিপ্লব বেঁচে থাকে, মানুষ বেঁচে থাকে। সে বাঁচা স্থিতধী করতে পারে সম্ভবত, খুব সম্ভব, এই সূত্রবদ্ধতা—মিলতেই পারে ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়িটা ; ফ্রয়েড অ্যাডলার হর্ণি সার্ত মার্কুস সর্বোপরি শ্রদ্ধেয় মার্কসের

যথাপ্রাক্ত সংমিশ্রণে অসম্ভব নয় এই উচ্চাশা 'যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর, তবে দয়া কোরো হে

দয়া কোরো হে

দয়া কোরো হে

ঈশ্বর।'

৫.

গণবিভাজনের যুগে মানুষ আজ টিণ্ডারের ভাষায় cosmic stranger, one who realizes oneself only in negation এবং নেতিবাদ ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রতিটি ক্রিয়ায়, যারা তিনদিকে নিয়োজিত হতে পারে ঃ

* বিলম্ববিহীন প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্নতা
* সমাজসামাজিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতা
* সার্বিক বিচ্ছিন্নতা, মনুষ্যত্বহীন পারিপার্শ্বিকতা

প্রথমটা বুঝতে ঋত্বিক ঘটকের জগদ্দল' স্মরণীয়, জগদ্দলের বক্তব্য এবং জগদ্দল ছেড়ে যাবার মানসিকতায় প্রথমপর্বের বিচ্ছিন্নতা। আমরা অতীতের মত আজও পদার্থ-অপদার্থ ব্যবহার করি কি অধিকার করি, কিন্তু অতীতের সাথে আজকের ফারাক এইখানে যে আজকের ব্যবহৃত পদার্থের সাথে আমার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠছে না, আমি স্রেফ প্রভুত্ব করছি, ব্যবহারের জন্য ব্যবহার করছি, মনস্তত্বের ভাষায় আমার জান্তব প্রবণতাকে অভিক্ষিপ্ত করছি মাত্র— ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। কিন্তু কেন এটা হচ্ছে? একে কি রোধ করা যাবে না?

সম্ভবত নয়। অটোমেশন এমন পর্যায়ে উঠে গেছে যেখানে কায়িক শ্রম এতোটা নীচের দিকে নামছে যার ফলে একটা দ্রব্য বা পণ্য প্রস্তুতিতে আমার সৃষ্টিকারী ভূমিকা সম্বন্ধে আমারই সংশয় এসে যাচ্ছে; কারণ উৎপাদন প্রক্রিয়াটা এত বিভাজিত এবং পণ্য প্রস্তুতিতে তথ্য ও প্রযুক্তির পথে এত অন্তরায় আসছে (আমাদের কাছে, কর্তাদের কাছে নয়) যাতে পণ্যের সাথে সহজাত কোন সম্পর্কই আমার গড়ে উঠছে না, গড়ে উঠছে না অপরাপর মানুষের সাথে সম্পর্কও। এছাড়া নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে ওয়ান-ইউস-থিওরি'র (one-use-theory) আরোপ প্রথম বিশ্বে প্রায় শেষ, শেষ পণ্যের সাথে সম্পর্কও। একবার-ব্যবহারে-ফেলে-দেওয়া ব্যাপারটা সমাজ-অর্থনীতির গতিতে যেমন ত্বরণ আনে, তেমনি প্রয়োজনীয় পণ্যের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক-

হীনতা বাড়ায়, তখন আর মমতা সহকারে বিচারের আশায় থাকে না জগদ্দল, তাকে বলাৎকার করে ছুঁড়ে ফেলা হয়। শব্দটা সচেতন ভাবেই বলছি ঃ বলাৎকার ; কারণ মানসিক বিচারে এই one-use-rejection মানুষের মনে পার্ভার্সনকে জ্বালিয়ে রাখে, এখনকার জাপান তার সেরা উদাহরণ।

ব্যক্তিজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা দানা বাঁধলে সমাজজীবনে তার প্রভাব পড়বে এবং শোষক গোষ্ঠী সমাজজীবনের আচার আয়োজনে মানুষকে দর্শক বানিয়ে ফেলার সাহস পাবে, কোনভাবেই মানুষকে অংশগ্রহণ করতে দেবে না। মার্কিন জনসমাজে রাষ্ট্রযন্ত্রের আচার অবয়ব সম্বন্ধে উদাসীনতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা, প্রথম তার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দ্য তকভিল, তকভিল দেখিয়েছিলেন মার্কিন জনসাধারণকে রাষ্ট্রের ব্যাপারে উদাসীন করে রেখেছে মার্কিন প্রভুরা (অবশ্য এতটা জোর দিয়ে তিনি বলেন নি, তাঁর অনুসন্ধানে অনুসন্ধান করে একথা বলার সাহস পাচ্ছি)। এবং আজকের সময়ে যখন কিনা ইনফোটেক (information technology) আদিগন্তে প্রভাবপরাক্রান্ত তখন মিডিয়া শোষণের (media exploitation) নানাবিধ কলাকৌশল দর্শিয়ে মার্কিন জনসাধারণকে শুধুমাত্র দর্শক করে রাখা হচ্ছে, মানুষ সক্রিয়ে অংশ না নিক সেটা শাসকবর্গ চাইছে। মার্কস বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্র অপ্রতিরোধ্য বিচ্ছিন্ন, যদিও শ্রমজীবি মানুষ সংঘবদ্ধ। আজকের সমাজে এই কথা আরেকটু নতুন পর্যায়ে পৌছেছে। রাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন শ্রমজীবি মানুষ বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রে শ্রমজীবি মানুষকে নিজেদের অবিচ্ছিন্ন স্বার্থে নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে শাসনকর্তারা—নবতম পর্যায় হল এই।

এবং ক্রাইসিস, সার্বিক ক্রাইসিস। এতদ্বাহিত বিচ্ছিন্নতা মানুষমনুষ্যত্বে এনে দিচ্ছে নিঃসংকোচ অধীনতা ঃ সংকট মানসিকতায় সংকট আলোক-প্রাপ্তিতে সংকট শিল্পসভ্যতায়। প্রতিটি জীবনমুখী কর্মেস্থষ্টিতে বিচ্ছিন্নতার ভয়ানক একটা ঝড় বইয়ে দিচ্ছে আমাদের সমাজ। এ ক্রাইসিস খুব দীর্ঘে বলা যায়, বলা উচিতও। সময়ে সেকথা বলা যাবে, আপাতত এইটুকুই বুঝি ঃ গণবিভাজনী পদ্ধতির প্রচলন ঘটিয়ে আজকের সমাজ মানুষে মানুষে অনৈক্য সৃষ্টি করছে, আত্মন্ত মানবিক রাজত্বে দূষণ এনে দিয়েছে, মানুষকে পরাধীন করে চলেছে।

৬.

আলোচনা এখানেই শেষ। দুটো দিক দেখাতে চেয়েছি। সমাজ কর্তৃক

[library stamp]
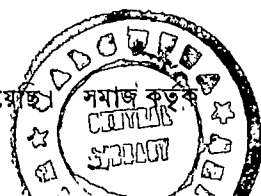
চালিত মানব বিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্ন মানুষকে সচল করার প্রচেষ্টা—সমাজের শাসকবর্গের লক্ষ্য অনুযায়ী। কিভাবে হচ্ছে কতভাবে হচ্ছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে সক্ষম হয়েছি।

এখন প্রশ্ন থাকে এখানে প্রশ্ন থাকে, সমস্যা থাকে তাই সমস্যা উত্তীর্ণতার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। শুরুর কথা দিয়ে শেষে বলি: শেষ কথা কে বলবে? গোথে? ফাউস্ত বলে উঠেছিল:

সেই অতীব ভীষণ
তমিস্রগহ্বর দ্বারে, কল্পনা যাহার
আনে মানুষের প্রাণে ভীষণ সন্ত্রাস!
চল সেই নরক বিবরে,
জ্বলে যার ক্ষুদ্রমুখে নিরয়ের সমস্ত অনল,
ফুল্লমনে দৃঢ় পদে হও অগ্রসর,
তাহে যদি আসে এ বিপদ,
মহাযাত্রা মহাশূন্যে, তবে তাই হোক।
এস তুমি নেমে এস···

মানুষ প্রস্তুত থাকে, মানুষ যাবেই।

৭.

সাহায্য পেয়েছি টিণ্ডার ( Tinder G ; **The crisis of political Imagination** : NY, Charles Scribber's Sons : 1964 ), রাইসম্যান ( Reisman D : **The Lonely Crowd** : New Haven : 1950 ) ও ষ্টেইন ( Stein M R : **The Eclipse oi Community** : Princeton : 1960 )-এর গবেষণাগ্রন্থ থেকে। তাত্ত্বিক ব্যাপারে নির্ভর করেছি মার্কুস ( Marcuse H : **One Dimensional Man** : London, RKP : 1964 এবং Marcuse H : **Negations** : Boston, Beacon : 1968 ) ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ( Jay M : **The Dialectical Imagination** : Boston. Little Brown, 1973 ) ধারাবাহিক গবেষণার ওপর। গোথের 'ফাউস্ত' থেকে উদ্ধৃতির জন্য ব্যবহার করেছি কানাই গঙ্গোপাধ্যায়ের বই ( প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স : ১৯৬১ ), মাঝের কবিতাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে সমর সেন থেকে। এই পুরো আলোচনা শ্রদ্ধেয় মার্কসের গবেষণা দিয়ে যাচাই করা যেত, তবে সেটা দীর্ঘতমের দিকে যাবে দেখে বাদ দিয়েছি, ভবিষ্যতে মার্কসতত্ত্বে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা করার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিচ্ছি, অতএব।

# তিনটি কবিতা

সুশান্ত বসু

## তুমি

দূরের দুঃখের কাছে গিয়েছিলে তুমি ?
হাত পেতেছিলে ম্লান খিন্ন অভিমানে ?
ঘরের ভিতরে ছিল প্রব্রজ্যার ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি ?
তুমি কি দ্যাখো নি চেয়ে
হেসে উঠেছিল দিন তোমারই কথার গূঢ় ওমে ?

নিশুতির মন্ত্র ছিঁড়ে জেগে উঠেছিল শিশু
সাজানো শব্দের সংঘারামে
তুমি কি শোনো নি তার গভীর নতুন ডাক
তোমাদের গোষ্ঠের গোকুলে ?

দূরের দুঃখের কাছে গিয়েছিলে তুমি
অভিমানস্ফুরিত উজানে ?
না কি সন্ধ্যাভাষা সেই দূরের প্রদীপখানি
জ্বেলেছিল তোমার উঠোনে ?

## হরিণ

বধির শব্দের শিয়রে চেয়ে থাকে
মুগ্ধ হরিণের শান্ত দুটি চোখ,
প্রত্ন ভাষা জেনে লুব্ধ সাত পাকে
নিজেকে বাঁধি যতো কেবলই নির্মোক

নতুন জালে বাঁধে, ক্লিন্ন সখ্যের
নিবিদে বেজে-ওঠা চতুর ভায়ে —
হরিণ চেয়ে থাকে হারানো লক্ষ্যের
পথের মুখ চেয়ে বিনীত দাস্যে ?

### চণ্ডালিনী

ছন্ন গোধূলির বিভা মুখে নিয়ে ক্ষুব্ধা চণ্ডালিনী
ও পাড়ার লোক—আদালতে
নালিশ জানিয়ে একা নির্বিচার ফিরে আসে
মৃত বৎসা ঘরের চৌকাঠে !

অমিত্রসূদন যত প্রতিবেশী প্রতিবাদী ঘর বৈতালিকে
ছুঁড়ে ছায় কীর্তনের রাতা—
সে চন্দ্রাতপের নীচে ক্ষুব্ধা চণ্ডালিনী,
নিরংশু শব্দের তাপে হি হি করে কাঁপতে থাকে
শুধু তার বুকজোড়া অবিশ্বাসী খিদে ।

## মৃত্যুর চাতাল

রেণুকা পাত্র

করতালি দেয়
অভাবিত সম্ভাবনা ।

নেপথ্য জলাভূমি ছেড়ে
নিহত একটি মুখ উঠে আসে
স্মৃতি যার পোড়ে না কখনও
মেহগনি, আবলুস কাঠে ।

মৃত্যুর চাতাল জুড়ে রক্তপলাশ হাঁটে
নিয়ে তার দ্রাবিড় গরিমা
সকলেই সহভাগী
বুঝে নিতে, শ্বাপদের সীমা।

অন্ধবাতাসও খোঁজে
পৃথিবীর অন্নজল।
তুমি শুধু রক্ত চাও
হে ঘোর আকাল।

## তৃষ্ণা

সুমিত্রা দত্ত চৌধুরী

একটু উষ্ণতা দাও আমি একটিবার জেগে উঠি
রক্ত নিয়ে নিশিদিন খেলি প্রিয় শব্দ মালা ছিঁড়ে ফেলি
এই হাত রেখেছি বৃক্ষের শিরায় শিরায় আকণ্ঠ তৃষ্ণা
নিয়ে বলো পিপাসার ঠোঁট রাখবো কোথায়? তুমি
আঁধার হয়ে যাও, সহস্র বছর ধরে প্রেমিকের সব চুম্বন নাও।
স্বরগুলি সর্বাঙ্গে জুড়িয়েছি এইবার নিজে হাতে তুমি
আমাকে বাজাও শুধু একটু উষ্ণতা দাও আমি
একটিবার জেগে উঠি॥

## যখনি যাই

নন্দিতা সেনবন্দ্যোপাধ্যায়

যখনি যাই রুদ্ধদ্বার,
বাতাসও দেয় বাধা।
অন্ধকার ঘুমিয়ে আছে
বুকের কোন জুড়ে।

বৃত্ত ঘিরে শব্দ শুনি,
অসহ উল্লাসে।
অথচ মন পরাঙ্মুখ
বৃথাই করে শোক.

জীবন শুধু বাড়িয়ে যায়
দিনের পরমায়ু।
কথার প্যাঁচে সুর কেটেছে
সন্ধ্যা, দিবা, রাত।

রৌদ্রকর ছড়িয়ে যেত শরীরে মাখামাখি,
সেসব দিন এখন যেন নষ্ট মৃত গাছ।
এখন কাল ভ্রূকুটি হানে সময়ে অসময়ে
অন্তরালে শানিত রাখে জিঘাংসার ছুরি,

যদিও ঝড় আসবে জেনে
আগেই জেগে ছিলাম।
আমায় ঘিরে বর্ম আঁটে
সূর্যহীরার দ্যুতি।

## পথ অবরোধ

শুভোদয় দাশগুপ্ত

সেদিন আমার খুব তাড়া আছে,
প্রচুর র'য়েছে কাজ তুমি জানো,
আমাদের দেখা হবে আবার অচিরে
তুমি জানো,
তবু তুমি দুহাত প্রসারিত ক'রে
অবরোধ ক'রলে পথ,
মুখোমুখি দাড়িয়ে আমার
সনির্বন্ধ ব'লে উঠলে 'না!'

এগোলেই তুমি—
সাগ্রহ ব্যাকুলতায় আগলে রয়েছ পথ—
আমাকে তো যেতেই হবে!

## শেষ পাঁচালি

অংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার কেন জ্বালাস রে মুখপুড়ি
যা ফিরে যা মন্দাকিনীর ঘাটে
হাড়ে হাড়ে বাজছে যে ঝুমঝুমি
দু'দিন পরেই ভুলবে ওরা মাঠে।

এখন মাঠে ফুটি ফাটা মাটি,
মুখ জুড়ে তার আঁকিবুঁকি কাটা
বুকের তলায় উইয়ের ঢিবি বাড়ে
মাথার ওপর গজিয়ে ওঠে জটা।

এখন কোথায় মৌসুমী মেঘ পাবি
কোথায় পাবি সবুজ চিকন ঘাস
মাঠ জুড়ে সব উধাও আকাশ ওড়ে
হাওয়ায় ঘোরে শুধুই হাহুতাশ।

জ্বালাস না আর জ্বালাস না শয়তানি
ফিরে যা তুই ব্যাঙ্গমীদের দেশে
মিথ্যে কেন আদাড় বাদাড় ঘোরা
হীরের আংটি হারিয়ে যাবে শেষে।

## সেই থেকে আমি

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন ছোটো ছিলাম তুমি দিয়েছিলে
নীলরঙের একটা আকাশ

কবরখানার ভেতর একটা জামরুল গাছ ছিল
আর মস্ত বড় একটা পুকুর
মাঝে মধ্যে ঢিল ছুঁড়তাম ওই জলে
এক লক্ষ্য তরঙ্গ উঠতো আর মির্জা ইউনিসের কবরের পাশ থেকে
মহাপাজী একটা কাক স্তব্ধতা ভাঙাতো ডেকে

আমি যখন কিশোর তুমি দিয়েছিলে
একটা লাঠাই-ভর্তি সুতো আর রঙিন ঘুড়ি
খুব দুপুরে বাতাসে ভর করে উড়িয়ে দিতাম
রঙ-বেরঙএর বিচিত্র সব ঘুড়ি
একদিন মেঘের ভেতর থেকে এক জাহাজ স্বপ্ন
ঝরে পড়তো আমার নরম শরীরে
আমি দেখতে পেতাম লাহাদের বাড়ির ফানুস
কিরকম উড়ে যাচ্ছে নক্ষত্রদের দেশে

আর আমি যখন সহসা গলার স্বর ভেঙ্গে ফেল্লাম
তুমি বললে এইতো যৌবন শুরু
এই নাও বড়ো একটা সাম্পান
জলে ভেসে পড়ো একদিন পৌঁছে যাবে
নীল রাজকন্যাদের দেশে
তারা তোমায় ভালবাসবে বীণা বাজিয়ে গাইবে গান
তাদের মোমের মতো শরীরে তুমি আলতো ঠোঁট রেখে বলবে
এইতো যৌবন
আর তাদের ইশারায় তুমি যে কোন মুহূর্তে
ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রতিবাদে বিদ্রোহে
যেন বিপ্লব তোমার রক্তে
যেন তোমার জন্যই এতকাল পৃথিবীর প্রতীক্ষা
তোমার যৌবনের তেজ ও অহংকার আমি মাথা পেতে নিলাম
তুমি বললে এই তো যৌবন ভরা প্লাবন

দীর্ঘ উপত্যকায় সবুজ মখমলের ওপর দাঁড়িয়ে এসব বলেছিলে

আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম
বাঙালি মুখ টেরাকোটার ভাস্কর্য
তুমি হাসছিলে না কাঁদছিলে লোকায়ত অলৌকিক
আমি কিছুই বুঝতে পারিনি
কেবল দেখলাম যৌবনের সাম্পানে আগুন ধরলো
ধূসর একটা মরুর সামনে
আমি পতঙ্গের মতো পুড়ে গেলাম
অনেক উর্ধে চলে গেছে প্রতিবাদের দিন
তুমি একটা তুষারের জামা দিলে আমার শরীরে
সেই থেকে আমি ধবল পক্ককেশ বৃদ্ধ।

## ভেবেছিলাম

**পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়**

ভেবেছিলাম হাত ধরে তুলে নিয়ে যাব,
কিন্তু শিয়রে সংক্রান্তি।
ভাবি, নিজেই আস না কেন
চলে চলে পথ বেয়ে চলে চলে
মাতাল চিত্রকরের অরক্ষিত গুহায়,
তুমি কি দ্বাররক্ষী নও?
স্বপ্ন কি ছিল না যে দেখবে
কে আসে কে যায়?
পেচকেরা নেই কি কোথাও?
কে শুধায়?
নাম বল নাম বল নাম বল
উভয়ের পাপস্খালন হোক
কিছুটা অন্ততঃ।

## যথাযথ সরলে

**নীরদ রায়**

কাগজকে বলি আর একটু শাদা হতে—
প্রকাশ্যে প্রকৃতি ঢালুক আগুন সেখানে;

আলিঙ্গন ছেঁড়ে সখ্যতা নামুক রাস্তায়
খোলামেলা হোক্ দুদিকেই আর একটু,
আর একটু লম্বা হোক্ ফর্সা হোক্
সত্থের স্থানীয় আবেগগুলি,
যথাযথ সরলে নির্ভুল হোক্ দশদিক
শব্দের অজস্র রং নীরবতা,

দেয়াল তুমিও সরে দাঁড়াও একটু।

## লোকায়ত

### পরিমল চক্রবর্তী

তোমার চোখের শান্ত সক্ষম বিনয়ী প্রতিবাদ
আমার সমস্ত দুঃখ সান্ত্বনার একক আশ্রয় ;
তোমার মুখের মায়া জীবনের গূঢ়তম স্বাদ
প্রাণে আনে, দূর করে হৃদয়ের অবসাদ, ভয়।

প্রেমিক ফাল্গুনমাস যৌবনের শোকের প্রচ্ছদ
সযত্নে লুকিয়ে রেখে অপরূপ রূপের আড়ালে
আমাকে বিমুগ্ধ করে, যেমন করেছে চিরদিন
দুঃখবাদী কবিদের প্রকৃতির রক্ত মাংস মদ ;
অশোক পলাশ কিংবা বকুলের বীতপত্র ডালে
বিরহের মূর্তি দেখে কেঁপে ওঠে স্মৃতির বিপিন।

বড়ো দুঃখ পেয়েছিলে, জানি আমি ; এই পৃথিবীকে
ভালোবেসে দুঃখ পাওয়া, তার স্বাদ আমারও শরীরে
রেখেছে করুণ চিহ্ন কী গভীর স্নেহমমতায়।
এই রোদ, এই ছায়া, শান্ত জলে পূর্ণিমার ছবি,
দেখে দেখে, দেখে দেখে এই মন ঈশ্বরের দিকে
ফিরে যায়, ডুবে যায় কবিতা ও শিল্পের গভীরে ;
প্রকৃতির শান্তির উৎস, জীবনের তীব্র যন্ত্রণায়
পেয়েছে সান্ত্বনা, শান্তি, প্রকৃতিতে চিরদিন কবি।

## গোষ্ঠী

মহুয়া চৌধুরী

যারা তার ব্যক্তিগত বধ্যভূমির কথা জানত ও
শিখেছিল যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্রের পুনর্বাসন
তাদের আত্মীকরণের প্রতিভা আজ ভেঙে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে ;
তারা ক্রমে

ছেলে জলপ্রপাত ও মেয়ে জলপ্রপাতের পার্থক্য বুঝতে শিখল
মুক্তোরঙা পানীয়ের খোঁজে বেরিয়ে দলে দলে হারিয়ে যেতে থাকল
তাদের বিদূষক কানমাথা আলোয়ানে ঢেকে ক্রমাগত বলতে লাগল
মফস্বল নয় বলে কিভাবে তাদের গ্রাম্য মাটির দেওয়াল দিয়ে শীত ঢোকে
মাটি তলতলে নরম হয়ে যায় ; কিভাবে তাদের
শাস্ত্রবাক্যের হাঁটুভর জল ও জঙ্গল ঠেলে উঠে আসে পৌরাণিক
প্রথম দেবতা

স্বাস্থ্যনিবাসের ছাদে উৎসারিত হয় তার আড়ষ্ট প্রকরণ, উন্মাদ বমন
তার আবহমান ভয়ও একটি সামাজিক কাছ ; তারা বলে
ডাইনী তাড়ানো হাওয়া খুঁড়ে তোলে কার কেশগাছি।

অধিকতম ছয়টি চান্দ্রমাস—
কাচের মতো স্বচ্ছ তার বাহু থেকে বাসস্থান উড়ে যায়
হারানো পুজার নীতি, মফস্বল প্রসারী কাম
ঝকঝকে দুধের দাঁতে শুষে নেয় পৃথিবীর মেরুদেশ
সূর্যের মতো দূরগামী এই শহর
রঙিন বুদ্বুদের মধ্যে অস্তগামী পথগুলি, দেওয়াল চিত্রগুলি নিয়ে
ক্রমশ মিলিয়ে যায়, লীলাভরে পরিখার তীরে এসে ধাক্কা খায় প্রেতদেহ
অশ্বগুমণ্ডল পেট, মাথার উপরে
দ্যুলোকে বাজতে থাকে সহস্র বীনার ঝনঝন, আর লোকজন বলে
কিভাবে তাদের, পাহাড়ে তারার দিকে উঠে যাওয়া শেষ পথটিতে
বাসযোগ্য ঘরে বাঁধা হল

# জাতক

প্রফুল্লকুমার সিংহ

এ্যা-এ্যা-এ্যাই।

খোঁড়া পা খালেই পড়ল।

—সাতে তুসী···অশ্লীল ভাষায় খিস্তি করে উঠল ড্রাইভার। ফটিকের বুকে ঝট্‌কা খেল চারশো চল্লিশ ভোল্ট বিজলীর। বাপরে-বাপ।

ব্যাজার মুখে বলল—আমি তোমাকে বলেছিলম পানাগড়ে চাকা বানিয়ে নাও।

—আরে বুড়বক! চাকাকো ক্যা কসুর? ও-তো ঠিক হ্যায়! অ্যাকসল টুট গিয়া। দেখতা নেই কিৎনা বড়া গাড্ডা।

সামনেই রেল গেট। ইস্টার্ণ রেলওয়ের মেনলাইন ও জি. টি. রোডের ক্রসিং। হরদম ট্রাফিক। রেল গেট পনেরো মিনিট বন্ধ হলেই জি. টি. রোড বরাবর এক কিলোমিটার লম্বা গাড়ির লাইন পড়ে যায়।

গেটের আগে বড় বড় হাম্প। তা তো ড্রাইভাররা জানে কিন্তু তার আগে যে একটা নালাও খুঁড়ে দিয়েছে সেটা ওর জানা ছিল না। দিন সাতেক আগে যখন এসেছিল তখন এ নালাটা ছিল না, দিন সাতেক পরেও হয়তো থাকবে না। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেল।

পিছনের একটা চাকাতে গ্যাটিস দেয়া ছিল সেটাই খটাং ঘটাং করে আসছিল। ফটিক ভেবেছিল—বুঝিবা চাকাটারই কিছু হয়েছে। গাড্ডায় পড়ে অ্যাকসল ভেঙে যাবার ব্যাপারটা ও বুঝতে পারে নি। বেশিদিনের অভিজ্ঞতা তো নয়। মাসখানেক হল ট্রাকের খালাসির কাজ করছে। আগে ছিল রাজমিস্ত্রির কুলি। লেগে থাকলে এতদিনে মিস্ত্রি হয়ে যেত। তা হল কই?

বলল—তা হলে কি হবে সর্দারজী?

—ক্যা হোবে? অ্যাক্সল বানাতে হোবে। গাড়িসে জ্যাক উতাড়। গুট্‌কা উতাড়। যোগান লাগা। অ্যাক্সল খোল।

ফটিকের ডান পা-টা জখম। হাঁটুর মালাইচাকি সরে গেছিল। সেই

থেকে পায়ে জোর পায় না। ভারী জ্যাক ও কাঠের গুটকা গাড়ির হুড থেকে নামাতে গিয়ে পা-টা থর থর করে কেঁপে উঠল।

রাস্তার পাশে ছাতিমতলা বস্তি। এলোপাথাড়ি ঝুপড়ি ঘর। টিন টালির দু একটা কোঠা। উদোম আদুল বাচ্চাকাচ্চা ধুলোবালি মেখে খেলে বেড়াচ্ছে। এদিক ওদিক যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ির চলাফেরা, ঘরের কাজকর্ম, একটা তাসের আড্ডা এবং একটি গাঁজার আড্ডা রাস্তা থেকে দেখাচ্ছে।

সর্দারজী বলল—আরে ফটকিয়া বস্তিমে যা। এক দো ছোকরা লে আ। বোল থোড়া মদৎ কর দে—দশটো রূপিয়া দে গা।

এই সেরেছে। ছাতিমতলা বস্তিতে যে ওর প্রবেশ নিষেধ। ঢুকলেই সরু মস্তান জান খারাপ করে দেবে। মিন্ মিন্ করে বলল—তুমিই যাওনা সর্দারজী।

—ক্যা তু হামার উপর হুকুম চালাবি রে। শ্যালা-মারকে খাটিয়া খাড়া কর দেগা। যা জলদি কর।

টাল বাহানা করতে করতে রাস্তায় নামল। এখানে জি. টি. রোড দু পাশের জমি থেকে তিন চার ফুট উপরে। মুখ আঁধারি সন্ধ্যাও নেমে এসেছে। ঝুপড়ি ঘরগুলি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশ-মার্গে। আঁধারের মেঘ ঝুলে আছে মাথার উপর। গা-টা কুল কুল করে ঘামছে গরমে, ভয়ে।

তবু জন্ম নিচ্ছে একটি বাসনা যদি একবারের জন্যেও তাকে দেখতে পায়। যদি সে হাতটা বাড়িয়ে বলে—ভয় কি? এসো।

হঠাৎ স্বর কেটে গেল। এক কুলিছোকরা ওর নাম ধরে ডাকল—ফটিক!

ওর বুকটা ধড়াস করে উঠল। লোকটির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাল। সে বলল—তুই কখন এসেছিস রে?

ফটিক স্বাভাবিক হতে পারছে না। ওর চোখে মুখে ভয় ও উদ্বেগের ছাপমারা অভিব্যক্তি। জড়িত কণ্ঠে বলল—রতন।

—হ্যাঁ। তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

—না-না। মানে—আমাদের ট্রাক খারাপ হয়ে গেছে।

—কোন ট্রাক?

—ঐ যে লাল মুখের মারশ্যালী।

—ওঃ। তো এখানে কি খুঁজছিস? কাজলীকে—না কি?

ফটিকের ভিতরে যেন একটা সাপ চরে গেল শর শর করে। কি রকম হয়ে গেল মুখটা। মার খাওয়া মানুষের মত।

ভয়ে ভয়ে বলল—না—না।

—আরে শ্যালা! বহুত লাজুক বনে গেলি যে। কাজলীর নামে তোর কালিজায় ধড়কন লেগে যাবে। আর না—না করছিস।

বলতে বলতে ও জানল।

ফটিক বলল—আমি কাজের লোক খুঁজছি ট্রাকের কাজে মদত করতে। চল—যাবি?

—কেন যাবো না? মালকড়ি ছাড়লেই যাবো।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সর্দারজী বলেছে—দশ টাকা দেবে।

—ধুঃ স্যালা! দশ টাকার বাজার আছে নাকি?

—চল। সর্দারজীর সঙ্গেই বাৎচিৎ করে নিবি।

—আচ্ছা চল।

সর্দারজী লাইনের ড্রাইভার। বহুত চলতা পুরজা আদমী। দু-চার কথাতেই রতনের সঙ্গে দোস্তি করে নিল। ওকে বোঝাল—আরে ইয়ার, রুপেয়া পয়সার কি ফিকির আছে রে। পহেলে অ্যাকসল তো মেরামত করিয়ে লিতে দে। উসকে বাদ দারু দাওয়াই পিয়ে মউজ করব।

এ কথাটা ম্যাজিকের মত কাজ করল। রতন কাজে লেগে পড়ল। ওরা তিনজনে মিলে চাকা খুলে, ট্রাকের নীচে গুট্‌কা যোগান দিয়ে ভাঙা অ্যাকসল বের করে ফেলল। এটাকে ওয়েল্ডিং করাতে আসানসোল যেতে হবে। সেটা কোন সমস্যা নয়। সর্দারজী জি. টি. রোডের ড্রাইভার। গম গম শব্দে কত ট্রাক হরদম চলছে। তারই একটাতে চড়ে ও চলে গেল।

রতন বলল—যাবে, কাজলীকে থোড়া টুসকি দিয়ে আয়।

কাজলীর নাম শুনলেই ফটিকের বুকে ঘোড়া দৌড়ায় কিন্তু পা টা যে এখনো জখম হয়ে আছে। আর কি তার কাছে যেতে পারবে?

খুব হতাশ ভঙ্গিতেই বলল—নারে ভাই। আমার ডর লাগছে।

—শ্যালা! ডরপুক আদমী।

মুখ মটকে চলে গেল।

ফটিক একা। সীটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। কাজলী ওকে ভীষণ

ভাবে টান মারছে। টোপ গেলা মাছ যেমন খাই খেয়ে ছপাল দেয় তেমনি-ভাবে মনটা খাই মারছে।

কিন্তু সরু মাস্তান!

নামটা মনে আসতেই ভিতরে ভয় গুরু গুরু করে উঠল। আরো গুটি সুটি মেরে শুল যাতে কেউ দেখতে না পায়।

বছর তুই আগে এই ছাতিম তলা বস্তিতেই ওর একটা স্বপ্ন মার খেয়েছে, একটা পা জখম হয়েছে, শরীরে তেরোটা সেলাই পড়েছে। দাগ এখনো বর্তমান।

ওঃ শ্যালা সরু মাস্তান! দত্তবাবু! ঘনশ্যামবাবু! সোহাগী। কত চরিত্র! একটা মানুষের ভালবাসা ছিনিয়ে নেবার জন্য কি তাদের রুদ্রমূর্তি।

তখন ও রাজমিস্ত্রীর কুলির কাজ করত। পি. ডবলিউ. ডি.-র ব্রিজ তৈরী হচ্ছিল। ইন্‌জিনিয়ার, সুপারভাইজার, ঠিকাদার, মুনসি রাজমিস্ত্রী, লোহার মিস্ত্রী, কুলিকামিন কত কি লোকের কাজ চলত রম রম করে।

ফটিক নামেই রাজমিস্ত্রীর কুলি ছিল। দিনের বেলায় দত্তবাবু সুপার ভাইজারের ভাত রাঁধত। সন্ধ্যাকালে চামচেগিরি করত।

দত্তবাবু একটা তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করতেন। তার আশেপাশে ছিল কুলি ধাওড়া। কাঠ বাঁশ খড় বিচালি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি আছে। জি, টি. রোডের ধারে একটা ধাবা আছে। সেটা দিনরাত গুলজার হয়ে থাকে। ভুর ভুর করে মাংসের গন্ধ ওঠে, ডালডা ঘিয়ের পরোটা তৈরী হয়। হায় হায় শব্দে বিয়ারের বোতল খোলে। দেশী মহুয়া থেকে ফরেন লিকার তক্ মদের যোগান মজুত থাকে।

দত্ত বাবুরা ধাবাতে গিয়ে মদ খান না। ওটা নাকি বারোয়ারী মাইফেল। সেখানে প্রাইভেট ব্যাপার কিছু নেই। সেজন্য ওঁর তাঁবুতেই আড্ডা জমে। শনি রবিবারে জমজমাট আসর। ঠিকাদার, মুনশি, ইন্‌জিনিয়ার, মাল পাচারের তু'নম্বরী আদমী, সরু মস্তানের পার্টির রংদার মাইফেল। ফটিক পাল তাদের খিদমতে হরদম হাজির। ধাবা থেকে নিয়ে আসত কষা মাংস, মাছ ভাজা, ঘুগনি, ছোলা ভাজা। আদা, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, শশা টমাটোর স্যালাড তৈরি করত ও। পাঁইট আনত সোহাগীর কাছ থেকে। দেশি মহুয়ার খাঁটি মাল। দাম ছিল চার টাকা।

সোহাগীর চার পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে কাজলাই বড়। দিঘল চোখ,

লম্বা গড়ন, ঘাড়ের উপর ডাগর খোঁপা। ছলবলে মেয়ে। তখনো বিয়ে হয় নি। ওর মা ওকে জীয়ল মাছের মত পুষে রেখেছিল।

সোহাগী বাস করত ঝুপড়ীতে। স্বপ্ন দেখত পাকা ঘরের। আগে রাজমিস্ত্রীর কামিনের কাজ করত। স্বামী একটা ছিল। হয়তো এখনো আছে। তবে তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না। সরু মাস্তানই ওর খাস আদমি। মাথা ভাঙা তালগাছের মত একটি সরল গুঁড়ি। তেমনি কালো রং। আঙুলগুলি লিক্ লিকে লম্বা। সাঁড়াশীর মত শক্ত। পকেটে চাকু, পিস্তল থাকে। সাঙ্গো পাঙ্গো নিয়ে মস্ত বড় দলের লীডার। তার মাথার উপরে রাজনৈতিক ঘুঘু। পেশাদার খুনী। ফটিক পাল তার ভয়ে জুজু।

মদের পাঁইট আনতে যখন তখন সোহাগীর ঘরে যেত। সোহাগী মদ খেলেই মাতাল। সরু মস্তান এলেই দরজায় খিল পড়ে যেত। তখন উঠোন থেকেই শোনা যেত তাদের আদিরসের গাল গল্প, হাসি, হুল্লোড় এবং সম্ভোগের বিচিত্র ধ্বনি।

কাজলী কালা নয়। বুঝবার বয়সও হয়েছে। ভাই বোন নিয়ে পাশের ঘরে তাল পাতার তালাই পেতে শুয়ে রঙ্গরসের বাক্য শোনে। রান্না বান্না করে। ভাই বোনদিগে খেতে দেয়। নিজেও খায়। মাঝে মাঝে মদের খদ্দের আসে। নগদ পয়সা গুনে নিয়ে পাঁইট দেয়।

এসব গোপন কারবার। উঠোনের একটা জায়গায় বাটা খুঁড়ে বোতল পুঁতে রাখে। তার উপরে জল টল ফেলে। যাতে কারো সন্দেহ না হয়। খদ্দেরকে দেবার সময় বোতলটা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। ফটিক এলে গল্প গাছা করে। ওকে পছন্দ করত ও।

আট বাই দশ ফুট মাপের তু'খানি ঘর। খড় বাঁশ দিয়ে ছাউনি করা। বাঁশের বেড়াতে তু'পাশ থেকেই মাটি লেপা দেওয়াল। সামনে একটি চালা। সেখানে রান্না হয়। কুটুস কাঁটা দিয়ে ঘেরা উঠোন ঘাস ও আগাছায় ভরে থাকে। একদিকে ছাই কুড়। শামুক গুগুলীর খোলা, যতসব আবর্জনা এবং উনুনের ছাই জড় হয়ে হয়ে ঢিপি হয়ে গেছে।

সন্ধ্যা হলেই উনুনের ধোঁয়া। যাঁহাতক্ ভাতের ফ্যান গড়ানো অমনি কাজলীর ভাইবোনরা সানকি নিয়ে বসে পড়ল। তারপরেই ঘুমে ন্যাতা।

একদিন হয়ে গেল আবগারী পুলিশের রেইড। কি করে যে গন্ধ পেল তা তারাই জানে।

ঘটনার দিন দত্তবাবুর তাঁবুতে জমকালো আসর বসেছিল। ফটিক মদের পাঁইট নিতেই আসছিল। জি. টি. রোডের উপর পুলিশের জীপটা থামতেই ও শিয়ালের মত স্বড়ুৎ করে সোহাগীর ঘরে ঢুকে গেল।

—মাসী গো—পুলিশ আসছে।

কথা তো নয় যেন দশ পাউণ্ড ওজনের হ্যামার। সোহাগীর মাথাতেই পড়ল। তৎক্ষণাৎ নেশা ছুটে গেল। সরু মস্তান ফড়িংয়ের মত ফুড়ুৎ করে পালাল।

সোহাগী বলল—তুই বাবা কাজলীকে বাঁচা। উয়াকে বাইরে নিঞে যেঞে খানেকক্ষন লুকাঞে রাখ গা। না হলে পুলিশ খালভারারা ডাগর বিটি ছিলা দেইখলে খেঞে দিবেক।

তা তো বটে। ফটিকের মাথাটা বন্ করে ঘুরে গেল।

এক লহমায় কাজলীর হাত ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে গেল। কুটুস কাঁটার বন জঙ্গল ভেঙে বে-রাস্তা দিয়ে ফাঁকা মাঠে উঠল। সেখানে নতুন হাইওয়ে তৈরীর জন্য ছ'পাশের মাটি কেটে ফেলা হয়েছে। মাটি কাটা খালের উপর জল চক্ চক্ করছে। ফিকে জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে তার উপর।

সে সব ডিঙিয়ে রাস্তা পার হয়ে ডাঙ্গার উপর দাঁড়াল ওরা। তখন ছজনেরই বুক ধড় ফড় করছে। কাজলী ফটিকের বুকে লেপ্টে গেছে।

ফটিক বলল—বোস ই-খানে। ই-দিকে কেউ আসবেক নাই। গাড়ি আসবার রাস্তা নাই।

কাজলী বলল—বাব্বাঃ। ভয়ে আমার জিউটি উড়ে গেইছিল। ছাখ বুকটি কেমন হপড় ধপড় করছে।

ওর ডান হাতটা তুলে নিজের বুকে চেপে ধরল কাজলী। কোমল মাংস-স্তূপে হাত পড়তেই গা-টা কেমন শির শির করে উঠল ফটিকের।

ওদের পায়ের নীচে ভিজে মাটি কোমল ঘাস। ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে চুমকি জলার মত জোনাকী জ্বলছে। মাঝে মাঝে মেঘ-ডম্বরু বাজছে। চাঁদটা কখনো মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছে। কখনো বিদ্যুৎ বিলোচ্ছে। ভয়ে বুক গুর গুর করছে। কাজলী সেঁটে আছে ফটিকের বুকে।

ভরা যুবতী। স্পন্দমান শরীর। সারা শরীরে বিদ্যুৎবলয়। দুই মেরুর ঘর্ষণে যেমন স্ফুলিঙ্গ ওঠে তেমনি করে স্ফুলিঙ্গ উঠছে মগজে, ফুসফুসে, হৃদযন্ত্রে। দারুণ উষ্ণতা বোধ করছে ওরা। কি রকম অস্থির অবস্থা।

আকাশে ঝলসে উঠল বিদ্যুতের রেখা। মাঠ প্রান্তরের মাটি, ঘাস ঝোপঝাড় এক মুহূর্তের জন্য আলোর বন্যায় ভেসে গেল। ফটিক দেখল কাজলীকে। কাজলী দেখল ফটিককে। দুজনের দেখার মধ্যে ছিল যুগান্তরের স্বপ্ন। অলৌকিক মায়া। অনাস্বাদিত কাম।

ফটিক ওকে জড়িয়ে ধরল নিবিড় আশ্লেষে। কেমন হিস্ হিস্ শব্দ করে বলল—একটা চুমু দেবে কাজল ?

—আমার ডর লাগছে।

—কিসের ডর। আমি আছি।

—আমার মরদ!

বর্ষার মাটিতে তখন প্রাণের উৎসব। প্রতি মুহূর্তেই অঙ্কুরিত হচ্ছে বীজ। চারিদিকে চষা মাঠ। শিকড়ে বাকড়ে, অঙ্কুরে পল্লবে অঘোষিত প্রাণের বার্তা নিয়ে ছুটে যাচ্ছে বাতাস। প্রকৃতি সেজেছে নতুনরূপে। নবীনা যুবতীর মত। গর্ভাধানের প্রস্তুতি নিয়ে।

ফটিকের পাশে কাজলী। দুজনে ফিরে আসছে। কাজলীর মুখে লাজুক হাসি। অকারণেই ঢলে পড়ছে ফটিকের বুকে। ভিতরটা ছল্ ছল্ করছে। করছে। বুক ভরে গেছে মিলনের আনন্দে।

হঠাৎ সে বলে বসল—মা বলেছিল কাজলীকে তুই বাঁচা। এই করে বাঁচালে। গোটাটিই খেঞে দিলে।

—আমি কি একাই খেঞেছি ? তুইও তো খেঞেছিস।

—ই-বারে উগরাবো কি করে ?

—উগ্‌রাবি ক্যেনে ? ভালবাসা কি ফেলবার মাল ?

বর্ষার পর শরৎ। তখন আকাশের রঙ নীল। মেঘের কোলে মেঘ। সাদা সাদা ঢেউ। আকাশের রঙ বদলায়। আকার বদলায়। কখনো হাতীর মত, কখনো নদীর মত।

আশ্বিনের রোদ ঝলক দিচ্ছে মাঠে। গর্ভিনীর পুলকে দোল খাচ্চে ধানের চারা। ছাতিম তলার ডাঙায় কাশ ফুলের মেলা। সবুজ ঘাস, সবুজ ধান, সবুজ গাছ পালার মাঝে দীঘল পরিসর একটি সাদা নৌকার পাল দোল-খাচ্ছে বাতাসে।

হাঁটা পথে আসছে ফটিক ও কাজলী। বর ও বধূ। মা ঘাগর বুড়ীর

কানে কাজলীর সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়েছে ফটিক। একজন পূজারী বামুন মন্ত্রপাঠ করে ওদের বিয়ে দিয়েছেন। দুজনেরই গলায় পরিয়ে দিয়েছেন মায়ের পায়ের প্রসাদী ফুলের মালা।

এখন ওদের বুকে অনেক স্বপ্ন। প্রকৃতির মতই সুন্দরী হয়েছে কাজলী। অমনি ভরাট, অমনি চিকন। ঐশ্বর্য্যময়ী জায়ার গর্ভে নতুন প্রাণের আগমনী বার্তা ধ্বনিত হচ্ছে তখন।

কাশফুলের ডাঙা দেখে ওদের বুক ফুলে উঠল। পরস্পরকে চোখ ঠেরে দেখাল সেই ঠাঁই।

ফটিক বলল—আর এক রাত আসবে কাজল ?

—ধ্যুৎ! আবার আসব ক্যেনে ? কিসের লুকাছাপা ? দু পারে আমাদের পারমিট হঞেছে।

প্রেমের পারমিট বিয়ে। গর্ব ভরে হাসল কাজলী। গোপন প্রেমের বড়ই আশঙ্কা, কখন কে দেখে ফেলে সেই ভয়ে বুক ফাটত। আবার মিলনের সুখেও বুক ফাটত। কত কি ফন্দি ফিকির করে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদের প্রেম—ভালবাসা—মিলন। আজ ওরা লাইসেন্স পেয়েছে। এবার বুক ফুলিয়ে সহবাস করবে।

কিন্তু হায়!

ছাতিম তলার বস্তিতে ঢোকামাত্র সোহাগীর খাঁই খাঁই শব্দে হৈ চৈ পড়ে গেল।

—খালভরা, বেজন্মা, হারামজাদা—আমার বিটিকে বিয়া করবি তুঁই। এত আস্পদ্দা! দেখছিস ডাং—বিয়ার সাধ মিটাঞে দিব।

সোহাগী সত্যি সত্যি ওকে লাঠি মেরে বসল। আচমকা ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ল ফটিক। মাথাটা ঘুরে গেল। সামলে নিয়ে উঠতে যাবে তখন হাওয়ার ভর করে ছুটে এল সরু মস্তান। এলোপাথাড়ী লাঠি পড়তে লাগল ওর সর্বাঙ্গে। কোথায় ছিটকে গেল কাজলী, আর্ত চিৎকারে ভরে গেল ছাতিমতলা।

মারের চোটে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখছে ফটিক। পা-টা তুলতে পারছে না। সারাগায়ে দর দর করে রক্ত ঝরছে। তবু মায়া নেই। সরু মাস্তানের সাঁড়াশীর মত আঙুল চেপে বসল ওর গলায়। টানতে টানতে গেল দত্তবাবুর তাঁবুতে।

উনি ওর বুকে পা দিয়ে বললেন—শ্যালা, বেইমান, নিমকহারাম। আমারই খাবি পরবি, আমারই মাল নিয়ে সটকে দিবি। এত হারামী তুই! জানিস, কাজলী আমার বায়না করা মাল! সোহাগীকে এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স পেমেণ্ট দিয়েছি। আর তুই ওর কপালে সিঁদুর দিয়ে বে-দখল করবি মনে করেছিস! বিয়া হল—বিয়া। শ্যালা, কাজলীদের আবার বিয়া হয়? যা নিকাল যা। ভবিষ্যতে কোনদিন যেন তোকে ছাতিমতলায় দেখতে না পাই।

কানদুটো ঝর ঝর করে উঠল ওর। তড়াক করে সিটে বসল। এদিক ওদিক তাকাল। মনে হল—এখনো এক পাল ঠ্যাঙাড়ে ওকে বে-ধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে। ওর ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে। রক্তের স্বাদ নোনা লাগছে। হাঁটুতে হাত দিল। ব্যথায় টন্ টন্ করছে। সরু মস্তানের লাঠিতে মালাই চাকি সরে গেছল। তারই দরদ উঠছে এখন। আবার সে এসেছে—এখবর জানতে পারলে জান খারাপ করে দেবে।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ও। ট্রাক থেকে নেমেছে। পালিয়ে যাবে ভাবছে।

হঠাৎ সর্দারজীকে দেখে ঘাবড়ে গেল্।

সর্দারজী বলল—আবে ফট্‌কিয়া—উ—টেরাকসে অ্যাকসল উতার। রতনকো বুলাকে লে আ।

বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিল ফটিক। ওর পাশেই একটা ট্রাক তখনো গর গর শব্দে গর্জন করছে। সর্দারজী ওটাতেই এসেছে।

অ্যাকসলটা নামাল। ডাক পেয়ে রতনও এল। ট্রাক মেরামত হল। সর্দারজী লুঙ্গির খুঁট তুলে ঘাম মুছতে মুছতে বলল—তিরপল উতার। বৈঠনেকা জায়গা বানা।

রাস্তা থেকে দূরে ছোট ত্রিপল পেতে ওরা বসল। সর্দারজী পকেট থেকে নোট বের করে দিল। রতন নিয়ে এল রুটি, তরকারি, ঘুগনি, পিঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা এবং দু'পাঁইট মদ।

বেশ জম্পেশ করে বসেছে ওরা। খাওয়া-দাওয়া চলছে। মেজাজটা বেশ তরল হয়ে এসেছে।

রতন বলল—ক্যারে ফটিক মাল কেমন আছে?

—ভালো।

—কোথাকার মাল জানিস ?

—না—তো।

—তোর শাশুড়ির।

ফটিকের গলায় হেঁচকি উঠল। অন্ধকারে মুখ নামাল দুঃখে লজ্জায়। রতন ফ্যা ফ্যা করে হাসল। সর্দারজীকে বলল—হাঁ! ফটিক এক ছোকরিকে পেয়ার করেছিলো। ঘাগর বুড়ীর থানে শাদি করেছিল। লাইসেন্স পারমিট লিয়ে মিঞা বিবি যখন আসলো তখন মার ধোলাই—মার ধোলাই—মিঞা বিবি দোনোকো ফিলাট করিয়ে দিলো।

সর্দারজীর নেশাটা চড়ে এসেছিল। বলল—কিঁউ ? ধোলাই কিঁউ ?

—আর সর্দারজী উ ছোকরির মা বহুত চালিয়াৎ আওরত। দত্তবাবুর কাছে আপনা বিটিকে দিবো বলে অ্যাডভান্স রুপিয়া লিয়েছিল। তার উশুল দিবার আগেই ফটিকের পেয়ারে উ-ছোকরির গা-ভারী হয়ে গেল। তব তো দত্তবাবুর রুপেয়া ভি চোট, উ আওরতের ব্যবসা ভি চোট। আ গাইল সরু মাস্তান। মারতে মারতে ফটিককে নিকালে দিলো।

সর্দারজী হুঙ্কার দিল—সাড়ে! ভঁসাড়ীবালা—

রতন বলল—ছোকরি ভি লাইনে এসে গেল। দত্ত বাবু পি. ডবলিউ, ডি'র রড, সিমিন্ট, কাঠ, টালি, লেবার লিয়ে মকান্ বানায়ে দিলো। কুরশি, টেবিল, আয়না, ছপ্পর বানায়ে দিলো ঘনশ্যামবাবু। জেবর দিলো, শাড়ি দিলো, রুপেয়া দিলো—

ফটিক ওর হাত ধরে বলল—হেই ভাই আর বলিস না। শুনে আমার মন খারাপ হঞে গেছে।

সর্দারজী খেঁকিয়ে উঠল—সাডে—ডরপুক আদমী। শাদি করিয়েছিল তো খিঁচকে লে-আ-উ ছোকরিকো।

ফটিক আঁতকে উঠল। ভয়ে ভয়ে বলল—উয়ারা মেরে আমার জান খারাপ করে দিবেক।

—সাডে নিকম্বা। এতো ডর তো শাদি করিয়েছিস কেনো ?

রতন বলল—উয়ার প্যায়দা এক বাচ্চা-ভি আছে সর্দারজী।

নেশাগ্রস্থ ঘোলাটে চোখ মেলে সর্দারজী বলল—তো? বা—আপনা বিবি-বাচ্চাকে লিয়ে জান কুরবান কর দে। শহীদ বন যারে—বেটা পেয়ার কা শহীদ।

ফটিকের কানে ঝাঁই ঝপক বাজনার মত লাগল। এত ঠাট্টা, এত টিট্‌কিরি। ছিঃ। জীবনে বড় ধিক লাগল। গুম হয়ে বসে রইল। ভিতরে শন শন শব্দে ঝড় বইছে।

প্রেম তো জাত সাপের বিষ। একবার মাথায় চড়ে গেলে আর রক্ষে নেই।

কিন্তু তার সন্তান?

ওহো! আমি যে বাপ!

মাথার মধ্যে কয়েকটা স্ফুলিঙ্গ চড় বড় করে উঠল।

খাওয়া দাওয়ার পর সর্দারজী সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। রতন চলে গেল নিজের ডেরায়। সে একা আবছা অন্ধকারে বসে আছে। সর্দারজীর নাক ডাকছে। ও মনে করছে মারসিডিস ট্রাক চলছে।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। ইতি উতি তাকাতে তাকাতে চলতে লাগল। এখন ওর বুকে ভয়কে জয় করার সঙ্কল্প।

সেই ঝুপড়িটা ভেঙে টালির ঘর হয়েছে। পাকা গাঁথনিকরা ইটের দেওয়াল। বেড়ার আগল খুলে উঠোনে পা দিল। পা টিপে টিপে বারান্দায় উঠল। পাশাপাশি দুটি ঘরেরই দুয়ার খোলা। একটি ঘরে দুটি তক্তাপোষের উপর সোহাগীর ছেলে মেয়েরা। ছেলে দুটি বেশ ডাগর হয়েছে।

অন্যঘরে একটি পালঙ্ক। সবুজ রঙের চাদর মোড়া বিছানা। নাইলনের মশারি টাঙানো। ফিকে আলোতে ভিতরটা অস্পষ্ট দিয়াছে।

হঠাৎ কাজলী বাইরে এল। হয়তো মানুষের গন্ধ পেয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিমূঢ়তা কাটিয়ে বলল—তুমি?

ওর পরনে সিল্কের শাড়ি। কানে সোনার দুল। হাতে চুড়ি, গলায় বিছে-হার। শরীরটি ভরাট। মুখটি টুস্ টুস্ করছে। স্নো পাউডারের ছোপ লেগে আছে। ফুর ফুরে সুগন্ধ বের হচ্ছে। কারো জন্যে যে প্রতীক্ষা করছে তা আর বলে বোঝাতে হবে না।

ফটিক ওকেই দেখছে। ও বলল—তুমি কি করে এলে? কি দরকার?

ফটিকের মনে হল—কাজলী তার পর হয়ে গেছে।

বলল—দেখতে এলম। বড় মন টানছিল।

—অঃ।

ফটিক বুঝে নিল এখানে সে অবাঞ্ছিত। তবু ছ্যাঁচোড়ের মত বলল—আমাকে তুমি ভুলে গেইছো না—কি ?

—না। ভুলব ক্যেনে ? ঘরকে এসো।

কাজলীর পিছনে পিছনে ঘরে এল ফটিক। দুটো বেতের চেয়ার পাতা ছিল। তারই একটাতে ওকে বসতে বলল কাজলী।

কাজলী বলল বড়ই আড়ষ্ট ভাবে।

কাজলী বলল—বেশীক্ষণ বসতে পারে নাই। যা দরকার তাড়াতাড়ি বল। ফটিকের একটি ডাকে যে মেয়ে নিশুতিরাতে অন্ধকার মাড়িয়ে মাঠের মধ্যে চলে আসত, ভিজে ঘাসের উপর বসে রাত ভোর করে দিত, আকাশ থেকে ঝুপ ঝুপ করে তারা খসে পড়ত তবু যে উঠতে চাইতো না, সে আজ ওকে বিদায় করতে পারলে বাঁচে।

বর্ষার রাতে টপ্ টপ্ করে জল পড়ত। মেঝেতে তালাই পেতে ভাইবোনদিকে নিয়ে শুত। বৃষ্টির ছাট বাঁচাতে চট আড়াল দিত। তার এখন একার একটি ঘর। গদিমোড়া বিছানা। চেয়ার; আলনা, বড় আয়না, প্রসাধন সামগ্রী—কত কি!

চুপ চাপ দেখে যাচ্ছে ও। কাজলী বলল—কি হল ? চুপ মেরে গেলে যে ?

—দেখছি।

—কি দেখছো ?

—তোমার সুখ। কত সুখে আছো। আমি জীবনে কখনো তোমাকে—এত সুখ দিতে পারতাম নাই।

ফটিক বলল—আমি তুমার পর হঞে গেইছি কাজল ?

কাজলী চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফটিক বলল—ভয়ের কাছে হেরে গেলাম। তোমার জন্যে আমার একটি পা জখম হঞে গেল। তবু পর হলাম।

কাজলী বলল—পর মনে করলেই পর। আমি ত একটা ম্যেয়ামানুষ। আমার রক্ত মাংস খাবার জিনিষ। হোটেলের কষা মাংসের মতন। কিন্তুক্ তুমার ভালবাসাকে আমি ফেলে দিই নাই। ঐ দ্যাখ বুকে করে রেখেছি।

হ্যারিকেনটা উস্‌কে মশারীর খুঁট তুলে দিল। ফটিক দেখল একটি উদোম আদুল ছেলে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তার কোমরে বাঁধা ঘুনসী কড়ি। গলায়

তামার মাদুলী। এক মাথা কালো চুল। গাল দুটো ফুলো ফুলো। গলা বেয়ে ঘাম পড়ছে গলে গলে।

ফটিক ওর দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর বুকে খোপ মইছে। আস্তে আস্তে হাত বাড়ালো। শিশুটিকে স্পর্শ করল। আলতো করে সারা গায়ে হাত বুলোলো। নরম স্পঞ্জের মত শরীর। চুমু খেতে ইচ্ছে করল।

কত কি ঘটে যাচ্ছে মনের ভিতর। চোখ ফেটে জল আসছে। ভাঙা গলায় অন্তরের সব ব্যাকুলতা ঢেলে দিয়ে বলল—বাপ বেটা—বাপ তই আমার হবি তো—আমাক বাপ বলবি তো—

আস্তে করে চুমু খেল ওর কপালে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঘুমন্ত শিশুর মুখে ফুটে উঠল এক ফোঁটা হাসি।

# কলকাতা '৮৯

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মানুষ কেমন সুখি তা দেখিনি, দুঃখেরে আমি দেখি প্রতিদিন.
স্কাইস্ক্রাপারের অদূরে টানেলে উচ্ছিন্নের মিলন বিরহ
অবাঞ্ছিত এ-জন্মের দায় বহনের ভারে বেঁকে চুরে যায়
মানুষ নামক দু'পেয়ে প্রাণীর শাদা কঙ্কাল কাঁধে দুর্বহ
অস্তিত্বের বোঝা, ক্ষুদকুড়ো জোটানো হা-মুখে
শিশুদের আর বুড়োবুড়িদের মাথার উপরে কাকের জটলা.
ও-ধারে নিবিড় সবুজের বুকে স্বাস্থ্যান্বেষী প্রৌঢ়, যুবতী—
এ যুগের সব ভাগ্যবিধাতা বুক ভরে নেয় বিশুদ্ধ হাওয়া
পোষা কুকুরের আলস্য-ভাঙা হাই ওঠে—বড়ো সুখের চিত্র.
তুঙ্গসুখের চূড়ায় সূর্য উঠে দাঁড়ালেন, ব্যস্ততা তাই
শুরু হ'লো এই মহানগরের, পথে পথে মহামানবের লীলা
ধুলো ও ধোঁয়ায় আমজনতায় জীবন্তের স্রোত পুণ্যসলিলা
গঙ্গার ঢেউ ভাঙে, বয়ে যায়—এইভাবে যাবে কতো শতাব্দী!

দুপুর গড়াবে বিকেলের দিকে বিকেল ফুরোলে নাগরিক রাত
ময়দানে কারা চুপে নিঃসাড়ে কথা বলে, ওই ক্যাথিড্রালের
চূড়ায় যখন যাই—যাই আলো, ফুটপাথে ওই যুবতীর সাথে
প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠায়, সন্ধ্যা নামলে ওরা এর হাতে
ওর হাত রেখে আদিম সুখের ক্ষুদকুড়ো বুঝে
নেবে, বিনিময়ে খুচরো টাকার কিছু প্রতিদান তারপর ফের
বিরাটির মেয়ে ধ্বস্ত শরীরে শিয়ালদা যাবে তারারা জ্বলবে
ভিকটোরিয়ার ধূসর আকাশে দু'একটা কোনো রাতজাগা পাখি
ডানা ঝাপ্‌টাবে; ব্যর্থ শিকারসন্ধানী নারী
পুলিশের দেনা শুধে মাঝরাতে স্খলিত চরণে
ফিরে যাবে বাড়ি।

মানুষ কেমন সুখি তা দেখিনি; দুঃখেরে আমি দেখি প্রতিদিন
মদালসা রাত গাঢ় হয়ে বসে চৌরঙ্গিতে; নষ্ট স্বাধীন
যুবকেরা জমে চোরকুঠুরিতে, প্রকাশ্যপথে, ডেকার্স লেনের
যুবকেরা জানে নিপুণ শিল্প হাত বদলের, ফ্যাকাশে যুবক—
দেখেছে অনেক জেনেছে অনেক, চোখে মুখে তাই প্রখর শান্তি
ভাঙাশরীরের ভাঁজে ধুলো আর অসীম ক্লান্তি
থাকা-না-থাকার সীমান্তে ওরা ভ্রমণক্লান্ত শিশুনাগরিক

ব্রহ্মপুরের রূপসী এবার ফিরে যাবে ফ্লাটে
সঞ্চয় তার কিছু বেশি দামে বিকিয়েছে হাটে
দেখেছে, শিখেছে তিলে তিলে মরা মায়ের কঠিন শেষ হাসিটুকু
দাতার চোখেও শকুন, অগ্নি ন'খে ও ছোঁবলে—করে অপেক্ষা
মানুষের দাঁত হায়েনায় চেয়ে ধারালো—
জেনেছে ছোটোবোন খুকু
দশবছরের বালিকা এবার দেবেই টেক্কা
মাংসের লোভে ওৎ পেতে যারা রয়েছে, তাদের; বকধার্মিক!
কলকাতা যারা শাসনে রাখেন
সেই নাগরিক মহানাগরিক
খুদকুড়ো দিয়ে গ্রাস করে ওরা প্রিয়জীবনের তাবৎ স্বপ্ন

ব্রহ্মপুরের রূপসী এবার প্রতিশোধ নেবে
নিঙরে নেবার পরে যৌবন
বার্ধক্যকে হাতে তুলে দেবে
এই সভ্যতা কে চেয়েছে? হায়! আমি তো চাইনি
ব্রহ্মপুরের কুমারী কন্যা চেয়েছিলো নাকি?
ওই যুবকেরা
ডেকার্স লেনের ফুটপাতে পোড়ে যাদের শরীর
ওরা চেয়েছিলো?
বিরাটির ওই কৃষ্ণাঙ্গিণী, শেষ লোকালের নিত্যযাত্রী
ও দেখেছে ঢের; এবার আত্মহননের বিষ হাতে তুলে নিলো
'শরীর ঠুকরে সুখ খেলো যারা তাদেরই জন্যে
এ শুভরাত্রি
পড়ে থাক, আমি বিষ টেনে নেবো একটি চুমুকে'

তোমরা ভাগ্যনিয়ন্তা, প্রভু ; ছাখো কৌতুকে
তফাতে দাঁড়িয়ে
এই কথা বলে বিরাটির মেয়ে ট্রামলাইনের আড়ালে
হারিয়ে
গেলো ; কয়েকটা শিমূল তখনো ফুটেছিলো গাছে

রবিঠাকুরের গানের ভিতরে বেঁচে থাকবার সান্ত্বনা আছে
'কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন রেখে যাও'. তুমি বিরাটির মেয়ে
শুনেছিলে নাকি কণিকার সেই দৈবী গলার কামনার গান
রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ?
কেন বেছে নিলে তবুও সে পথে মহানির্বাণ ?

নিশুতি রাতের বুক ছিঁড়ে কার কান্না শুনছি,
ওখানে ও কারা ?
মফঃস্বলের ষ্টেশানের পথে হ্যারিকেনকাচনিঃসৃত মৃত আলো
কাকে খোঁজে ? সেই মেয়েটিকে ? সেই কৃষ্ণা যুবতী ?
রেললাইনের ওধারে বনের আড়ালে হারালো ?
খুঁজে পাবে ওরা ?
এই শতাব্দী খেয়েছে যে ওকে, উগ্‌রে দেবে না,
মেয়েটি এভাবে শোধ কোরে গেছে
অবাঞ্ছিত এ জীবনের দেনা ।

যে গেলো হারিয়ে, ছু'হাত বাড়িয়ে যতো ডাকি
সেতো ফিরবে না আর
হাসপাতালের বেডে শুয়ে তবু যুবতী মায়ের স্বপ্ন দেখার
শেষ নেই
তার সদ্যপ্রসূত সন্তান এই পৃথিবীর বুকে
অনন্তকাল বেঁচে থেকে এই স্বর্গরাজ্য ভোগ কোরে সুখে
পৃথিবী নিঙ্‌ড়ে বেঁচে থাকবেই, পরিবর্তে কি দেবে না ফিরিয়ে ?
[ ব্রহ্মপুরের, বিরাটির মা-ও গিয়েছিলো এই স্বপ্নে তলিয়ে ]

তারপর কতোদিন গেছে আর রাত্রি এসেছে
নবজাতকেরা ·
মাটি ছেনে আর মাটি মুখে পুরে বড়ো হ'লো
মা-ও হয়ে গেলো বুড়ি
ওরাও দেখলো রাজপথে আর গলিপথে হেঁটে
দিনের আলোতে ঘোরে ঘাতকেরা।
ভেজালে মিশেলে জীবনের আয়ু শুষে নেয় আর
চড়ে গাড়িজুড়ি
তখ্‌তে বসায় রাজাকে আবার ছুঁড়ে ফেলে দেয়
নষ্টকমলালেবুর মতোই।

পুতুলের সুতো ওদের হাতেই
আমরা যতোই
মানুষের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে
চেতনায় স্থির আলো জেলে নিয়ে
সৃষ্টির কাজে ডুবে থাকি হাসি ধূর্ত বেনিয়া
সে হাসির মানে বুঝেও ঘানির বলদ পারে না
দড়ি ছিঁড়ে যেতে
স্বাধীন আত্মপ্রকাশের আর জৈবধর্মে ফের ডুবে যেতে

আমরা আরুণি, উদ্দালকের ফসল বাঁচাতে তার ধানক্ষেতে
শুয়ে, পিঠ দিয়ে ফসল-বিনাশী স্রোতকে ঠেকাবো!
বাদশার প্রিয় হারেমের খোজা হয়ে কিছু পাবো!
ভাঙা হাড়গোড় জুড়ে রাখবার জন্যে যেটুকু প্রয়োজন, তাই—
আমাদের মেয়ে সন্ধ্যা নামলে
দেহকে পণ্য কোরে ফেরে নাই
ঘৃণায়, বাড়িতে; গলা দিলো রেলট্রাকে
ছেলেটাও
আকণ্ঠ দেশী মদে চুর হয়ে হাড়কাটা জানবাজার, কোথাও
ঠিকানা গাড়লো

ন'মাসে ছ'মাসে দেখা হয় পথে
মেট্রো রেলের উত্থানে থুথু ছিটিয়ে ঘৃণায় সুনীল শরতে
প্রস্রাব করে ; চেনে না আমাকে ; দুচোখে কঠিন
হিংস্রতা ; আমি 'অবিন, অবিন'
বলে যতো ডাকি, পাথুরে মুখের ভাবলেশহীন
চেয়ে-থাকা দেখি, হাত পা অসাড় !
আমি ওর মাকে
ফিরে গিয়ে তবে কি বলবো ? সে তো পথ চেয়ে থাকে ।
কণ্ঠার হাড়ে চামড়া ঠেকেছে, নিয়তই শোনে মৃত্যু-শব্দ ;

ধূর্তবণিক সভ্যতা তার স্নেহার্দ্র মুখে গনগনে আঁচ
ঢেলে দিয়ে তার স্বপ্নগুলোকে এভাবে জব্দ
কোরেছে ; রুদ্র শুরু করে তার তাণ্ডব নাচ
পৃথিবী এখন কোটি কোটি মারণাস্ত্রকে জমা
রেখে । বাজারের প্রতিযোগিতায়
কখনো শান্তি ফেরি করে—বলে
শত্রুকে ক্ষমা
করাই ধর্ম ; ওদের পাপের
মাশুল আমরা গুণে দিই, মুখ গুঁজে নিতে
বিষ শরীরে পুরছি
অক্ষম রাগে আছড়াই মাথা, স্বহস্তে নিজ কবর খুঁড়ছি
কেন না, জানি না বেরুবার পথ, চক্রব্যূহের অন্ধিসন্ধি
যা কিছু জেনেছি ইতিহাস থেকে ধর্ম অথবা দর্শন সবই
শুধু মানুষের কুটিল ফন্দি ?—
না বুঝেই আমি হেঁটে চ'লে যাই—সামান্য কবি—
কোন্ দিকে, কোন্ স্থিরতার দিকে, কি অভ্রান্ত ?

খুঁজে খুঁজে আমি এখন নিঃস্ব, এখন ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত !

# পায়ের তলার মাটি

## সুদর্শন সেনশর্মা

খোদ সাহেবের মুণ্ডু তো আর চিবানো যায় না—কালীবাড়ির উল্টোদিকের সস্তার এই মাছ-ভাতের হোটেলে মুড়ো চিবিয়ে চিবিয়ে তিমির বড়বাবুর মস্তক চর্বণের পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা মুখে ফুটিয়ে তুলতে চায় যেন। অনুপস্থিতি তো অলরেডি আবার পরপর চারদিন হয়ে গেল, গালফুলো হরিবাবু মুখটা যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলবে, তিমির বাবু, আপনার বাবার সঙ্গে আমাদের বহুদিনের—আপনি একটু এবার না দেখলে বুঝতেই পারছেন···অবশ্যি চারবছরে; বাবার 'পরিত্রাণ' নার্সিংহোমের মাতব্বরি বাদ দিয়ে, পাঁচবার চাকরি পাল্টানো উত্তর-চল্লিশের তিমির এসব থোরাই পরোয়া করে—অফসেট প্রেসের সিটি অফিসের এ চাকরীটাও যাবে সেদিনই বুঝেছে তিমির।

দিনদশেক হল বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তিমির। তার ভাল্লাগেনা। এবং বহুবিধ কিছুই তার ভাল লাগে না। তার বাবার 'পরিত্রাণ' নার্সিংহোমের নিস্তরঙ্গ জীবন তার ভাল লাগে না। সেই একঘেয়েমি। রোজ পঞ্চাশ-ষাট। বৈধতার তকমা আঁটোনি বলেই ক্ষণিক চমকের, আশ্লেষের খেসারত দাও—সাকার মেশিন সকাল থেকেই টইটম্বুর হবে নতুন প্রাণের শোণিতে···প্রফেসর দাশ রসিকতা করে বাবা নিখিলেশ্বরকে প্রলয়েশ্বর ডাকতেন—সৃষ্টির পরেই তো প্রলয়···। আনন্দোন্মুখ যুবক-যুবতী প্রকৃতির সৃষ্টির ফাঁদে পড়লেই বা কি, নিখিলেশ্বর প্রলয়ের কল খুলে বসেই আছে—কি বল নিখিল! দাশ সাহেব হাসতেন। সকাল থেকেই নীচের সিঁড়িতে চটির ফটফটাস। আয়া, সুইপারের কুটকাচালি। কমিশন খেকো দালালদের বাতেল্লা। বাবাও পারে হেঃ হেঃ করতে। বাবার দরদস্তুর। সময়ের সঙ্গে খেসারতের পরিমানও বাড়বে।···আ হা হা করেছেন কি সে যে প্রায় ভায়েবল হয়ে গেল, এখানে থাকতে হবে দিদিমণি, এ সাধারণ কেস নয়। আই. এ. এস হবে। শ' পাঁচেক পড়ে যাবে···বাবা নিখিলেশ্বরের পার্সটা বেলা বারোটা নাগাদই ফুলে কোলা ব্যাঙের পেটের মত হবে—টাকার ড্রয়ারটা দুপুর বেলায় আহা—তিমির অভিমান করে পকেটে মাল্লু পুরতেও যায়নি অফিসে—মারো গোলি পয়সায়

তিমির···অবশ্য বুঢঢা ও তো ক্যাশ ছেড়ে পড়েনি মুহূর্তের জন্যও ··তিমিরকে টাইট দেওয়া হচ্ছে···এসব ভাবতে ভাবতেই তিমির সামনের দিকে চোখ রাখে। ঠনঠনে কালীবাড়ির কালীরও পুজোর ছুটি চলছে। সাটার নামানো। তা ভক্ত রোখা শক্ত। ভক্ত বলে কথা, বন্ধ দরজায় মাথা ঠোকা চলেছে। সে দেখে আর ভাবে—জ্যোৎস্নার এবাড়িতে আসাটা ভাল চোখে কেউ নেয়না। তা ট্যাকে পয়সা না থাকলে বাপও শালাজকে পোঁছেনা। মেয়েটা হন্যে হয়ে তিমিরকে খুঁজছে।

আজ থেকে চার বছর আগে জ্যোৎস্নার যখন পনেরো বছরটছর হবে সবে ইজের ফ্রক ছেড়েছে তখনই একদিন জ্যোৎস্না তিমিরকে শুনিয়েছে—

'সে কখন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্যে পৌঁছাল! অনঙ্গার অন্ধকারের পিঠ তীক্ষ্ণ নখরে বিদ্ধ করতে করতে খোঁজায় রত হলাম তার। সে আমার পার্শ্বে ছিল, ভ্রমরের স্বরের মত মধুর, সে আমার পার্শ্বে ছিল···'

—এই পাকা বুড়ি থামবি? তিমির ধমকেছিল।

—কেন তিমির, তোমার এ কবিতা ভাল লাগেনা? ওর মায়ের মত জ্যোৎস্নাও নাম ধরে ডেকে উঠেছিল।

—'তুই এ কবিতা কোথায় পেলি?' 'কেন মা দিয়েছে।'

তিমির তখন বলেছিল, সব কবিতা সবার নয়। মেয়েদের গলায় 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' যেমন মানায় না।

—সে কি তিমির!

—পাকা মেয়ে। খুকি তোমাল বয়স কত?—কানের লতি জ্যোৎস্নার নাড়িয়ে দেয় বটে তিমির কিন্তু জলদ গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের মত পড়েও যায়—

'তার আশ্চর্য স্তন চুম্বন করেছি, অরণ্যপ্রসাধিত দুর্মর ক্ষুধার মুখে। ধ্বংস করেছি শীলিত পরিচ্ছন্ন বোধের আকন্দজ্ঞান বাহুমূলের গন্ধে, নাভির গন্ধে, অধর গহ্বরের গন্ধে'

জ্যোৎস্না ফিস ফিস করে বলেছিল, কচু করেছ।

তিমির তখন থামতে পারেনি, 'লুব্ধপ্রাক শীত শঙ্খচূড়ের মতো বুকের যে প্রান্তে প্রাণ জ্বলে, তাপময় নদী—তীরের উরুযুগে স্থাপিত হয়ে সে রৌদ্রের অনুভবে মায়া বসেছে। তাকে প্রেম বলেছি।' জ্যোৎস্না ঝংকার দিয়ে বলে ওঠে, মিথ্যুক! তুমি কবে বলেছ?

খেই হারাল হঠাৎ তিমিরের। ঠনঠনে কালীর বন্ধ দরজায় কপাল ঠুকিস কে রে? চিনতে পারতা হায়—হাম আভি যাতা। তিমির কোন ক্রমে মুখে জল দিয়েই উঠে পড়ে।

'জড়োয়া'র হীরেন পিল্লাই মশাই ঠনঠনে কালীর বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকছেন।

নমস্কার র ·····

আরে আপনি?

কেমন আছেন?

এই চলছে। আপনারা সব ভাল?

তিমির মাথা নাড়ে—আপনার কাগজ?

হীরেন বাবু একটু হাসেন 'জড়োয়া?' তাও চলছে।

হীরেণ বাবুর প্রণামাদি শেষ হয়েছিল। দুজনে কালীচত্বর থেকে নেমে এলে তিমির জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা আশু, ব্রতদা আসেন অফিসে?—হীরেণ বাবু তিমিরের মুখে কিছু খুঁটিয়ে দেখেন; আপনি জানতেন না? ওরা তো বহুদিন আসে না। ব্রতবাবু আর আশু মিলে আমার বেশ কয়েক হাজার টাকা নয় ছয় করে দিয়েছে।

তিমির কথাটা লুফে নেয়।—সেই জন্যই আপনি আমার উপন্যাস চেয়ে নিয়ে ইলাসট্রেশন করিয়েও সেটা ছাপলেন না, এবং লেখাটা ফেরত ও দিলেন না।

হীরেণ বাবু হাহাকার করেন, ব্রতবাবু আর আশু আমার যা সর্বনাশ করল ভাই আপনাকে আর কি বলব; কাগজটাকেও ডোবাল। তিমির কথা কেড়ে নিয়ে বলল, ওসব সহাবস্থান দিয়ে কিছু হয় না। মলাটে আপনার আধন্যাংটো ছবি আর ভেতরে প্রগতিশীল গল্প আশুবাবুদের—সোনার পাথর বাটি।

হীরেন বাবু চমকে বলে, অ্যাঁ আমার আধন্যাংটো···

—মানে আপনার মনোনীত টপলেস প্রচ্ছদ; তিমির বলে।

হীরেন বাবু বলেন 'জড়োয়ার' একটা পাঠক ছিল তাদেরও লুজ করলাম। ঠিকই বলেছেন—তিমির হাসল, কুত্তার প্যাটে ঘি সহ্য হয় না।

আশু আর তিমির আড়ালে বলত 'হীরের জড়োয়া', আর হাসত। সম্পাদক থেকে নিজের নাম তুলে ব্রতদার নাম বসিয়োছলেন।

একটু সময় নিয়ে তিমির নারদের মত বলল, আশু আর ব্রতদা সত্যিই ভুল করেছে, মহাভুল…কিন্তু একথাও তো সত্যি হীরেনবাবু 'ইন্দ্রলোক' বেরোতে শুরু করার পর থেকেই আপনার 'গাত্র বিচিত্রা' ডুবতে বসেছিল। আপনিই অবস্থা সমাল দিতে ব্রতদাকে নিয়ে আসেন…

হীরেন বাবু চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ কি বিচিত্রা বললেন। ওর নাম তো জড়োয়া। তিমির বাবু আপনি একইরকম…তা তিমির বাবু এদিকে।

বৃদ্ধ কথা ঘোরাতে চাইছে। তিমির বলল, আপনি পার্কসার্কাস থেকে ঠনঠনে আসতে পারেন, আর আমি তো এদিকেই থাকি…

—কাজে !

—হ্যাঁ একটা বন্দুকের লাইসেন্স।

লাইসেন্স তো লালবাজার দেবে আর বন্দুক পাবেন ডালহাউসি বা ধর্ম-তলায়। হীরেন বাবুর মুখে হাসি 'এইবার তোকে পেয়েছি' গোছের।

—ঠিকই বলেছেন। লালবাজারে যিনি লাইসেন্স দেন তিনি আবার নাটকও করেন, আমার বন্ধু। টিকিট দিতে পারি…তা উনি আজ অফিস যাননি, অফিস-ক্লাবের শো-এর জন্য নায়িকা খুঁজতে চোরবাগান লেনে এসেছিলেন খবর পেয়ে আমিও মশাই তক্কে তক্কে…

—আপনি যা করেন না মশাই, বৃদ্ধ হীরেন পিল্লাই ফোকলা দাঁতে হেসে পালানোর উদ্যোগ করেন।

তিমির এবার চিবিয়ে বলল—লেখাটা কবে ফেরৎ দিচ্ছেন ?

—কাকে মারবেন বললেন না তো ?…

—প্ল্যান আছে অনেককেই মারার। তবে খেলিয়ে নিতে হবে। জানেন তো পৃথিবীটা বানচোতদের দখলে চলে যাচ্ছে…

—অ্যাঃ কি বললেন ?

—লেখাটা কবে ফেরৎ দিচ্ছেন…?

—ওফ্ এককথা ! হীরেন বাবু অস্থির ভাব দেখান, গলায় স্বর গাঢ় হয়, হয়, এতদিন বাদে লেখা ফেরৎ চাইলে।

তিমির বলে, লেখাটা আপনার পছন্দ হয়েছে শুনেছিলাম…তাও ছাপাননি কেন ?

আচ্ছা আমি দেখছি…

এই তো চলে যাবেন, তারপর ?

—না না আপনি লেখা ফেরৎ পাবেন।

আর পেয়েছি—তিমির হঠাৎ গলা নামিয়ে বলে : প্রেসটা বেঁচে দিলেন !

—কে ! কে আপনাকে বলেছে ?

—আপনার প্রেসের লালটুই বলেছে…

হীরেন বাবু একদম মিইয়ে গেলেন ! ধীরে ধীরে বললেন—নানা ঝক্কি, কথায় কথায় উনিয়ান…সব বেঁচে বুচে…

—একে বারে ঠনঠনে !

—অ্যাঁ !

—আপনার নতুন মালিককে বলে দেবেন আমার পুরোনো লেখা ফেরৎ দিতে…না হ'লে এক্কেবারে ভতাং দিয়ে দেব। বন্দুকের লাইসেন্স পাচ্ছি মনে থাকে যেন…

—আপনি কি পাগল মশাই ? নাকি ইচ্ছে করেই।

—সেকি লালটু বলেনি ? এই সেদিন মানকুণ্ডু থেকে ফিরলাম। শিগগির কেটে পড়ুন, মাঝে মাঝে আমার মাথায় খুন চেপে যায়।

তিমির দেখল বৃদ্ধ হীরেন পিল্লাই রাস্তার ভীড় ঠেলে উত্তরের দিকে প্রায় দৌড় লাগালেন।

এরপর তিমিরের অট্টহাসি।

২.

সত্যিকারের পাগলের দেখা তারপর। তারও পরে জ্যোৎস্নার।

সারাটা দুপুর কলেজষ্ট্রীট পাড়ায়। এধার ওধার করল তিমির। রোদ মরেনি এখনও। বিকেল হতে চলেছে। তিমিরের আর কোনও কাজ নেই। এতবড় অফসেট প্রেসের সিটি অফিসে হালে কাজ নিয়েছিল তিমির, কয়েক মাস হ'ল। আজ নিয়ে পরপর চারদিন ডুব হয়ে গেল। ভেতরে এক ছন্নছাড়া বাউল ডানা মেলছে। হীরেন পিল্লাইকে অহেতুক চমকালো আজ সে। বেচারা। তাঁর উত্তর চল্লিশের মানসিকতার সংগে আজকের ঘটনা কোন শত্রু ও মেলাতে পারবেনা। কি যে হয় এক একদিন তার। সে কি অবচেতনে লেখাটার জন্য এতকাল রাগ পুষে এসেছে ! হবে হয় তো। ম্লান হাসল তিমির। উল্টো ফুটে এসে দুটো সিগারেট কিনলো। হাত পেতে পানের একটু মিষ্টি মশলা চাইল। জিভের একটা পাশ এখনও জলছে। ব্যাটা

এত ঝাল দিয়েছে আজ। হোটেলে খাও! এই তো সেদিন আলসারের ব্যথায় সে প্রায় মরতে বসেছিল। এখন আর কি করা যেতে পারে। তিমির ভাবল। তখনই মনে পড়ল মহাপৃথিবী পুজো সংখ্যায় আশুর একটা গল্প বেরিয়েছে। সামনের স্টলে এসে স্টলওয়ালাকে হাসি উপহার দিয়ে কাগজটা উল্টিয়ে আশুর চারপাতার গল্পটা পড়ে ফেলল নিমেষে। বইটা ফেরৎ দিয়ে সামনের ওষুধের দোকানে ঢুকলো। টক ঢেঁকুর উঠল সে সময় আর বুকটা জ্বলে উঠল। যেমন জ্বলে। চারটে ক্যাটক্সিম্যাগ চাইল। দুটো ট্যাবলেট চিবিয়ে কাচুমাচু মুখে দোকানদারকে বলল—একটা ফোন করতে পারি ?··· দোকানদার ওষুধের দাম আগেই নিয়েছিল, কালো যন্ত্রটা তিমিরের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল,—পাঁচসিকে···তিমির নাম্বার ঘোরাতে ঘোরাতে মাথা নাড়ল।

—আশু নাকি রে ?

—হঠাৎ এখন ফোন করছিস কেন! স্টলে কাগজ দিয়েছিস ?

—একটু বেরুতে পারবি ?

—ওহ ব্যাটা আজও ডুব মেরেছ তিমির দা। তোমার এ চাকরীটাও যাবে। বছর পাঁচেকের ছোট আশুটা কখন যে দাদা বলে কখন তুই তোকারি করে, নিজেও জানেনা।

—তোকে সামনে পেলে ঠিক কামড়ে দিতাম ; তিমির বলে, কাকে তেল দিচ্ছ বাছাধন এখন ?

দোকানদার সামনের মহিলাকে 'ওভ্রাল' দিতে দিতে চমকে তাকায়। মহিলাও।

—তেল দিচ্ছি··· !

—তেল না দিলে অমন লেখা ছাপা হয় ? গল্পটা পড়লাম রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। আয় ফাইন দিবি আয়!

—পড়েছিস ? আশুর আদুরে গলা! কোন গল্পটা ?

—খুব যে গল্প মারছিস : ক'টা লিখেছিস পুজোয়, চাঁদ। মহাপৃথিবীর গল্পটা···

—কেমন লাগল ? ভাল লাগেনি!

—ছবিটা বেশ ভাল হয়েছে গল্পের। তোকে সামনে পেলে কামড়ে দিতাম—হতভাগা গরুকে গাছে তুলেছ—সামনে পাই কান ধরে হির হির করে ফের নামাবো।

আশু হিঃ হিঃ হাসে—রেখে দিই তবে···

—ওহ শোন একটা কথা, আসল কথাই বলা হয়নি—তিমিরের গলা ফিস ফিসিয়ে কি সব বলে···

তাড়াতাড়ি করবেন। তাড়াতাড়ি ছাড়ুন। তিমির ফিরে তাকিয়ে দেখে একটি মেয়ে ফোনের সামনে দাঁড়িয়েছে।

দোকান থেকে ফের রোদে নেমে এল তিমির। রোদ মরেনি। বিশ্রী লাগছিল। আর একটা দিন বাজে খরচা হয়ে যাচ্ছে···

···—শুনছেন ?

তিমির চমকে দেখে সামনে কাঁচাপাকা খোঁচাদাড়ি আর অবিন্যস্ত বেশভূষার এক বৃদ্ধ। পাগল তাহলে !

—শুনছেন ! ফের বলল লোকটা।

তিমির তাড়াতাড়ি একটু দূরত্ব তৈরী করতে চাইল।

লোকটা হেসে বলল—কি রাগ বলুন তো ?

তিমির বলল—রাগরাগিণী কোথায় পাচ্ছেন ?

লোকটা হাসল—আপনাদের নিয়ে এই এক প্রবলেম—শুনছেন না ! লোকটা বাঁহাতে বাঁ' কান চেপে ডান হাতের তর্জনী অন্তরীক্ষের দিকে তুলে বলে—বা রে, এখনও শুনছেন না ?

তিমির বিরক্ত ও কৌতুহলী।

—পারলেন না তো···ললিত কালাংড়া। লোকটা মাথা দোলায়। এই রাগে আমি একটা কমন গান বেঁধেছি। লোকটা তিমিরের হাত চেপে হঠাৎ—দারুন জমবে মশাই—জমেছেও, বলে চীৎকার করে ওঠে। তারপর ফিসফিস করে ওঠে ওই যে আবার, আবার হচ্ছে···শুনুন না গানটা।

—গান কোথায় পেলেন ?

বোগাস, সবাই শুনছে আপনি শুনছেন না। পাগল নাকি ! অন্তরীক্ষে তো এখন সকাল বিকেল একটাই গান—

কি গান ?

লোকটা এবার দু'হাত তুলে ঠনঠনে কালীচত্বরে গৌরাঙ্গ হয়ে দু'পাক খেল—খোলা গলায় গেয়ে উঠল—বাবুদের ক্যাথায় আগুন বাবুদের ক্যাথায় আগুন—ঠিক সেই মিউজিক তাই না ?

তিমির হাসল। বলল—ঠিক বলেছেন। লোকটা কি মনে করে চলে

যেতে যেতে ফের ফিরে এল, এসে বেশ স্বাভাবিক লোকের মত বলল—এই বেশবাস দেখে ভাবছেন আহাম্মক ; জেনে রেখে দিন এ শর্মা ঠিক কথাই বলে সবসময়—পাগল তো হেঃ হেঃ

তিমির বিস্ময়ে হতবাক, আর্তস্বরে বলে—ত্রিদিবদা না !

লোকটা খেঁকিয়ে ওঠে—ওই ভুলই সবাই করে। তুমিও করলে। ত্রিদিব মরে গেছে—লোকটা পাঁচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ঢুকে যায়।

রোদ মুছে গিয়ে আপ্লুত জ্যোৎস্নায় তারপর। সামনে কে আসছিল তিমির খেয়াল করে নি। অন্যমনস্ক তিমির। কাঁধে ঝোলা মেয়েটি সামনে দাঁড়িয়ে যায়—এক্সকিউজ মি। আমার না মাঝে মধ্যে গুলিয়ে যায়। আমার এক পালিয়ে যাওয়া হারিয়ে ফেলা বন্ধুর সঙ্গে আপনার অদ্ভুত সিমিলারিটি··· আপনি যে নন তো—বলুন না আমি এক তিমিরবিহারীকে···শেষের কথাগুলো বলার সময় মেয়েটির হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছিল···

তিমির চোখ মেলে গম্ভীর গলায় বলল—ও আপনি ! তা তুই এদিকে কোত্থেকে ! আমার নামই তিমির হা হুতাশন—সারনেমটা সামনের পুঁচকে মেয়েটারই দেওয়া।

প্রায় উনি যাইযাই মেয়েটি হঠাৎ তিমিরের হাতে এক রামচিমটি দিয়ে দেয়—আপনিই তিমির সত্যি তো ! বিশ্বাস হয়না।

আর একটা চিমটি দিই ?

—থাপ্পর খাবি কিন্তু টুপুর

জ্যোৎস্না ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে পড়ে,—পায়ের ধুলো দিন তিমির বাবু, আপনি মাইরি দেবতা আছেন. কতদিন আপনার ধ্যানে···

—এই ওঠ ওঠ, কি করছিস। তিমির তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে। রাস্তায় করছিস কেন ? হেসে বলে—তোর ধ্যানে ভেজাল ছিল।

জ্যোৎস্না হাসল—তাই বুঝি ! কাঁধের ঝোলা ঠিক করতে করতে জ্যোৎস্না বলল—আমার নতুন প্রেমিককে তুমি বকছিলে কেন ! একদম বকবে না – জ্যোৎস্না ঝকঝকে চোখে হাসল···

—কে তোর প্রেমিক রে ?

জ্যোৎস্না হাসি মুখে বলে—সেই লোকটা একদিন বলেছিল—তুই তো বড় সুন্দর। এই খুকি আমাকে ভালবাসবি ?

গম্ভীর গলায় বলল তিমির—

—সেরেছে। তা তুই এদিকে কি করছিলি?

তুলে-বাগ্দিদের মত তুই তোকারি ছাড়বে তিমির?

—আচ্ছা টুপুররাণী, তা না হয় হ'ল কিন্তু আপনি এখনও আমাকে তিমির বলেন কেন?

—বেশ করি···

—এই যখন এট্টুখানি ছিলেন তখন না হয় কিছুদিন আমায় তিমি বলেছেন তারপর তিমিল, আপনার 'র' আর 'ল' এর গণ্ডগোল এই সেদিন ও ছিল, এই সেদিন আপনি দয়া করে তিমির বলতে পারলেন, ওর ওপরে আর উঠলেন না?

বয়ে গেছে আমার।

—মণিকা ডার্লিং একা তিমির বলবেন? বলবেন তিমু তিমু···? ভাগ্যিস কাকু বলিনি আমি, তিমির কি মণিকা ডার্লিংএর পেটেণ্ট করা নাকি?

—টুপুর মার খাবি কিন্তু। বললিনা তো এদিকে কোত্থেকে···

—আবার তুই তোকারি? ওহ্ তি-মি-র···,

—হয় আমাকে জ্যোৎস্না তুমি বল—নয়তো চলে যাব, কিন্তু হ্যা আমি এখানে স্বরসপ্তকে গান শিখতে আসি। আর ঐযে পাগলটাকে দেখলে, বড্ড ম্যাড তিমির ও আমাদের···

—গানের স্কুলের ত্রিদিব মুখার্জী—তুমি কি করে চিনলে ওকে তিমির তুমি কি করে?

তিমির জ্যোৎস্নার চিবুকে টোকা মেরে বলল,—খুকুমণি তোমার মাকে জিজ্ঞেস করবে···ত্রিদিব মুখার্জীকে তিমির কি করে চিনল···

টুপুর বা জ্যোৎস্না দুই বিনুনী দুলিয়ে বলল,—বলনা তিমির তুমি গান শিখতে নাকি?

—কেন আমি গান শিখতে পারি না?

—আহ্ বলই না। শিখতে তুমি?

—হুঁ···

টুপুর বিজ্ঞের হাসি হাসল—এটা তো জানা ছিল না। আসলে শেখার নাম করে আসতেন বাবুমশাই, ধান্দা ছিল অন্য···

—ধান্দা!

—অল রোড লিডস টু রোম। হোয়ার ইজ ইওর মণিকা ডার্লিং? জ্যোৎস্না খলখলিয়ে হেসে উঠল।

—বড্ড বজ্জাত রে তুই। গুরুজনদের নিয়ে ইয়ার্কি করিস কেন? থাপ্পর দেব একটা...

—গুরুজন আমার ঢের দেখা আছে। থাপ্পর মেরেই সেনাদলকে ডাকবো?

—তারা কোথায়?

—এই এল বলে তারা এখন 'সংকটের কল্পনাতে'···

—বাহ্, বেশ সেনাদল তৈরি করে ফেলেছিস!

—করবো না! অ্যাডমায়ারার থাকবেনা আমার? বলনা তোমার মণিকা ডার্লিংএর থেকে আমি কি দেখতে খারাপ?···বলনা···

তিমির হাসল। তুই বড্ড হিংসুটে। ছোলবেলায় বলতি মা পচা, এখনও কি তাই বলবি?

—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও নি কিন্তু···

—এটা আবার বলার নাকি। মণিকা ডার্লিং-এর থেকে তুই অনেক বেশী সুন্দর, খুরি সুন্দরী···

—এটা বলতে হয় তাই বললে। এটা তোমার মনের কথা নয়

—কেনরে পাগলী, তুই সুন্দরী হলে আমার কি ক্ষতি হবে?

—ঠি-ই-ই-ক? ছুঁয়ে বল?

ছুঁয়ে বল—তিমির ভেঙ্গাল টুপুরকে—এই নে এই বললাম—তিমির টুপুরের বিনুনী দুলিয়ে দিল।

—কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, আয় কোথাও একটু বসা যাক।

—চল জুহু বিচে চল!

তিমির চমকে উঠল, এখন জুহু বিচে যাবি?

—মুরোদ আমার জানা আছে। আমি তো মণিকা ডার্লিং নই।

আচ্ছা মণিকা ডার্লিং পরে। এখন আমার টুপুর ডার্লিং কি ভাবছে···সে কি খাবে?

টুপুর চোখ বুজে বিড় বিড় করে বলে,—তিমির প্লীজ, আর একবার বল, কি বললে

তিমির দু আঙুলে নাক টিপে দিল জ্যোৎস্নার।

—প্লি-ই-জ—আর একবার···

—টুপুর ডার্লিং···

জ্যোৎস্না লজ্জায় লাল হয়ে বলল—তিমির তোমার লজ্জা করছে না একটুও ?

তিমির দাঁড়িয়ে পড়া-জ্যোৎস্নাকে নাড়িয়ে দেয়। কথা ঘুরিয়ে বলে, কি বললি না তো···

—চাঁড়ালদের মত তুইতোকারি বন্ধ না করলে আমি এখুনি বাসে উঠে যাবো।

—বাবার বন্ধুকে চাঁড়াল বলছিস ? নাম ধরে নাহয় ডাকিসই।

টুপুর জ্যোৎস্নার মত উদ্ভাসিত হল। জ্যোৎস্নারই মত, তুমি বাবার বন্ধু না শত্রু সেটা ইতিহাস খতিয়ে দেখবে···

—বাহ্ বেড়ে বলছিস তো ?

সিনেমা হলটা ছাড়িয়ে বাদিকের ছোট রেঁস্তোরার কেবিনে বসতে বসতে তিমির বলল—তোর পড়াশুনোর কথা বল। কেমন চলছে রে তোর !

মুখ তুলে জ্যোৎস্না একবার তিমিরকে দেখল। নাক কুঁচকে বলল—এই সো সো। সামনেই পরীক্ষা।

— তোর অনার্স কিসে যেন ?

—দর্শন।

—যাক্ জীবন দর্শন ছকে ফেলেছিস তো। আমাদের মত বাউণ্ডুলে হোসনা কিন্তু। জ্যোৎস্না আবার তিমিরকে দেখে। চায়ের কাপ পৌঁছেছে। আলতো চুমুক মেরে জ্যোৎস্না বলে,—বাউণ্ডুলে তো একদিক দিয়ে ভালই— মুস্কিলে হয়েছে সখের বাউণ্ডুলেদের নিয়ে—যারা নিজেকেও ঠকায়—ধারে কাছের সবাইকেও জ্বালায়···

—দর্শনের কথা বলছিস ?

কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে জ্যোৎস্না বলে—এসবে দর্শন লাগে নাকি ? মানব জীবনের গতি প্রকৃতি সব দর্শন। মনোবিজ্ঞান দিয়ে মেলানোও যায় না ? তোমার মেলে তিমির ?

—খুব পেকেছিস টুপুর। ক'জন বয়ফ্রেণ্ড তোর ?

—তোমাকে নিয়ে পাঁচজন।

—অ্যাই বাপ, বাপের বয়সী লোককে বয়ফ্রেণ্ড করছ ?

টুপুর ম্লান হাসল। অথচ গলায় কাঠিন্য আনল—বাপের বয়সী লোকদের নিয়েই তো সমস্যা তিমির···এদিকে গলায় রামপ্রসাদি 'মা' ডাক, ভেতরে ভেতরে কাম হুতাশন···গোবেচারা মুখে 'গিলে খাই চোখে'—

—টুপুর, তোর এভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না আমার সঙ্গে? আজও অপমান করবি!

—না তিমির না। অপমান তোমায় আর করব না। তুমি অপমানটাই গায়ে মেখে রাখলে আমার ভেতরটা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করতে

—আবার পাকা পাকা কথা?

—না তিমির, একটু পাকা কথা বলতে না হয় দিলেই। আমার চরাচরে চারধারে সবাইতো পাকা মাথার বিচক্ষণ লোক—যেমন তুমি একজন

—বলে যা বলে যা

—তোমাকে ধরতে দু'দুবার তোমাদের 'পরিত্রাণ' নার্সিং হোমে গেছিলাম। এখন রক্ষা নেই··কেউ চিনতেই যেন পারে না। তোমাদের পরিত্রাণ নার্সিং হোমে···

—আমার নয়, টুপুর, ওটা আমার বাবার। আমার কিছু নেই।

—মাঝে মাঝে পকেটে মাল্লু পুরতে যাও না তিমির?···

—নার্সিং হোমে গেছিলি কেন?

তোমার মৃণিকা ডার্লিং যে জন্য গিয়েছিল সেজন্য নয়।

—আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম,—খামোখা অপমান করার জন্য।

—তুই ছেলেমানুষ, তোর আর দোষ কি? তুই তোর বাবার কথায় মাথা গরম করেছিলি।

কেন যেন তিমির হঠাৎ মনে হয়েছিল তুমিই অশান্তির মূল কারণ। আমাদের বাড়ির অবস্থাতো জানো—

সে মনে হওয়া তো স্বাভাবিক। সত্যিও হয় তো—

— না সত্যি নয়, ওসব বাবার ছুতো। হেমন্ত কেবিনেও দুদিন তোমায় খুঁজতে গেছি, পাইনি।

—এখন তো পেয়েছিস এবার বলে ফেল—

– তোমাকে সামনে পেয়ে এখন সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে

থাক বাদ দে ওসব—তোর বাবা কেমন আছে?

টুপুর উদাস মুখ করে বলল—কে, বিমলবাবু? তিনি ভালই আছেন। এখন সন্ধ্যাপিসির সঙ্গে আছেন।

—কোন সন্ধ্যা?

—তুমি চেন না? তোমাদেরই ক্লাসমেট সন্ধ্যা। উকিলদাদুর মেয়ে

তিমিরের সব আগোছাল হয়ে যায়। এই সন্ধ্যা একবার

—তোমার সঙ্গে কি সন্ধ্যাপিসির কখনও বিয়ে হয়েছিল? জ্যোৎস্নার তীক্ষ্ণস্বরে ঝাঁঝ ছিল না, ছিল কিসের আর্তি।…

—না তো, কখনই না, এসব তোকে কে বলেছে?

—তবে মাকে তুমি দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে ছিলে কেন? ওই ব্যাপারটা ভাবলে তোমাকে সবাই কিন্তু ক্রুয়েলই বলবে। তুমি তো তখন সন্ধ্যা পিসিকেই বাফার হিসেবে ব্যবহার করছিলে, তাই না?

—মিথ্যে, টুপুর সব মিথ্যে, আমি তোদের ভাল চেয়েছিলাম। তোদের ক্ষতি করতে চাইনি…

—আর কি ক্ষতি হবে তিমির বাবু

—তোর মা কেমন আছে?

—তোমার মণিকা ডার্লিং? তার এখন সাধুবাই হয়েছে। তুমি তো বহুদিন আর খোঁজ নাওনা…তাই অভিমানে তিনি এখন কনখলে সাধুসংগ করছেন। তাও যদ্দুর মনে হয় জালি সাধু। তারও আগে ধনবান বিপত্নীক চারু মেসোর সঙ্গে কিছুদিন বম্বেতে লিভ টুগেদার করে এসেছেন।

—টুপুর! তিমির যেন হঠাৎ রেগে যায়,—বাবা মাকে বাবা মা বলিস না কেন? বিমলবাবু, মণিকা ডার্লিং এসব কি? বাবা মা বলে ডাকলে কি মহাভারত…

—তুমি থামো তিমির উকিল। মণিকা ডার্লিং-এর নামে কিছু বললেই অগ্নি লেগে যায়? পারলে না তো কিছুই, চিরটা কাল ভয়েই মরলে

—ভাখ টুপুর, তোর সঙ্গে এসব আলোচনা করা কি ঠিক! যদিও মানছি তুই দিব্যি লেডি হয়ে গেছিস এবং তোর মায়ের প্রায় এই বয়সেই বিয়েও হয়ে গেছিল

—সেই প্রথম তুমি যেবার কাগজে কলমে হেব্বো হলে?

—ওসব নয়, আমি তোকে বলতে চাইছি ওরা তোর বাবা মা, খানিকটা সফ্‌টনেস কথাবার্তায় অন্তত……

—তুমি থামবে ?···তোমাকে কে বলেছিল তিমির দয়া দেখাতে ?···যারা আমাকে চায়নি জবরদস্তি তাদের ওপর চাপিয়ে···

—কারা চায়নি ?

—বিমলবাবু

—তবে বহুবচন করছিস কেন ?···

—সরি, জান তিমির, যখন ভাবি আমার থেকে যাওয়াটাই অ্যাক্সিডেণ্ট, জনকের অনিচ্ছা, সন্দেহ জিইয়ে এই যে আমার থেকে যাওয়া বেঁচে থাকা ভাবতেই কেমন হতাশা এবং গ্লানি আমায় ক্লান্ত করে, আর তখনই সব রাগ গিয়ে পড়ে আমার সেভিয়ার-এর ওপর।

—তোর বাবা আজকাল কি বলে ! আই মিন বিমলবাবু

—আমি বাড়িতে থাকি না

—সে কিরে ! কবে থেকে আবার নতুন কি হল

—এদিকে পিতৃদেব ডেসপারেট, তোমার মণিকা ডার্লিংও কিছু কম যান না, কাগজে কলমে তখন দু'জনের মামলাটা শুরু হয়েছে। তবে মুস্কিল কি জান তিমির তোমার মণিকা ডার্লিং-এর কোন টেনাসিটি নেই···মামলা বেশ জমবার মুখে তিনি মোকদ্দমায় গুলি মেরে কল্খল চলে গেলেন, মামলাও ভোগে। আমিও হস্টেলে এসে উঠেছি।

—ভাল কথা, মণিকা ডার্লিং ক'দিন আগে আমাদের ভিজিটরস্ রুমে এসে হাজির। প্রথমটায় চিনতে পারিনি···পরে খুব দুঃখ হ'ল এবং রাগও। বিমলবাবুর ওপর। তিমিরবাবুর ওপর, নিজের ওপর। মা চুল কেটে ফেলেছে, একেবারে অন্য চেহারা—

—কিছু বলল সে ?

—তোমার কথা জানতে চাইল। কি করছ তুমি···তার যা আছে আমায় দিয়ে দিতে চাইল, ইভেন তোমাকেও।

—কিসব বলছিস টুপুর ? রাগে লাল হয়ে সোজা হয়ে বসল তিমির।

জ্যোৎস্না হঠাৎ সামনে ঝুকে দিদিমনির মত বলল,— বলুন স্যার আমার জন্ম বেত্তান্তটা বলুনতো শুনি !

—শুনবি ! দ্বিধা খানিকটা তিমিরের—আচ্ছা শোন তাহলে। যখন জানলাম বিমল দায়িত্ব এড়াতে চাইছে এবং কারণটা শুধু এত তাড়াতাড়ি তোর এসে যাওয়াটাই নয়, এর মধ্যে একটা মিথ্যে সন্দেহ

—ওদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও তুমি কনটাক্ট রাখলে কেন ?

—সেটাই দোষ হয়েছিল টুপুর। আমাদের দুজনের সম্পর্কের কথা জেনেও বিমল যেদিন বলল ও মণিকাকে বিয়ে করছে সেদিন আকাশ থেকে পড়েছিলাম ·· তখন ও জানিনা মনিকাও তলে তলে পাল্টে গেছে। আর বিয়ের পরে তখন সবে আমরা পাস করেছি, আমার কি একটা ভাল চাকরি··· ভোপালে তোর বাপ যেতে দিলনা। বলল, আমরা বন্ধু, তুই একা চলে যাবি কি—

—ভালবাসার জন্য তোমাকে একটা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিৎ। ভীতুর ডিম। সারাজীবন শুধু শুধু প্রেম করে গেলে, আর নেপোয় দৈ মেরে গেল।

তিমির ম্লান হাসল,—তখন তোর বাবার নার্সিং হোমে প্রফেসর দাস আসতেন। বস্তি। গুপ্তটা লিখতেন না। হঠাৎ একদিন তোর মাকে দেখে রেগে গিয়ে বললেন—সে কি ফার্স্ট বেবি টার্মিনেট করবে কি। একে বস্তিরা কমে যাচ্ছে, বস্তির বাচ্চা আমি বস্তি হয়ে ইভাকুয়েট করব না। ব্লাড গ্রুপিং হয়েছে ?

জ্যোৎস্না হেসে উঠলো—ও বাব্বা ভদ্রলোক বেশ কমিউনাল তো—

—আসলে উনি কিছুতেই ডি, ই করতে চাইতেন না। ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি হলে তো কথাই নেই। একটা ছুতো ঠিক বের করতেন।

—তোর বাবাও প্রফেসর দাশকে ভয় করতেন। কিছু গণ্ডগোল করলেই প্রফেসর দাশ ডাকতেন, এই নিখু শোন, কাল থেকে আমি আর আসছি না।

তোর বাবার তখন মুখটা ছিল দেখার মত।

তিমির থামল। জ্যোৎস্নাকে দেখল। কপালের সামনে ওর চুলের গোছা ঝুলছিল। পরম মায়াভরে চুলটা ঠিক করে দিল তিমির। আর তখন তিমিরের হাতটা কব্জির কাছে চেপে ধরে জ্যোৎস্না বলল—আমি তোমাকে প্রথম বাবা বলেছিলাম !···

তিমির ভ্রু কোঁচকাল—এটা আবার তোকে কে বলল।

—সেদিন তোমার মনিকা ডার্লিং বলে গেছে···

তিমির আনমনা হ'ল, হাসল, সেদিন খুব অশান্তি হয়েছিল শুনেছি। প্রায় সব বাচ্চাই আগে মা বলে, তারপর বাবা। তুই বাবা বলতে পেরেছিস

মা ডাকের অনেক পরে। আমি সেদিন তোদের বাড়ি গেছি হঠাৎ তুই আমাকে দেখে বা-বা ব্যা-ব্যা করে উঠলি।

—বিমল ঘরে ছিল। ব্যাপারটা খেয়াল করে। মণিকা আমায় পরে বলেছিল। আমি বললাম ওই তো বাবা তোর, বিমলকে দেখিয়ে। বিমল গম্ভীর মুখে কি একটা কাগজ দেখছিল।

—তুই তোর মায়ের কোলে চেপে আমার দিকে তাকিয়ে সমানে তখন ব্যাব্যা বাবা করে যাচ্ছিস।

জ্যোৎস্না কনুইয়ে ভর দিয়ে দুহাতের আঙুল জড়িয়ে তাতে চিবুক রেখে ঝুঁকে বসেছে,—সেদিন কি প্রথম বাবা ডাক বেরিয়েছিল?

—হুঃ তিমির বলল, বাদ দে সব। সেদিন কেন গেছিল বললি নাতো?...

—ক্ষমা চাইতে, আর একটা ঘোষণা করতে।

—কি ঘোষণা?...আজ তোর জন্মদিন আজকেই ঘোষণাটা করে ফেল...

জ্যোৎস্না সোজা হয়ে বসল—তুমি মনে রেখেছ? আজ আমার জন্মদিন?

—এইমাত্র ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হল, আজ ত্রিশে অক্টোবর না?

—জন্মদিনে কি দেবে আমায়?

—কি নিবি বল।

—যা চাইব দেবে তো?

—তুই যদি এখন আকাশের চাঁদ চাস।

—ভাল কথা, জ্যোৎস্না বলে, মা তোমার জন্য একটা চিঠি রেখে গেছে। চিঠিটা হস্টেলে আছে। যেদিন যাবে সেদিন দেব। আর মা বলে গেছে, জ্যোৎস্না মুখ তুলে তিমিরকে দেখল—আমার সব দায়-দায়িত্ব এখন তোমার—

তিমির বলল উদাস গলায়—তোর মা বলেছে বলে বলছিস না এটা তোর কথা। জ্যোৎস্না বলল—অধিকার চাইলেই পাওয়া যায় না—অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। তারপর ঝকঝকে দাঁতে হাসল,—আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তুমি নাকি মাকে ভয় দেখাতে বলে দি টুপুরকে সব। ওকে তোমরা ডেস্ট্রয় করতে চেয়েছিলে—

—তোমার মণিকা ডার্লিং তখন একগাল হেসে বলত,—হ'লও মেয়ে। দাঁড়াও না। ওর বিয়ের সময় তোমার থেকে খরচা আদায় করবো। তুমি বলতে—আচ্ছা বেশ তাই হবে।

—তো কি? তিমির বলল…

—তোমার খরচটা যদি বাঁচিয়ে দি—

—মানে? ঠিক করে ফেলেছিস!

—হ্যাঁ, জ্যোৎস্না মাথা দোলায়।

—কে সে, চল আজকেই সেলিব্রেট করে ফেলি। তারপর তুই অনার্সটা বাগিয়ে নিলেই হুল্লোড় লাগিয়ে দেব।

—বলছ…টুপুর হাসে না, মুখটা হঠাৎ তার গম্ভীর হয়। অনেকক্ষন পরে ক্লান্ত গলায় বলে তিমির—একসপ্তাহ ভীষণ আপসেট হয়ে আছি। কিছুই ভাল লাগছে না'

—কি হয়েছে তোর? ডোণ্ট গেট আপসেট।

—তিমির?

—বল

—আচ্ছা আমার মা কি অসুস্থ?

—জানি না

—আমার বাবা?

—টুপুর আমি জানি না। আমিতো ডাক্তার নই।

—তুমি?

তিমির হাসল। তোর কি মনে হয়?

– আচ্ছা তিমির তুমি যদি হঠাৎ আজ কি কাল শোন টুপুর পটকে গেছে, ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে?

– টুপুর, তিমির প্রায় চীৎকার করে উঠে—টুপুর ডোণ্ট বি মিসলি—কি হয়েছে আমাকে বল।

তিমির টুপুরের পিঠে হাত রাখল। নীচে কিস্যু পরেনি। মেয়েগুলোর এই এক ফ্যাশান হয়েছে।

—সামনে তোর পরীক্ষা—মন দিয়ে পড়াশুনো করে ভালো রেজাল্ট কর, সব ঠিক হয়ে যাবে

—কি ঠিক হয়ে যাবে?

তিমির টুপুরের পিঠ থেকে হাত সরাল না, বলল,—আমি বিমলের সঙ্গে কালই দেখা করবো। টাকা পয়সা ঠিকমত দেয় তো?

—তা দেয়। না দিলে গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবো না?

—তবে আবার কি, এখন তোদের খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না'র বয়স, আর তোরা এরকম ডিপ্রেশনে ভুগবি ?

জ্যোৎস্না ম্লান হাসল—প্রেম বড় সাংঘাতিক জিনিস। বড্ড ডিপ্রেশন ও হয় থেকে থেকে। তোমার হয়নি তিমির ?

খেলি না! খেয়ে নে, খাচ্ছিস না তো ? তিমির তাড়া দেয়, এবার তোর হস্টেলটা দেখে আসি। এরপর বিমলকে ধরে নিয়ে আসব বন।

—তোমার আসতে হলে আসবে তিমির বাবু—বিমল-ফিমলকে আনার দরকার নেই···

—তুই কার প্রেমে পড়েছিস বললি না তো ? ঘোষনাটাও করলি না···

টুপুর ঝাঁঝিয়ে উঠল, তিমিরের হাত খিমচে ধরে বলল—তোমার হয়েছে তো! তিমির হাসল,—পুঁচকে যখন ছিলি তখন অনেক অত্যাচার করেছিস, এখন এই বুড়ো তো একটু ভালবাসা ক্লেইম করতেই পারে···

জ্যোৎস্না বা টুপুর এক দৃষ্টিতে তাকিয়েইছিল তিমিরের দিকে। সে যেন এক্স-রে মেসিনের সামনে নিস্তেজ চলৎশক্তিহীন অসুস্থ মানুষ। তবু গিন মিন করল সে—

—তোর আজ জন্মদিন। তোকে কিছু দিতে হবে তো—কি নিবি বল ? পকেটে কিছু টাকা আছে তুই আমার মনিকা ডার্লিং-এর একমাত্র কন্যা—বলেই তিমির হো হো করে হেসে উঠে পরিস্থিতি সহজ করতে চায়!

—মণিকা ডার্লিং-এর মেয়ে বলে করুণা করছ ? যে কথাটা এখনও বলা হয়নি সেটাই আবার বলছি।

—যত দোষ আমার বাবার কিন্তু মাকে আমি সহ্য করতে পারি না, মা আমাকে ভালবাসে তাও কেন জান তিমির ?—

—তুই পাগলি বলে। তিমির পিঠে হাত রাখে ফের,—কি নিবি বললি না তো ? তিমির কল্পনাও করেনি। কেবিনের পর্দা তোলা ছিল। সামনে খাবার নিয়ে টুপুর নাড়ছিল, খাচ্ছিল না,—হঠাৎই পাশ্চাত্য দক্ষতায় ঝটিতি টুপুর ডান হাতে পর্দাটা ফেলে দিয়েই সামনে ঝুঁকে তিমিরের পাঞ্জাবির খোলা বুকে ক্যাক করে কামড় বসিয়ে বলল—ভালবাসা নিতে পারি। স্রেফ ভালবাসা, দেবে তিমির ? দেবে ?

তিমির ব্যথায় প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। ছেলেবেলায় টুপুরের দাঁত ওঠার

পর হামাগুড়ি দিতে দিতে এসে কোলে উঠে যেমন কামড়ে দিত হঠাৎ⋯তিমির হকচকিয়ে গেল।

—তুই একটা কেলেঙ্কারি করবি। আমার বয়স কত জানিস?

—বাবার থেকে তুমি বছর খানেকের ছোট। মায়ের সমান সমান। তোমার চল্লিশ আমার উনিশ।

—এখনও বাচ্চাদের মত কামড়াস? তোর কি দাত উঠছে নতুন? আমার বুকটা জ্বলছে।

—দাও হাত বুলিয়ে দি, ইস্ কি দুখ্খি তুমি,মাকে ভালবেসে কিস্যু পাওনি

—আমি পুষিয়ে দেব, নেবেতো?

—টুপুর তুইও কি ড্রাগ-টাগ ধরেছিস? এবার আমি ঠেঙাব তোকে, মার খাবি কিন্তু—

—মারো না মেরে ফেল, তোমার তো সে রাইট আছেই

—নাহ সত্যি তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে

—তিমির, তোমাকে আমি ভালবাসি

—বেশ, এনিয়ে পরে কথা হবে। তুই তদ্দিন মন দিয়ে পড়াশুনো কর।

—এটা সেট্‌ল না করলে আমি পরীক্ষায় ডাহা ফেল করব।

—বাবার বন্ধুর সঙ্গে কেউ এমন করে? প্রেম কথাটা বলতে তিমির এখন সত্যিই লজ্জা পেল, ঘাটের মড়া আমি। তোর উনিশ বছর বয়স, কত তরতাজা টাটকা ছেলে তোর জন্য বুক চিতিয়ে দেবে।

—বাজে কথা রাখ।

—তোর বাবাকে আমাকে নিয়ে কেচ্ছা গাওয়ার ফের সুযোগ করে দিবি? কি কেলেঙ্কারি হবে বলতো? ফুটফুটে মেয়ে তুই, তোর স্যাণ্ডালের ভয় নেই?

—আমার জন্মের থেকেও কি বড় কেলেঙ্কারি? তিমির আহত হয়ে বলল—জন্মে আবার কেলেঙ্কারি কি পেলি?

—কেলেঙ্কারি নয়? টুপুর মাথা দোলায়—জন্মটাতো তিমির বাবু আমার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।

—উঠবি না?

—তবে কি বসে থাকবো? তিমির বাবু শুনে রাখ, স্যাণ্ডাল আমি হাওয়াই স্যাণ্ডালে মাড়াই।

—টুপুর !

—তিমির তোমাকে সাতদিন সময় দিলাম। এর মধ্যে ডিসিশন জানাবে। সঙ্গে একটা গল্পের বই আছে। তোমার জন্যই এনে ছিলাম। সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি। দেবনা তো কক্ষনো দেবনা।

—তুই কদ্দিন স্নান করিস নি টুপুর। ছেলেবেলার সেই স্নান না করার অভ্যেস এখনও আছে ?

জ্যোৎস্না অবাক হয়ে বলে-হঠাৎ। স্নানের কথা কেন ?

—না তোর মাথাটা বেশ গরম হয়েছে দেখছি। তিমির হাসার চেষ্টা করে, মেয়েটার পেটে পেটে হিংসে সেই ছোট বেলা থেকে

টুপুর গ্রীবা বেঁকিয়ে বলে : হ্যা বাবা, আমার গরমিরই ধাত, মায়ের বন্ধু তিমির কাকুর মত কুড়িতেই ঠাণ্ডা মেরে যাব নাকি।

—আচ্ছা পাগলির পাল্লায় পড়েছি তো। তিমির প্রশ্রয়ের হাসি হাসে। ফের কাকু বললে থাপ্পর খাবি টুপুর—

—তুমি কি করবে তাই বলো আগে।

—তুই পড়া শোনা কর মনদিয়ে

—আমি তবে চললাম—জ্যোৎস্না রাত আগেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার জ্যোৎস্না হাঁটা সুরু করল,—সাতদিন সময় দিলাম, তারপর আমি কিছু জানিনা কিন্তু। আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবেনা তিমির…আমি চললুম—

—দাঁড়া, এই জ্যোৎস্না শুনে যা

জ্যোৎস্না হন হন করে হাঁটা শুরু করে। এমুহূর্তে পৃথিবীর সে একমাত্র রাগী যুবতী।

তিমির দাঁড়িয়ে থাকল। টুপুরটাকে এখন আর ধরা যাবেনা। তিমির বাস স্টপে দাড়িয়ে হাই তুললো।
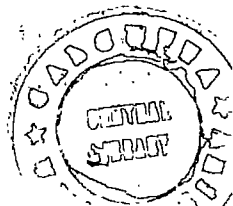
## সালাম বম্বেঃ ইচ্ছাপূরণের ছবি

এই শীতে কলকাতায় এসেছিল মীরা নায়ারের ছবি 'সালাম বম্বে'। রাস্তার শিশুদের জীবন নাকি এই ছবির বিষয়বস্তু—মুক্তির বহু আগেই এইভাবে বিজ্ঞাপিত হয় সালাম বম্বে। বিজ্ঞাপন সর্বস্বতাই যে এই সামাজিক পরিকাঠামোয় শিল্পের পূর্বশর্ত সেকথাই আরও একবার প্রমাণিত হয় ছবি দেখার আগে দর্শকের উৎসাহে এবং পরে ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে দর্শকের ইর‍্যাশানাল অথচ ইমোশনাল একাত্মতায়। এরই মধ্যে ছবিটির ভাগ্যে দেশি-বিদেশি একাধিক পুরস্কার জুটেছে; আর একথা তো জানাই আছে বিদেশি পুরস্কারের ক্রাইটেরিয়ায় নির্ধারিত হয় ভারতীয় ছবির উৎকর্ষ। তাই ছবিটি এখানে মুক্তি পাবার আগেই আমরা নড়েচড়ে বসেছিলাম। ছবি দেখার পর আমরা দুটি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে পৌঁছই; যা প্রকৃতই তাৎক্ষণিকঃ এক. ছবিটির প্রকরণগত পারফেকশান যা সাম্প্রতিক ভারতীয় ছবিতে একটি ব্যতিক্রম, দুই. বিষয়বস্তুর আপাত-অভিনবত্ব। স্বীকার করতেই হয় মীরা নায়ার দক্ষ ছবি-করিয়ে। এখন প্রশ্নঃ এই দক্ষতা, বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে আদৌ সমর্থনযোগ্য কিনা। অর্থাৎ বলতে চাইছি ফিল্ম মিডিয়ামের ওপর পরিচালকের সহজাত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাই শেষ কথা নয়, এর পরেও আর দুটি বিষয় থেকে যায়, প্রাসঙ্গিকতার নিরিখে যা অনতিক্রম্য; তা হলো ছবির প্রবণতা এবং পর্যায়িত প্রভাব। এই প্রবণতা এবং প্রভাবই চ্যাপলিনের 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' এবং লেনি রাইফেনস্তাল-কৃত হিটলার-জীবনী চিত্র ( Triumph of the will )-এর মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করে। যদিও অনেক সময়ই এই পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব হয় না। যেমন হচ্ছে না এই মুহূর্তে সালাম বম্বের ক্ষেত্রে। মীরা নায়ার পেশাদারী দক্ষতার সঙ্গে বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির যাবতীয় উপকরণ প্রয়োগ করেন আপাত নিও-রিয়ালিজমের মোড়কে। গল্প বলা ছবির আঙ্গিকে, সাবলীলতাকে বজায় রেখে ডকুমেন্টেশানের বিপজ্জনক amalgam ছবিটিকে

জনপ্রিয়তার কারণ এবং এখানেই ছবিটির বিভ্রান্তি। আয়রণি এই, সালাম বম্বের ছিন্নমূল চরিত্রদের মতই দর্শকের চিন্তার মূলস্রোতও ছিন্ন হয়।

সালাম বম্বে ভারত অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বের যে দারিদ্রকে চিত্রায়িত করে আসলে তা বড়ই রোমাঞ্চকর মনে হয়, অন্তত সাহেবদের দেশে। মনে রাখতে হবে কলকাতায় যখন মুক্তি পায় সালাম বম্বে, তখন ইয়োরোপের ২২টি শহরে তার প্রদর্শন চলছে) ; এ সেই দারিদ্র্য যা দর্শককে বিনোদিত করে, কোনো অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাবার পরিবর্তে। ছবির কিশোর নায়কের ঢুলুঢুলু চোখের সারল্য, মুখের নিষ্পাপ অভিব্যক্তি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের বিপর্যয়ের পরও শেষাবধি অপরিবর্তনীয় থাকে। যেন পরিচালক বলতে চান এই ব্যবস্থার মধ্যেও এই সারল্য অটুট রাখা সম্ভব এই 'কৃষ্ণ প্রেমের দেশে'। উল্লেখ থাক, সালাম বম্বের নায়কের নামও কৃষ্ণ। প্রচলিত বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির যাবতীয় চরিত্র কিভাবে সালাম বম্বেতে প্রচ্ছন্ন থাকে দেখা যাক।

যদিও সালাম বম্বে ফুটপাতের শিশুদের নিয়ে তোলা ছবি হিসেবেই বিজ্ঞাপিত, আসলে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ঘিরেই গড়ে ওঠে এ ছবির কাহিনী। এই কেন্দ্রীয় চরিত্র কৃষ্ণ, মীরা নায়ারের নিপুণতায়, অত্যন্ত সাবলীল-ভঙ্গীতে যে কোনো প্রচলিত সুপারস্টারের আদলে সুপারম্যান হিরোতে পরিণত হয়। কৃষ্ণের প্রতি দর্শকের আস্থা ও সমর্থন আদায়ের জন্য পরিচালক ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার মধ্যে দিয়ে দর্শকের একাধিক ইচ্ছাকে উসকে দেন এবং সময়মত পরিশীলিত চিত্রভাষায়, দর্শকের অজ্ঞাতেই ইচ্ছাপূরণ করেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ইচ্ছাপূরণের আগে মীরা ধীরে ধীরে সেই ইচ্ছাগুলোকে 'পরিণতি-আকাঙ্ক্ষা'র শীর্ষে নিয়ে যান। ফলতঃ এভাবে দর্শকের একাধিক ইচ্ছাপূরণের ঘটনা ঘটে :

এক. বোম্বাই শহরে পৌঁছনো মাত্র এক পাগল তাড়া করে কৃষ্ণকে, দর্শক চায় কৃষ্ণ তার নাগালের বাইরে থাক, এবং তাই ঘটে।

দুই. দর্শক চায় কৃষ্ণ উপার্জনের জন্য কোনো কাজ খুঁজে পাক, অতঃপর সে বোম্বাই-এর কুখ্যাত কামাতিপুরার পতিতাপল্লীর চায়ের দোকানে কাজ পায়।

তিন. দর্শক চায় ~~কৃষ্ণর~~ থাকার জায়গা হোক, শহরের ফুটপাতে কৃষ্ণের জায়গা হয়।

চার. দর্শক চায়—তার নির্বান্ধব জীবনের অবসান ঘটুক; একাধিক বান্ধব এবং এক দুর্ধর্ষ গেঙলারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দর্শককে তৃপ্তি দেয়।

পাঁচ. এবার দর্শকের চাহিদা—সে একটু দরদ পাক; অনিতা কানোয়ার তার যোগান দেন।

ছয়. শেষাবধি দর্শক চায় তার একটি হৃদয়ের অংশীদার আসুক; অনিতা কানোয়ারের বালিকা কন্যা এ ব্যাপারে অভাব পূরণ করে।

অতএব বোঝা যাচ্ছে এই ইচ্ছাপূরণ এবং 'নায়ক-দর্শক একাত্মতার' মনস্তাত্বিক কৌশলের প্রয়োগে কৃষ্ণ নায়কের ইমেজ পাকাপোক্ত করে নেয়, যে কোনো বাণিজ্যিক ছবির মতই। এভাবে কৃষ্ণর প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আদায়ের পর ছক মেনেই মীরা, নায়কের দুটি সাব-ইমেজের প্রতি নজর দেন। তা হলো কৃষ্ণর সারল্য এবং তার প্রতিবাদী মানসিকতা। ফলে যে ব্যবস্থার শিকার এই ছবির চরিত্রগুলি সেই 'ব্যবস্থাকে' একবারের জন্যও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই সুরুতেই নায়ক তার বাস্তব অবস্থান থেকে বিচ্যুত হয়। এবং এভাবেই, কাঠামোর বিশ্লেষণ বা উপস্থিতি ছাড়াই আমরা ছবিতে দারিদ্র দেখি, ভায়োলেন্স দেখি, দেখি যৌনতা এবং স্থূল প্রতিশোধের কাহিনী। কামাতিপুরার নিষিদ্ধ পল্লীতে কাজ করার সুবাদে আমরা এক সময় কিশোর নায়কের হাত ধরে ঢুকে পড়ি 'লাল-বাতি-এলাকার' অন্দরমহলে। অর্থাৎ বোঝাই যায়, এরপর আর কোনো বাণিজ্যিক ঝুঁকি থাকে না সালাম বম্বের।

কিন্তু মীরা জানেন এভাবে বেশীক্ষণ চলে না, চললেও ছবির মহত্ব ক্ষুন্ন হয়। তাই নতুন উত্তেজনা অনুপ্রবিষ্ট হয় ছবিতে। ষোলো বছরের একটি মেয়েকে জোর করে ধরে আনা হয় গণিকা পল্লীতে। তার অসহায়তার, সারল্যের প্রথম সাক্ষী থাকে কৃষ্ণ। এই 'ষোলো সালে'র সঙ্গে কৃষ্ণ-র মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রধানতম কারণ কৃষ্ণর রোমান্টিক অথচ নিরুচ্চার প্রতিবাদ-আকাঙ্ক্ষা। এই প্রতিবাদ সোচ্চার হয়, মেয়েটির বিছানায় আগুন ধরিয়ে তাকে মুক্ত করার ব্যর্থ প্রয়াসের দৃশ্যে। এভাবেই নায়কের ভাবমূর্তিকে প্রথাসিদ্ধ হাইলাইট করার প্রচলিত কৌশল দেখা যায়। এরপর যখন কৃষ্ণ ধরা পড়ে ঐ পতিতা পল্লীতেই, তখন পল্লীর স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী কৃষ্ণর মত একটা 'ফালতু' ছেলের প্রহৃত হয়ে মারা যাবার কথা। কিন্তু 'বাবা' নানা পটেকর এসে তাকে বাঁচায়, এবং গল্পও এগোতে থাকে।

ছবির এই পর্যায়ে দর্শক সহজেই সংযুক্ত হয়ে পড়ে গ্ল্যামারাইজিং দারিদ্রের

সঙ্গে। বেঁচে থাকার তাগিদ যে কী ভয়ংকর অসহায়তা তা বোঝার বদলে আমরা বুঝি রাস্তার জীবনে দারিদ্র্য কত রোমাঞ্চকর। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো, সালাম বম্বের দর্শকের একটা বড় অংশ বাস্তবের রাস্তার ছেলেরা। তারা এই প্রথম দেখল কোনো সিনেমার নায়ক অমিতাভ নয়, মিঠুন নয়, এমনকি হালের ছোকরা গোবিন্দও নয়, এ ছবির নায়ক তারাই, অখ্যাত, পূর্ব-পরিচিতিহীন কৃষ্ণ আসলে তাদেরই রিপ্রেসেনটেটিভ। এখানেই সালাম বম্বের আরও একটি সূক্ষ্ম চালাকি। কোনো পরিচিত সুপারস্টার অভিনয় করলে, যতই দরদী হাবভাব করা হোক, এ ছবি তার ছবি হিসেবেই পরিচিতি পেতো। এটাই ভারতীয় বাণিজ্যিক ছবির ট্র্যাডিশনাল অনিবার্যতা। তাই 'কুলি' কখনোই শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ছবি নয়, আসলে এটি অমিতাভের বই হিসেবেই স্বীকৃত। কিন্তু সালাম বম্বে, আনকোরা কিশোর নায়ক—যার সম্বন্ধে দর্শকের পূর্ব-ধারণা নেই—তাকে ব্যবহারের সুবাদে 'রাস্তার ছেলেদের' ছবি হিসেবে ভ্রান্ত ধারনা তৈরি করে।

হিরোইজমের ব্যাপক ও অবান্তর প্রয়োগ সালাম বম্বেতে করা হয়, সূক্ষ্ম চালাকির মিশ্রণে। মীরা তার নির্দায় নিপুণতায় এতটাই সাবলীলতার সঙ্গে কৃষ্ণকে সুপারম্যান হিরো করে তোলেন যে মনস্ক দর্শকেরও, খুজে বের করতে সময় লাগে। অবিকল সুপার-অ্যাকশন স্টারদের মত কৃষ্ণ তার সঙ্গীদের মধ্যে একাই বান্ধবী পায়। সঙ্গীদের মধ্যে একাই সততার ইমেজ রাখতে পারে। সঙ্গীদের মধ্যে একাই জিজ্ঞাসু। একমাত্র কৃষ্ণই প্রতিবাদী, সংবেদনশীল। ক্যাটারারের কাজ সেরে ফেরার পথে সবাই পালিয়ে যেতে পারলেও কৃষ্ণ ও তার বান্ধবী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এরপর কৃষ্ণকে পাঠানো হয় সংশোধনাগারে। এই জেল-সদৃশ শোধনাগার থেকে কৃষ্ণ, একমাত্র কৃষ্ণই পালাতে পারে। জেল ব্রেক করার এই সাসপেন্সপূর্ণ সিকোয়েন্সে কৃষ্ণ যখন সুউচ্চ পাচিল থেকে নীচে লাফ দেয়, আমরা নির্বাক বিস্ময়ে দেখি নীচে দাঁড়িয়ে থাকে খড় বোঝাই ট্রাক। কৃষ্ণ তার ওপর গিয়ে পড়ে। এবং দৌড়ে ফিরতে থাকে, কামাতিপুরার দিকে। আসলে, হিরো ফ্যান্টাসি এই চূড়ান্ত পর্যায়ে, মীরা নায়ার সূক্ষতার আড়ালে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে চালনা করে দিলেন এই পরিণতির দিকেই। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের মুহূর্তে আমরা তৃপ্তির অনুভবে আক্রান্ত হই, বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন তোলার বদলে।

এভাবেই সারা ছবিতে, একবারের জন্যও পরিচালক সামাজিক কাঠামোর

প্রতি কোনো প্রশ্ন তোলেন না। কিন্তু বলাই বাহুল্য; এ ধরনের ছবিতে বিন্যস্ত ব্যবস্থার প্রতি কোনো আক্রমণ, নিদেন কিছু জিজ্ঞাসা ভীষণই জরুরী। প্রচলিত ব্যবস্থার থেকে বিচ্ছিন্ন করে চরিত্রের বিপর্যয়কে দেখানোর এই প্রবনতার জন্য সালাম বম্বে যে বানিজ্যিক ছবির গোত্রেই পড়ে যায় শেষাবধি, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

সামাজিক কাঠামোকে আক্রমণের পরিবর্তে বুর্জোয়া দর্শনের আদলে 'বাবা' (নানা পটেকর)-কে খাড়া করা হয় শোষনের প্রতিভূ হিসাবে। আবহমানকালব্যাপী 'হিরো-ভিলেন বৈপরীত্য' – এই স্টিরিও টাইপকে আর সব বানিজ্যিক পরিচালকের মতই মীরা বেছে নেন, সিস্টেমজনিত একটি সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে। সমগ্র ছবিতে দর্শকের ইমোশানাল টেমপারেচারের সঙ্গে মাত্রা রেখে ধীরে ধীরে কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করা হয় সর্বহারা প্রলেতারিয়ে সমাজর প্রতিভূ হিসেবে। 'বাবা'র প্রতি দর্শকের সুপ্ত ক্ষোভ ক্রোধে এবং ক্রমে 'প্রতিশোধ স্পৃহা'য় উন্নীত হয়। তাই যখন কৃষ্ণ 'বাবা' কে খুন করে আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। ভুলে যাই 'বাবা'ও আসলে এই পরিস্থিতির শিকার, এই ব্যবস্থার হাতের পুতুল মাত্র। এবং এভাবেই, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নয়, ব্যক্তি বিশেষের ওপর দর্শকের ক্ষোভকে কেন্দ্রায়িত করা এবং ব্যক্তির বিনাশেই সমাধান খুঁজে দেবার যে কৌশল বানিজ্যিক ছবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট, সালাম বম্বেতেও তার উপস্থিতি তাকে বাণিজ্য-সফল করে তোলে। তাই সালাম বম্বে আমাদের অস্বস্তি দেয় না, কাঁদায় না, চোয়াল শক্ত করায় না, পরিবর্তে শুধুই আমাদের প্রগতিশীলতায় বিনোদিত করে।

আসলে লেনিন যেমন বলেছিলেন পৃথিবীটাকে না বুঝে বা ভুল বুঝে একে বদলানোর উপায় নেই। তাই ব্যক্তি বিশেষের বিনাশই যথেষ্ট নয়; বিনাশ প্রয়োজন একটা কাঠামোর, তবেই উত্তরণ, তবেই নতুন আলোক।

রজতনারায়ণ রায়চৌধুরী

## যা কিছু উজ্জ্বল, সোনা নয়

জীবন-সায়াহ্নে অনেকেরই ইচ্ছে হয় কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি ফিরে পেতে। স্মৃতির প্রবল টানে অনেক হারিয়ে যাওয়া মুখ আর ভুলে যাওয়া ঘটনা কেবল ফিরে ফিরে আসে। দুঃখের পর দুঃখের মিছিল চোখের সামনে সার বেঁধে দাঁড়ায়। সময়ের যবনিকা সরে গিয়ে অতীতের ছায়ামূর্তিসব শরীরী হয়ে ওঠে। শোনা যায় তাদের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ঢেউয়ের মাথায় ঢেউয়ের মতো কথার পর কথা বুকের মধ্যে অবিরাম মাথা কোটে। কোন এক অলৌকিক মায়ায় রূপ-রস-বর্ণময় অতীত বর্তমানের আটপৌরে অস্তিত্বকে পুরোপুরি কব্জা করে এবং ঠিক তখনই জন্ম নেয় এক সার্থক স্মৃতিকথা। এই প্রজন্মের মানুষ তখন আর এক প্রজন্মের মানুষের সঙ্গ পেয়ে চরিতার্থ হয়।

সার্থক স্মৃতিকথা তাই এক প্রজন্মের সঙ্গে আর এক প্রজন্মের আলাপচারিতা। এই আলাপচারিতা আবার বিশেষ করে অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন একজন রাজনৈতিক কর্মী নিজের কথা বলেন। অতীতের প্রেক্ষাপটে তখন বর্তমানকে চেনা সহজ হয়। আলোচ্য স্মৃতিকথার কথক নির্মল রায় চৌধুরী একজন পুরোনো রাজনৈতিক কর্মী। স্বভাবতই তাঁর কাছে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক এবং সবক্ষেত্রে তিনি একেবারে হতাশও করেননি—ঘটনা ও মানুষে ঠাসা তাঁর এই ১৬১ পৃষ্ঠার বইখানিতে ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্মৃতির উজানে সন্তরমান। জন্মভূমি বিক্রমপুর পরগণার হাঁসাড়া গ্রাম থেকে ঢাকা সদর। তারপর লালমণির হাট থেকে কলকাতা। শৈশব থেকে কৈশোর—কৈশোর থেকে প্রথম যৌবন—অবাধ তাঁর বিচরণ। তিনি এই বইতে শোনাতে চেয়েছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির কথা। ফলে, আমরা জানলাম, তিনি মায়ের হাত ধরে 'বন্দেমাতরম' ও 'গান্ধীজীকি জয়' ধ্বনি দিয়ে মিছিলে হেঁটেছেন। নির্মলদার সঙ্গে আলোচনার পর তিনি অনুশীলন সমিতির 'পুরোপুরি রিক্রুট' হয়ে গেলেন। তাঁর ভাষায়, 'এর কয়েক মাস পরেই উক্ত

সমিতি আর. এস. পি, আই-তে রূপান্তরিত হয়'। অতএব তিনিও একজন আর, এস, পি-র তরুণ কর্মী। তারপর তিনি আর ফিরে তাকান নি। ১৯৪০ সালে যখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র—তখনই তিনি একজন পুরোদস্তুর রাজনৈতিক কর্মী। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একজন বাম-জাতীয়তাবাদী কর্মী। যে পরিবারে জন্ম ও যে প্রতিবেশের জল হাওয়ায় তিনি পুষ্ট—তাঁর অন্যকিছু হওয়ার তো কথা নয়। সব শেষে তাঁকে দেখতে হল ১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট 'আবাল্য পরিচিত ঢাকা নগরী, প্রাণের অধিক হাঁসাড়াগ্রাম আজ থেকে বিদেশে পরিণত হল।'

সভা-মিছিল—সম্মেলন ও বারকয়েক কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর এই আখ্যায়িকা। অতএব বইয়ের পাতায় পাতায় বিপ্লবীদাদা, নেতা ও কর্মীদের নামের ছড়াছড়ি। জেলখানাতেই বিপ্লবী দাদাদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। দেখেছেন, তাঁরা সবাই স্বদেশের জন্যে নিবেদিত প্রাণ—কিন্তু গোমড়া মুখ মানুষ নন। কেউ কেউ আবার মজার গল্পও শুনিয়েছেন। বইতে তার নমুনাও কয়েকটি রয়েছে। তবে সেসব গল্প আজকের পাঠকের কাছে কতখানি উপাদেয়—তা বলা শক্ত। কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রসবোধও পাল্টায়। বইয়ের ছত্রে ছত্রে উল্লিখিত তিরিশ-চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক কর্মীদের তালিকা নিঃসন্দেহে গবেষকদের কাজে লাগবে কিন্তু রসপিপাসু পাঠকের মন অনিবার্যভাবে দখল করবে—অত্যাচারী দারোগার মনোরঞ্জনে অনিচ্ছুক পতিতা কন্যাটি আর ধলেশ্বরীর উথাল পাথাল-বুকে লড়াকু মূলফত মাঝি। পাঠক বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হবে যখন দেখবে—হাঁসাড়া গ্রামের দুর্গা মণ্ডপে দেশবন্ধু জায়া বাসন্তীদেবী হরিজনদের সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন। শরতের দলছুট মেঘের মতো লাবণ্যে ভরা এসব দৃশ্য বইখানির আসল সম্পদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের নাম ও ঘটনার বালুরাশি গ্রাস করেছে বইখানির সরস যা কিছু।

হাঁসাড়া—ঢাকা-লালমানর হাট পর্বে লেখক যতখানি স্বচ্ছন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ত—বর্ণনার ক্ষেত্রে কলকাতা পর্বে ততখানি আড়ষ্ট। একজন কিশোরের প্রথম কলকাতা দর্শনের মুগ্ধতা কোথায় গেল? কলকাতা শহর কি শুধু কলেজ স্ট্রীট—শিয়ালদহ অঞ্চলের কয়েকটি স্ট্রীট আর লেন! তিরিশের দশকের ঘটনাবলী বর্ণনায় নির্মলবাবু যতখানি সফল—চল্লিশের দশকের ক্ষেত্রে ততখানি অসফল। বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে অনেকটা যেন দায়সারা বর্ণনা।

যেহেতু বইয়ের কলেবর শীর্ণ—তাঁর উচিত ছিল কোনরকম বর্ণনার ধারে কাছে না গিয়ে ২১ নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে ২৯ জুলাই, ১৯৪৬ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের বিদ্রোহী কলকাতার মেজাজ সংক্ষেপে ফুটিয়ে তোলা। আর একটা কথা, স্মৃতিচারণ অভিজ্ঞতার চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ রাখাটাই সঙ্গত। কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন আগস্ট আন্দোলন) তাঁর বর্ণনা হয়েছে শ্রুতি-নির্ভর। তেমনি আবার তিনি বইয়ের নানা জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানা ডিঙিয়ে। চল্লিশের দশকের রাজনীতির বিভিন্ন বাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা নিশ্চয় বিতর্কের উর্দ্ধে নয়। এবং তা নিয়ে বিতর্কতো আজও চলছে। সেযুগে যে বাম-জাতীয়তাবাদী দলগুলি ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আদৌ সম্প্রীতি ছিল না—এটাতো সকলেরই জানা। আত্মঘাতী পারস্পরিক হানাহানির পরিনাম যে ভাল হয়নি—এটাও কারো অজানা নয়। কি হবে নতুন করে সেসব খুঁচিয়ে তুলে। তাছাড়া স্মৃতিচারণার ক্ষেত্রে সেসব কি একান্তই অপরিহার্য। নির্মলবাবুকে ভেবে দেখতে বলি।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

---

যুগসন্ধির স্মৃতি (১৯৩০-৪৭)। নির্মল রায় চৌধুরী। প্রকাশক—সাথী রায়চৌধুরী। ২২ সি, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৫০। কুড়ি টাকা।

## সেই দিনগুলি এবং মনস্বিতা

রঞ্জনবাবু অনেকদিন লিখছেন এবং নিছক লেখার জন্যই লিখছেন না। তাঁর লেখা এবং বই প্রকাশের ধারাবাহিকতা ঈর্ষনীয়। 'মনস্বিতা' রঞ্জনবাবুর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। পড়া শুরু করলে উপন্যাসটিকে একেবারে শেষ করে উঠতে হবে। দীপা-উপাখ্যান পাঠককে ঠিক ধরে রাখবে। এই এই উপন্যাসে রঞ্জনবাবু অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন, বলেওছেন। দীপার সংগ্রামী জীবন-যাপনের কথা, চৌধুরী সাহেবের ঔদার্যের কথা। যৌথ-পরিবার ভাঙার কারণগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। স্বার্থপর কিছু চরিত্রের নিটোল ছবি এঁকেছেন রঞ্জন ধর।

অফিস ইউনিয়নের সুবিমল তার দ্বিধা দ্বন্দ্ব টানাপোড়েন নিয়ে উপন্যাসটিকে আলোড়িত করেছে। বিশুকে আমাদের ভাল লাগে। বিশুর বিশ্বাসকে আমরা ধ্বস্ত হতে দেখলাম না। সে দিদির কাছ থেকে হাত খরচা নেয়, দেওয়াল লিখন ছাড়া আর কিছু করে না এবং সে বিপ্লব ও প্রগতির স্বপ্ন দেখে। চাকরীর চেষ্টা করে কিন্তু পায় না। বিশু তাদেরই একজন যারা বামপন্থী রাজনীতি বিশ্বাস করে সব কিছু সঁপে দিয়েছিল—পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি দেখে দেখে যখন সে প্রায় অসহায়, বিশ্বাস ভাঙতে বসেছে তখন তার দিদিই তাকে ভরসা দেয়। ততদিনে বড়দা শিবু বউ-বগলে ভেগে গেছে দীপার ওপর সবদায় চাপিয়ে। যৌথ পরিবার মুখ থুবড়ে পড়া যারা যারা দেখেছেন এবং যারা কিছুটা পুরাতনপন্থী তাদের এ বর্ণনা ভাল লাগবে। দীপার পুরানো সেক্সনের বস চৌধুরী সাহেব নিজেই উদ্যোগী হয়ে দীপার ছোট ভাইকে চাকরী জুটিয়ে দিলেন শেষ অবধি। ততদিনে অবশ্য চৌধুরী সাহেব ও দীপার সম্পর্কও একটা নতুন মোড় নিতে চলেছে—প্রাকৃতিক নিয়মেই।

বিপত্নীক চৌধুরী সাহেব অ্যাদ্দিন দীপাকে স্নেহই করে আসছিলেন,—দীপার কাজের নিরিখে দায়িত্ব সচেতন শ্রমে কি খাটুনিই না যে খেটে গেছে নিরন্তর—উপন্যাসের শেষ পর্বে আমরা চৌধুরী সাহেব এবং দীপার সম্পর্ককে প্রেমরসে সিঞ্চিত হতে দেখি—সুবিমলের নেতৃত্ব আগেই গিয়েছিল—দীপাকেও যে পায় না।

কিছু কিছু ছবি রঞ্জনবাবু দুর্দান্ত ফুটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে দীপাকে তো তিনি মণিদীপা বানিয়েছেন। দীপা সুন্দরী, অফিসের আর পাঁচটা লোকের মত শ্রমবিমুখ নয়। দীপা অত খাটুনি, বাড়ির নানা ঝক্কি সত্বেও 'ল' পরীক্ষায় প্রাইভেটে স্ট্যাণ্ড করতেই পারে। দিল্লিতে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসে টুক করে মনোনীতাও হয়ে যায়। এত সবের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য সুপাঠ্য উপন্যাসের কারণে রঞ্জনবাবুকে এটুকু ছাড় দেওয়া উচিত।

লার্ডার্স লেনের ঘটনার বর্ণনাটুকু ভাল লাগেনি। ঘটনাটা পাঠকের জন্যই অনুক্ত রইল। তবে অফিসের বড়সাহেবদেরও যে একটা সংবেদনশীল মন আছে, অফিসের লাল ফাইলের বাইরেও তাঁরা যে কিছু প্রগতিকর্ম সমাধা করেন আপন তাগিদেই—ইউনিয়নের হুড়কো ছাড়াই—রঞ্জনবাবু তাও দেখালেন। চৌধুরী সাহেব উপন্যাসটিকে তার অবয়ব দিয়েছে।

'সেইদিনগুলি' উপন্যাসটি একাশি সালে প্রকাশিত। বইটির চতুর্থ প্রচ্ছদের শব্দমালা থেকে ধার করছি—'শান্তনু ও জয়া মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতির মধ্য দিয়েই তাদের জীবনের বন্ধন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হবার পর তাদের মনে দেখা দেয় ভাবনা-সংঘাতের টানাপোড়েন এবং নিজের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয় পরস্পরের বিপরীত অবস্থান। দুই শিবিরের সংঘাত তখন তুঙ্গে সেই সংঘাত তাদের দাম্পত্য জীবনেও আঘাত হেনে অনিবার্য করে তোলে তাদের বিচ্ছেদ। কিন্তু রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সত্তর দশকের পটভূমিতে এসে তারা থমকে দাঁড়ায়—অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি।

শান্তনু এখন পার্টির লাইন নিয়ে ক্ষুব্ধ। সে কংগ্রেসীদের মধ্যে প্রগতিশীল খোঁজার প্রয়াসের বিরোধী।

জয়াও সি, পি, এম-এর সন্ত্রাসে তিতিবিরক্ত হয়ে বসে গেছে। এতদিন দু'জনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন প্রায় সম্পর্কের সেতু হয়েছিল টুকুন। টুকুনের অসহায়ত্ব, বেদনা, অভিমানবোধ, রঞ্জনবাবু অপত্য স্নেহেই ট্যাকল করেছেন। শান্তনুকে জয়ার পার্টির লোকেরা মেরেছিল এক উগ্রপন্থীকে আশ্রয় দেবার অপরাধে। ব্যাপারটাকে জয়া মানতে পারেনি। শান্তনু প্রাণে বাঁচল—ভেলোর যেতে হ'ল—টুকুনের দৌলতে জয়ার একটু একটু করে ফের শান্তনুর ডেরাতেই ফিরে আসা।

'জয়া নির্বাক বিস্ময়ে শান্তনুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হ্যাঁ এইতো

সেই মানুষটা যাকে তার অদেয় কিছু নেই। অতীতের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি বিভ্রান্তি সত্ত্বেও। এই মুহূর্তে তার মনে হতে থাকে, পৃথিবীতে আর সে একা নয়।...শান্তনু, মৃদু হেসে আবার বলে, 'তোমার কি মনে হয়—তোমায় এভাবে ফেলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ?'

আনন্দে জয়ার কান্না পায়। সে জানে সম্ভব নয়। ভুল হয়না তার। আর ভুল হবেনা। কোনদিন না।'

আর ভুল হবেনা ? জয়া, জয়াদের হয়ে রঞ্জনবাবু গ্যারান্টি দিচ্ছেন পার্টি বিভাজনের সময় থেকে যারা ভুল করে আসছে—তাদের ভুল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। অবশ্য উপন্যাসে ব্যাপারটা ঠিকই আছে। একটা কথা। জয়া শান্তনুর মিলন দেখিয়ে তলে তলে রঞ্জনবাবু কমিউনিষ্ট ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছেন কি ? রঞ্জনবাবু আরও লিখুন। তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতে হয়। কব্জি মুচড়ে, হৃদয় নিংড়ে তিনি অবিরত লিখে যান।

অলীক বসু

সেইদিনগুলি। রঞ্জন ধর, উচ্চারণ ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। বারোটাকা।

মনস্বিতা। রঞ্জন ধর। প্রাইমা পাবলিকেশন্স ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ কুড়ি টাকা

# লখ্‌নৌতে নাট্যোৎসব

বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি লখনউ আয়োজিত ২৬তম প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার গত ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ তারিখে শুভ উদ্বোধন করলেন, কলকাতার প্রখ্যাত হিন্দি নাট্য সংস্থা "অনামিকা" এবং উপচার ট্রাষ্টের "নাট্যশোধ" সংস্থানের প্রতিষ্ঠাত্রী ডঃ প্রতিভা আগরওয়াল। তিনি তাঁর ভাষণে এই আশা প্রকাশ করেন যে বেঙ্গলী ক্লাবের সভ্যদের এই মহান প্রচেষ্টা দীর্ঘায়ু হবে এবং প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলন জয়যুক্ত করার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে নূতনতর নাট্য ইতিহাস অপসংস্কৃতির মুখোশ খুলে যাবে, দর্শকদের মনে জাগাবে নূতন চিন্তাধারা। এই মহান নাট্য-উৎসবে সম্মানিত হওয়ার জন্য ক্লাবের সম্পাদক অমলেন্দু দত্ত ও সভ্যদের তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ বিশ্বাস দর্শকদের মাঝে শ্রীমতী আগরওয়ালের বহুমুখী প্রতিভা, নাট্যজগতে তাঁর বিশেষ অবদান এবং নবনব উন্নতিমূলক প্রচেষ্টায় ব্রতী থাকার নিয়ত-প্রয়াসের কথা উল্লেখ করেন। প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসনে বসেন, কলিকাতা থেকে আগত ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গীত শাখার সভ্য বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও নাট্যপ্রেমী প্রবীন নেতা সাধন গুহ, থার্ড থিয়েটার ও প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের সুদক্ষ কর্মী ও অভিনেতা তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত শিল্পী ও মঞ্চাভিনয়ে পারদর্শিনী সুদেষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৮ সালে প্রতিযোগিতায় ১৬টি প্রতিযোগীদল যোগদানের প্রতিশ্রুতি দিলেও ১৪টি সংস্থা যোগদান করেন। ৬ই জানুয়ারী ৮৯ পুরস্কার বিতরন ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে, পুরস্কার বিতরণ করেন উত্তর প্রদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের সচিব শ্রীসুরেন্দ্র মোহন। গুণীজন রূপে মানপত্র ও শাল প্রদান করে ভূষিত করা হয় ক্লাবের বিশিষ্ট অভিনেতা ও প্রবীন কর্মী কুসুমকুমার মিত্র ও শ্রীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কে। পুরস্কৃত হয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—"নগদ ১০০১ টাকাও প্রকাশচন্দ্র স্মৃতি শীল্ড—গণসুর শিলচর" নৈশভোজ"। ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—নগদ ৫০১-০০ টাকা ও শোভারাণী ঘোষ স্মৃতি শীল্ড, যাত্রিক নাট্য গোষ্ঠী—পশ্চিম দিনাজপুর "গাববু খেলা।" ৩য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—নগদ ২৫১ টাকা ও

গোপীপ্রসাদ ব্যানার্জী শীল্ড—বড়িষা অপরাজিতা, কলিকাতা" "শেষ থেকে স্বরু"। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্ববোধ ব্যানার্জী স্মৃতি পুরস্কার, নরেন্দ্রনারায়ণ ব্যানার্জী "কাঠিগিত্তির" গাববুখেলা" যাত্রিক নাট্য গোষ্ঠী, পশ্চিমদিনাজপুর। ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কালীপদ বস্থ—স্মৃতি পুরস্কার, স্বপনরায় চৌধুরী "গুরুপদ" সওয়াল বর্ত্তিক, লখ্নউ। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—যামিনী চ্যাটারজী স্মৃতি পুরস্কার—মিতা সান্ন্যাল "রাধা—সওয়াল, বর্ত্তিক, লখনউ। ২য় শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী নিয়তি চ্যাটার্জী স্মৃতি পুরস্কার, লিখা বিশ্বাস, স্বরবালা, শকুনের বাচ্ছা, সারথি, ত্রিপুরা। শ্রেষ্ঠ পরিচালক নরেন্দ্রনারায়ন চক্রবর্ত্তী গাববু খেলা-যাত্রিক নাট্য গোষ্ঠী পশ্চিমদিনাজপুর। ২য় শ্রেষ্ঠ পরিচালক দুর্গাদাস ব্যানার্জী "এ আমি চাইনি" ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স-৫ কলিকাতা। স্থানীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা—সওয়াল—বর্ত্তিক, লখনউ। স্থানীয় ২য় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, আর এক ঝিন্দের বন্দী—সৌখিন নাট্য গোষ্ঠী, লখনউ।

মণ্টু বস্থ

# পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

## প্রকাশিত গ্রন্থ

### প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ

একখণ্ডে ৭৪টি নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ সংকলন। তৎসহ লেখকপুত্র অমৃত রায় লিখিত জীবন পরিচয়। সাড়ে চারশো পৃষ্ঠার বই, রয়াল সাইজ। মূল্য ৪৫ টাকা।

### সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৮৬টি কবিতাসংগ্রহ। তৎসহ কবিকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা, সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপরিচয়। রয়াল সাইজ। ৪২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ টাকা।

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত প্রণীত

### বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সার্ধ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত জীবনী। মূল্য ২ টাকা।

### আকাদেমি পত্রিকা / ১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুখপত্র/সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : অন্নদাশংকর রায়। মূল্য ১০ টাকা।

### প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা

মূল্য ১০ টাকা।

### প্রাপ্তিস্থান

(১) কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, (বেলা ২টো থেকে ৭টা)

(২) ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল কাউন্টার,
৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ (বেলা ১২টা থেকে ৬টা)

(৩) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

(৪) মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

(৫) দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ২৭২৮/৮৯
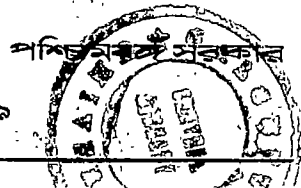
# আনন্দধারার বই

**কলিকাতা তারিখ অভিধান** ॥ দিব্যেন্দু সিংহ ॥ ৫০.০০ টা

তিনশ বছরের কল্লোলিনী কলকাতা। তার সমাজ-শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের পরম গর্বের। একদিনে নয়, কালে কালে তিলে তিলে বহু জন্ম-মৃত্যুতে, প্রাণপাত-পরিশ্রমে, সংস্কার-আন্দোলনে গড়ে ওঠা এই তিলোত্তমা নগরীর প্রতিটি দিনে কোন কোন সালে কী ঘটেছিল, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ।

'কলকাতা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে তাঁদের বইগুলোর মধ্যে শ্রীদিব্যেন্দু সিংহের বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করবে নিজস্ব অধিকারের দাবীতে।'

**—নিশীথরঞ্জন রায় (ভূমিকা)**

"বইটি একদিকে যেমন কলকাতার সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতাকে একটি সূত্রে বাঁধার প্রয়াস, তেমনি অগণিত অজ্ঞাত তথ্যের আকর-গ্রন্থ। ...নির্দেশিকা অংশে 'কলকাতার প্রথম', 'পত্র-পত্রিকা' 'প্রতিষ্ঠান' 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন / উদ্বোধন এবং কলকাতার ব্যক্তিত্ব'—শুধু নির্দেশ-পঞ্জী নয়, উল্লেখ্য সংযোজন।"

**—সন্তোষকুমার অধিকারী**

"অসামান্য, অবিশ্বাস্য তোমার বই—'কলিকাতা তারিখ অভিধান'। আমি অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। এ তোমার বিদ্যার পরিচয় শুধু নয়, এ তোমার পরিশ্রমের বাহবা নয়, এ তোমার সাধনার বিরাট প্রকাশ।"

**—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

আনন্দধারা। ৭৭/১বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

# পরিচয়

৫৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা জুলাই ১৯৮৯ শ্রাবণ ১৩৯৬

পুস্তক পরিচয়

যাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন  জগদীশ ভট্টাচার্য  ৯০
স্মৃতি-বিস্মৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল  রুশতী সেন  ৯৩

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত


সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ  ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

# তৃপ্তি মিত্রের শেষ সাক্ষাৎকার

নিয়েছেন : সন্ধ্যা দে

[ বাংলা মঞ্চের এক প্রখর ব্যক্তিত্ব—তৃপ্তি মিত্র। একজন সাধারণ নাট্যকর্মী হিশেবে আমার দীর্ঘ দিনের কৌতূহল ছিল কিংবদন্তীপ্রতিম এই অভিনেত্রী সম্পর্কে বিশদভাবে জানার।

হঠাৎ অভাবনীয় সুযোগ এসে গেল। যদিও তিনি ছিলেন খুবই অসুস্থ, তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে সুযোগের সদব্যবহার করবার চেষ্টা করেছি।

ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, চেনামুখ এবং আরব্ধ নাট্য-বিদ্যালয়ের অন্যতম পুরোধা শ্রীমতী মিত্র শুধু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীই নন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন প্রবাদপ্রতিম শম্ভু মিত্রের একেবারে কাছের মানুষ। তাছাড়াও একজন নাট্য পরিচালক, নাট্যকার এবং প্রবন্ধকার হিসেবেও তিনি সুপরিচিত।

গণনাট্য আন্দোলন, গ্রুপ-থিয়েটার আন্দোলন নিয়ে প্রায় ছ-মাস ধরে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে ১৯৮৭-৮৮র দিনগুলিতে আমি তাঁর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি এবং তাঁকে একান্ত কাছে পেয়ে নিজে ধন্য হয়েছি। সেই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার আমার কাছে ক্যাসেটে ধরা আছে। আমার আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছ থেকে জানবার ছিল কিন্তু সে কাজ আর সমাধা হলো না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই বাণীবদ্ধ দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃতি হলো। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, মাত্র কয়েকদিন আগে এই বিরল চরিত্রের অভিনেত্রী গত হয়েছেন। গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের একজন নগণ্য পদাতিক হয়ে এই সাক্ষাৎকার তুলে ধরা আমার কাছে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করা ছাড়া আর কিছু নয়। ]

প্রঃ বৌদি, আপনি ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, পরে তার শাখা গণনাট্য সংঘের সঙ্গে কবে এবং কিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন? নাট্যজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি-পর্বের কথা যদি কিছু বলেন।

উঃ কোনওরকম প্রস্তুতি না নিয়েই আমি নাট্য-জগতে প্রবেশ করি। ১৯৪৩

সালের মাঝামাঝি আমি ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। হঠাৎই, এ জগতে এসে পড়েছিলাম। নাটকই করব এমন কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

ম্যাট্রিকুলেশনের রেজাল্ট বেরোনোর আগেই আমি এ-আর-পি-তে জোর করে চাকরি নিই। থিয়েটারের মেয়ে তুমি নিশ্চয়ই জানো—বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন আমার আপন মাসতুতো দাদা; আমরা তাকে গোষ্ঠদা বলে ডাকতাম। ওঁরই একটি নাটিকা তখন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে হচ্ছিল।

প্রঃ আগুন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ জীবনের প্রথম নাটক অভিনয় করার অভিজ্ঞতার কথা যদি কিছু বলেন।

উঃ আসলে আমি তখন নাটক সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, বুঝতাম না। হঠাৎই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল। মনে আছে, একদিন গোষ্ঠদা (বিজন ভট্টাচার্য) একটি নাটিকা লিখে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলো। আমাদের বাড়ি বলতে—আমার মামার মাড়ি, যেখানে আমি থাকতাম। আমার দিদি ও জামাইবাবু কবি অরুণ মিত্র (যাঁকে আমি খোকাদা বলে ডাকি) তাঁরাও ওখানে থাকতেন। গোষ্ঠদার নাটকটার নাম ছিল 'আগুন'। যতদূর মনে পড়ছে, সেটা আমাদের বাড়িতেই বোধহয় প্রথম পড়েছিল। কারণ ও কিছু লিখলেই দিদি আর খোকাদাকে শোনাত। এই সময়ে, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ নামে যে সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল—সেখানকার মেম্বার ছিলেন গোষ্ঠদা এবং আমার জামাইবাবু। সেইখানে এ নাটকটি করবার কথা হয়। বস্তিজীবন নিয়ে লেখা নাটকটি—না খেতে পেয়ে স্বামী স্ত্রীকে ধরে মারছে। স্ত্রী বলছে—চাল নেই আমি রাঁধব কি? এইসব। আমি শুনলাম, অরুণদারা বেশ প্রশংসা করছেন—বা বেশ তো তুই লিখেছিস।—এরমধ্যে যে শেষপর্যন্ত আমি জড়িয়ে পড়ব কোনোদিনই ভাবিনি।

তা, একদিন কি হলো জানো—গোষ্ঠদা হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো—'মণি, (আমার ডাকনাম), তোকে একটা পার্ট করে দিতে হবে, কারণ যিনি করছিলেন তিনি চলে গেছেন। তাঁর শাশুড়ি নাকি তাঁকে নাটক করতে দেবেন না। তুই এটা করে না দিলে নাটকটা করা সম্ভব হবে না। তখনকার দিনে অভিনেত্রী পাওয়া সহজ ছিল না। সাতদিন বাদে

নাটক, কি করে করব? না, বাবা আমি পারব-টারব না। তাছাড়া ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করা, ওরে বাবা—সে তো অসম্ভব। গোষ্ঠদা আমাকে জোর করতে লাগলো। দিদি বললো—'যা না করে দে না, বেচারা প্রথম নাটক লিখলো—নইলে ওর নাটকটা হবে না।' তারপরে তো যা হবার তাই হলো। শেষ পর্যন্ত আমাকেই সেই ভূমিকায় অভিনয় করতে হলো। ভীষণ ভয় করছিল। মনে হয়েছিল—এখানেই আমার অভিনয়ের ইতি।

প্রঃ কিন্তু, আপনি যেখানে ইতি মনে করেছিলেন, সেখান থেকেই তো শুরু হলো আপনার নাট্য-জীবনের যাত্রা—তাই না?

উঃ হ্যাঁ, আর সেই থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে চলছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হতে চললো।

প্রঃ আপনার ছাত্র-জীবনের কথা, মা-বাবা, ভাইবোনদের কথা যদি কিছু বলেন।

উঃ এসব কথা অনেকবার বলেছি। এখন বসে বসে আমায় আবার বলতে হবে।

প্রঃ বাঃ, আপনারা আমাদের আদর্শ। আপনাদের মুখে পূর্বজীবনের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া ক্যাসেটে রেকর্ড করে নিচ্ছি যে আমি?

উঃ আমার জন্ম উত্তরবঙ্গে। এখন তা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ সাব ডিভিশন। আমার বাবা ছিলেন উকিল। তবে, ওকালতিটা তাঁর একেবারেই ভাল লাগত না। আমরা নয় বোন, এক ভাই। ঠাকুরগাঁ-তে পড়াশুনা করলাম আমি ক্লাস সিক্স পর্যন্ত। এরপর, মায়ের সঙ্গে চলে এলাম কলকাতায়। দিদি-জামাইবাবু (শান্তিদি এবং অরুণ মিত্র) আর বড়মামা সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ওঁরা সব একসঙ্গে তখন মদন মিত্র লেনের একটা বাড়িতে থাকতেন। সেখানেই উঠলাম আমরা। প্যারিচরণ মিত্র স্কুলে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলাম। স্কুলে সবাই 'বাঙাল' বলে খুব ক্ষ্যাপাত। কিছুদিনের মধ্যেই, কেমনভাবে জানি না, উচ্চারণ ঠিক করে ফেললাম। এক আশ্রমেও ছিলাম কিছুদিন। এছাড়া আমার এক দাদার বাড়িতে থেকেও পড়াশোনা করেছি বেশ কিছুদিন, যদিও তিনি আপন দাদা নন, তবু, এখনো তাঁকে তাই বলেই মনে করি। আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলন, কিন্তু কিছু করতে পারিনি। বড়দির সঙ্গে তখন যশোরে চলে গিয়েছিলাম।

আমার ঠাকুমা আর বাবার মৃত্যু হয় উনচল্লিশ-চল্লিশ সালের মধ্যে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন খুবই খারাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তখন, ঠাকুরগাঁয়ে মা ভাইবোনেদের নিয়ে খুবই বিপর্যস্ত। যুদ্ধের মধ্যে বাড়ি গিয়ে দারিদ্র্যের চেহারাটা দেখলাম এবং অনুভব করলাম। এরপরই, কলকাতায় এসে যোগ দিলাম এ, আর, পি'তে। নাটকের সঙ্গেও আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়লাম। ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হলাম আশুতোষ কলেজে। ফেমিনের কারণে রিলিফ-কিচেনের জন্য তখন টাকা তুললাম, শিখতাম ফার্স্ট-এড। কখনো অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হতো। তখন দেখতে হয়েছে কত মৃতদেহ। সেইসময় গোষ্ঠদা (বিজন ভট্টাচার্য) 'নবান্ন' লিখল। নবান্নের সময় থেকেই পুরোপুরি জড়িয়ে গেলাম নাটকের সঙ্গে। আর ছাড়া গেল না।

প্রঃ 'নবান্ন'-র আগে আর কোন নাটকে আপনি অভিনয় করেছেন?

উঃ ঐতো বললাম, প্রথমে আগুন। একবার এরকমই আর একজনের অনুপস্থিতিতে 'ল্যাবরেটরী' নাটকে অভিনয় করে দিয়ে আসতে হলো। ঐ নাটকটি পরিচালনার ভার ছিল শম্ভু মিত্রের ওপর। তিনিও এতে অভিনয় করেছিলেন। তারপর, 'জবানবন্দী'। তারপরই……

প্রঃ আগে সেখানে কে করতেন?

উঃ সুজাতা মুখোপাধ্যায়। আমি দু-তিনটে শো করেছি।

প্রঃ শম্ভু মিত্রের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কোথায়?

উঃ ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘে। সেখানেই আমার আলাপ হলো শম্ভু মিত্রের সঙ্গে। তাছাড়া, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও কত বিখ্যাতজনের সঙ্গে।

প্রঃ শম্ভু মিত্রের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলো কবে?

উঃ (হেসে) হ্যাঁ, সেতো 'গণনাট্য সংঘে' থাকার সময়েই। 'নবান্ন' হওয়ার পর 'ধরতি কে লাল' ছবি করার জন্যে আমাকে বম্বে চলে যেতে হয়। শম্ভু মিত্র 'ধরতি কে লাল'-এ অভিনয় করেছিলেন। 'নবান্ন'-কে অনুসরণ করেই ছবিটি তৈরি হয়েছিল—ওখানেই আমাদের বিয়ে হয়।

প্রঃ 'নবান্ন' কি আপনারা গ্রামে গিয়ে অভিনয় করেছেন?

উঃ না। আমার গ্রামে যাওয়া হয়নি। 'নবান্ন' বেশির ভাগ শহরেই হয়েছে।

প্রঃ কিন্তু বৌদি, গণনাট্য সংঘের কোন নাটক নিয়ে আপনারা গ্রামে গেছেন ?

উঃ 'জবানবন্দী' নিয়ে আমরা অনেক গেছি। কোথায় কোথায় সব যেন ঘোরা হয়েছে। 'আগুন' গ্রামে বেশি হয়নি। তখনতো দুর্ভিক্ষের সময় ছিল, তাই 'জবানবন্দী' নাটকটা সকলের খুব ভালও লাগতো। তাছাড়া ঐ সময়ে দুর্ভিক্ষের জন্য ছোট ছোট নাটিকা হতো। 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলে একটা হিন্দীতে নাটক হতো। সেটাও করতে যেতাম। তাছাড়া গান হত তখন কোরাসে আমরা গানও গাইতাম। অভিনয় শেষে চাঁদা তুলতাম।

প্রঃ আপনি একা কোন গান গেয়েছেন ?

উঃ না, না। ঐ তো বললাম কোরাসে করতাম।

প্রঃ কি রকম একটু করুন না ?

উঃ তুমি আচ্ছা পাগল তো, এখন কি ওসব মনে আছে। (হেসে) একটা গান একটু একটু মনে পড়ছে,—' বলে তৃপ্তি মিত্র আপন মনে গানটি ধরলেন, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম গান গাইতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে, গানের রেশ থাকছিল না। দু-লাইন গাওয়ার পর আমি থামিয়ে দিলাম। গানটা এইরকম—) 'ভুখা হ্যায় ভগওয়ান……ভুখা হ্যায় ভগওয়ান।'

প্রঃ আপনারা তাহলে তখন রীতিমত গানের চর্চা করতেন ?

উঃ সুযোগ তেমন পাইনি। তাছাড়া অল্প বয়সে বিয়ে করলাম তো। ঘর-সংসার করে থিয়েটার, তাই অতটা সম্ভব হয়নি। তবে চেষ্টা করেছি। চিরটাকালই struggle-এর জীবন আমার।

প্রঃ তখন কি নাটক করে কিছু পয়সাকড়ি পেতেন ? তাছাড়া আর অন্যকোন কাজ করতেন কি ?

উঃ না, না। খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে তখন। Post-office-এ চাকরির জন্যে একটা দরখাস্ত করেছিলাম। তার appointment letter এসেছিল। বড়মামা এসে বললেন—দশটা-পাঁচটা কাজ করলে তাহলে কি থিয়েটার করা যাবে ? শেষপর্যন্ত সে চাকরি করা হলো না থিয়েটারের জন্যে। কিন্তু কী করব, কী খাব জানি না। তখন কিছু ভাবিনি। ঐ যাকে বলে—কী বলে না, নৌকো ঘুরিয়ে দিয়ে এপারে চলে আসা। যাতে ওপারে যাবার রাস্তা আর না থাকে।

সেরকমভাবেই আমাদের থিয়েটার করা। লোকে শুনলে বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, না খেয়ে, একেবারেই না খেয়ে আমাদের অভিনয় করতে হয়েছে। বাবা মারা যাবার পরে ধরতে গেলে মামাই আমাদের কষ্টের মধ্য দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন।

প্রঃ এই যে নাটক করতে গ্রামে গেলেন আপনারা, সেই নাটকগুলো কি গ্রামের মানুষদের মত করে করেছিলেন?

উঃ গ্রামের মানুষদের মত করে একেবারে তা নয়, তবে ওদের যাতে ভাল লাগে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। তখন যাঁরা কর্ণধার ছিলেন মহর্ষি বলো, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র এবং আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদেব মুখে বলতে শুনেছি—সত্যি সত্যি যদি তুমি ভাল করে একটা জিনিশ করো, তাহলে শহরের লোকও যেমন নেবে গ্রামের লোকও তেমনভাবেই নেবে। একটু তফাৎ থাকতে পারে। 'জবানবন্দী' যখন গ্রামে করতে গেছি, তখন এখানেও যেমন করেছি গ্রামেও তেমনভাবেই করেছি। অবশ্য 'নবান্ন' আমি গ্রামে করতে পারিনি—তাই সেটার কথা ঠিক বলতে পারব না। কারণ তখন তো আমি 'ধরতি কে লাল' ফিল্ম করতে বম্বে চলে যাই, ফিরে যখন এলাম তখন 'মুক্তধারা' হলো আই. পি. টি-তে। তারপর আই. পি. টি. এ-র সঙ্গে মনোমালিন্য এবং আমরা চলে এলাম। ফলে 'নবান্ন' করতে কলকাতার অনেকেই গ্রামে-গঞ্জে গেছে কিন্তু আমরা পারিনি।

প্রঃ 'গণনাট্য সংঘ' থেকে সরে এসে 'বহুরূপী' গঠিত হলো, কিন্তু কেন? তার কি কোন ঐতিহাসিক ও শিল্পগত প্রয়োজন ছিল?

উঃ দেখো, এটা বলতে গেলে আমাকে ভাল করে মনে করে, যাতে ভুল না করি এভাবে বলতে হবে। তাছাড়া আজকে অনেক বেলা হয়ে গেছে, আজকে থাক।

প্রঃ আমাদের সমাজকে থিয়েটার কি দেয়? আর যদি দেয় তো তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল কী?

উঃ থিয়েটার এই নাট্য জিনিসটাই সমাজকে অনেক কিছু দিতে পারে। যদি নিষ্ঠার সঙ্গে সৎ হয়ে সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন কোন নাটক করা যায়। একটা সময়ে ইংরেজি প্রবাদ খুব ব্যবহার করা হতো, মঞ্চ তথা পুরো নাট্য জিনিসটাই সেই সমাজের দর্পণ। এটা নিয়ে একসময় গিরিশবাবু থেকে সবাই গর্ব করেছেন। কেন না, তাঁরা

তাঁদের মতো করে সেই সামাজিক পরিস্থিতিতে দায়িত্ব সম্পন্ন নাটক করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে, সেখানেও কি বেনো জল ছিল না? ছিল, সেটা 'রঙ্গালয়ের ত্রিশ বছর' অপরেশবাবুর বইটা পড়লে জানবে।

গিরিশবাবু মঞ্চটাকে মন্দির মনে করতেন। সেখানেই অন্য কোন থিয়েটারে হ্যাণ্ডবিলে 'ঘোড়ার প্রবেশ' 'পরীর মঞ্চে আসা' সারি সারি সখির নাচ' বিজ্ঞাপনে দেওয়া হতো। নাট্য শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মা ভরতকে নাট্যশাস্ত্র লিখতে বললেন, ভরত লিখলেন এবং নাটকও লেখা হলো। প্রথম অভিনয় হয়ে যাবার পর নাকি তখন সকলে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা বললেন—নৃত্য, গীত, উপচার ইত্যাদি সব আছে তবে তোমার নাটকে কৌশিকী বৃত্তির অভাব আছে। অর্থাৎ এইটেই বলতে চেয়েছিলেন সমস্ত আছে কিন্তু লালিত্য বা এসথেটিক নেই। এইজন্য নান্দনিক কিছু বা লালিত্য না থাকলে নাটক সম্পূর্ণতা পায় না, সমাজের দর্পণ হতে পারে না। আর একটা কথাও নাকি উনি বলেছিলেন নাটকের মধ্যে এমন জিনিস থাকা চাই যাতে লোকে জীবনের ভালো মন্দ বুঝতে পারে, শোকের সান্ত্বনা দুঃখের পাথেয় পায় ইত্যাদি এবং কোনটা উচিত কোনটা নয় যাতে সমাজ একটা জ্ঞানলাভ করতে পারে, তা না হলে কেবল মাত্র এণ্টারটেনমেণ্টের জন্য নয়, বোধহয় এমন কথা ব্রহ্মা বলতে চেয়েছিলেন। যাঁরা দেখবেন তাঁরা যাতে ভালো-মন্দ, শোক-দুঃখের সান্ত্বনার পাথেয় এর থেকে সংগ্রহ করতে পারেন তাহলেই নাটক করার সার্থকতা। যদি এসব না থাকে তবে এই পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করার কোন মানে হলো না।

আমি এই গল্পটা এই জন্য বললাম যে, যুগে যুগে গ্রীক নাটক থেকে আরম্ভ করে (মাঝখানের অনেক কথা বলতে পারা গেল না।) এমন কি মস্কোতে স্তানিস্লাভস্কি যা বলেছিলেন য়ুরোপের বড় বড় নাটকের লোক মাথা ঘামিয়েছেন যাঁরা এসব বলেছিলেন। বার্নার্ড শ যা বলেছিলেন, গিরিশবাবু এরকম কথা তো জোর দিয়ে বলেছিলেন। তাঁরা কি ঠিক একই কথা বলেন নি? সে যুগ থেকে এ যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত? যাঁরা নাটককে সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই কি একই কথা ভাবেন নি? কাজেই পরোক্ষ ফল বলতে তো এটাই দাঁড়ায় যে, তার থেকে কেউ উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের জীবনে তার কোন কোন ভাল অংশ ব্যবহার করতে চাইলে তবেই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফল হলো।

কিন্তু কেউ যদি নাটকটা দেখে গিয়ে ভাবে এইবার একটু কফি খাই, আজকালতো আরও অনেক কিছুই খাওয়া শুরু হয়েছে, বা তাস খেলতে বসে গেল বা টি. ভি. দেখতে বসে গেল তাহলে বলব সে নাটক সার্থকতা লাভ করেনি।

প্রঃ এ পর্যন্ত আপনি কত নাটকে অভিনয় করেছেন? নাট্যরূপ দিয়েছেন কোন্ কোন্ নাটকের, পরিচালনা করেছেন কোন কোন নাটকের? কি কি লিখেছেন?

উঃ এ প্রশ্নের উত্তর এখন আমি দিতে পারব না। এটা তোমায় তৈরি করে নিতে হবে। প্রচুর নাটকে অভিনয় করেছি, সব মনে করে বলতেও পারব না। আর আমার শরীরটাও ভীষণ খারাপ। তুমি বরং তৈরি করে আমাকে দেখিয়ে নিও। আজ আর তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না, কারণ ডাক্তার আমায় দুপুরের খাবার সময় বেঁধে দিয়েছেন।

প্রঃ একজন ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে গেলে কি কি করতে হবে? আদর্শ অভিনয়ের রীতিনীতি কি?

উঃ অভিনয়ের রীতিনীতি এক একজন তার স্বভাব, তার ক্ষমতা অনুযায়ী ঠিক করে নেয়। তবে একটা কথা বলতে পারি যে অভিনয় করতে গেলে অনুশীলন ভীষণভাবে দরকার। কেবলমাত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ নয়, প্রত্যেকটি মহৎ কাজের পেছনেই রয়েছে অনুশীলন। ঠিক যেমন ভাল ক্রিকেটার হতে গেলে তাকে অনেকদিন ধরে নানান পদ্ধতিতে নানানভাবে শিখতে হয়, কতো কঠোর পরিশ্রমত করতে হয়। তেমনি একজন গায়ক হতে গেলে, একজন বাদক হতে গেলে ঠিক সমানভাবেই অনুশীলন করতে হয়। আসলে প্রত্যেকটি জিনিসের গ্রামার শিখে তারপর এসথেটিক্ জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে তবেই সে শিল্পে স্বীকৃতি পায়। এখানে আমাদের নাটকের ক্ষেত্রে এখন দেখছি যে কয়েকজনকে নিয়ে দল গড়া হলো তারপর যে যার মতাদর্শ অনুযায়ী একটি নাটক ঠিক করলো গলা তৈরির দরকার নেই, চলা তৈরির দরকার নেই, নিজের মেকাপ নিজের শেখার দরকার নেই। কোন মতে কথাগুলো মুখস্থ করে বা না মুখস্থ করে প্রমটারের সাহায্যে কোনমতে মঞ্চে গিয়ে কথাগুলো তারা বলে দেয়। সেইজন্য দেখা যায় তারা এক-একসময় একজন অভিনেতা যে কৃষকের অভিনয় করছে তখনও যেমন করে হাঁটছে আর রাজার অভিনয় যখন করছে তখনো

সে সেইরকম করে হাঁটছে। এই দুটো হাঁটার যে পার্থক্য করা দরকার এটা আজকাল বেশির ভাগ অভিনেতাই বোঝেন না,বা পরিচালকও সেদিকে মন দেন না। উচ্চারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ, বেশ খারাপ অনেক কথা বোঝা যায় না। যেমন একটা উদাহরণ দিই বাংলায় তিনটে 'র' আছে। আমরা তিনটেই ব্যবহার করি র ড় ঢ় এটা অধিকাংশই লোকই অর্থাৎ ৯৯% নাট্যকর্মী ঠিক করতে পারে না। আর 'স' এর দোষ বা 'শ' বেশি করে 'শ' বলা এসব তো আছেই। কাজেই যদি অভিনয়টাকে ভালো করে করতে হব তবে অনুশীলন বা এইসব শিক্ষায় তীক্ষ্ণ নজর না রাখলে কোন ভালো নাটক হওয়া সম্ভব নয়। ভালো অভিনেতা ও অভিনেত্রী হওয়া সম্ভব নয়।

আজকাল যেসব ছেলেমেয়েরা আসে তারা অনেকেই নাটক পড়ে খুব কম। যদি জিজ্ঞেস করা হয় রবীন্দ্রনাথের কি কি নাটক পড়েছ। এক-আধটার নাম বলার পর চুপ করে থাকে, আসলে অতি অল্পে আজকালকার বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই নাম করতে চায়। কিন্তু আমাদের সময়ে রীতিমতো নাটক পড়তে হতো, গান শিখতে হতো, আবৃত্তি চর্চা করতে হতো, হাঁটা-বলা অভ্যাস করতে হতো। কিভাবে মঞ্চে চলাফেরা করতে হয় তা শিখতে হতো, এখন এসবের বোধহয় আর দরকার পড়ে না।

প্রঃ বিজন ভট্টাচার্যকে তো আপনি ভাল করে জানতেন ও চিনতেন। তাঁর নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে কিছু বলুন না ?

উঃ দেখ, বিজনদা (গোষ্ঠদা) আমার আত্মীয়। সে আমার মাসতুতো দাদা। ওঁর সম্পর্কে বেশি বলতে গেলে কেমন শোনাবে জানি না— তবে এটা বলতে পারি, অনেক গুণের অধিকারী ও।

ওঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকে আমি অভিনয় করেছি। 'নবান্ন' বা 'জবানবন্দী'তে যেটা সবচেয়ে আমার চিন্তাকে নাড়া দেয় সেটা হলো—চাষা নায়ক। বোধহয় এরকম বিষয় নিয়ে তার আগে কোন নাটক লেখা হয়নি। চাষীদের সম্পর্কে দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সেটা ঠিক চাষাদের নিয়ে নয় সেখানে নবীনমাধব বা বিন্দুমাধব—তাদের সঙ্গে জড়িত একটা আন্দোলনের ব্যাপার দেখানো হয়েছিল। কিন্তু গোষ্ঠদার এই নাটক দুটি নিঃসন্দেহে একটা অন্যরকম মোড় ফিরিয়ে দিল। সেটা ও কি

বুদ্ধিতে কি ভেবে লিখেছিল আমি ঠিক বলতে পারব না, তবে দেশ যেটা ওঁর কাছ থেকে পেল সেটা একেবারে মোড় ঘোরানোর ব্যাপারই। ও যদি না লিখত, তাহলে এই বাংলার নাট্য আন্দোলনই বলি বা গণনাট্য আন্দোলন বা তখন সেটা যে নামই থাক না—এই মোড়টা ফিরত কিনা জানি না। 'জবানবন্দী' হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে। তার থেকে আলাদা হয়ে জন্ম নিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সেখানেই ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকটি হয়। পরিচালনা করেছিলেন একসঙ্গে শম্ভু মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য। ১৯৪৭-৪৮ সালে I. P. T. A ছাড়ি, গোষ্ঠদাও ছেড়ে দেয়। আমাদের কারণ আর ওঁর কারণ আলাদা হতে পারে হয়ত, কিন্তু ছাড়তে হয়। তারপর আমরা ১৯৪৮-এ বহুরূপী থেকে আর একবার 'নবান্ন' অভিনয় করি একসঙ্গে মিলে। তারপর আর একসঙ্গে, গোষ্ঠদার সঙ্গে কাজ করা হয়নি। গোষ্ঠদা 'জীবনকন্যা' লিখেছিলেন এটা মূলত গানের নাটক। অপেরা করবার মত। কিন্তু কি জানো, এ নাটকটা তেমন ভাল করে প্রযোজনা হয়নি। যদি হতো, আমার মনে হয় এটাও একটা দারুণ গীতিনাট্য বলে চিহ্নিত হতো।

বিজনদার অভিনয়ের কথা কী বলব, না দেখলে তা বোঝানো অসম্ভব। 'নবান্ন'তে একটা দৃশ্য ছিল গ্রাম ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত চাষারা এসেছে কলকাতায় একটু খাদ্য সংগ্রহের আশায় যদি টিঁকে থাকা যায়। এক বুড়ো, যার স্ত্রী '৪২-এর আন্দোলনে ইংরেজের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে—দুটি ছেলেও। ভাইপোদের নিয়ে যার সংসার ছিল। তাদের সঙ্গে কলকাতায় এসে হারিয়ে ফেলেছে তাদেরও। তার নাকি সর্বাঙ্গে ব্যথা। এক খয়রাতি চিকিৎসালয় দেখে ঢুকে পড়ে সেখানে। ডাক্তারকে বলে, 'আমার ব্যথা সারিয়ে দাও।' ডাক্তার বলে, 'কোথায় তোমার ব্যথা'? একবার শরীরের এখানে আর একবার ওখানে, নানা জায়গায় দেখাতে থাকে। ডাক্তার বোঝে মাথার গোলমাল, বলে—'তোমার ব্যথা-ট্যথা কিছু নেই—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।' বুড়ো বলে—'ভুলে যাব?' তারপর 'ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা, ভুলে যাও' এই কথাটা ক্রমাগত আবৃত্তি করতে করতে বুড়ো বেরিয়ে যায় মঞ্চ থেকে। বুড়োর নাম প্রধান সমাদ্দার আর অভিনয় করেছিলেন গোষ্ঠদা। সে যে কি অভিনয় যারা না দেখেছে তাদের

বোঝানো সম্ভব নয়। তাঁর চলার ভঙ্গী, বলার ভঙ্গী আর কারো দ্বারা কি সম্ভব? প্রতিটি দর্শক হতবাক। উইংসের পাশে আমরাও অভিভূত। আরও অনেকদিন পর দেখিছিলাম 'মরাচাঁদ' নাটকে ওঁর অভিনয়। অন্ধ গায়ক পবন। দোতারা বাজিয়ে গান গায়। রাজনৈতিক সভায়ও গান গাইতে নিয়ে যায় বাবুরা কখনো-সখনও। তার সুন্দরী বৌ প্রেমে পড়লো এক বৈষ্ণব ভেকধারী ভণ্ডের। তারপর একদিন তার সঙ্গে চলে গেল। আমি যে অভিনয়টি দেখেছিলাম তাতে দুটি চরিত্রেই গোষ্ঠদা অভিনয় করেছিল। দুটিই অসাধারণ অভিনয়। তারমধ্যে বিশেষ করে পবন। বৌ চলে গেছে—বিমূঢ় পবন একলা বসে আছে। এমন সময় রাজনৈতিক কর্মী এসে বললো, 'পবন আজকের মিটিং-এ তোমাকে গান গাইতে হবে··· ।' পবন হঠাৎ বলে, 'আমি গান গাইতে পারব না বাবু, আমার সব ভেঙে গেছে' এই জায়গাটায় সেদিন এমন একটা অভিনয় করেছিল! চড়া জায়গা থেকে শুরু করে আরও চড়া জায়গায় গলা নিয়ে গিয়ে প্রায় আর্তনাদের জায়গায় পৌছে কোন ছেদ না দিয়েই একটা বুকফাটা গান ধরল। দর্শক ফেটে পড়েছিল সেদিন, সেও না দেখলে বোঝানো অসম্ভব।

আর একটা কথা না বলে পারছি না। অপূর্ব ভঙ্গিতে ও নিজের নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ত। প্রত্যেকটা ঘটনা এবং চরিত্র জ্যান্ত হয়ে যেন চোখের সামনে ফুটে উঠত আমাদের। 'আজ বসন্ত' নাটকটা পড়বার কথা এখনও মনে পড়ে। সেসব দিনগুলোর কথা ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়।

প্রঃ অজিতেশ সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন।

উঃ অজিতেশ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই মনটা ভার হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি যে মানুষটা চলে যাবে, এ ভাবতেই পারিনি। একেবারে অকল্পনীয়, ওর মত মানুষ হয় না। সারাটা জীবন কিভাবে যে পরিশ্রম করেছে তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়।

নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পার আমাদের দেশে একটা দলকে, দাঁড় করাতে গেলে কি পরিমাণ পরিশ্রম এবং কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করতে হয়। যারা যারা ভাল নাটকের দল গড়েছে তাদের সকলকেই এ ধরণের পরিশ্রম করতে হয়েছে। অজিতেশও ঠিক এ ধরণের অমানুষিক পরিশ্রম করে দলকে দাঁড় করিয়ে ছিলেন। নাটকের জন্যে

সমস্ত জীবন দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাটক লেখা, অভিনয় করা, পরিচালনা করা সমস্ত দিক দিয়েই এমন কি অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করা থেকে সবকিছুতেই তার কঠোর পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল। প্রকৃতভাবে বিদেশী নাটকের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে ছিলেন। খুববেশি পরিশ্রম, খুববেশি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেন হাউইয়ের মত জ্বলতে জ্বলতে হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। এরকম প্রতিভাধর লোকেরা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলে আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাছাড়া ওর ব্যবহারের তো কোন তুলনাই ছিল না। মারা যাবার কিছুদিন আগেও আমরা একসঙ্গে 'থানা থেকে আসছি'তে অভিনয় করতে রামমোহন মঞ্চে গিয়েছি। কি বলব—বলে বোঝাতে পারছি না যে, ও কতবড় মাপের অভিনেতা। ওর এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া এ যেন বজ্রাপাতের মত। আমাদের ছোট ও অথচ কত আগে চলে গেল। ওর আগে তো আমার যাবার কথা।

প্রঃ ছাত্রজীবনে আপনার কোন প্রিয় বন্ধু সংসর্গ ঘটেছিল কি?

উঃ তখন আমার এক প্রিয় বান্ধবী ছিল—গীতা গোস্বামী। বলতে পার আমার প্রাণের বন্ধু। আমার সেই বন্ধুটির রঙ ময়লা কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। ওর সঙ্গে আমি একবার নিউ থিয়েটার্স এ গিয়েছিলাম। সেখানে ও একটা সাইড রোলের কাজ পেল; আমি সঙ্গে ছিলাম ওর, ওখানে আমাকেও তখন তারা বলেছিল—আপনিও একটা রোল করতে পারেন। আমি তো রেগে টেগে লাল। গীতার সঙ্গেও আর কথা বললাম না। বেরিয়ে এলাম। তখন তো অন্যরকম ছিলাম। অভিনয় দেখতে ভাল লাগত, অ্যাপ্রিশিয়েট করতাম কিন্তু অভিনয় করা—সেটা মোটেই ভাবতে পারতাম না। যাই হোক, রাস্তাঘাট চিনি না, খুব ভয় করছিল, তবু বাড়ি চলে এলাম। সে একটা মজার কাহিনী বলতে পারো। তারপর গীতা যখন আবার এলো আমার কাছে আমি ওর সাথে কথা বলব না ঠিক করায় আমার দিদি ওকে বলল - 'ও কথা বলবে না'। আমি কেন কথা বলছি না ও বড়দিকে জিজ্ঞাসা করল। তখন ও সব বুঝতে পারল এবং ঐ কাজটা ও ছেড়ে দিল। কিন্তু তারপরই তো আমি 'আহ্বান' করলাম। 'ল্যাবরেটরী'-তে করলাম, তারপর 'জবানবন্দী' এভাবে চলতে লাগলো। আমার বান্ধবী অভিনয়ের কাজ

ছেড়ে দিল কিন্তু আমি তখন থেকে জড়িয়ে পড়লাম নাটকের সঙ্গে, অভিনয়ের জগতে।

প্রঃ আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন—চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে যেভাবে নাটক করা হয়েছিল, এখনও সেভাবে করা কি সম্ভব ?

উঃ আমি ঠিক তা মনে করি না। দেখো, একটা ভাল নাট্যকারের ভাল নাটক তুমি নিলে সেটাকে তো বদলানো ঠিক নয়। অবশ্য এখনকার কথা ছাড়ো, অনেক কিছু বদলে ফেলে তারপর করে। যাক গে, সেটা ছেড়ে দাও। নাটকে যে বক্তব্য আছে অর্থাৎ নাট্যকার যা নাটকে বলতে চাইছেন সেটাতো তুমি বদলে দিতে পার না। যদি বদলাতে হয় তাহলে ফর্ম বদলাতে পার, আঙ্গিক বদলাতে পার বাচনভঙ্গি বদলাতে পার, অর্থাৎ কিনা যখনই নাটকটা করনা কেন, নাট্যকারের মেসেজটা ঠিক ঠিক পৌঁছে দিতে হবে। দেখো, আমি বা আমরা একটা নাটক যখন করতে যাই তখন কেন করতে যাই নিশ্চয়ই নাটকটা পছন্দ হয়েছে বলে তো ? নাটকের বক্তব্য ভাল লেগেছে বলেই তো ? তাহলে সেই বক্তব্যটাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই যে ধর না কেন, আমি যে 'রক্তকরবী' করলাম সেখানে আমার ছেলেমেয়েরা সব অল্প বয়সের ছাত্র-ছাত্রী। তাদেরকে নিয়ে আমাকে করতে হয়েছে এই নাটকটি। এই নাটকটি অনেক আগে আমরা সেই পঞ্চাশের দশকে একবার করেছি, তখনকার ধ্যান-ধারণা আমাদের অন্যভাবে কাজ করেছে। আবার এ দশকের লোকের কাছে যখন সেটা করতে হলো, তখন সেটা আগের মত হয়নি একেবারেই অন্যভাবে করানো হয়েছে। কিন্তু সেটাও তো দর্শকেদের কাছে ভাল লেগেছে। দর্শকের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমাকে করতে হয়েছে। 'বহুরূপী'র 'রক্তকরবী'র সেটটা যেমন দর্শকের ভাল লেগেছিল, এই 'রক্তকরবী'র সেটটাও দর্শকের ভাল লেগেছে। অথচ, আগের 'রক্তকরবী'তে সেট খালেদকে করতে হয়েছে। আবার এবারেও কিন্তু তিনি করেছেন। কিন্তু, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মঞ্চের উপায়টাতো তাঁকেই বার করতে হয়েছিল। এবারের সেটটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। তাহলে, ও নিজেকে ভাঙল। তাহলে সময়ের ব্যবধানে সেটাতো হতেই পারে। ধরো একটা কথা বলি—এমন যদি হয়, মন্মথ রায়ের 'কারাগার'। 'কারাগারে' এমন কতকগুলো জিনিশ ছিল যার জন্য সেটা বৃটিশ সরকার বন্ধ করে

দিয়েছিল, কিন্তু কতকগুলো সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার ছিল। অবশ্য তখনকার দিনে সেটার প্রয়োজন ছিল এবং দর্শকও সেটা গ্রহণ করেছে। কিন্তু আজ যদি আমি মন্মথদার 'কারাগার' করতে যাই, তাহলে যদি সেটা লোকে না নেয়—তখন সেখানে আমাকে অভিনয়ের পদ্ধতি বদলাতে হবে। 'কারাগার'টা হয়ত ওরকম করব না, মঞ্চের আলো ওরকম করব না। আর ধরো, তখনকার দিনে নাটককে টেনে টেনে বড় করা হতো। কিন্তু এখন আর সেটা হয় না। অবশ্য তখন সেটাই ঠিক ছিল। লোকে দেখত। কিন্তু এখনকার লোকে অত সময় ধরে দেখতে চায় না। সেক্ষেত্রে আমাকে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। আলোর কাজ বদলাতে হবে। আমি অবশ্য তখনকারটা খারাপ বলছি না, এটাই তো তখন খাপ খেতো। সময়ের ব্যবধানে একটি নাটককে অন্যভাবে স্থাপন করা যেতে পারে, দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বদলাতে হবে অনেক কিছু।

প্রঃ আপনার দীর্ঘকালীন অভিনয় জীবনে কোন একটি নাট্য চরিত্রকে তুলে ধরতে গিয়ে আপনি কি মাঝে মাঝে অভিনয়-রীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন? আপনি কি একটি চরিত্রের মধ্যে সময়ের ব্যবধানে নতুন নতুন interpretation খুঁজে পেয়েছেন?

উঃ সে তো ঘটাতেই হবে। ধরো, রবীন্দ্রনাথের তিনটে নাটকের কথাই— চার অধ্যায়ের 'এলা'। এলা কি? না, বিশ শতকের প্রথম দিকের মেয়ে। যখন সবে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে বেরিয়েছে। তখনো তাদের মনে অনেক বাধা। তারা বেরিয়েছে কিন্তু মনের সংস্কার তারা কাটাতে পারেনি—তাই তো? সেটা একটা করতে চেয়েছি, ডায়লগগুলো হলো ভাবার ডায়লগ, শুধু বলে গেলেই চলবে না— ভাবতে হবে আর সেই ভাবনা চলে শেষদিন পর্যন্ত। ভাবার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ করতে হয়। এটা করতে গেলে পদ্ধতি বার করতে হবে। এই পদ্ধতি বার করতে গিয়ে আমাদের অসম্ভব কষ্ট করতে হয়েছে। প্রথমদিকে বুঝতেই পারিনি। কত চেষ্টা করে, ধীরে ধীরে বুঝতে হয়েছে। আর বুঝতেই পারছ—রবীন্দ্রনাথের নাটক বলে কথা। আমরা তখন যেটা ভাবতে পারিনি, রবীন্দ্রনাথ ভাবতে পেরেছেন বলেই তো লিখতে পেরেছিলেন। তাহলে আমরাই বা কেন তা অভিনয়ে প্রকাশ করতে পারব না? শেষ পর্যন্ত আমাদের

দিয়ে এটা ( শম্ভুবাবু ) উনি বের করে নিয়েছিলেন।

দেখো, আবার সেই 'রাজা' নাটকের কথাই ভাবে—'রাজা' নাটকে রাণী সুদর্শনা, দেখো তার আগে আমি 'অয়েদিপাউসের' রাণী করেছি, অনেক 'রাণী' দেখেছি যাত্রা-থিয়েটারের অভিনয়ে, এদেশে বিদেশের অনেক রাণী চরিত্র দেখেছি এবং করেছি কিন্তু 'রাজার' যে রাণী 'সুদর্শনা' সে একেবারেই অন্যরকম। 'কে রাজা, রাণী কে? অয়েদিপাউসের করা সহজ। কারণ, এরকম রাণী ইতিহাসে ছিল। কিন্তু 'রাজার' রাণী কোথাও নেই, কেউ ছিল না। সেটা করা যে কী শক্ত, কীভাবে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হবে, কোথায় যে কী করতে হবে, কোথায় Naturalism acting হবে—কোথায় কাব্য হবে, 'রক্তকরবী'র নন্দিনী'তেও তো তাই।

প্রঃ কিন্তু 'নন্দিনী'র চরিত্র প্রকাশে তো একটা সহজ, সরলতার ছাপ রয়েছে, সেটাকে বোঝা যায়, সুদর্শনার ব্যাপারটা ঠিক···

উঃ ( কথা থামিয়ে ) ঠিক, নন্দিনীকে বোঝা যায়। কিন্তু সুদর্শনাকে বোঝা খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। সেটা একবারেই অন্তরের গভীরের উপলব্ধি। এই যে রাণীর দ্বন্দ্ব এটা কি দেখো গিয়ে সেটা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানেন কিনা, কে জানে? তিনি 'শাপমোচন' 'অরূপরতন' লিখেছিলেন তারপর অনেক পরিশীলিত করে অন্য দৃষ্টি ভঙ্গিতে সুদর্শনার চরিত্র তৈরি করলেন। রাজা'র সুদর্শনা কিন্তু 'কমলিকা' নয়। কমলিকাকে বোঝা কিছুটা সহজ কিন্তু রাজার সুদর্শনাকে বোঝা শক্ত। কমলিকার দ্বন্দ্ব বোঝা যায়। সুদর্শনা করতে যেয়ে আমার যে কী অবস্থা সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

'রক্তকরবী' যেদিন আমি শেষদিন করি সেদিনও আমার মনে হয়েছিল, আরও কিছু করা যেত। আমি যেন ভাল করে করতে পারিনি, এটা মনে হয়েছিল। শুনলে হয়ত লোকে বলবে এটা আবার বেশি, বেশি। কিন্তু এটা আমি সত্যি কথাই বলছি। আমি বলছি তোমাকে করতে গিয়ে যে একটা আবেগ আমি অনুভব করেছিলাম। এবং প্রথম যেদিন পড়ি তখন আমার করবার কথা ছিল না। কিন্তু পরে যখন করতে হয় তখন দেখেছি যে আমি বোধহয় ঠিক পারলাম না, আমারটা বোধহয় ঠিক হল না। কী করলে ঠিক হয়, কেমনভাবে করলে ঠিক হয়—এটা সব সময়ই আমার মনে হত। অনেকে বলেওছে

যে নন্দিনীকে পাওয়া যান নি, ঠিক হয়নি এরকম। শেষ যেদিন নন্দিনী হল সেদিন আমি জানিনা যে, আজকেই শেষ অভিনয়। পরে জানলাম উনি ( শম্ভুবাবু ) আর এটা করবেন না।

প্রঃ আপনার দীর্ঘকালীন অভিনয়-জীবনে কোন চরিত্রটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে ?

উঃ অনেক চরিত্র করতেই ভাল লেগেছে। তবে, সুদর্শনা করতে গিয়ে সেই ভাল আরও বেশি অনুভব করেছি। বোধহয়, সেটা দুর্বোধ্য বলেই।

## তৃপ্তি মিত্র অভিনীত নাটক

### ১৯৪৩ সালে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ

(১) আগুন। নির্দেশনা—বিজন ভট্টাচার্য
(২) ল্যাবোরেটরী নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র
(৩) জবানবন্দী। নির্দেশনা—বিজন ভট্টাচার্য।

### গণনাট্য-সংঘ ১৯৪৪

(১) নবান্ন—বিনোদিনী—নির্দেশনা শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য।
(২) মুক্তধারা—

### বহুরূপী ১৯৪৮—৭৯

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) | নবান্ন | রাধিকা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (২) | পথিক | সুমিত্রা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৩) | উলুখাগড়া | করুণা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৪) | ছেঁড়াতার | ফুলজান | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৫) | বিভাব | তৃপ্তি মিত্র | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৬) | চার অধ্যায় | এলা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৭) | দশচক্র | হৈম | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৮) | স্বপ্ন | | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (৯) | ধর্মঘট | মায়া | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১০) | রক্তকরবী | নন্দিনী | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১১) | সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে | অনিমা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১২) | স্বর্গীয় প্রহসন | অশ্লেষা | নির্দেশনা | অমর গাঙ্গুলী |
| (১৩) | অংশীদার | সবিতা | নির্দেশনা | অমর গাঙ্গুলী |
| (১৪) | চৌর্যানন্দ | | নির্দেশনা | কুমার রায় |
| (১৫) | পুতুল খেলা | বুলু | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১৬) | মুক্তধারা | স্ত্রীলোক | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১৭) | কাঞ্চনরঙ্গ | তরলা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১৮) | বিসর্জন | গুণবতী | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (১৯) | রাজা অয়দিপাউস | য়োকাস্তে | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (২০) | রাজা | সুদর্শনা | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (২১) | বাকি ইতিহাস | বাসন্তী | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (২২) | অপরাজিতা | অপরাজিতা | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (২৩) | চোপ, আদালত চলছে | বেনারে বাঈ | নির্দেশনা | শম্ভু মিত্র |
| (২৪) | দুরাশা | | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (২৫) | সুতরাং | সুব্রতা | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (২৬) | বলি | | নির্দেশনা | অরিজিৎ গুহ |

( তত্ত্বাবধান—তৃপ্তি মিত্র )

### চেনামুখ ১৯৭৯

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) | অপরাজিতা | অপরাজিতা | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |

### আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয় ১৯৮২ শেষদিন পর্যন্ত

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (১) | অপরাজিতা | অপরাজিতা | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (২) | দুরাশা | | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৩) | সরীসৃপ | | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |

### তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটক—বহুরূপী

| | | | |
|---|---|---|---|
| (১) | সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে | নির্দেশনা প্রথমে | শম্ভু মিত্র |
| | | নবপর্যায়ে | তৃপ্তি মিত্র |
| (২) | ডাকঘর | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (৩) | কিংবদন্তী | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৪) | অপরাজিতা | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৫) | টেরোড্যাকটিল | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৬) | গণ্ডার | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৭) | ঘরে বাইরে | নাট্যরূপ ও নির্দেশনা | |
| (৮) | সুতরাং | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (৯) | বাঘ | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (১০) | যদি আর একবার | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (১১) | পাখি | নির্দেশনা | তৃপ্তি মিত্র |
| (১২) | বলি | নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান | |

## তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত অন্যান্য নাটক

বিশ্বভারতীতে ৮০-৮১ সালে 'ডাকঘর' পরিচালনা।
রঙ্গকর্মীদের জন্যে 'গুড়িয়াঘর' পরিচালনা।
'প্রহরশেষে'-র হিন্দী সাঁঝঢলে, অনামিকা নাট্যগোষ্ঠী, পরিচালনা।

## আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ে তৃপ্তি মিত্র নির্দেশিত নাটক

'রক্তকরবী', 'সরীসৃপ'।

## তৃপ্তি মিত্র লিখিত নাটক ও নাট্যরূপ

| | | |
|---|---|---|
| নাট্যরূপ | রবীন্দ্রনাথের | 'দুরাশা' |
| নাট্যরূপ | রবীন্দ্রনাথের | 'ঘরে বাইরে' |

স্টেইনবেক থেকে অনুপ্রাণিত নাটক 'সুতরাং'

| | | |
|---|---|---|
| 'বলি' (একাঙ্ক) | নাটক | তৃপ্তি মিত্র |
| 'প্রহরশেষে' | নাটক | তৃপ্তি মিত্র |

## চলচ্চিত্রে অভিনয়

(১) 'ধরতি কে লাল', 'গোপীনাথ', 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' (হিন্দী)
(২) 'পথিক', 'কাঞ্চনরঙ্গ', 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' এবং অন্যান্য (বাংলা)
(৩) তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের চলচ্চিত্র—'জাগো হুয়া সবেরা'
পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান আর ইউ. কে-র যুগ্ম প্রয়োজনা—'পদ্মানদীর মাঝি'।

## পেশাদারি রঙ্গমঞ্চে

(১) সেতু
(২) হাসি
(৩) বিরাজবৌ
(৪) থানা থেকে আসছি

## পুরস্কার প্রাপ্তি

১৯৫২ সঙ্গীত-নাটক আকাদেমি পুরস্কার
১৯৭১ পদ্মশ্রী
১৯৮৯ কালিদাস পুরস্কার ( মধ্যপ্রদেশ )
এছাড়া ১৯৭৫-৮০ আকাশবাণীর প্রোডিউসার, এমেরিটাস
১৯৮০-৮১ শান্তিনিকেতনের ভিজিটিং ফেলো।

## ভ্রমণ

ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা।

| ছদ্মনাম | লিখিত গল্পগ্রন্থ |
|---|---|
| শিবতোষ ভাদুড়ি | 'এই পৃথিবী রঙ্গালয়' |

# এলিঅটের অবয়ব : দ্য পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রোম্যান্টিসিজমের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে তাকে চিরে চিরে দেখতেই হবে।[১] এ উক্তি যাঁর সেই টি. এস. এলিঅট নিজে কীভাবে তা করেছিলেন? তিনি যে শুধু কবিতার শরীর থেকে ধোপদুরস্ত, নিপাট বহিরঙ্গটুকুই সরিয়ে দিলেন এমন নয়। কবিতার রূপকল্পকে কখনো তিনি ক্লোরোফরমে আচ্ছন্ন করে হাজির করলেন হাসপাতালের টেবিলে। কখনো আবার পিনে-গাঁথা মোচড় খাওয়া অবস্থায় আটকে রাখলেন বৈঠকখানার দেয়ালে। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে করলেন কাটছাঁট, ভেঙেচুরে ঝরিয়ে দিলেন ভাবালুতার মেদ। আর লঘুগুরুর সহজবোধ্য ব্যবধান ঘোচাতে গিয়ে যে আড়ষ্ট এবং আঁকাবাঁকা পথটি বেছে নিলেন, তাই-ই বন্দিত হল তাঁর বিশ্ববিশ্রুত কাব্যকৌশল হিশেবে। তিনি নিজে থেকে গেলেন আড়ালে আর পাঠকও যাতে এবার থেকে কবিতা পাঠ করে টানটান হয়ে ওঠে তারই ব্যবস্থা করলেন পাকাপাকি।

কবিতায় এই নতুন বাগ্‌ভঙ্গি এবং বিভঙ্গ অন্বেষণের প্রথমতম পাঠ তিনি ত লাফর্গের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিতার আলোচনায় আমাদের কিছুটা অলস এবং কিছুটা তরল আড্ডামনস্কতা কোনোদিনই জানতে চাইল না কেমন করে একটা নতুন মেজাজ এলিঅটকে তাঁর কাব্যকৃতির প্রাথমিক পর্বেই ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলেছিল। ১৯২৯-৩২-এ সুধীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো পরে বিষ্ণু দে, সমর সেন যেটুকু এলিঅট-চর্চা করেছিলেন আজ তা পর্যবসিত কফিহাউস অথবা সম্পাদকের টেবিলে একধরনের গা-না-লাগানো বৈঠকে। বুঝি আর নাই বুঝি, এলিঅটের কথা উঠলেই আমরা আজ অবলীলায় 'আইডিয়া' এবং 'রিয়্যালটি'-র মাঝখানে ছায়াপাতের প্রসঙ্গ টানি, বলে উঠি আ হিপ অভ্ ব্রোকেন ইমেজেস-এর কথা অথবা প্রতিধ্বনি করি "আই গ্রো ওল্ড···আই গ্রো ওল্ড" এই প্রুফ্রকীয় স্বগতোক্তির। কিন্তু আমরা কিছুতেই নিরত থাকতে চাই না কেমন করে এবং কতদিন ধরে তিনি ইংরিজি কবিতায় রুচিবদলের পাথর ভাঙার কাজ শুরু করেছিলেন সেই তথ্যটুকু জেনে নিতে। তাঁর প্রথম পর্বের 'সুইনি'-এর মত কবিতায় লাফর্গকে সরাসরি অনুকরণ করতে গিয়েও নিজেকে খুঁজে পাওয়া

আর সেখান থেকেই এক অবিরাম পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে 'দ্য লাভ সঙ্গ অভ্ জে. অ্যালফ্রিড প্রুফ্রক'-এ তাঁর নান্দনিক উত্তরণ যথাযথ জানার পরিবর্তে আমরা যা করেছি তা আর যাই হোক তাঁর কবিতার সমালোচনা নয়।

'স্প্লিন' যখন লেখা হল এলিঅট একুশে পা দেওয়া সদ্য তরুণ।[২] কবিতাটিকে পুরোপুরি লাফর্গের অনুকরণ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। তবুও উল্লেখযোগ্য এই কারণেই যে এ পর্যন্ত 'স্প্লিন'-ই এলিঅটের লেখা সব থেকে মৌলিক রচনা।[৩]

কবিতাটির ভাবনামূলে এমন একটি আত্মবোধ কাজ করছে যা বাইরের জগতের সঙ্গে অস্বভাবী এবং বিচ্ছিন্ন। রবিবারে বুর্জোয়াদের আত্মতুষ্ট ভঙ্গিমা (…this satisfied procession/of definite Sunday faces ;) আর তাদের পোশাকে আশাকের জৌলুশে ( Bonnets, silk hats, and conscious graces ) নিজেদের জাহির করার বহর দেখে এলিঅটের স্বাভাবিক স্থৈর্য টাল খেয়ে গেছে। যেহেতু তিনি এইসব রবিবাসরীয় অসার গতানুগতিকে বীতশ্রদ্ধ, বাধ্য হয়েই চৌহদ্দির বাইরে নিজেকে এক অস্বস্তিকর অবস্থানে সরিয়েও এনেছেন। অন্তরীণ হয়ে পড়া আত্মবোধের এই ভাব কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবকে স্পষ্টতই প্রাঞ্জল হলেও নিশ্চিতভাবেই তা লাফর্গের Les Derniers Vers-এর চতুর্থ স্তবকটিকে মনে করায়। লাফার্গ সেখানে নিজে Grand Chancelier de L' Analyse-এর ভূমিকায়।

কবিতাটির তৃতীয় স্তবক, যা শেষ স্তবকও, কবিতাটিকে রীতিমত ভারি করে তুলেছে ; আগে থেকে প্রস্তুতি না থাকায় এই ভার কবিতাটির আপাত-হাল্কা আঙ্গিকে খাপ খায় নি। এলিঅট অবশ্যই, লাফার্গের ধরনে কবিতায় তন্নিষ্ঠ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে মেজাজ তখনও গড়ে ওঠে নি।

তৃতীয় স্তবকে এলিঅট জীবনের যে রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তা অবসন্ন, খুঁতখুঁতে, নিরুত্তাপ ; তবুও পোশাকে যথাযথ, টুপি এবং দস্তানা হাতে অনন্তের দোড়গোড়ায় দণ্ডায়মান ( And Life, a little bold and gray, / Languid, fastidious, and bland, / waits, hat and gloves in hand, / punctilious of tie and suit…On the doorstep of the Absolute )। আবার একই সঙ্গে 'punctilious of tie and suit'—এর মত রূপকালঙ্কারের ব্যবহারে 'জীবন' এবং 'অনন্ত'-র মত গুরুগম্ভীর চালের শব্দদুটির গুরুত্ব ও অনেকটাই ঝরিয়ে দিলেন। শব্দদুটি গুরুত্বপূর্ণ

হলেও এলিঅট তাদের যে ভাবে এবং যা ভেবে ব্যবহার করেছেন তাতে আওয়াজটা একটু ফাঁকা হয়ে যায় না কি ?

জীবন কী ? অনন্তের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই বা কী ? আবার অনন্তের স্বরূপই বা কেমন—এসব প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের খুঁচিয়ে দেয়। কিন্তু এলিঅট জরুরি কিছু প্রশ্ন এড়িয়েও গিয়েছেন। মনে হতে পারে, জীবন এবং অনন্তের মাঝে নিহিত কোনো পার্থক্য আছে যা বুর্জোয়াদের ঠুনকো ভাঁড়ামিভরা জগৎ ধরতে পারছে না। এই পার্থক্যই যেন একটা জমকালো দেউড়ি যা পার হতে পারলেই আর-এক জগৎ, সেখানে আমরা প্রবেশ করলেও করতে পারি। মজার কথা এই যে লাফার্গের কাছে এই জগৎ স্বপ্রত্যক্ষ। তিনি একেই বলেছেন অচেতন বা নির্জ্ঞেয় সত্তা। এখান থেকেই এলিয়ট যাবতীয় এলোপাথাড়ি তাৎক্ষণিকতা পার হতে-হতে স্বকীয়তায় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করা পর্যন্ত লাফর্গকেই অনুসরণ করবেন। অবশ্যই তির্যক দূরত্বে অবস্থান করে।

আর্থার সাইমনস তাঁর 'দ্য সিম্বলিস্ট মুভ্‌মেণ্ট ইন লিট্‌রচার'-এ লাফর্গকে যেভাবে এঁকেছেন 'স্প্লিন'-এর শেষ স্তবকটি ত তারই অবিমিশ্র নির্যাস।[8] এবং বাবুয়ানার ঢং, তিক্তমধুর ভাঁড়ামি—লাফর্গের এইসব গুণের কোনো রেশ না থাকলেও কবিতাটিকে শুধু অনুকরণের দোহাই দিয়ে খারিজ করাও চলে না। তরতাজা বাগ্‌ভঙ্গিমা, ছন্দের আয়ামৃবিক লাবণ্য ও তালফেরতা সর্বোপরি বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকতার অভিঘাত এমনই যে আমরা কবিতাটির ধমনি ছুঁতেও পারি। দ্বিতীয় স্তবকটি ত 'প্রেলিউডস', 'র‍্যাপসডি অন আ উইণ্ডি নাইট' এবং 'প্রুফ্রক'-এর নীরক্ত, অসংলগ্ন ও খিটখিটে জগৎটির দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে রাখে। সব মিলিয়ে কবিতাটিকে এক অস্বভাবী সত্তারই অভিক্ষেপ ঘটেছে ; এবং এলিঅট এভাবেই বিযুক্তির হাহাকার ব্যক্ত করে গেছেন যতক্ষণ না পৌঁছতে পারছেন সেই প্রশান্তির স্থৈর্যেঃ We have lingered in the chambers of the sea / By sea-girts wreathed with seaweed red and brown / Till human voices wake us, and we drown.

গতানুগতিকের বেড়াজাল ভেঙে বেরিয়ে আসার পথটুকুই শুধু লাফর্গ এলিঅটকে দেখান নি। মাধ্যাকর্ষণ যেমন যে কোনো বস্তুকে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিগ করে লাফর্গও তেমনি এলিয়টকে টেনে রেখেছিলেন তাঁর কেন্দ্রেই।

সুতরাং ইংরিজি কবিতায় রুচি এবং ঋতুর বদল ঘটাতে গিয়ে এলিঅটকে সেই আকর্ষণ ছিন্ন করতেই হয়। তাঁকে তৈরি করে নিতে হয় নিজস্ব জগৎটি।

একাজ তিনি কীভাবে নিষ্পন্ন করেছেন, বরং বলা যেতে পারে কী করে জন্ম হয়েছে সর্বার্থে সর্বপ্রথম আধুনিক ইংরেজ কবির, আমরা তা জানতে পারব যদি তাঁর লেখা 'পোর্ট্রেট অভ্‌ আ লেডি' কবিতাটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

কবিতাটির আরম্ভ ধোঁয়াশামলিন এক ডিসেম্বরের বিকেলে একটি প্রায়ান্ধকার ঘরে। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। ছাদে তা বৃত্তাকারে প্রতিফলিত। সব মিলিয়ে পরিবেশটি যেন জুলিয়েটের সমাধির।[৬] কবি (কবিতাটি আদ্যন্ত উত্তম পুরুষে বর্ণিত, কখনো-বা বহুবচনের প্রসঙ্গে) এসবের মুখোমুখি নাটকীয় স্বগতোক্তি করছেন ; you have the scene arrange itself—as it will seem to do—। কিন্তু যে কারণে এই পরিবেশ রচনা সেখানে সবকিছু বলা হতেও পারে অথবা থেকে যেতে পারে অনুক্ত (all the things to be said, or left unsaid)। এবং যা কিছু ঘটছে আমাদের চোখের সামনে তাতে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। উদ্ধৃত পংক্তিটিতে 'তুমি' সর্বনামটি কাকে বোঝাচ্ছে সেটাও স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের সমস্যা বাড়ে যখন আমরা উদ্ধৃত বক্তব্যটির দুটি অংশের পারস্পরিক বৈপরীত্যে একটু ধাক্কা খাই। যে ভাবেই দেখতে চাই না কেন, কবি কোনো কিছুতেই নিজেকে জড়াচ্ছেন না। তিনি ত বলেছেনই "you have the scene arrange itself—as it will seem to do—"। শেষের অংশটি মারাত্মক। যদি বলতেন "you have the scene arrange itself—as it will do" কোনো সংশয় থাকত না। কিন্তু "it will seem" বলায় অনিশ্চয়তা থেকেই যাচ্ছে। আমরা জ্ঞাত হতে থাকি যে এলিঅট ফরাসি কবিতার আতপ্ত আবেগ থেকে সরে যাচ্ছেন আর এগিয়ে চলেছেন আপাত নিরীহ অথচ গূঢ় বাগ্‌ভঙ্গিমার দিকে।

প্রথম দিককার কবিতায় তিনি ছিলেন স্ব-স্থানচ্যুত এবং নির্লিপ্ত। ফলে কী সামাজিক কী ব্যক্তিকভাবে সক্রিয় না হতে পারায় মানবতা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল একইসঙ্গে আদর্শবাদী অথচ নেতিবাচক। অন্যকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে নিজেকেও এমন তুচ্ছ করেছিলেন যে নিজের কাছেই প্রত্যক্ষ হওয়া জীবনের গূঢ় দিকটিও হাল্কা হয়ে গিয়েছিল।[৭] আর এখন এক এবং আরেকের মাঝে খেলাচ্ছলে সেইসব দুষ্টুমিভরা ব্যঙ্গকৌতুকের ঝোঁক কমে

আসছে। কিন্তু পাঠককেও ত কবি যা বলবেন সে সম্পর্কে স্থির-প্রত্যয় হতে হবে। তাই এলিঅট একটি পরোক্ষ উক্তিও যোগ করেন। সব মিলিয়ে কবিতাটির আরম্ভ হয়; Among the smoke and fog of a December afternoon / you have the scene arrange itself—as it will seem to do— / with 'I have saved this afternoon for you'। এখানে উত্তম পুরুষের সর্বনামটি কি কবি যাকে সম্বোধন করছেন সেই 'তুমি'রই সমার্থক নয়? আর তার পরেই যাতে কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ না থাকে, এলিঅট সুকৌশলে, সময়, স্থান এবং যাবতীয় খুঁটিনাটির বিশদ বর্ণনা করেন মোমবাতি, আলোর বৃত্ত, আলো আঁধারি পরিবেশ এবং বলা-না-বলার ইঙ্গিতের ভেতর দিয়ে।

বেশ কিছু লক্ষণ, যেমন স্বগতোক্তি, পরোক্ষ উক্তি, নাটকীয় সূচনা থাকলেও 'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি'-কে পুরোপুরি ড্রামাটিক মনলোগ বলা যাবে না। মনলোগের বক্তাকে আমরা ত পাই কেবলমাত্র পরোক্ষ উক্তিতে। আবার যিনি প্রতিবেদন করছেন তিনিই যদি মনলোগের বক্তা হন তবে সেই কণ্ঠস্বর ত কবিরই, যদিও তাঁর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি প্রতিফলিত নয়। কবি এমন কিছু করছেন না, বলছেন না, যাতে আমরা তাঁর কোনো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির আঁচ পেতে পারি।

কবিতাটিকে চূড়ান্ত ভাবে তির্যক মনে হয় পরোক্ষ উক্তির (পংক্তি ১০-১৩, ১৯-২৮)[৮] বক্তাকে আমরা ঠিক যে মুহূর্তে শনাক্ত করি তখনই সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠা আর একটি গলার আওয়াজে (পংক্তি ২৯—৩৫)[৯]। এই গলা কিন্তু ড্রামাটিক মনলোগের প্রধান বক্তার নয়, যিনি দ্বিতীয় চরিত্রের বক্তব্যকেও পাঠকের কাছে তুলে ধরেন কখনো পরোক্ষ উক্তিতে, কখনো নিজের কথায়। এখানে বক্তা সরাসরি পাঠকের কাছেই নিজের কথা বলতে থাকেন। ফলে এতক্ষণ ধরে যে ড্রামাটিক মনলোগ চলছিল তা ভেঙে যায়। বেজে ওঠে গীতিকবিতার সুর; Among the windings of the violins / And the ariettes / Of cracked cornets / Inside my brain a dull tom-tom begins / Absurdly hammering a prelude of its own, / Capricious monotone / That is at least one definite 'false note'।

উদ্ধৃত অংশটিতে যে রূপকালঙ্কারের ব্যবহার করেছেন এলিঅট, তার আক্ষরিক প্রকাশ ত কবিতার ভাষার সঙ্গীতময়তার ভেতর দিয়েই ঘটেছে।

এখানে এলিঅটের ভাষা এতই নমনীয় যে আমরা প্রায় ঠকেই যাই। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হয় 'Capricious monotone' শব্দ দুটির সম্পর্কে। কারণ, এই শব্দ দুটির সংশ্লেষের ভিত্তিতেই রূপকালঙ্কারটি গড়ে উঠেছে।

যে সংগীতের পরিবেশে নাটকটি ঘটেছে তার ভেতরেই বেজেছে বেসুর। টমটমের ভারি আওয়াজে মগজ হয়ে উঠেছে ঠাসা। আবার সবকিছুই চেতন মনকে ছাড়িয়ে কল্পনাবিলাস হলেও যেহেতু অনড় একঘেয়েমিতে ভরা, সেহেতু তা সৃজনশীলতার পরিপন্থী, যে-সৃজনশীলতা অচেতন মনেরই স্বয়ম্প্রকাশ।

এখানে মন তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলেছে। নিজেরই সৃষ্টির ফাঁদে পা দিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে অচেতনে। কিছুতেই নিজেকে ব্যক্ত করতে পারছে না।

কবিতাটিকে আমরা কীভাবে নেব তা নির্ভর করছে লাফর্গের কাছ থেকে শেখা রূপকের গূঢ়ার্থের ভেতর দিয়েই এলিঅট এতাবৎ ইংরিজি কবিতায় প্রচলিত রীতিপদ্ধতিকে যেভাবে ঢেলে সাজাচ্ছেন তার ওপরে।

কবিতাটির প্রথমপর্বে এলিঅট যে পরস্পরবিরোধী আবহ গড়ে তুলেছেন তার থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। প্রথম পর্বটি শেষ হয়েছে এইভাবে ;—Let us take the air, in a tobacco trance, / Admire the monuments, / Discuss the late events, / Correct our watches by the public clocks, / Then sit for half an hour and drink our bocks. 'Let us' শব্দ দুটির ভেতরে কবি যে সঙ্গলাভের জন্যে ব্যাকুল তা স্পষ্ট। অথচ মানবিক সম্পর্কের গতানুগতিকতা থেকে আত্মপ্রসারের জন্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ করে তুলে আবার সেই সম্পর্কেই ফিরে যেতে চাওয়া মর্মান্তিকই। কবিতাটির গভীরে ঢুকলে এমনও মনে হতে পারে যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো প্রধান চরিত্রটির সংলাপ প্রায় প্রলাপের পর্যায়ে পৌঁছেচে। অবশ্য শেষপর্যন্ত ভারসাম্যও থাকছে এই একান্ত আত্মনিষ্ঠ অবস্থা থেকে বিপ্রতীপে ফিরে যাওয়ায়। যেখানে মার্জিত বুর্জোয়া দৈনন্দিনে মিশে গিয়ে কবি ফিরে পাবেন তাঁর মানসিক স্থিতি।

'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি'-র ঘটনাক্রম উন্মোচিত হয়েছে এক ঋতু থেকে এক ঋতুর পরিক্রমায়। প্রথমপর্বের প্রথম পংক্তিতেই ডিসেম্বরের বিকেলে ধোঁয়াশার ভেতরে নাটকীয় সূচনা, দ্বিতীয়পর্বের দ্বিতীয় স্তবকে এপ্রিলের কবোষ্ণ সূর্যাস্তে অতীতচারনা এবং নিঃসঙ্গতাবোধ আর চূড়ান্তপর্বের অক্টোবরের

রাত্রির অস্বস্তিকর নক্ত পরিবেশের পুনরাবর্তনের ভেতর দিয়েই কবিতাটি শেষ হচ্ছে। তবুও কবিতাটির নির্মাণে ইচ্ছাকৃত অপ্রতিসাম্য চোখে পড়বে। পরিণতির ঋতুটি (এপ্রিল থেকে অগাস্ট) কবিতাটির মাঝখানে। আর তাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে মৃত্যু আর ক্ষয়ের ঋতু—ডিসেম্বর আর অক্টোবর। তাহলে এলিঅট কি প্রতীকীবাদী ঔপন্যাসিক যেমন করেন, কবিতাটির নামের ভেতর দিয়েই আমাদের মনোযোগকে টেনে রাখছেন একের পর এক অভিজ্ঞতার বিন্যাসে? তারপর, আবার সেই মনোনিবেশ, সেই প্রত্যয় সুকৌশলে কাব্যিক সুসংগতিতে সরিয়ে দিচ্ছেন? মনে হয় তাই-ই করছেন তিনি। এই কাব্যিক সংগতি অথবা গীতিময়তাই কবিতাটির রূপকে প্রাণসঞ্চার করেছে। শুধু আধেয়র ক্ষেত্রেই নয়, আধারের ক্ষেত্রেও গীতি-বৈশিষ্ট্যই কবিতাটির বিচারে চূড়ান্ত মানদণ্ড। গীতিঐতিহ্যের ভেতরে থেকেই ত কবিতাটি পরিণত হচ্ছে এক মুহূর্ত থেকে আর এক মুহূর্তের রূপান্তরে। স্মর্তব্য, এই গীতিময় রূপান্তরের পেছনে কাজ করছে লাফর্গের প্রভাব। যদিও এলিঅটের স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্টরেখ।

লাফর্গের রচনায় পিয়ানো প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত। তিনি মূর্ছনার ভেতরেই দুর্লভকে অনুভব করেন। ক্ষণকালের জন্যে হলেও জীবনের শূন্যতা সুরে ভরে যায়। পিয়ানো তাই তাঁর কবিতায় কোনো অচেতন পদার্থ নয়। আবেগপ্রবণতার কেন্দ্রে তার স্থান। এলিঅটের কবিতাটিতে সঙ্গীত কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যে তির্যক অবস্থানে, সেখানে বেহালার ক্ষীণ স্বর দূরাগত বাঁশির সুরে মিশে ভাঙাচোরা অনুষঙ্গ আর রূপকল্পের ('cracked cornets', 'dull tom-tom') ভেতর দিয়ে আবহমান দুঃখ প্রেমের অনুভবকেই ব্যক্ত করছে—যেমন করেছিলেন হ্যামলেট।[১০] এলিঅট এইভাবেই গীতিকবিতার প্রচলিত ধারণা আর বাস্তবে তার অসংস্থানকেই আরও বিশদ করে ইংরিজিকবিতার প্রসার ঘটাচ্ছেন।

এই অসংস্থান যেমন কবিতাটির প্রারম্ভেই, তেমনি দ্বিতীয়পর্বের শেষ পরিচ্ছেদের কেন্দ্রেও। কারণ, নায়িকা (কবিতায় যিনি 'she' বলে উল্লিখিত) কবিকে যা বলেছেন "But what have I, but what have I, my friend, / To give you, what can you receive from me? / Only the friendship and the sympathy / Of one about to reach her journey's end"—তার কী প্রতিবিধান করবেন তিনি? এই অসংস্থান আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে বাইরের জগতের অসাড়ত্বের ভেতরে আশ্রয়

খোঁজায় : You will see me any morning in the park / Reading the comics and the sporting page. / Particulary I remark/ An English countess goes upon the stage. / A Greek was murdered at polish dance, / Another bank defaulter has confessed। আর এই সবকিছুর ভেতরে থেকে কবি মানবিক দায়বদ্ধতায় তাঁর তির্যক অনীহা বজায় রাখতে পারছেন। অবশ্য তাঁর সবকিছু থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের মধ্যে ডুবে থাকার ভাবটা কেটে যাচ্ছে যখন যান্ত্রিক এবং ব্যবহারজীর্ণ মামুলি কোনো সংগীত পুনরাবৃত্ত হচ্ছে···When a street-piano, mechanical and tired / Reiterates some worn-out common song. লাফর্গের প্রভাব থাকলেও পার্থক্য এই যে, লাফর্গের কবিতার সংগীতের অপাপবিদ্ধতা এলিঅটে নেই। এলিঅটের কবিতায় যা আছে তা ক্লান্তিকর, শুধু মামুলিই নয়, বস্তাপচাও। এর ভেতরে না আছে কোনো অসামান্যতা, না কোনো দুর্লভ বা নির্জ্ঞেয় সত্তার অনুভূতি। এ সংগীত কেবল বিশ্বজোড়া মানবিক পরাভবের কথাই বলে—যে বিশ্বে A Greek was murdered at a polish dance. জেগে ওঠে ভাঙাচোরা সম্পর্কগুলোই। শ্রুত সংগীতও সমাপতনিক হয়ে ওঠে With the smell of hyacinths across the garden.

এই পরিচ্ছেদটি আবার আমাদের মনে করিয়ে দেয় কবিতাটির প্রারম্ভিক নাটকীয়তা, যেখানে লিরিকের সূত্রপাত হয় এইভাবে : So intimate, this Chopin, that I think this soul / Should be resurrected only among friends / Some two or three, who will not touch the bloom / That is rubbed and questioned in the concert room. তেমনি একইসঙ্গে আমাদের চালিত করে কবিতাটির উপসংহারে : This music is successful with a 'dying fall' / Now that we talk of dying -'dying fall', বাক্যাংশটি 'Twelfth Night'-এর প্রারম্ভেই Orsino-র সংলাপ থেকে ধার করা। আবার এলিঅট তাঁর কবিতাটিতে আগাগোড়া এক মুহূর্ত থেকে আর এক মুহূর্তের গীতিময় রূপান্তরের ভেতর দিয়েই যে কোমল স্বরগ্রাম গড়ে তুলেছেন তা ত Orsino যা বলেছেন তারই অনুস্মৃতি : If music be the food of love, play on, / Give me excess of it, that, surfeiting, / The appetite may sicken and so die. / That strain again! It had a dying fall; / O, it

came o'er my ear like the sweet sound / That breathes upon a bank of violets, / stealing and giving odour !'[১১]

শেক্‌স্‌পীয়রীয় এই সংলাপটিতে ফুলের সঙ্গে সংগীতের যে একরূপতা, নায়িকার প্রারম্ভিক উক্তিতে তার পরোক্ষ আভাসও মেলে। হায়াসিন্‌থের গন্ধসহ ব্যবহারজীর্ণ মামুলি সংগীতের পুনরাবৃত্তির চিত্রকল্পের ভেতর দিয়েই তার প্যারডি করেছেন কবি: I remain self-possessed / Except when a street-piano, mechanical and tired / Reiterates some worm-out common song / with the smell of hyacinths across the garden / Recalling things that other people have desired. লক্ষণীয় রোম্যান্টিক কবিতায় হায়াসিন্‌থের যা গুরুত্ব তা এখানে কিন্তু হ্রাস পেয়েছে। কারণ, বাগানের ওপর দিয়ে ভেসে আসা হায়াসিন্‌থের সুগন্ধ ব্যবহারজীর্ণ, মামুলি গানের সঙ্গে শুধু সমাপতনিকই নয়, গতানুগতিক চাওয়া-পাওয়ার ভেতরে কবিতায় তার স্বাভাবিক যোগও হারিয়ে গিয়েছে।

'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি'-র নায়িকা, এলিঅট তাঁকে যেভাবে এঁকেছেন, কম্প্রকণ্ঠ এবং আত্মগত এক রমণী। তিনি 'about to reach her journey's end'. তাঁর নিঃসঙ্গতাবোধ এমনই যে তিনি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন আর একজনকে। আর এক সত্তাকে গ্রাস করে নিতে চাইছেন নিজের ভেতরেই। এককভাবে পেতে চাইছেন তার সবটুকুই। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা যত জোরালো হয়ে উঠছে, নায়কের (কবিতায় যিনি উত্তমপুরুষে নিজের এবং পরোক্ষ উক্তিতে নায়িকার কথার প্রতিবেদন করছেন) নির্লিপ্তিও যেন ততই বেড়ে উঠছে। তিনি কোনো প্রতিশ্রুতির দায়ে নিজেকে জড়াবেন না। একজনের এই আঁকড়ে ধরতে চাওয়া আর অন্যজনের নিজেকে সবকিছু থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তির্যক হয়ে ওঠায় যে নাটকীয়তা তা পরিস্ফুট হচ্ছে কবিতাটির ভেতরে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ স্বগতোক্তিতেই।

নায়িকা প্রকাশ্যে বলছেন, "You do not know how much they mean to me, my friends··· How much it means that I say this to you— / Without these friendship—life, what cauchemar !" নায়ক নিবিষ্ট হয়ে শোনা ছাড়া নায়িকার এই আর্তিতে কোনো সহানুভূতিই দেখাচ্ছেন না। একটি কথা বেরোচ্ছে না তাঁর মুখ থেকে। উপরন্তু 'Capricious monotone' এবং 'false note'-এর

দোহাই দিয়ে বলছেন, "Let us take the air, in a tobacco trance…"। আবার নায়িকা যখন লাইলাক ডাঁটা মৃদু মোচড়াতে-মোচড়াতে বলছেন, "What life is, you who hold it in your hands…you let it flow from you, you let it flow" নায়ক একান্তেই স্বীকার করছেন, "I smile, of course, / And go on drinking tea." এবং শেষপর্বে নায়িকার "And so you are / going abroad ; and when do you return ?"—এর উত্তরে "My smile falls heavily among the bric-a-brac", "I have been wondering frequently of late… Why we have not developed into friends"—এর উত্তরে "I feel like one who smiles, and turning shall remark / Suddenly, his expression in a glass." ও চূড়ান্ত পংক্তির And should I have the right to smile ?—এও শুধু তিনি দ্বিধান্বিতই নন, অনান্তরিকও। তার চেয়েও বড় কথা, 'I smile'-এর পরিবর্তে যখন "I feel like one who smiles" বলেন, নিজের ভেতরেই আর-এক সত্তাকে অনুভব করেন যেন। কবিতায় যিনি উপস্থিত, যাঁর ভূমিকা প্রকাশ্য, সেই সত্তা সরে যাচ্ছে। সরে গিয়ে অচেতনকেই জায়গা দিচ্ছে : And I must borrow every changing shape / To find expression…dance, dance / Like a dancing bear, / Cry like a parrot, chatter like an ape.

লাফর্গের কথাই মনে পড়ে যায়। অচেতন যে শেষ সত্য এবং জীবনের মূল উৎস, এলিঅট তা লাফর্গের কাছ থেকে ( পরে আঁরি বার্গসঁ ) [১২] জেনেছিলেন। আর লাফর্গ যেমন করেছেন, গতানুগতিক সব তুচ্ছতাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে, এক মুহূর্ত থেকে আর-এক মুহূর্তের গীতিময় রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তিনিও পৌঁছে গিয়েছেন অচেতনে। ওপরে উদ্ধৃত পরিচ্ছেদটুকু কবিতাটি থেকে আলাদা করে খুলে নিলে যা দাঁড়ায় তা এলিঅট তাঁর কবিতায় অচেতনকে প্রকাশ করবার জন্যে যে লিরিক 'মোড' গড়ে তুলেছেন তারই পরিণতি। লাফর্গের অনুকরণে কবিতায় নায়কের অবিরত নিজেকে পাল্টানো কেবলমাত্র যে সত্তাকে প্রকাশ করে তার কোনো মুখোশ নেই। সামাজিক মানুষই হাসে। ভাল্লুক, তোতাপাখি অথবা বনমানুষ নকল হাসি হাসে না। সমগ্র কবিতাটিকে আমাদের এই তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে হবে। কবিতার নায়ককে আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন সে অন্তত কোনো

কিছুতেই জড়িয়ে পড়ে না। প্রতিশ্রুতির কোনো দায় মেনে-না নেওয়ার দিক থেকে সে সৎ। কিন্তু নায়িকার আত্মদর্শন বলতে কিছু নেই। তবু এরকম ঝটিতি স্থির সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারব না, কারণ আমরা তাহলে কবিতাটির সবটুকু তল নাও পেতে পারি।

নায়িকার উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয় যে তিনি অন্য প্রজন্মের। নায়ক তরতাজা তরুণ, কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে সবকিছুকেই ঘুরিয়ে দেখতে চান। তবু নায়িকা যখন বলেন, "You are invulnerable, you have no Achillers' heel. / You will go on, and when you have prevailed / You can say : at this point many a one has failed./ But what have I, but what have I, my friend, / To give you, what can you receive from me ? / Only the friendship and the sympathy / Of one about to reach her journey's end." এবং তারপরেই যেন একটু বিরতির পর হতাশায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, "I shall sit here, serving tea to friends"—'তুমি' এবং 'আমি' এই ব্যক্তি সর্বনামগুলির সনির্বন্ধে নায়ক শুধু অন্তর্মুখীই হন না তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, এই কণ্ঠস্বরের একটানা আন্তরিক গুঞ্জন তাঁর বেদিতাকে আলোড়িত করতে থাকে। তিনি তাঁর নিজের ভেতরে অস্বভাবী সত্তাটি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন যেন। কিন্তু যে দুস্তর ব্যবধান ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে তার ত আর কোনো চারা নেই। আর তাই নায়ককে বলতেই হয়, "I take my hat : how can I make a cowardly amends / For what she has said to me ?"

এলিঅটের লাফর্গীয় কবিতাগুলির মধ্যে 'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি' সবচেয়ে জটিল। আর সে জটিলতা পারম্পরিক আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য এবং ভাষাকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং কবিতাটির সবটুকু তল পেতে হলে আমাদের আরো গভীরে যেতে হবে। দ্বিতীয়পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নায়িকা যখন বলেন, "yet with these April sunsets, that somehow recall / My buried life..." তিনি কি তার ভেতর দিয়ে আর এক জগতের ইঙ্গিত দেন না, যা আশ্চর্যময়তা এবং তারুণ্যে ভরা ? এবং আমরাও যখন এই ইঙ্গিতটুকু পাই, কবিতার ভাষা এবং নায়িকার আত্মকরুণার বহিরঙ্গটুকু সরিয়ে গভীরে যেতে বাধ্য হই।

'My buried life' বাক্যাংশটি অবশ্যই ম্যাথু আর্নল্ডের 'The Buried Life' কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেয়। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে দুটি কবিতাই গড়ে উঠেছে ব্যক্তিবিশেষের মনের আবিষ্ট অবস্থাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু একথা ভাবা ভুল যে এলিঅট আর্নল্ডকেই তাঁর কবিতায় ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তুলেছেন বা ভিক্টোরীয় রোম্যান্টিসিজমকে চিরে-চিরে দেখার বদলে পা দিয়েছেন তার ফাঁদেই।

আর্নল্ড তাঁর কবিতাটিকে যেমন উঁচু তারে বেঁধেছেন এলিঅট তা করেন নি। বরং একদিকে ভিক্টোরীয় প্রজ্ঞা আর অন্যদিকে এলিঅটের লাফর্গীয় অভিজ্ঞতা আমাদের উপলব্ধি করায় প্রাজন্মিক ব্যবধান কত দুস্তর। আর্নল্ড তাঁর কবিতাটিতে বলেছেন, "After the knowledge of our buried life ; / A thirst to spend our fire and restless force / In tracking out our true, original course ; / A longing ro inquire / Into the mystery of this heart which beats / So wild, so deep in us— to know / whence our lives come and where they go.'[১৩] দৈনন্দিন জীবনযাপনের হাল্কা, তরল স্তর ভেদ করে ফল্গু জীবনের কথা আর্নল্ডের কবিতায়। এলিঅট উল্টোটাই করেন। আমরা যতই জানি—আমাদের জানার ইচ্ছা কমে যেতে থাকে ততই।

এইভাবে, শেষপর্যন্ত প্রাজন্মিক ব্যবধানই বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে 'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি'-র। 'Poetry is at bottom a criticism of life'—আর্নল্ডের এই মতকে একবার এলিঅট নস্যাৎ করলেও[১৪] তিনি তাঁর কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, "···his poetry, the best of it, is too honest to employ any but his geunine feelings of unrest, loneliness and dissatisfaction"।[১৫] পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি-র নায়িকার অস্থিরতা, নিঃসঙ্গতা এবং অসন্তোষের বোধও ত অকৃত্রিম। এদিক থেকে তিনি যে আর্নল্ডের সঙ্গে ঐকাত্ম তাও সঙ্গত বলেই মনে হয়।

অবশ্য 'The Buried Life'-এ আর্নল্ড যে আশ্বাসের কথা বলেন "And what we mean, we say, and what we would, we know."— এলিঅট তাতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না। জীবনের গভীরতা বা আত্মাই আর্নল্ডের অনুধ্যানের বিষয়। তিনি ত ওয়র্ডস্‌ওয়র্থের মতই বলেছেন "whence our lives come and where they go." কিন্তু গভীরতম তলে যে-জীবনের কথা তিনি বলেছেন, আমাদের দৈনন্দিন, অসুখী অভিজ্ঞতায় তার কোনো

ছাপই নেই। বরং তা কাল্পনিক, এমন কী ধর্মীয় মর্যাদাহীনও। আর্নল্ড হয়ত ভেবেছিলেন আমরা সবাই সত্যিই খুব যথাযথ; ভেবেছিলেন আমরা প্রসন্নতায় নম্র এবং দয়াবানও হতে পারি। কিন্তু এলিঅটের কবিতার ক্ষেত্রে এ জিনিশ বিগত প্রজন্মের হেত্বাভাস ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ / আর্নল্ডের সঙ্গে এলিঅটের বিচ্ছেদ অত্যন্ত সুপ্রত্যক্ষ এবং সুগভীরও।

এতদ্‌সত্ত্বেও কবিতাটি ত মোটের ওপর কতকগুলি বিকল্পেরই সমাহার। কারণ, গভীরতম তলে নয়, বরং ওপরের আস্তরে আমাদের ভদ্র আচরণের যে জগৎ সেখানে আমরা ত বাস করি বিভিন্ন পরিবর্ত-কল্পনার ভেতর দিয়েই। আর তাই কবিতাটিও শেষ হয় এক উৎপ্রেক্ষামূলক প্রশ্নের ভেতর দিয়েই; Well! and what if she should die…and leave me sitting pen in hand…Doubtful, for a while / Not knowing what to feel or if I understand / Or whether wire or foolish, tardy or too soon…would she not have the advantage, after all? এখানে যে সন্দেহের কথা বলা হয়েছে তা কোনো কিছুতে নিশ্চিত না হতে পারার ফল।

নায়ক ত প্রথম থেকে মানবিক সম্পর্কের ওপর তির্যক। শুধু অনান্তরিকই নন, হয়ত বা অসূয়াপ্রসূতও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। অবিরত নিজেকে পাল্টাতে-পাল্টাতে তিনি তাঁর অনুভবী সত্তাকে তাঁর সচেতন, ভদ্র, সামাজিক সত্তার থেকে আলাদা করেছেন। প্রকাশ করেছেন অচেতন বা সমস্ত নৈতিকতা, সামাজিক শাসন এবং সদাচরণের অতীত নৈরাজ্যে ভরা ভয়ঙ্কর এক প্রাণ-শক্তিকে; And I must borrow every changing shape / To find expression…। সত্তার এই দ্বিখণ্ডকরণই তাই এমন সন্দেহ জাগায়, প্রশ্ন করে।

নায়ক দ্বিধান্বিত, কারণ, তিনি 'Not knowning what to feel'। কিন্তু কী ভাবব তা কি কারও পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভব? মানুষ ভাবে, ভাবনা আসে তাই-ই। ভাবনা ত ভাবনাই। কী ভাবব আগে থেকে ঠিক করে রাখা ত ভদ্রসমাজে কৃত্রিম আচরণেরই চূড়ান্ত লক্ষণ। তবু এই অবাঞ্ছিত অবস্থা এলিঅটের কবিতায় সঙ্গত। আবার, আমাদের অভিজ্ঞতা বলে দেয় যে আমরা এমন সব প্রক্ষোভের মুখোমুখি হই যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, নিয়ন্ত্রণহীন। তবু আমরা আমাদের দায়দায়িত্ব এড়াতে পারি না। এলিঅটের তরুণ নায়কও পারছেন না। Not

knowing what to feel or if I understand / On whether wise or foolish, tardy or too soon…পংক্তিদুটিতে 'Or' এই অব্যয়ের উপর্যুপরি ব্যবহার ত রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। নায়কের সচেতন, ভদ্র, সামাজিক মন যে ইতিপূর্বে নায়িকার ওপর তার বেদরদী এবং অনিয়ন্ত্রিত মনোভাবকেই সংযত করতে চাইছে এ ত তারই পরোক্ষ ইঙ্গিত।

নায়ককে আমরা যতই অপছন্দ করি না কেন (তিনি নিজেও তা অবহিত) এ পর্যন্ত তিনি আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছেন। নায়িকার অকপটতা, আন্তরিকতায় আমাদের কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মুমূর্ষু কল্পনাবিলাস আর অতীতচারণার ভেতর দিয়ে নিজেকে যেন বড় বেশি কৃপাপ্রার্থী করে তুলেছেন। তাঁর কোনো আত্মদর্শন নেই। তিনি নির্বোধও। নায়ক কান খাড়া করে তাঁর সব কথা শুনেই যাচ্ছেন কিন্তু কোনোকিছুতেই নিজেকে জড়াচ্ছেন না! নায়িকাকে এইভাবে তিনি যে পরিহার করছেন তাতেও আমাদের সায় আছে। কিন্তু তিনিই যখন জানা-না-জানা, বোঝা-না-বোঝায় অস্থিত এবং দ্বিধান্বিত হয়ে বলেন, "would she not have the advantage, after all?"—তিনি কি আগে যা বলেছেন তারই প্যারডি করছেন না? এতক্ষণ ধরে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিভাসিত হয়েছে, কবিতাটির শেষ পরিচ্ছেদে তিনি আর একবার অসংস্থিত করছেন তাকে। পৌঁছতে চাইছেন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে। কে জেতে, আর কে হারে অথবা কাকে ছাপিয়ে প্রাধান্যই বা পায় কে—তর্কটা যেন এইরকম। কিন্তু মৃত্যু কেমন করে সেই সামাজিক জয় বা প্রাধান্য এনে দিতে পারে?

আবার, নায়িকার মৃত্যু ঘটলে ভবিষ্যৎসম্ভাবনা সম্পর্কে যে কল্পনার ভেতর দিয়ে কবিতাটি শেষ হচ্ছে তাও কিন্তু ভদ্র আচরণের আড়ালে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াই। কারণ, নায়ক তাঁর বক্তব্য শেষ করছেন "This music is successful with 'a dying fall' / Now that we talk of dying— / and should I have the right to smile?"—একথা বলে। কবিতাটিও শেষ হয়ে যাচ্ছে। কবিতাটির প্রথম থেকেই যে লিরিকের আবহ তা কিন্তু ভীষণভাবে ব্যাহত হয় নায়কের অচেতন সত্তা যখন কাজ করে, যখন তিনি নিজেকে ভাল্লুক, তোতাপাখি এবং বনমানুষের ভূমিকায় কল্পনা করেন। কবিতার সেই সংকটমুহূর্তে নায়কের শেষতম উক্তির ভেতর দিয়েই গীতিমূর্ছনার পুনরাবির্ভাবও ঘটে।

'dying fall' শব্দ দুটি 'Twelfth Night'-এর নায়ক Orsino-র

প্রারম্ভিক সংলাপটিকেই মনে করায়। কিন্তু এলিঅট শেক্‌স্‌পীয়রের ভাবানুষঙ্গ-কে ব্যবহার করেছেন এমন এক প্রসঙ্গে যা চূড়ান্তভাবেই অমসৃণ। কবিতাটির শিরোনামের ঠিক নিচেই এপিগ্রাফ হিশেবে মার্লোর 'The Jew of Malta' থেকে যে-উদ্ধৃতি : Thou hast committed—Fornication : but that was in another country, And besides, the wench is dead.— তার কথাই ধরা যাক। এলিঅট এটির সঙ্গে Orsino-র অপ্রতিরোধ্য অবাধ ইচ্ছাপূরণের প্রতিস্থাপনা করেছেন। প্রথমটিতে সিদ্ধান্তে আসতে কোনো সমস্যা হয় না কারণ কুমারীটির মৃত্যু হয়েছে। আর শেক্‌স্‌পীয়রের 'dying fall'-এর পূর্বাভাস 'if she should die'-এর ভেতর দিয়েই। নায়িকার বাস্তবে মৃত্যুকল্পনার ভেতর দিয়ে নায়কের যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে তা অশোভন এবং রূঢ় অবহেলার থেকেই উদ্ভূত।

কবিতাটির শেষতম পংক্তিতে নায়ক জানতে চাইছেন তাঁর হাসার অধিকার আছে কি না—'And should I have the right to smile ?' আমরা প্রশ্নটিকে অর্থহীন ভেবে ভ্রূ-কুঞ্চন করতেই পারি। তবু অর্থহীন নয় হয়ত। শোভন এবং শীলিত আচরণমণ্ডিত আমাদের অস্তিত্বের স্তর থেকেই প্রশ্নটি উৎসারিত হয়েছে, আর্নল্ড যা চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু কবে হাসির বিষয় হয়েছে ? এমন প্রশ্ন এলিঅট করবেনই বা কেন ? তিনি ত আর্নল্ডের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ সংশয়াতীত ভাবে প্রকাশ করেছেন। নায়িকা মারা গেলে নায়কের হাসির অধিকার আছে কি না—এমন প্রশ্নে আহত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পংক্তিটির ভেতর দিয়েই এলিঅট আর্নল্ডের প্রজন্মের মূল্যবোধকে চূড়ান্ত তির্যকতায় অসংস্থিত করে দিচ্ছেন।

এলিঅট তরুণ নায়ক-নায়িকার গভীরে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন নিজেকে। কারণ বিগত দিনের ('buried life') ইতিহাস শুধু অপ্রীতিকরই নয়, অনৈতিকও। আর এ জানার পর সামাজিক ভদ্রতার অভিনয় করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কবিতার শেষে এলিঅট যেভাবে নিজেকে নিজেরই প্রশ্নের মুখোমুখি করেছেন তা মনুষ্যত্ব এবং সভ্যতাকেই ব্যঙ্গ করা। আর এই ব্যঙ্গই যেন অচেতনকে সজ্ঞানে প্রকাশ করছে। আর্নল্ডের নিঃসঙ্গতা বোধ আর আত্মিক অসন্তোষের স্বীকৃতিই ত 'পোর্ট্রেট অভ্‌ আ লেডি'-র পরিপ্রেক্ষিত রচনা করেছে। কিন্তু সদাচার আর আন্তরিকতাই যে তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে আর্নল্ডের এই মতকে এলিঅট বর্জন করেছেন। এলিঅটের পরবর্তীকালের কবিতায় এই পরিপ্রেক্ষিত বিশদতর হয়ে উঠবে আর এ কবিতায় নায়িকার

নিঃসঙ্গতাবোধ জে, অ্যালফ্রিড প্রুফ্রকের স্বগতোক্তির ভেতর দিয়ে আরও তীব্রতা পাবে। অবশ্য তার আগে এলিঅটের প্যারিস যাত্রা আর আঁরি বার্গসঁর বাস্তবসত্তা বা অচেতনের প্রাণ-তত্ত্বের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে।

এলিঅটের বন্ধু কনরাড আইকেন তাঁর কাহিনীমূলক আত্মজীবনী 'Ushant'-এ বলেছেন এলিঅট তাঁর হার্ভার্ডের দিনগুলিতে অ্যাডেলেইন (অথবা ম্যাডেলেইন) মোফাট নাম্নী জনৈকা আবেগপ্রবণ, বয়স্কা মহিলার স্যাঁলোতে প্রায়ই চা খেতে যেতেন। আর ভাসা-ভাসা হলেও ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটু জড়িয়েও পড়েছিলেন। এলিঅটের ছাত্রজীবনে লেখা একাধিক কবিতা তাঁদের দুজনের এই সম্পর্ক কলাও করে জানালেও এলিঅট কিন্তু কোনোদিনও তাঁর কবিতায় এই মহিলাকে পুরোপুরি আনেন নি। 'পোর্ট্রেট অভ্ আ লেডি'-তেও অ্যাডেলেইন নিজে নন, সম্ভাব্য প্রেমিকের ওপর তাঁর প্রভাবটাই মুখ্য হয়ে ওঠে।

আইকেন ত খোলাখুলিই অ্যাডেলেইনকে সার্সি (Circe) বলে উল্লেখ করেছেন—'Oh so precious, the oh so exquisite, Madéleine, the Jamesian lady of ladies, the enchantress of the Beacon Hill drawingroom—who, like another Circe, had made strange shapes of wild Michael and the Tsetse (T. S. Eliot).' কিন্তু তাঁর ছলাকলায় ভুলে অন্যেরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে যা পেতে চাইত এলিঅট স্বভাবতই সঙ্কুচিত থাকতেন সেইসব থেকে। এলিঅট অস্বস্তি বোধ করতেন এবং কিছুটা অসুখীও, যখন যৌনতা নিয়ে তাঁর এই বাধবিচার ক্রমাগত ঠাট্টা ইয়ার্কির বিষয় হয়ে উঠত। ম্যাডেলেইন কি চাইতেন এলিঅটও অন্যেরা যেমন আসক্ত হয়, হয়ে উঠুন? কবিতাটি খুঁটিয়ে পড়লেই আমরা ত দেখতে পাব নায়িকার আবেগপ্রবণ কথাবার্তা, ছলচাতুরি, অবসাদ, রুচি, সর্বোপরি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নায়কের নিদারুণ অবজ্ঞাই আছে। তিনি যেন আত্মরক্ষার জন্যে তির্যক থেকে তির্যকতর হয়ে ক্রমশ নিরাপদ দূরত্বে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন।

ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিষয়টি কবিতাটিকে এলিঅটের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে। এই তাঁর প্রথমতম কবিতা যেখানে তিনি লাফর্গের অনুকরণ করছেন না। বরং লাফর্গের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে এলিঅট যাতে এলিঅট হয়ে উঠতে পারেন তার মালমশলা

যোগাড় করছেন লাফর্গেরই কাছ থেকে। আর তারই সাহায্যে ক্ষয়িষ্ণু আবেগ-প্রবণতা এবং ফ্যাকাশে বাস্তবের স্বীয় অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করছেন নিজের মত করে। কবিতাটি ত আগাগোড়া গড়ে উঠেছে আকর্ষণ আর বিকর্ষণের টানা-পোড়েন ও শেষপর্যন্ত আত্মনিক্রমণের অস্বভাবী সত্তায় আশ্রয় খোঁজার ট্র্যাজিক সংঘাতেই। আর তা করতে গিয়ে এলিঅট নিপুণ কৌশলে একের বিরুদ্ধে অন্যের প্রতিস্থাপনা করেছেন। প্রজন্মের বিরুদ্ধে প্রজন্ম, নারীর বিরুদ্ধে পুরুষ, বাস্তবের বিরুদ্ধে আদর্শ, সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি, প্রকাশ্যের বিরুদ্ধে গোপন, প্রকাশ্য-গোপনের বিরুদ্ধে গোপনীয়-গোপন, সদাচারের বিরুদ্ধে কদাচার, সর্বোপরি মার্লোর সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিস্থাপনা করে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত চিরে চিরে দেখেছেন পূর্ববর্তী যুগের স্খলিত পাণ্ডুর ভিক্টোরীয় আবেগ-প্রবণতা আর ভাবালুতার বাতাবরণকে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. 'ইমপারফেক্‌ট ক্রিটিকস', দ্য সেক্রেড উড, ৩১ পৃ.

২. 'স্প্লিন' ঠিক কবে লেখা হয়েছিল জানা না গেলেও কবিতাটি 'দ্য হার্ভার্ড অ্যাডভোকেট'-এ প্রকাশিত হয় ২৬ জানুয়ারি, ১৯১০-এ। এলিঅটের বয়স তখন ২১ বছর ৪ মাস।

৩. 'টমাস স্টার্ন্‌স এলিঅট পোয়েট', এ. ডি. মুডি, ২০ পৃ.

৪. তদেব ২০ পৃ
'এলিঅটস আর্লি ইয়ারস' লিনড্যাল গর্ডন, ৩০-৩১ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।

৫. দ্য লাভ সঙ্গ অভ্‌ জে, অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক, শেষতম স্তবক, দ্য কমপ্লিট পোয়েমস অ্যাণ্ড প্লেইজ অভ্‌ টি, এস, এলিঅট, ১৭ পৃ.

৬. 'দ্য পোর্ট্রেট অভ্‌ আ লেডি', ৬ পংক্তি, দ্য কমপ্লিট পোয়েমস অ্যাণ্ড প্লেইজ অভ্‌ টি, এস, এলিঅট, ১৮ পৃ.

৭. এই প্রসঙ্গে পিয়েরস গ্রে-র 'টি, এস, এলিঅটস ইনটেলেক্‌চুয়াল অ্যাণ্ড পোয়েটিক ডেভেলপমেণ্ট ১৯০৯-১৯২২'-এর ১০-১২ পৃষ্ঠায় লাফর্গের 'Autre Complainte de Lord Pierrot' এবং এলিঅটের প্রথম দিককার কবিতা 'Conversation Galante'-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৮. দ্য কমপ্লিট পোয়েমস অ্যাণ্ড প্লেইজ অভ্‌ টি. এস. এলিঅট, ১৮ পৃ.

৯. তদেব ১৯ পৃ.

১০. 'O, that this too too solid flesh would melt,…' Act

1, scene 2 এবং 'To be, or not to be—that is the question ;...' Act 3, scene 1—হ্যামলেটের এই দুটি স্বগতোক্তি দ্রষ্টব্য।

১১. ট্র্যয়েলকথ নাইট, Act 1, scene 1, ১-৭ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

১২. এলিঅট কলেজ ডি ফ্রাঁস-এ, ১৯১১, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বার্গসঁ-র সাতটি বক্তৃতা শুনেছিলেন। তাঁর ওপর বার্গসঁ-র প্রভাব সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি, "I was certainly very much under Bergson's influence during the year 1910—11, when I both attended his lectures and gave close study to the books he had then written." 'এলিঅটস আর্লি ইয়ারস' লিনড্যাল গর্ডন, ৩৮ পৃ., 'বার্গসঁ অ্যাণ্ড দ্য স্ট্রিম অভ কনসাসনেস নভেল',, এস, ভি, কুমার, ১৫৪ পৃ., 'টি, এস, এলিঅটস ইনটেলেকচ্যুয়ল অ্যাণ্ড পোয়েটিক ডেভেলপমেণ্ট ১৯০৯-১৯২২', পিয়েরস গ্রে, ২ পৃ, এবং একই সঙ্গে 'দি অ্যাচিভমেণ্ট অভ টি, এস, এলিঅট', এফ, ও, ম্যাথিসেন, ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় এলিঅটের উদ্ধৃত উক্তি ও দ্রষ্টব্য।

১৩. দ্য পোয়েমস অভ্ ম্যাথু আর্নল্ড, কেনেথ অ্যালট সম্পাদিত, ২৭১-৫ পৃ। এই প্রসঙ্গে সাউথ্যাম-এর 'আ স্টুডেণ্টস গাইড টু দ্য সিলেকটেড পোয়েম অভ টি, এস, এলিঅট', ৩৭ পৃ, দ্রষ্টব্য।

১৪. 'দি ইউজ অভ পোয়েট্রি অ্যাণ্ড দি ইউজ অভ ক্রিটিসিজম' টি, এস, এলিঅট, ১১১ পৃ.

১৫. তদেব ১০৬ পৃ,

# মানিক ও কল্লোল

## তপোবিজয় ঘোষ

### ॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

বুদ্ধদেব বসুর 'অ্যান একর অব গ্রীন গ্রাস' প্রকাশিত হলে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বইটির সমালোচনা করেন বিশিষ্ট কবি-সমালোচক বিষ্ণু দে তাঁর 'রাজায় রাজায়' প্রবন্ধে।[১] এটি পরে তাঁর 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (১৩৫৯) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে' বুদ্ধদেব বসুর 'শুদ্ধ' সাহিত্যবাদ যে কি-রকম ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে তিনি সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ঐ প্রবন্ধে তিনিই সম্ভবত প্রথম মানিক-সম্পর্কিত বুদ্ধদেব বসুর উক্তিসমূহের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—"মানিকরাবুর গত কয়বছরের রচনাবলী নাকি ভীষণ বিকৃত! মানিকবাবু নাকি আজকাল নিউরটিক ও সেক্স্যুয়াল পারভার্টস ছাড়া আর লেখেনই না! এ ভাইরস মানিকবাবু প্রতিভাবলে দূর করবেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি এ আশা করেছিলেন কিন্তু মানিকবাবু বোধ হয় 'প্রিডিসপোসড্ টু দি ডিস্ঈজ্' ইত্যাদি এবং উপসংহারে

'Now it is maniac instead of a moror, libertine instead of a lout, criminality instead of imbecility…'

যে উগ্রতায় মানিকবাবুর বিষয়ে এই উষ্মা সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাবতে বিশ্বাস হয় না। এই উগ্রতার জন্যেই বোধ হয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলা চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল? যেমন গল্পের তালিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ সেন, নরেন্দ্র মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাঙ্‌ক্তেয় কিম্বা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য! …

এই যে দলীয় বা রাজনীতিগত রোষদুষ্ট জাতিবিচার এ বুদ্ধদেববাবু কি করে তথাকথিত বানপন্থী সমালোচনার প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করেন?"…

এরপর বিষ্ণু দে অবশ্য মানিকের দিকেও হঠাৎ ওই একই প্রবন্ধে প্রবলভাবে কটাক্ষ করেন 'তথ্যের উপরে অবজ্ঞা'র জন্য। এবং এর পেছনে অনিবার্যভাবেই

কাজ করে পরস্পরের পূর্ববর্তী কিছু সাহিত্য-বিতর্ক।[২] কিন্তু এ সব বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে[৩] বলেছি বুদ্ধদেব বসু তাঁর ইংরেজি অথবা বাংলা নিবন্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি রাজনীতিগত দিক থেকে আক্রমণ করেন নি, যেমন করেছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। তাঁর ইংরেজি-রচনাটিতে রাজনীতি বিষয়ে যে একটি অর্ধ-বাক্য পাওয়া যায়[৪] তা একটি সামান্য উক্তি বা জেনারেল স্টেট্‌মেণ্ট-গোছের এবং তার সঙ্গে মানিক-সাহিত্য-আলোচনার কোনো কার্যকারণগত সম্পর্ক নেই। বুদ্ধদেব বসু অত্যন্ত কৌশলী ভঙ্গিতে নিজের রাজনৈতিক দর্শনকে সংগুপ্ত রেখে মানিকের ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করেছেন শিল্পগত-প্রশ্নে। বিষ্ণু দে সে-বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেন নি—যদিও তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সে-সময় খুবই জরুরী ও মূল্যবান ছিল এবং এখনো আছে। বুদ্ধদেব বসুর বাংলা নিবন্ধটির—যেখানে মানিকের মার্কসবাদে উত্তরণকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁকে প্রকৃতিবাদে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, এমন কি অস্বীকার করা হয়েছে তাঁর মানবিকতা-বোধকেও—তার প্রতিবাদ কেউ করেছেন কিনা জানা নেই।

মানিকের মৃত্যুর পর কল্লোল-কালিকলমগোষ্ঠীর ত্রয়ীর একজন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিকের উপর স্মৃতিচারণমূলক একটি শোকনিবন্ধ রচনা করেছিলেন। (উক্ত 'ত্রয়ী' শব্দটি আমার কল্পিত নয়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আমার যৌবন' গ্রন্থে একস্থানে বলেছেন, 'আমি আর প্রেমেন আর অচিন্ত্য—লোকেরা যাঁদের তখনও বলছে 'কল্লোলের ট্রায়ো'…' ইত্যাদি)। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' শিরোনামে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট রচনাটি মানিকের মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন পরে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার ৮ই ডিসেম্বর (১৯৫৬) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্য পরিক্রমা' নামে একটি গ্রন্থের (১৯৮৬) অন্তর্ভূক্ত হয়। এই রচনাটির সঙ্গে বুদ্ধদেব বা অচিন্ত্যকুমারের দৃষ্টিভঙ্গির শুধু মাত্রাগত নয়, গুণগত পার্থক্য আছে। প্রথমত, প্রেমেন্দ্র কোথাও মানিককে কল্লোলের কুলবর্ধন, belated Kallolean বা কল্লোলের সর্বশেষ বিলম্বিত পরিপক্ক ফল ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেন নি। তাঁর রচনাটিতে কল্লোল-কালিকলমের নাম দূরে থাক, সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিতমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত, মানিককে তিনি প্রাক্-কমিউনিস্টপর্বে স্থাপন করে খণ্ডিত বিচার করেন নি। তৃতীয়ত, কমিউনিস্টপর্বে পৌছে মানিক লেখক হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন - এমন কোনো অন্তরালশায়ী রাজনৈতিক-বিদ্বেষজাত কটাক্ষ তাঁর রচনায় নেই। এটি

একটি পরিচ্ছন্ন অন্তরঙ্গ রচনা—যেখানে প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজস্ব মানবতাবাদী শিল্পিস্বভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে মানিকের সমগ্র সত্তার স্বরূপ ও যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। মানিক-চরিত্রের ও মানিক-সাহিত্যের ব্যক্তিগত ও শিল্পগত সফলতা-অসফলতা, অস্থিরতা-উৎকেন্দ্রিকতার মূল অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। এবং তা করতে চেয়েছেন শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রে নয়, বহমান সমাজ-সভ্যতার পুঁজিবাদী-চরিত্রের দিকে যথোচিত দৃষ্টি রেখেই। প্রেমেন্দ্র লিখছেন—

'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বিরলতম লেখকদের একজন জীবনে ও সাহিত্যে মানস-সত্তা যাঁদের অভিন্ন। ফলে ছাঁটা মাপসই মানুষদের মাঝখানে বিসদৃশ বেমানান প্রাণবেগ ও ঘোলাটে মুখস্থ ধারণার জগতে অন্তর্ভেদী স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে আসবার যে ট্র্যাজিডি তাই তাঁর জীবন ও সৃষ্টিকে স্পর্শ না করে ছাড়েনি।

জীবনে ও সাহিত্যে তাঁর দুরন্ত প্রাণবেগ সম্বন্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অপবাদ ওঠবার যদি কোনো অবকাশ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী সেই কাল ও সমাজ—এ প্রাণবেগকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হতে দেওয়ার মত সুবিন্যস্ত দৃঢ়তা যার মধ্যে এখনো অনুপস্থিত। তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ সুস্থতা সম্বন্ধে যদি কোথাও সন্দেহ জাগে তাহলে নিজেদের সুস্থতার স্বরূপও আমাদের আগে বিচার করা দরকার।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত গোত্রছাড়া প্রতিভা যে উৎকেন্দ্র তার কারণ আমাদেরই অসমবিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, তাঁর রচনায় যেটুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব।'

এরপর প্রেমেন্দ্র অনুভব করেছেন মানিকপ্রতিভার মধ্যে যে প্রবল অসন্তোষ ও গভীর বিদ্রোহের অস্থিরতা ছিল তা কোনো কিছু মানিয়ে নেবার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাপনে যেমন, সাহিত্যসৃষ্টিতেও তেমনি এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যথার্থই মাঝারি বা গড়পড়তা মানুষের মাপ নিয়ে আসেন নি, 'চূড়াও যেমন তাঁর মেঘলোক ছাড়ানো—খাদও তেমন অতল গভীর।'

প্রবন্ধের উপসংহারে বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে প্রেমেন্দ্র বলেছেন—'যেখানে নিজের এই অসামান্য সত্তাকে অস্বীকার করে মানিয়ে নিয়ে মাপসই হবার স্বভাববিরুদ্ধ চেষ্টা তিনি করেছেন সেইখানেই তাঁর ব্যর্থতার ফাঁদ তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে পেতেছেন।

যে দলের মধ্যেই তিনি থাকুন; সমস্ত দলের ঊর্দ্ধে তিনি সেই নিঃসঙ্গ সরল

অতিকায় উদ্দাম চিরকিশোর জীবন-সন্ধানী—মাঝারি মানুষের তৈরী জগতে পায়ে পায়ে হোঁচট খেয়ে দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে নির্বোধ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে অবিরাম যুঝে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাঁকে বিদায় নিতে হয়।'

এই মূল্যায়নের হয়ত সবটুকুই সমানভাবে গ্রাহ্য বা বিতর্কের অতীত নয়, হয়ত এর শেষাংশে কমিউনিস্ট-পর্বে পার্টির নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ মানিকের রাজনৈতিক রচনাগুলির আংশিক ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিতও আছে—কিন্তু যে-কোনো পাঠকই অনুভব করবেন প্রেমেন্দ্র এখানে খুব অকপটে, গভীর অন্তরঙ্গতায় ছুঁতে চেয়েছেন মানিকের সমগ্র সৃষ্টি-সত্তাকে ; বিশেষ ভাবে তাঁর আত্মধ্বংসী ব্যক্তিজীবনের দুর্মর ব্যর্থতার যন্ত্রণাকে। মানিকের দ্বিতীয়-পর্বের সাহিত্য সম্পর্কে অল্পবিস্তর যান্ত্রিকতার অভিযোগ তো কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীরাও অনেকে করে থাকেন এবং মানিকসাহিত্যের সমগ্রতায় শ্রেষ্ঠকীর্তি রূপে 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-কে এখনো নির্দেশ করেন। মার্কসবাদীদের এ রকম নির্বাচনে বিতর্ক থাকলেও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই থাকে না। প্রেমেন্দ্রও মানিকের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'কেই 'বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মত রচনা' বলে মনে করেছেন কিন্তু মানিকের রাজনৈতিক রচনাগুলিও তাঁর কাছে তাৎপর্যহীন মনে হয় নি। আসলে আলোচ্য নিবন্ধে প্রেমেন্দ্রের কাছে মানিকের শিল্প অপেক্ষা শিল্পী-জীবন অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে—ব্যক্তিগত সূত্রে যে জীবনের অনেক কিছুরই খবরাখবর রাখতেন তিনি। একদিকে মৃগীরোগাক্রান্ত, দারিদ্র্যপীড়িত, বেহিসেবী নেশাতাড়িত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, অন্যদিকে কঠিন আদর্শের দ্বারা নিয়মবদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টি—এই বিষম বৈপরীত্যের মধ্যে উৎক্ষিপ্ত আত্মধ্বংসী প্রতিভার যে ট্রাজেডি—তাকেই গভীর মমতার সঙ্গে ধরতে চেয়েছেন প্রেমেন্দ্র।[৫]

কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্রই যথার্থ বন্ধুতার দাবি উপস্থিত করেছেন মানিক সম্পর্কে—'শুধু লেখক হিসেবে নয়, বন্ধু হিসেবেও তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ তার পরে আমার হয়েছে।' এবং বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তিনিই এ কথা বলতে পেরেছেন যে, লেখক-জীবনের শুরুতে গল্পের গুণাগুণ বিচারের জন্য মানিক আধডজন গল্পের প্যাণ্ডুলিপি হাতে তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হয়েছিলেন। বিষয়টি তেমন আলোচিত নয় বলে এবং মানিকের একমাত্র জীবনী গ্রন্থেও[৬] এর প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ না-থাকার জন্য বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য।

পূর্ব-কথিত ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ নিবন্ধটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে স্মৃতিচারণ, দ্বিতীয়ভাগে মূল্যায়ন। স্মৃতিচারণ অংশে প্রেমেন্দ্র বলেছেন যে, ‘ব্যাঙের ছাতার মতো একটি সদ্যোজাত সাপ্তাহিক’ পত্রিকার অফিস ঘরে মানিকের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রেমেন্দ্র ওই সাপ্তাহিকটির সম্পাদক ছিলেন। মানিক লেখা দিতে আসেন নি, একজন বন্ধুর মারফৎ আলাপ করতে এসেছিলেন। ‘আর পাঁচজন সাহিত্যযশোপ্রার্থী নতুন লেখকের’ মতই প্রেমেন্দ্র তাঁকে সেদিন বিশেষ আমল দেন নি। কিন্তু মানিকের সুদীর্ঘ সুঠাম বলিষ্ঠ চেহারা প্রথম দর্শনেই তাঁর মনের উপর ছাপ ফেলেছিল। এই ঘটনার ক’দিন পরে ‘গুটি ছয় সাত গল্পের পাণ্ডুলিপি’ নিয়ে মানিক প্রেমেন্দ্রের বাসায় যান দেখানোর জন্য। প্রেমেন্দ্র তাঁকে সপ্তাহখানেক পরে আসতে বললেন। এর পরের অংশ—

‘যেদিন লেখকের আসবার কথা ঠিক তার আগের দিন রাত্রে সৌভাগ্যক্রমে লেখাগুলির কথা মনে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে বসেছি। বুলোতে গিয়ে চোখ সত্যিই স্থির হয়ে গেছে। সমস্ত গল্প একবারের জায়গায় দু’বার করে পড়া শেষ না করে উঠতে পারি নি।…

কি তাঁকে বলেছিলাম যথাযথভাবে মনে নেই। শুধু এইটুকু তাঁকে জানিয়েছিলাম যে, সাহিত্য সম্বন্ধে যেটুকু বোধ আমার আছে তাতে তাঁর প্রতিভা আমার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট। সেই সঙ্গে সে প্রতিভা কতদিনে কতখানি স্বীকৃতি পাবে সে বিষয়ে একটু সন্দেহও প্রকাশ করেছিলাম মনে আছে। কারণও জানিয়েছিলাম এই যে, সাধারণত সুস্থ বলতে যা সবাই বোঝে তাঁর প্রতিভা তা নয়।’

এই স্মৃতিকথায় সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম নেই, সময়ের কোনো উল্লেখ নেই, মানিকের গল্পগুলিকে চেনা যায় এমন কোনো সূত্রও নেই। আবার মানিকের ‘লেখকের কথা’-র অন্তর্গত আত্মজৈবনিক প্রবন্ধগুলিতে, এ-যাবৎ প্রকাশিত ডায়েরী ও চিঠিপত্রে, এবং মানিক-সম্পর্কে লেখা অন্যদের স্মৃতি-চারণে—কোথাও প্রসঙ্গটির কিছুমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় না। মানিক কখনো কাউকে নিজের বই উৎসর্গ করেন নি—কাজেই সে-দিক থেকেও কিছু ইঙ্গিত পাওয়ার পথ বন্ধ। তাছাড়াও আছে ‘অতসীমামী’ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে মানিকের হঠাৎ-আবির্ভাবের রোমাঞ্চকর গল্প, অচিন্ত্যকুমার কথিত ‘এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম’-এর প্রখর দীপ্তি ছড়ানো ভাবমূর্তি—যার সঙ্গে গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়ার ছবিটি মিলিয়ে নেওয়া কষ্টকর।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র এত স্পষ্টভাষণে বিষয়টি বলেছেন যে তার প্রতি কোনোরকম সন্দেহ পোষণ করারও প্রশ্ন উঠতে পারে না। সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নাম জানার জন্য আমাদের ব্যাকুলতা নেই; প্রেমেন্দ্র সে-সময় অনেকগুলো কাগজের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদকের কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন, যথা কালিকলম, বাংলার কথা, কবিতা, সংবাদ, খবর ইত্যাদি। কাগজটি 'বাংলার কথা' (১৩৩৫) হতে পারে কিন্তু তার সম্পাদক ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। প্রেমেন্দ্র অন্যতম সহ-সম্পাদক ছিলেন।[৮] সময়টা অনুমান করা যেতে পারে 'অতসীমামী' বের হওয়ার পরবর্তী দু-তিন বছর অর্থাৎ ১৯২৮ থেকে '৩০-'৩১-এর মধ্যবর্তীকাল, যখন মানিক একটির পর একটি গল্প লিখে চলেছেন কলেজীয় পড়াশুনায় চিরকালের মত ইস্তফা দিয়ে। যখন তিনি নবীন, সাহিত্যযশোপ্রার্থী, প্রতিষ্ঠা যখন পর্যন্ত করায়ত্ত নয় (এ ইঙ্গিত প্রেমেন্দ্রের স্মৃতিচারণেই আছে)।

কিন্তু গল্প-পড়ানোর জন্য মানিক প্রেমেন্দ্র মিত্রকেই কেন নির্বাচন করে-ছিলেন? কেন যান নি মণীন্দ্রলাল বসু, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অথবা প্রেমেন্দ্রের চেয়েও বছর খানেকের বড়ো অচিন্ত্যকুমারের কাছে?

এ প্রশ্নের মীমাংসাও কঠিন নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোলে'র হাত ধরে বাংলাসাহিত্যে প্রবেশ করেন নি। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২) স্প্যানিশ লেখক জাসিন্তো বেনাভাঁৎ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ, প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের রবীন্দ্র-আনুকূল্যধন্য 'প্রবাসী' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩২৯), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন যার সম্পাদক এবং যে-পত্রিকায় লেখা ছাপানোর জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল অচিন্ত্যকুমারেরা নীহারিকা-শেফালিকা নামের আশ্রয় পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন।[৯] তখন কল্লোলের জন্ম হয় নি। এরপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি গল্পও 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় ('শুধু কেরাণী' ও 'গোপন চারিণী')।[১০] ততদিনে 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়েছে (বৈশাখ, ১৩৩০)। 'প্রবাসী'-র গল্পদুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পত্রস্থ করে কল্লোল গোষ্ঠীভুক্ত করে নেয় প্রেমেন্দ্রকে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় কল্লোলের প্রথম বর্ষে প্রেমেন্দ্রের কোনো লেখা নেই। এর অর্থ—কল্লোলের আদি পরিকল্পক বা সংগঠকদের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের কোন যোগ ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে অন্তিমকাল পর্যন্ত এই পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থেকেছেন প্রেমেন্দ্র। তাঁর কমপক্ষে সাতটি গল্প, ন'টি কবিতা এবং দুটি উপন্যাস

('আগামীকাল' ও 'মিছিল') কল্লোলে প্রকাশিত হয়। এরপর কল্লোলের সহযোগী রূপে ১৩৩৩, বৈশাখে 'কালিকলম' প্রকাশিত হলে তার আংশিক সম্পাদনার কর্তব্য-সহ নিয়মিত লেখালেখির দায়িত্বও পালন করেন তিনি—স্বনামে এবং 'কৃত্তিবাস ভদ্র' ছদ্মনামে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসিকতা বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য-যুবনাশ্বদের সমগোত্রীয় ছিল না। ভাবের ফেণিলতা, রোমান্টিকতার তারল্য, মধ্যবিত্তের স্বপ্নবিলাস, যৌনতার সুড়সুড়ি কিম্বা হঠাৎ হঠাৎ রবীন্দ্র-বিদ্রোহিতার গর্জন তাঁর উপন্যাসে-গল্পে-কবিতায় দেখা দেয় নি। তাঁর সাহিত্যকর্ম লক্ষ্যহীন আত্মমুখী যাযাবরী আনন্দের বা কল্পিত অন্তর্মুখী বেদনার স্মৃতিচর্বনা মাত্রও ছিল না। স্বদেশ, সমাজ ও সমকালের বিষয় ও ভাবনা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ব ছিল সুগভীর। তথাকথিত ভদ্রলোকদের ধোপদুরস্ত ধুতিপাঞ্জাবির আবরণ ছিঁড়ে ভেতরকার কর্কশ-কুৎসিত রূপটিকে তিনিই প্রথম বাংলাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক কলাকৌশলে উদ্ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন। তাঁর 'প্রথমা' কাব্যগ্রন্থ ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হলেও এর প্রথম সংস্করণভুক্ত ২৫টি কবিতার প্রায় সবগুলিই প্রকাশিত হয়েছে ১৯২৩-২৪ সাল থেকে। এইসব কবিতায় আমরা পেয়েছি 'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের / মুটে মজুরের / আমি কবি যত ইতরের' কিংবা 'মহাসাগরের নামহীন কূলে / হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই / জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়' অথবা 'সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে / গৃহবলিভুক পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে··· / মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে, খুলিতে সহে না তর / সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর' ইত্যাদি সব উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি যা-কিনা সুস্থ সমৃদ্ধ মানবিক-রসে পরিপূর্ণ এবং দৃঢ় অথচ অন্তরঙ্গ উচ্চারণের স্বাদুতায় চিত্তগ্রাহী। অন্যদিকে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' (যা 'বিজলী' ও 'কালিকলম' পত্রিকায় দুই পর্বে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে ১৯২৬)[১১]—বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস যেখানে অন্ত্যজ মুচিশ্রেণীর একটি দিনমজুর-মানুষকে কাহিনীর নায়ক করা হয়েছে—নায়িকা হয়েছে এক মজুরণী। ড. সুকুমার সেন এই উপন্যাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন 'দরিদ্র গৃহস্থ ও বস্তিবাসীর হীন ও কুৎসিত সংসারযাত্রার চিত্রাবলী'। কিন্তু এ বর্ণনা অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। এই উপন্যাস আসলে বৃত্তিচ্যুত এক মুচি-যুবকের কাহিনী, স্নেহময়ী বিধবা বোন পাঁচিকে নিয়ে যার অভাবের সংসার, একখণ্ড শাড়ির

অভাবে যে-পাঁচি প্রায় উলঙ্গ থাকে এবং ক্ষুধার তাড়নায় যে-কালাচাঁদ দিন মজুরের কাজ করতে গিয়ে বাবু-ভদ্রলোকদের হাতে কখনো প্রহৃত, কখনো প্রতারিত বা বিতাড়িত হয়। কালাচাঁদ ভালবাসে তারই মত এক দরিদ্র মজুরণী নেত্যকে, অথচ সামাজিক ও মানসিক সংস্কারের তাড়নায় তাদের প্রেমজীবন ব্যর্থ হয়। এই মুখ্যকাহিনীকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে অন্যান্য অনুষঙ্গ, বস্তিজীবনের কদর্যতা ও নির্মমতা। কিন্তু এ উপন্যাসে কোনো যৌনতা নেই। পরিবর্তে সমাজের অসম ধনবিন্যাসের জন্য, দুর্বলের উপর প্রবলের শোষণের জন্য আছে লেখকের ঘৃণা ও অসন্তোষ। গল্পের নায়ক কালাচাঁদও মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠে, প্রতিবাদ করে, বিদ্রোহী হতে চায় কিন্তু তার একক উত্থানের পেছনে সংঘশক্তির জোর না থাকায়—তার পরাভব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' উপন্যাসে[১২] আছে একদল জেলখাটা ও জেল খাটার সম্ভাবনাযুক্ত স্বদেশী তরুণের বিচিত্র জীবনযাপনের কাহিনী। এই উপন্যাসের শচীন চরিত্রটি মানিকের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কুমুদ-চরিত্রের পূর্বাভাস। এর শেষার্ধে আছে দুটি বিধবা তরুণীর উপর সামাজিক নির্যাতনের করুণ কাহিনী। কল্লোলে বের হওয়ার পর উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে বের হয় ১৯৩৩ সালে। কল্লোলে প্রকাশিত অপর উপন্যাস 'আগামীকাল'[১৩] কলকাতার সম্প্রসারিত রূপের অর্থাৎ নতুন শহরতলী গড়ে ওঠার বাস্তব-ইতিহাস। ছোট ছোট বহু চরিত্রের ভিড়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, হাটুরে, দোকানী, মহাজন, ব্যবসায়ী। তারা অনেকেই শহরের প্রাণ-হীনতায় আক্রান্ত। আবার রঙিন নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত। আত্মপ্রতারক ও আত্মঘাতী। নষ্টমূল জীবনের অস্থিরতায় বিদীর্ণ। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের গুণে, তির্যক ভাষণের পটুত্বে নগর-অর্থনীতির নিপুণ প্রয়োগে এ উপন্যাস এখনো আমাদের বিস্মিত করে।

এসবের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্ব ছোটগল্পের জগৎ তো ছিলই যেখানে তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেকালের সকল তরুণ গল্পকারের অনুকরণ ও ঈর্ষার পাত্র। ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর দুটি গল্পগ্রন্থ—পঞ্চশর ও বেনামী বন্দর। এসব গল্পের কোন-কোনটিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনতত্ত্বের যৌনগন্ধী ঝাঁঝ থাকলেও তা কখনো সংযমের সীমা ও শিল্পের নিয়ম লঙ্ঘন করে নি। এ কারণে প্রেমেন্দ্রকে কেন্দ্র করে কখনো অশ্লীলতার অভিযোগ উচ্চকিত হয়ে ওঠে নি। তাঁর কোনো বই

নিষিদ্ধ হওয়া দূরে থাক, সজনীকান্ত দাসও তাঁর কোনো লেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন নি। অতি আধুনিক সাহিত্যের অশ্লীলতা দমনের জন্য সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের নিকট ১৩৩৩ সনের ২৩ ফাল্গুন যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে অভিযুক্তদের নামের তালিকায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, যুবনাশ্ব, এমন কি কালিকলমে প্রকাশিত 'মাধবীপ্রলাপ' ও 'অনামিকা' কবিতার জন্য নজরুল ইসলামেরও নাম পাওয়া যায়, কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের কোনো লেখার উল্লেখ তিনি করতে পারেন নি।

সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই হয়ত প্রেমেন্দ্র কালিকলমের সম্পাদকমণ্ডলীতে এক বছরের বেশি থাকতে পারেন নি এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' কাগজের (প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৩৫) অন্যতম সম্পাদক হয়েও পৌনে দু'বছরের মাথায় (জুন, ১৯৩৭) সেই পদও পরিত্যাগ করেন।[১৪] তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে 'অ্যান্ একর অব গ্রীন গ্রাস'-এ বুদ্ধদেবের প্রতিকূল সমালোচনাও সুবিদিত।

অন্যদিকে কল্লোলগোষ্ঠীর মধ্যে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পরেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে 'প্রগতি লেখক সংঘ' ও 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘ'-এর যোগাযোগ ছিল গভীর, দীর্ঘস্থায়ী এবং আত্মিক। ঐ পর্বেই মানিকের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রের যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ঘন হয়।

১৯২৮ সালে মানিক যখন লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন তখন কল্লোল-কালিকলমের লেখকদের লেখার সঙ্গে তাঁর যে যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছিল তার প্রমাণ 'লেখকের কথা'র নিবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়।[১৫] প্রেমেন্দ্র তখন প্রতিষ্ঠিত লেখক। মানিকের মানসজগতে জীবনধর্মী সাহিত্য রচনার যে সুস্থ আকৃতি ছিল, সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবের বিজ্ঞানসিদ্ধ বিশ্লেষণের যে প্রবণতা ছিল, তির্যক বঙ্কিম দৃষ্টিপাতের দ্বারা ভদ্রবাবুশ্রেণীর স্বরূপ উদ্ঘাটনের যে প্রতিজ্ঞা ছিল এবং ছোটগল্পের সমুন্নত শৈল্পিকরূপ নির্মাণের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল—এ সবকিছুই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল প্রেমেন্দ্রের কাছে যেতে ও তাঁকে গল্প পড়তে দিতে। সে-সময়ের মানিক তাঁর সৃজ্যমান সাহিত্যের রূপকল্পনায় প্রেমেন্দ্র-রচিত গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কিছু অনুকূল আদর্শ বা মডেল যে খুঁজে পেয়েছেন তাতে সন্দেহের কারণ নেই। এ জন্যই বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে মানিকের আত্মীয়তার কথা বলেছেন তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বাংলা নিবন্ধে (দ্রঃ প্রথম পর্ব)।

কিন্তু মানিক কমিউনিস্টপর্বে এসে যখন কল্লোল-কালের মূল্যায়ন করেছেন

তখন প্রেমেন্দ্র মিত্রকে একদিকে বস্তিজীবনের বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য ঈষৎ স্বীকৃতি জানিয়েও পরমুহূর্তে তা যেন সমালোচনার কঠিন আঘাতে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কেন-না কল্লোলের বস্তিজীবননির্ভর সাহিত্যের বাস্তবতা তাঁর কাছে মনে হয়েছে মধ্যবিত্তেরই 'রোমান্টিক ভাবাবেগ'। মানিক নাম উল্লেখ না করলেও এখানে প্রেমেন্দ্র মিত্র স্পষ্টতঃই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন—কারণ 'পাঁক' উপন্যাসকে আশ্রয় করেই বস্তিজীবন প্রথম পূর্ণাঙ্গ শরীরী রূপ পেয়েছিল। অন্যদিকে জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে একই সঙ্গে ন্যুট হ্যামসুন ও ম্যাক্সিম গোর্কির পাঠশালায় যেতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে মানিক যেন একটু ব্যঙ্গের সুরেই পাল্টা প্রশ্ন করেন প্রেমেন্দ্রকে—'হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেন্দ্রবাবু মেলাবেন কি করে?' কেননা মানিক অনুভব করেন, একজন হলেন 'ভাবের আকাশের ঝড়', অপরজন 'মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা' এবং এঁদের পার্থক্য দুরতিক্রম্য। কিন্তু এ তো মানিকের ১৯৫১ সালের ভাবনাচিন্তার কথা—কারণ যে নিবন্ধে ('সাহিত্য করার আগে') তিনি এসব কথা বলেছেন সেটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ সনের শারদীয় 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায়। কিন্তু যে সময়পর্বের কথা তিনি বলছেন তখন মানিকের কাছেও ওঁদের পার্থক্য স্পষ্ট ছিল না এবং তাঁর নিজের কথাতেই—'আমার তখন হ্যামসুনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না।' সে সময়ের মানিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের খুব দূর-আত্মীয় ছিলেন না। তাহলে তিনি গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন না।

কল্লোল-কালিকলমের আরেকজন প্রধান লেখক শৈলজানন্দ (১৯০০-৭৫)। কালিকলম পত্রিকার অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সঙ্গেও মানিকের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কোন্ সূত্রে? নিশ্চয়ই কয়লাকুঠির গল্পমালার সূত্রে। মুচিপাড়ার বস্তি থেকে প্রেমেন্দ্র যেমন তুলে এনেছিলেন দিনমজুর কালাচাঁদকে, আসানসোল-রাণীগঞ্জের কয়লা খনি থেকে তেমনি শৈলজানন্দ তুলে এনেছিলেন আদিবাসী সাঁওতাল কিংবা বাউড়ি শ্রেণীর পুরুষ-রমণী খনিশ্রমিককে। অন্যদিকে অল্প কিছু পরেই তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে প্রথম ভূমিচ্যুত কৃষক গোষ্ঠকে গ্রাম থেকে তুলে এনে রেল-কারখানার শ্রমিক করে নায়কের মর্যাদা দিয়েছিলেন 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে (সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকায় ১৩৩৬ সনের কার্তিক-চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত, গ্রন্থাকারে ১৩৩৮)। এসব ঐতিহাসিক ঘটনা মানিকের লেখক রূপে জন্মলাভের আগে অথবা জন্মমুহূর্তে

-সংঘটিত হয়েছে। মানিক এ সবেরই উত্তরাধিকারী। শৈলজানন্দের কয়লা-কুঠিধারার গল্প ১৩২৯ (১৯২২) সালের শেষদিক থেকে প্রথমত 'প্রবাসী' পত্রিকা, পরে কল্লোল কালিকলমকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। এসব গল্প পরে 'দিনমজুর' গ্রন্থে সংকলিত হয়ে ১৯৩২ সালে বের হয়। এই গল্পগুলিই শৈলজানন্দকে বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব দিয়েছে, অন্যথা তাঁর উপন্যাসসমূহ রোমান্টিক ভাবাবেগে ভরপুর তাৎপর্যহীন রচনা। 'কয়লাকুঠির দেশ' উপন্যাসটির নামও ভয়ঙ্কর প্রতারক—কেননা এতে কয়লাখনি বা খনিশ্রমিকদের কোনো কথাই নেই। এক যাযাবরী নারীর সঙ্গে এক ধনী যুবকের অসম প্রেমের রোমান্সতাড়িত গল্পকাহিনী এটি। উপন্যাসটি না পড়ে অনেকেই একে কয়লাকুঠির গল্পমালার সঙ্গে একাসনে বসিয়ে আলোচনা করেছেন এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে।

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে শৈলজানন্দ এবং 'পাঁক' রচয়িতা প্রেমেন্দ্র উভয়কেই একধরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন মানিক নীচের উক্তিতে, একজনের নাম করে, অন্যজনের না করে—

"আধুনিকতা'র আন্দোলনে যদি শৈলজানন্দের খাঁটি গ্রামের মানুষ আর কয়লাখনির কুলিদের সাহিত্যে আনা সম্ভব করে থাকে, বস্তির জীবনকে অন্তত সাহিত্যে প্রবেশের পথ করে দিয়ে থাকে,—শুধু এইজন্যই রাশিকৃত জঞ্জালের আবির্ভাবটা ক্ষমা করে চলে।" ('সাহিত্য করার আগে')

কিন্তু প্রেমেন্দ্রের মত শৈলজানন্দও যথারীতি সমালোচিত হয়েছেন একটু পরেই—'শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি।' (ঐ)।

কিন্তু মার্কসবাদী মানিকের বিচারে তা— না এলেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই সে-সময়ের কল্লোল-কালিকলম আধুনিকতার নামে যে 'রাশিকৃত জঞ্জাল' জড়ো করে তুলছিল তার মধ্যে ঐ মাটিঘেঁষা গ্রামের মানুষ, কয়লাখনির কুলি আর বস্তিজীবনের বাস্তবতাই ছিল সার্থক ইতিবাচক সঞ্চয়ের দিক। মানিক তার কাছে নিশ্চয়ই ঋণী।

## তৃতীয় পর্ব

মানিক সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার যে বলেছেন—'ছুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত'—শব্দ সংস্থানের ত্রুটির জন্য তার অর্থ স্পষ্ট

নয়।—এখানে 'রাস্তা' শব্দটির যদি কোনো প্রতীকী অর্থ থেকে থাকে তাহলে এরকম একটা ব্যাখ্যা হয়ত করা যায় যে, কল্লোল-কালিকলমের প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর শরীরাশ্রিত রোমান্টিক প্রেমপ্রণয় কামকেলির মনো-বিকলনধর্মী ধারা এবং গ্রামমাটিবস্তি ও খনিআশ্রিত বাস্তবসমৃদ্ধ মানবিক জীবনধারা—এই দুই ধারা থেকেই পাঠগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মানিক বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হয়েছিলেন ও দ্রুত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু অচিন্ত্য কি ঠিক এরকম অর্থেই কথাটা বলেছিলেন? কল্লোলের দুটি ধারা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা যা ছিল তা অবশ্য আমাদের ব্যাখ্যার খুব বিরোধিতা করে না। অচিন্ত্য লিখেছেন—"কল্লোলে' এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ধারা ছিল। একদিকে রুক্ষ শুষ্ক শহুরে কৃত্রিমতা, অন্যদিকে অনার্য্য গ্রাম্য জীবনের সারল্য। বস্তি বা ধাওড়া, কুঁড়েঘর বা কারখানা, ধানক্ষেত বা ড্রয়িংরুম। সমস্ত দিক থেকে একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ।" ('কল্লোল যুগ')। কিন্তু ধারা দুটি এতই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ যে তার যথার্থ মিলন কল্লোলের জমিতে সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রেমেন্দ্র বা শৈলজানন্দ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যেটুকু করেছিলেন তার কথা বাদ দিলে কল্লোল-কালি-কলমের মূলধারাই ছিল রোমান্টিক ভাববিলাসের ধারা—যে রাস্তা ধরে হাঁটার পক্ষপাতি মানিক ছিলেন না।

বুদ্ধদেব বসু কল্লোলের চরিত্র লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে পরিণত বয়সেও তাঁর নিজের উপন্যাস 'সাড়া' ও অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' গ্রন্থকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। 'সাড়া' বুদ্ধদেবের প্রথম উপন্যাস—১৯৩০ সালে অচিন্ত্যকুমারকে উৎসর্গিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে তার নতুন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বলেন—' 'সাড়া' ভরপুর হয়ে আছে সেই কালের স্বাদে ও গন্ধে, যাকে সম্প্রতি 'কল্লোল-যুগ' বলা হচ্ছে—তার কাঁচা সবুজ ছেলেমানুষিটুকুও এতে বিদ্যমান…যেমন অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসে তেমনি এই পুস্তকে 'কল্লোল'-যুগে চরিত্রলক্ষণ আমি দেখতে পাই…।"

এই উপন্যাস একসময় চিহ্নিত হয়েছিল অশ্লীলতার দুঃসহ নিদর্শনরূপে, কেউ এতে ইডিপাস-এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বা অজাচার। এ সংবাদ উক্ত ভূমিকাতে বুদ্ধদেব নিজেই আমাদের দিয়েছেন। তাঁর 'এরা আর ওরা' এবং আরও অনেকে' (১৯৩২) বইটি[১৬] অকারণে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত ও নিষিদ্ধ হয়েছিল। ওতে কিছুমাত্র যৌনতা নেই। সম্ভবত এই কারণেই আনন্দবাজারে সম্পাদকীয় লিখে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তার প্রবল

প্রতিবাদও করেছিলেন।[১৭] কিন্তু 'সাড়া' উপন্যাসটি একালের বিচারেও অশ্লীল ও রুচিহীন বলে গণ্য হতে পারে নানা কারণেই। যৌনতাকে আশ্রয় করে পারম্পর্যহীন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক ভাববিলাস কিভাবে যে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে তার একটি উদাহরণ এই রচনা। এর মধ্যে শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর তরল সংস্করণ হিসেবে নির্মলা-নাম্নী এক গণিকাকে আমদানি করে তার মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেমের মাহাত্ম্য-দর্শন উৎকট কল্পনার চরম নিদর্শন।

অচিন্ত্যকুমারের প্রথম গ্রন্থ 'বেদে' কল্লোলে প্রকাশিত হয়ে (আশ্বিন, অগ্রহায়ন, পৌষ, ফাল্গুন, ১৩৩৩) ১৯২৮ সালে গ্রন্থকারে বের হয়। ('সাড়া' বের হয়েছিল 'প্রগতি' পত্রিকায়।[১৮] বুদ্ধদেব বসু এটিকে 'উপন্যাস' বলেছেন। কল্লোলের সূচীপত্রে কখনো 'গল্প' কখনো 'উপন্যাস' বলা হয়েছে। আসলে এটি আহ্লাদি-বাতাসী-মুক্তা আসমানীদের চরিত্রচিত্রমালা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বেদে'র মধ্যে 'বীভৎস অশ্লীলতা'র কথা বলেছেন। যাযাবর শ্রেণীর চরিত্রগুলিকে আশ্রয় করেছিলেন অচিন্ত্য, অপরাধ-জগতের ক্লেদপঙ্কিল রূপ ফোটানোর জন্য—তাদের অস্তিত্বের মৃত্তিকামূল অন্বেষণের জন্য নয়, যেমন পরবর্তীকালে করেছিলেন তারাশঙ্কর। ফলে চরিত্রগুলি বাস্তবতা অপেক্ষা অবাস্তবতার জগতে অসংলগ্ন ভাবে ভাসমান হয়েই থেকেছে, তাদের চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে মৃত্তিকালগ্ন হয়নি।

বুদ্ধদেব বসু এ দুটি গ্রন্থের মধ্যে নিজে থেকেই যখন কল্লোলের চরিত্রলক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন—তখন আমাদের পরিশ্রম করে আর অধিক তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই! মানিকও ঠিক এই কারণেই কল্লোলীয় বাস্তবতাকে আমল দেন নি। বলেছিলেন—'আসল পরবর্তন আসবে অন্যরূপে, সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে।'

এই সূত্রে আরও দু'একটি কূটপ্রশ্নের উত্থাপন ও তার মীমাংসার চেষ্টা করা যেতে পারে। মানিক কেন তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশের জন্য কল্লোলে যান নি? অথবা কালিকলমে? কেনই বা পরেও ওই দুটি পত্রিকার একটিতেও কখনো লেখেন নি? 'বিচিত্রা'য়ই বা গিয়েছিলেন কেন?

সেকালে কল্লোল ছিল বহু বিজ্ঞাপিত তারুণ্যের পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪-২৭) ভূমিকা তখন নিঃশেষিত। কল্লোল-কালিকলমকে ঘিরেই তখন টাটকা তাজা সবুজ-প্রাণের ভিড়। প্রৌঢ়রাও অনেকে তার তাপে হাত সেঁকতে চেয়েছেন। এই অবস্থায় কলকাতাবাসী, প্রেসিডেন্সি

কলেজের ছাত্র, সদ্যোপ্রাপ্ত যৌবনের আবেগে উজ্জ্বল মানিক তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশের জন্য একবারও কেন যে কল্লোলের কথা ভাবেন নি—তা আজ আমাদেরই ভাবনার বিষয়। তারাশঙ্কর থেকে অমরেন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত অনেক গল্পকার, বহু কবি ও প্রাবন্ধিক ওই দুটি পত্রিকার কোনো একটিতে প্রথম লিখে সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন। তরুণ উদীয়মান গল্পলেখকদের জন্য কল্লোল-কালিকলমের দ্বার ছিল অবারিত। বিশেষত কল্লোল তো বিশেষভাবেই ছিল গল্পপত্রিকা। প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই তার ঘোষণা ছিল—'কল্লোল—মাসিক গল্পসাহিত্য।...এরূপ গল্পসাহিত্য বাংলাদেশে এই প্রথম।' একজন গবেষক হিসেব করে দেখিয়েছেন, কল্লোল পত্রিকায় গোড়ার দিকে গল্প রচনার সংখ্যা পনেরো হলে দুই তিনটি কবিতা, আলোচনা-ডাকঘর-সমাচার শীর্ষক গদ্যনিবন্ধ তিন-চারটি বাদ দিয়ে আর সবই থাকত গল্প কিংবা ধারাবাহিক উপন্যাস।[১৯] কল্লোলের ১৩৩১ সালের আশ্বিন-সংখ্যা এবং ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা শুধুমাত্র গল্প নিয়েই বের হয়েছিল। (ছিল যথাক্রমে ১০টি ও ১১টি গল্প)। এর মধ্যে একমাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' (আশ্বিন, ১৩৩১) কালজয়ী হয়েছে। যে পত্রিকায় বেশি সংখ্যায় গল্প প্রকাশিত হয়—সেখানেই অপরিচিত তরুণ লেখকের সহজে স্থান করে নেবার সুযোগ ঘটে। তবু মানিক সে রাস্তায় হাঁটলেন না। কল্লোল-কালিকলমের এগিয়ে আসা দুটো রাস্তা দ্রুতপায়ে পার হয়ে বিচিত্রায় চলে গেলেন।

যাঁরা মনোবিজ্ঞানের কিছু খবর রাখেন তারাই জানেন নতুন লেখকের পক্ষে পত্রিকা-নির্বাচনের বিষয়টি মনস্তত্ত্বের একটি গূঢ় প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। চেতনে অবচেতনে তা নিয়ে ঝাড়াই বাছাই চলে। লেখক মনে মনে নিজের শক্তির পরিমাপ করেন, লেখাটির গুণাগুণের সঙ্গে পত্রিকার ভাবাদর্শ মেলে কিনা তার বিচার করেন, নিজের মর্যাদাবোধ ব্যক্তিত্বের গঠন ও অভিমানী-সত্তার নিরিখে লেখাটির গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনার কথা ভাবেন, আত্মপ্রকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাড়নার সঙ্গে লেখা ও পত্রিকার সামঞ্জস্য-বিধানের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেন। লেখকের নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠে থাকলে পত্রিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার প্রেরণাও সক্রিয় থাকে। কাজ করে জাতিগত সংস্কারও। মনে মনে এসব বোঝাপড়া সম্পূর্ণ হলে তবেই চূড়ান্তভাবে পত্রিকাটি নির্বাচিত হয়। সুদূর মফস্বলে লাভপুর গ্রামে বাস করেও তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম গল্পের জন্য নির্বাচন করে-ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ মাসিক প্রবাসীকে। কিন্তু প্রবাসী দীর্ঘকাল সে গল্প

অপঠিত অবস্থায় ফেলে রাখার জন্য অভিমানী তারাশঙ্কর তা তুলে নিয়ে কল্লোলে পাঠান ( রসকলি, ফাল্গুন ১৩৩৪ )। এতে তারাশঙ্করের কোন ক্ষতি হয় নি। লাভ হয়েছে কল্লোলের। আর প্রবাসী বঞ্চিত হয়েছে এক দুর্লভ সম্মানের গৌরব থেকে। তারাশঙ্কর কোনো অর্থেই কল্লোলীয় চেতনার ভাববিলাসী বা বাস্তববিলাসী লেখক ন'ন। তিনি ভাসমান উদ্ভিদ ছিলেন না, মৃত্তিকামূলের শিল্পী ছিলেন। তবু কল্লোল আজও তাঁর স্বত্ব দাবি করে ওই প্রথম গল্প-প্রকাশের তাৎক্ষণিক যোগাযোগের কারণেই।

প্রাথমিক পর্যায়ে মানিক নির্বাচন করেছিলেন তিনটি পত্রিকা—ভারতবর্ষ, প্রবাসী ও বিচিত্রা।[২০] বন্ধুদের বলেছিলেন, একটা গল্প লিখে তিনমাসের মধ্যে ঐ তিনটি পত্রিকার কোনো একটিতে ছাপিয়ে দেবেন। দেখা যাচ্ছে তাঁর প্রাথমিক নির্বাচনের মধ্যেও কল্লোলের ( এবং কালিকলমের ) কোনো স্থান ছিল না। তখন গল্পটি লেখা হয় নি বলে একটি বিশেষ পত্রিকা সম্পর্কে মনস্থির করতে পারেন নি, তাই তিনটি পত্রিকা।

এরপর 'অতসীমামী' লেখা হল। কিন্তু লেখার আগে মানিক ভেবে নিলেন কি ধরনের গল্প লিখবেন। ঐ তিনটি পত্রিকার চরিত্রও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। সব দিক দিয়ে নতুন ধরনের হবে এমন পরীক্ষামূলক গল্পে তিনি হাত দিতে সাহস করলেন না। কারণ 'একেবারে আনাড়ি, হঠাৎ একদিন কলম ধরে নতুন টেকনিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন বিষয়ের গল্প খাড়া করা সম্ভবও নয়, রেশি 'নতুনত্ব' সম্পাদকের পছন্দ নাও হতে পারে।'[২১] অতএব মানিক ঠিক করলেন—'আদর্শ অপার্থিব প্রেমের জমকালো গল্প ফাঁদতে হবে।'

বলাবাহুল্য কল্লোল অনুসন্ধান করেছিলেন আদর্শহীন পার্থিব প্রেম—যা শারীরিকতায় উত্তপ্ত ও মদির। মানিক কল্লোল-কে নির্বাচন করলে হয়ত এইরকমই কোনো গল্পের পরিকল্পনা করতেন। কিন্তু তাঁর মাথায় আছে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বিচিত্রা—যাঁদের চরিত্র এককথায় বললে 'রক্ষণশীল'। 'অতসীমামী' মানিকের পরবর্তী বিচারে 'হাস্যকর রকমের রোমান্টিক কল্পনা' হলেও এতে প্রেমের অতি-আদর্শায়িত রূপ প্রায় পৌরাণিক মহিমা নিয়ে পরিস্ফুট, প্রচলিত সমাজ-সংস্কারকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্র নেই, অতসীমামী সতীধর্মে সীতা-সাবিত্রীরই সমগোত্রীয়া। এরকম গল্প ভারতবর্ষ-প্রবাসী-বিচিত্রার উপযুক্ত ছিল।

শেষ বিচারে মানিক বিচিত্রাকে মনোনীত করলেন। কেন? প্রথমত

প্রবাসী ও ভারতবর্ষ দীর্ঘকালের সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকা (প্রবাসী বের হয় ১৩০৮-এ, ভারতবর্ষ ১৩২০)। তুলনায় পত্রিকার জগতে নতুন লেখকের মতই বিচিত্রা নতুন আগত পত্রিকা (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত এই পত্রিকার জন্ম ১৯২৭-এ)। নতুন পত্রিকাকে ঘিরে নিয়মিত ও প্রতিষ্ঠিত লেখকগোষ্ঠী তখুনি-তখুনি গড়ে ওঠে না বলে নতুন লেখকদের লেখাও সাদরে গৃহীত ও বিবেচিত হয়। অন্যদিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' অতি অভিজাত, নাক-উঁচু, ব্রাহ্মিক শুচিতাবিদ্ধ পত্রিকা—যেখানে নতুন লেখকের লেখা মাঝে মাঝেই উপেক্ষিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত, তখন জলধর সেনের দ্বারা সম্পাদিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাও ছিল কিছুটা গোঁড়ামিযুক্ত পত্রিকা। নতুনকালের নবীন লেখকেরা এই পত্রিকা বিশেষ পছন্দ করতেন না। ভারতবর্ষের একচ্ছত্র লেখক হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' ঐ পত্রিকা থেকেই একদা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল—এ ঘটনাও স্মরণযোগ্য। মানিক প্রবাসীর বিষয়ে কোনো ঝুঁকি নেন নি, ভারতবর্ষ হয়ত তেমন পছন্দ করেন নি, বিচিত্রাকেই তাঁর লেখা প্রকাশের পক্ষে সর্বাধিক অনুকূল মনে করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিচিত্রা অল্পদিনের মধ্যেই মুদ্রণ পারিপাট্যে, চিত্রসজ্জায়, প্রচারপ্রযত্নে একটি উৎকৃষ্ট অভিজাত পত্রিকা হয়ে দেখা দিয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন সুসাহিত্যিক, অভিজ্ঞ সম্পাদক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সহিষ্ণু ও উদার। সম্পাদক রূপে একমাত্র তিনিই তাঁর পত্রিকাতলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে মেলাতে পেরেছিলেন।[২২] ১৯২৮ সালে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস (আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫) এবং তখন পর্যন্ত অপ্রতিষ্ঠিত নবীন লেখক বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' (আষাঢ় ১৩৩৫ – আশ্বিন ১৩৩৬)। যে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস বের হয়, তার প্রতি উচ্চাকাঙ্খী লেখকের আকর্ষণ জন্মানোটাই স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত কল্লোল-কালিকলমের সাহিত্যে অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্ক তখন চরমে উঠেছে। শনিবারের চিঠির (সাপ্তাহিক রূপে প্রথম প্রকাশ ২৩ জুলাই ১৯২৪) সজনীকান্ত দলবল নিয়ে তখন পুরোপুরি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। অন্যপক্ষে শরৎচন্দ্র ও 'অতি-আধুনিক সাহিত্যের পরাক্রান্ত পরিপোষক' নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। পত্র পত্রিকাগুলিও তখন মোটামুটি দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু 'বিচিত্রা' এই বিতার্কিক কোলাহলের মধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিকায় স্থিত। বুদ্ধদেব বসু এক চিঠিতে অচিন্ত্যকুমারকে লিখছেন—'বিচিত্রায় একটা anti—আধুনিক feeling

আছে'। আসলে বিচিত্রা মধ্যপথ অবলম্বন করেছে। এ কারণেই উপরোক্ত সাহিত্য-বিতর্কের পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়শ্রেণীর রচনাই বিচিত্রায় নির্বিবাদে প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণতঃ—রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' বিচিত্রায় বের হয় ১৩৩৪-এর শ্রাবণ সংখ্যায়। এর প্রতিবাদে নরেশচন্দ্র লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' (ভাদ্র, ১৩৩৪)। নরেশচন্দ্রের প্রতিবাদে দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী লেখেন 'সাহিত্যধর্মের সীমানা-বিচার'। নরেশচন্দ্র এর প্রতিবাদে 'কৈফিয়ৎ' লেখেন। পূর্বোক্ত রচনাদুটি যথাক্রমে আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ (১৩৩৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

অন্যদিকে 'বঙ্গবাণী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় বের হয় শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যের রীতিনীতি' (আশ্বিন ১৩৩৪) এবং রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের নবত্ব' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)। শরৎচন্দ্র প্রভাবিত 'বঙ্গবাণী' কল্লোলের পক্ষ অবলম্বন করে। 'প্রবাসী' সজনীকান্তদের পক্ষ। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, অতি আধুনিক সাহিত্যকে আক্রমণ করার উদ্যোগের মূলে ছিলেন প্রবাসীর অশোক চট্টোপাধ্যায় (রামানন্দের পুত্র) ও যোগানন্দ দাস; 'প্রবাসী অফিস ইহার জন্মভূমি'।[২৩] এসব বিতর্কের পরিণামেই রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার-সভা বসে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-ভবনে—পর পর দু'দিন ৪ ও ৭ চৈত্র, ১৩৩৪। এতে বিবদমান উভয়পক্ষ থেকে যোগ দেন মোহিতলাল, সজনীকান্ত, অচিন্ত্য-কুমার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন মৈত্র, গোপাল হালদার, প্রমথ চৌধুরী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কিন্তু তাতে মীমাংসা কিছুই হয় না। বিতর্ক, উত্তেজনা চলতেই থাকে। সাহিত্যের পাঠক হিসেবে মানিক এসব নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। কলহ-কোলাহল-বিতর্কের এই ধূম্রজালের মধ্যে জড়িয়ে পড়া কল্লোল-কালিকলম-প্রবাসী-বঙ্গবাণী-শনিবারের চিঠি ইত্যাদি পত্রিকার মধ্যে পরমতসহিষ্ণু মধ্যপথাবলম্বী 'বিচিত্রা' পত্রিকাকেই সেদিন হয়ত বেশি ভাল লেগেছিল মানিকের।

আমাদের এত কথা বলার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা যে, মানিকের ক্ষেত্রে কল্লোলে না-লেখার ব্যাপারটা, বুদ্ধদেব বসু আমাদের যেমন বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো 'strange chance' বা 'দৈবাৎ' ঘটে যাওয়ার ব্যাপার নয়। ইতিহাস, তা সমাজেরই হোক বা মনেরই হোক, আকস্মিকতার মালা নয়। মানিক হিসেব করে, অঙ্ক কষে, বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণ করে 'বিচিত্রা' পত্রিকাটি নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁর মনোধর্মের সঙ্গে চেতনে-অবচেতনে কোন যোগসূত্র স্থাপিত না হওয়ায় ও মনের কোথাও

কল্লোলের প্রতি কোনো বিরূপতা সৃষ্টি হওয়ায়, পরেও কোনোদিন, মুখ্যত গল্পপত্রিকা জেনেও, কল্লোলে লেখা ছাপানোর তাগিদ অনুভব করেন নি।'

এবার বিপরীত দিক থেকেও একটি প্রশ্ন তোলা যায়, কল্লোল গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কেউ কখনো মানিককে দিয়ে তাঁদের পত্রিকায় লেখানোর চেষ্টা করেন নি কেন? শক্তিশালী তরুণ লেখকদের লেখা চেয়ে, তাদের উৎসাহ দিয়ে তাঁরা তো অনেক চিঠিপত্র লিখতেন, ব্যক্তিগত ভাবেও যোগাযোগ করতেন। লাভপুরে চিঠি পাঠিয়ে কল্লোলের পক্ষে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তো তারাশঙ্করকে উৎসাহিত করেছিলেন—'এতদিন আপনি চুপ করিয়া ছিলেন কেন?' কিন্তু কলকাতায়, হাতের কাছেই ছিলেন যে মানিক, তাঁকে কখনো কি বলেছেন, আপনি কল্লোলে লেখেন না কেন?

সমস্ত ঘটনাপরম্পরা বিচার করলে আজ মনে হয়—সেদিন উভয়েই উভয়কে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। উভয়ের মানসিক সাযুজ্য ঘটে নি। হয়ত একপক্ষে ছিল যৌবনের বিদ্রোহের নামে অসংযত তরল ভাবোচ্ছ্বাস, অকারণ যৌনতা ও সাহিত্যের আদর্শরিহীন উৎকেন্দ্রিক পদচারণার[২৪] বিরুদ্ধে মানসিক অনীহা ও গুহায়িত বিতৃষ্ণা, অন্যপক্ষে নিঃশব্দ শীতল উপেক্ষা, পরিকল্পিত অপরিচিতের ভঙ্গি। অন্তত মানিকের চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে কল্লোল-সম্পর্কে যে নির্মম সমালোচনী বিশেষ একটা প্রবণতার অস্তিত্ব ছিল তা তো তাঁর বিভিন্ন উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। কল্লোলের কালে সাহিত্য করতে নেমে সচেতন ভাবে- বস্তুবাদের আদর্শ তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে পারেন নি বটে 'কিন্তু ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল'[২৫]—এ কথা মানিকের নিজেরই। এবং এ 'বাস্তব' কল্লোলীয় নয়। বিজ্ঞানাশ্রিত বাস্তব।

একদা বুদ্ধদেবের উক্তির আংশিক প্রতিবাদ করেছিলেন বিষ্ণু দে। অচিন্ত্যকুমারের উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন এ যুগের অন্যতম বরণীয় কথা-শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মানিকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকার বিশেষ মানিক-স্মৃতি সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৬৩। তখন গোপাল হালদার ও ননী ভৌমিক সম্পাদক) 'কল্লোলের কুলবর্ধন'-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন, 'কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে, সম্পূর্ণ সত্য নেই। কল্লোলের সঙ্গে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততা ও বক্রতার বহিরঙ্গে—আন্তরধর্মে তিনি একেবারেই স্বতন্ত্র। এবং একক।'

এই উক্তির সমর্থনে তিনি নিজেই কল্লোলের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন

এইভাবে : 'বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন যে কল্লোল গোত্রীয়দের মধ্যে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র বাংলাদেশে বুদ্ধিবাদের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল—'কল্লোলে' তার তরঙ্গ এসেছিল। প্রথম সমরোত্তর জর্জীয় সাহিত্যের নৈরাজ্যমনন কল্লোলীয়দের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু 'কামনার কাপালিক' এই 'মুসাফেরে'র দল—যাঁরা 'নিখিল নারীর দ্বারে' নিত্য উন্মাদচঞ্চল' হয়ে ঘুরে বেড়াতেন—আসলে চরিত্রধর্মের দিক থেকে ছিলেন পুরোপুরি রোমান্টিক। সেই রোমান্টিকতার তাড়নাতেই তাঁরা দুঃখবিলাসের চড়া সুরে তার বেঁধেছিলেন।...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধারায়। এ ধারা 'কল্লোল'-এর নয়। পূর্বগামী কোনো লেখকের পরোক্ষ প্রভাব যদি তাঁর উপর কখনো পড়ে থাকে, তা হলে দু'জনের নাম অনুমান করা যায়। একজন জগদীশ গুপ্ত. অপরজন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরোক্ত বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত, শুধু পরোক্ষ প্রভাবের ক্ষেত্রে পুনর্বিচারের পর আর একটি নাম আমরা যুক্ত করতে চাই—প্রেমেন্দ্র মিত্র। বলাবাহুল্য এ সব প্রভাবই মূলতঃ মানিকের প্রাক্-কমিউনিস্ট পর্বের রচনাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর শেষ সীমা ধরা যায় 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস।[২৬]

বুদ্ধদেব বসুর 'এন্ একর অব্ গ্রীন গ্রাস'-এর অন্তর্ভুক্ত সমালোচনা অংশটি মানিক দেখেছিলেন নিশ্চয়ই—কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কিছু জানা যায় না। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সেটি পাঠ করে মানিক যথেষ্ট উত্তেজনা বোধ করেছিলেন ঐ সময়কে নিয়ে একটি স্মৃতিকথা লিখবার। নিতান্ত এলোমেলো ভাবে লেখা মানিকের ডায়েরীর এক জায়গায় পাওয়া যায়—'অচিন্ত্যকে ধন্যবাদ। সেকালে যেমন অচিন্ত্য ও আরও অনেকে নতুন ভাবে লিখতে শুরু করে আমার আরও দেরী করে সাহিত্য সুরু করার পরিকল্পনা ভেঙ্গে সাহিত্যে নামিয়েছিল—কল্লোলযুগ লিখে অচিন্ত্য তেমনি আমায় সে যুগের কথা লিখতে বাধ্য করেছে—সে কাজটা আরও বছর দশেক পরে করব ভেবেছিলাম।'

—১৯৪৫ সালের পুরনো ডায়েরীতে ১৯৫২ সালের কোনো সময় (তারিখ নেই) লেখা এই অংশ সম্পর্কে যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছেন যে, উল্লিখিত বিষয়ে কোনো স্মৃতিকথা বা প্রবন্ধ মানিক লেখেন নি। তবে মানিকের পরিত্যক্ত কাগজের মধ্যে কল্লোলযুগ তথা নিজের সাহিত্য জীবনের

অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিকল্পিত একটি বড় লেখার মাত্র দুটি পূর্ণ পৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। তা থেকে কিছু অংশ তিনি তৎ-সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত করেছেন। তথ্যের দিক থেকে তা মূল্যহীন। এ থেকে পুনশ্চ জানা গেল যে অচিন্ত্যকুমারের বই তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছে 'গতদিনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের এক অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর যুগ সম্পর্কে একটা স্মৃতিকথা লিখতে।'

মানিক এ রকম একটা বই লিখলে কি লিখতেন তা নিয়ে এখন আর জল্পনা করে লাভ নেই। তবে অচিন্ত্যকুমারের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি যে একমত ছিলেন না তার ইঙ্গিত 'লিখতে বাধ্য করেছে' [ করছে ? ] শব্দ তিনটির মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া 'লেখকের কথা' বইয়ের অন্তর্গত তাঁর আত্মজৈবনিক নিবন্ধগুলি[২৭] থেকে মানিকের স্পষ্ট মতামত আমরা পেয়েছি। অন্য প্রমাণা-ভাবে তাকেই মানিকের চূড়ান্ত অভিমত বলে মানতে হবে॥[২৮]

### তথ্য-নির্দেশ

১. সাহিত্যপত্র, পুস্তক পরিচয় বিভাগ, ১৩৫৫, শ্রাবণ সংখ্যা।

২. এ সবের আলোচনার জন্য ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৩. মানিক ও কল্লোল, পরিচয়, মানিক সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৬।

৪. 'Like the great quantities of verse and fiction ( if we must call them so ) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine, Manik Bandyopadhyay's sex stories are illustrations of psycho-pathological cases, rendered of course, with great skill.' Reprint Edition (1982). P. 96

৫. একদা গোপাল হালদার মানিক-প্রতিভার বিশ্লেষণ সূত্রে বলেছিলেন—"ইউরোপীয় ভাষায় যে দুর্জয় শক্তিকে 'ডীমন' বলে অভিহিত করা হয়, আমরা তাকে কি নাম দিতে পারি জানি না। সর্বনীতি-নিয়মের অতীত সেই মানস শক্তি যেন নিজেই একমাত্র নিয়ম, নিয়তির মতোই সে অলক্ষ্য ও অনিবার্য। সে শুধু সামাজিক

নীতি-নিয়মের অতীত নয়। যাকে সে আশ্রয় করে তার দৈহিক মানসিক সমস্ত জীবনকেই সে কবলিত করে একমাত্র আপনার অমোঘ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়ে নেয়। অলৌকিকতায় বিশ্ববাসীরা তাকে 'ডেভিল' বলতে পারেন; আর আমাদের অদৃষ্টবাদের দেশে বিমূঢ় হতাশায় আমরা তাকে 'নিয়তি' ও বলতে পারি। আমরা এ শক্তিকে 'প্রকৃতি' ও বলতে পারতাম, 'প্রবৃত্তি' ও বলতে পারতাম; কিন্তু 'প্রতিভা' বলেই এ ক্ষেত্রে আমরা তাকে স্বীকার করতে রাধ্য। আর তার স্বরূপ বুঝলে বলতে পারি-এ হচ্ছে 'বিদ্রোহী প্রতিভা'—বিদ্রোহেই যার আত্মপ্রকাশ, আর তাই আত্মনাশ যার আত্মপ্রকাশেরই প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ।' 'মানিক-প্রতিভা', পরিচয়, বিশেষ মানিকস্মৃতি সংখ্যা, পৌষ ১৩৬৩।

৬. সরোজমোহন মিত্র লিখিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ জীবন ও সাহিত্য', প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৭।

৭. একমাত্র 'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেছেন 'সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনসাধারণকে' যে জনসাধারণ 'মানবতার প্রতীক'।

৮. উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকাটির বিষয়ে সঠিক তথ্য আমরা এখনো উদ্ধার করতে পারি নি। কারো জানা থাকলে বলবেন।

৯. দ্রঃ কল্লোল যুগ, চতুর্থ প্রকাশ, ১৩৬৬, পৃ. ১-২

১০. ডঃ সুকুমার সেন প্রকাশের তারিখ দিয়েছেন—'শুধু কেরাণী' প্রবাসী চৈত্র, ১৩৩০; 'গোপনচারিণী' বৈশাখ ১৩৩১। দ্রঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৪র্থ সং ১৯৭৬, পৃ, ৩৪৪

১১. "পাঁক'-এর নতুন সংস্করণের 'লেখকের নিবেদন' অংশে প্রেমেন্দ্র বলেছেন এটি প্রথমে 'সংহতি' ও পরে 'বিজলী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি 'কালিকলম' এর নাম করেন নি। অথচ এর দ্বিতীয়ার্ধ কালিকলমের প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে সুকুমার সেন 'সংহতি'র নাম করেন নি। আমাদের ধারণা স্মৃতিবিভ্রমে প্রেমেন্দ্রই ভুল করেছেন। সুকুমার সেন জানিয়েছেন, 'পাঁক'-এর প্রথম পর্ব 'বিজলী'তে ১৮ বৈশাখ থেকে ১২ ভাদ্র ১৩৩২, এবং দ্বিতীয় পর্ব কালিকলমে (১৩৩৩) প্রকাশিত হয়। দ্রঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪৪

১২. 'মিছিল'—কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ থেকে আষাঢ় ১৩৩৬। মধ্যবর্তী মাঘ, চৈত্র, বৈশাখ সংখ্যায় বের হয় নি।

১৩. 'আগামীকাল'—কল্লোল, বৈশাখ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ১৩৩৪।

১৪. ১৩৪২ আশ্বিন প্রথম সংখ্যা থেকে ১৩৪৪ আষাঢ় ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র বুদ্ধদেবের সঙ্গে ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন।

১৫. দ্রষ্টব্য—এই প্রবন্ধের প্রথম পর্ব।

১৬. সুকুমার সেন বইটির সঠিক নাম উদ্ধৃত করেন নি। এ কারণে আমাদেরও একটু ভুল হয়েছে (দ্রঃ প্রথম পর্ব, ৩ নং পাদটীকা)। বুদ্ধদেব বসু যে নিষিদ্ধ 'four novels'-এর কথা বলেছেন তা হল—প্রবোধকুমার সান্যালের 'দুয়ে আর দুয়ে চার', অচিন্ত্যর 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' ও 'প্রাচীর ও প্রান্তর' এবং বুদ্ধদেবের 'এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে'। শেষোক্ত বইটিকে বুদ্ধদেব নিজে 'উপন্যাস' বললেও একটি প্রকৃতপক্ষে চারজোড়া যুবক যুবতীর বিচ্ছিন্ন প্রেমের কাহিনী। তবে দু'একটি চরিত্রে সর্বত্র আনাগোনা আছে। [দ্র. 'আমার যৌবন' বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, ১৩৮৪]।

১৭. আনন্দবাজার, ১৪ জানুয়ারী, ১৯৩৩। দ্র. পূর্বোক্ত রচনা-সংগ্রহ, গ্রন্থ পরিচয় অংশ, পৃ. ৫৮১-৮২।

১৮. প্রগতি (বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত সম্পাদিত). আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন, ১৩৩৬, 'সোনার শিকল' অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। দ্র ঐ রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৫, গ্রন্থ পরিচয়, পৃ, ৬৪৩। দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৪৭) গ্রন্থটি আদ্যন্ত পরিমার্জিত হয়।

১৯. দ্রঃ 'কল্লোলের কাল', জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ১৯৭৩, পৃ ২৭ ২৮

২০. দ্রঃ 'গল্প লেখার গান', লেখকের কথা।

২১. দ্রঃ 'উপন্যাসের ধারা', লেখকের কথা।

২২. শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের চতুর্থ পর্ব বিচিত্রায় বের হয় ফাল্গুন ১৩৩৮ থেকে মাঘ ১৩৩৯। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আর কোন পত্রিকায় একসঙ্গে প্রকাশিত হয় নি। উভয়ের লেখার পত্রিকা ভিন্ন ছিল। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ প্রবাসী ও সবুজ-পত্রের লেখক। শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ ও যমুনার। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রায় আরো দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন—দুই বোন (অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন

১৩৩৯) এবং মালঞ্চ (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০)। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে এবং শরৎচন্দ্র প্রবাসী সবুজপত্রে কখনো গল্প উপন্যাস লেখেন নি। একমাত্র বিচিত্রায় উভয়ে মিলেছিলেন।

২৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৬

২৪. প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র, রুশ বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনিবার্য অনুপ্রবেশ, ভারতের বুকে বিশেষত বাংলাদেশের মাটিতে অহিংস ও সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবলতা—এ সমস্ত কিছুই কল্লোলীয় সাহিত্যে কার্যতঃ উপেক্ষিত হয়েছে। শুধু সমরোত্তর এলিয়টী অস্থিরতার ছাপটুকুই দেখা গেছে। অন্যদিকে সাহিত্যের বা জীবনের স্থির কোন আদর্শ না থাকায় কল্লোলের লেখায় ও ছবিতে একই সঙ্গে দেখা গেছে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থানের নায়ক মুসোলিনী ও তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ রোমা রঁলাকে। ম্যাক্সিম গোর্কি ও ন্যুট হামসুন পাশাপাশি অনূদিত হয়েছেন। মধ্যবিত্তের চরম যৌনতার পাশেই স্থান পেয়েছে দরিদ্রতমকে নিয়ে দুঃখ বিলাস। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের গভীর চর্চা না করেই তার বিকৃত প্রয়োগ করেছেন তারা। মানুষের জীবনে ও চরিত্রে কোনো উত্তরণের সংবাদ রাখে নি। পরিণত বয়সেও 'সাড়া' উপন্যাসের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বলছেন—'মানুষের মৌল প্রকৃতির বদল হয় না!'

২৫. 'সাহিত্য করার আগে', লেখকের কথা।

২৬. একদা 'বঙ্গ সাহিত্য উপন্যাসের ধারায়' শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চতুষ্কোণ' উপন্যাসটির প্রকাশকাল দিয়েছিলেন ১৯৪৩। অধুনা কবি শঙ্খ ঘোষ বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংশয়াতীতভাবে প্রমাণ করেছেন এর প্রকাশকাল ১৫ মে, ১৯৪২। (দ্রঃ অনুষ্টুপ, চতুর্থ সংখ্যা ১৯৮৭)। এ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪১ এর শেষভাগ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)। কারণ একটি উপন্যাস লেখা হওয়ার পর বই হয়ে বেরুতে মোটামুটি মাস পাঁচ-ছয় লাগে।

২৭. এই নিবন্ধগুলি হল 'লেখকের কথা'র অন্তর্ভুক্ত—১. 'গল্প লেখার গল্প'—'আমার লেখা গল্প' নামে বেতার ভাষণের (১২ মে, ১৯৪৫) পরিমার্জিত রূপে শারদীয় 'চতুষ্কোণে' প্রকাশিত (১৩৬১)। ২.

'সাহিত্য করার আগে'—১৩৫৮ সনের শারদীয় 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত। ৩. 'উপন্যাসের ধারা'—'উপন্যাসের কথা' নামে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৫৮, জ্যৈষ্ঠ)। ৪. 'লেখকের সমস্যা'—'গল্প লেখার জীবিকা' নামে 'চতুষ্কোণে' প্রকাশিত (১৩৬০, আষাঢ়)।

২৮. উল্লেখ করা হয় নি অথচ সাহায্য নেওয়া হয়েছে এমন কয়েকটি গ্রন্থ ঃ রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় খণ্ড। আমার সাহিত্য জীবন, (১ম, ২য়), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আত্মস্মৃতি, সজনীকান্ত দাস। চলমান জীবন (১ম), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তরী হতে তীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শতবার্ষিক সংস্করণ শরৎ রচনাবলীর গোপালচন্দ্র রায় লিখিত 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশসমূহ, প্রভৃতি ॥

# বাংলা সাহিতে মানিক ঃ অবস্থান এবং অবদান

ক্ষেত্র গুপ্ত

এক

অবশ্যই গল্প এবং উপন্যাস। অল্পস্বল্প কিছু কবিতা ডায়েরি নিবন্ধ জাতীয় লেখা তিনি লিখেছিলেন। মানিককে বুঝবার সহায়ক উপাদান থেকে বেশি গুরুত্ব তাদের নেই।

কথাসাহিত্যিক মানিক উপন্যাস এবং ছোটগল্প দু ধারায়ই এমন কিছু লিখেছিলেন যা মানের দিক থেকে একেবারে উপরের ধাপে। ৩টি উপন্যাস এবং গুটি ১৫ ছোটগল্প এমন আছে যা যে কোনো মাপে সেরা জিনিস। এবং এত সম্পদ নিয়ে যে-কোনো দেশের যে-কোনো লেখক অনেক কাল বাঁচেন। তাছাড়া মাঝারি ভালোও বেশ কিছু আছে। তবে সাধারণ লেখা অনেক। পেশাদার লেখককে নানা বাইরের কারণেও অনবরত লিখতে হয়। যদিও সব লেখায়ই মানিকবাবুর হাতের কিছু কিছু ছাপ—বড় মাপের বাঘের থাবা, চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মোক্ষম শিকার ঐ কয়েকবারই—৩টি উপন্যাস, গুটি ১৫ ছোটগল্প। লেখক মানিকবাবুকে চিনব বড় মেজো ছোট সব লেখা নিয়ে। মানিকের মধ্য দিয়ে জীবনকে সম্ভোগ করব ঐ অল্পসংখ্যক কয়েকটিতে—যেখানে পাঠকের প্রতিক্ষণ নবজন্ম।

কুড়ি-একুশ বছরের লেখকজীবন। মারা যান মাত্র আটচল্লিশে। মানি সব লেখক রবীন্দ্রনাথ নন—যাঁর জীবনবোধ আমৃত্যু বদলেছে। কিন্তু মাত্র আটচল্লিশে মৃত্যু, আরও বিকাশের-বাঁকফেরার সম্ভাবনা থেকেই যায়। পঁয়ত্রিশে-চল্লিশে দু-দুবার পালাবদল যাঁর লেখায়, সেই বদলের আবার বদল ঘটত না কি? আটচল্লিশ বছর বয়সে বঙ্কিম 'সীতারামে' ধর্মতত্ত্বের সব মোহ ভেদ করে তীব্র বেদনায় জেগে উঠেছিলেন; এবং সাতবছর মৌনের পরে 'রাজসিংহে'র নতুন সংস্করণ করতে গিয়ে নতুন উপন্যাসে গেয়েছিলেন 'সোয়ান সঙ'। মানিক কিন্তু সব সম্ভাবনা নিয়ে আটচল্লিশে মারা যান,—যদিও সাহিত্যভাবনায় এ-সবই অলস বিলাস।

দুই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস একটু ঘনিষ্ঠভাবে পড়লে তাঁর বিকাশকে তিনটি স্তরে ভাগ করতে ইচ্ছা হয়।

প্রথম স্তর ॥ [ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ ]

এই সময়ে লেখা :

ছোটগল্পের বই : অতসীমামী, প্রাগৈতিহাসিক, মিহি ও মোটা কাহিনী, সরীসৃপ, বৌ, সমুদ্রের স্বাদ, ভেজাল, হলুদ পোড়া পরে বেরুলেও কিছু গল্প আগে লেখা।

উপন্যাস : জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মা-নদীর মাঝি, জীবনের জটিলতা, অমৃতস্য পুত্রাঃ, সহরতলী, অহিংসা, ধরাবাঁধা জীবন, প্রতিবিম্ব।

দ্বিতীয় স্তর ॥ [ ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ ]

গল্পের বই : ভেজাল, হলুদপোড়ার অনেক গল্প, আজ কাল পরশুর গল্প, পরিস্থিতি, খতিয়ান, ছোটবড় ( অংশত )।

উপন্যাস : দর্পণ, সহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি, চিহ্ন, আদায়ের ইতিহাস, চতুষ্কোণ।

তৃতীয় স্তর ॥ [ ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ ]

গল্পের বই : ছোট বড় ( অংশত ), মাটির মাশুল, ছোটবকুলপুরের যাত্রী এবং পরের লেখাগুলি।

উপন্যাস : জীয়ন্ত থেকে পরের সব কটি উপন্যাস।

স্তর বিভাগে অল্প এদিক-সেদিক হতেই পারে। কোনো বই, কোনো বইয়ের কিছু গল্প লেখার সময় মিলিয়ে কিছু আগে-পিছে করা হয়ত সম্ভব। তাতে আমার মূল স্তর বিন্যাসে রকমফের ঘটবে না।

তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি বন্ধু সরোজ মিত্রের বই থেকে। সে-জন্য কৃতজ্ঞতা। যদিও তাঁর বিশ্লেষণের সঙ্গে আমার কোথাও কিছু বনিবনা নেই। এবং গুরু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থের মানিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে গোড়ায়ই সপ্রণাম বিদায় জানিয়ে রাখি।

মানিকের বিকাশকে এতকাল দুটি স্তরে ভাগ করে দেখা হয়েছে। স্থূলভাবে বলা হয়েছে সে বিবর্তন ফ্রয়েড থেকে মার্ক্সে। মানিকের নবজন্ম বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা উজ্জ্বল বিশ্লেষণের অন্ধ অনুসরণে অভ্যস্ত

না হলে স্তর দুটো নয় তিনটে। সেই বোধ প্রয়োজন—না হলে মানিককে ঠিকঠাক জানায় বড় ধরনের ফাঁক থেকে যাবে।

তিন

পূর্বোক্ত তিন স্তরের মধ্য দিয়ে ভারতের বিশেষ করে বাংলার ইতিহাস কিভাবে এগিয়েছে তার পরিচয় এবং মানিকের অবস্থান সূত্রাকারে নির্দেশ করছি।

প্রথম স্তর॥ আইন অমান্য ব্যর্থ—স্বাধীনতা আন্দোলন স্তিমিত। বিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক উত্থানের চেষ্টা পর্যুদস্ত। সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের চক্রান্ত কুশল চরিত্র, আপোসপ্রবণতা। আসন্ন মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা—ব্যাপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ-বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা, আগের বিরূপতা মুছে দিলে ('বদনাম' গল্পে), ফ্যাসীবাদী যুদ্ধের প্রতি ধিক্কার (ধ্বংস' গল্পে) প্রয়াত।

কয়েকবছর আগে মারা গেছেন শরৎচন্দ্র—নতুন সময়ের প্রভাবে পরিবারতন্ত্রের ভাববিলাস থেকে বাইরে আসতে চাইছিলেন, যদিও নৈতিকতার আবর্ত কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি (শেষ প্রশ্ন)।

মানিক দর্শক।

যদিও সমকালীন তারাশঙ্কর গ্রামীণ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গী।

এই স্তরের শেষে ফ্যাসীবিরোধী আন্দোলন থেকে মানিক দর্শকের আসন থেকে নেমে আসেন। তখন দিগন্তে দুর্ভিক্ষ। তার ফল ফলতে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ।

দ্বিতীয় স্তর॥ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বত্র। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে আগেই। তার প্রচণ্ড ফলাফল। যুদ্ধের শেষ—গণ আন্দোলনের তীব্রতা—দাঙ্গা—দেশভাগ ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বিষয়ে মোহভঙ্গ।

মানিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

তৃতীয় স্তর॥ কংগ্রেসী শাসনের নগ্ন শ্রেণীস্বার্থ প্রকট। জনগণের দুর্গতি। দুর্নীতি স্বজন পোষণ। মানবিক সুস্থ মূল্যবোধের দ্রুত ও ক্রমিক অবক্ষয়। পশ্চিমবঙ্গে গণআন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রসার। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের অতিবিপ্লবী কার্যক্রম।

ঝ্‌দানভ থিসিস। রবীন্দ্রগুপ্ত থিসিস ও শিল্পী সাহিত্যিকের নতুন দায়িত্ব।

কমিউনিস্ট মানিকের গভীর সংযোগ ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া।

তৃতীয় পার্টি কংগ্রেসের নতুন লাইন—রবীন্দ্রগুপ্ত থিসিস পূর্বেই পরিত্যক্ত।

অব্যাহত ঝানভ থিসিস।

কমিউনিস্ট ভাবনা ও আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মানিক।

কমিউনিস্ট বিরোধিতায় তারাশঙ্কর নতুন ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সন্ধানে।

আরও অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক।

কিছু অনুজ লেখকসহ মানিক বাংলা সাহিত্যে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব।

স্তরগুলির সীমারেখা বরাবর একে অন্যের মধ্যে কিছু ঢুকে গিয়েছে। সাহিত্য-শিল্পের আলোচনায় পার্থক্যের লাইনগুলো একেবারে সোজা ও অনড় থাকে না, একথা সবাই মানবেন।

চার

এই তিন স্তরে মানিকের গল্প এবং উপন্যাসে যে-সব বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে তার একটি তুলনামূলক ফর্দ নিচে দেখানো হল। সমাজ, ব্যক্তি, রীতি; ভাষা এবং দৃষ্টিকোণও জীবনবোধ এই কটি দিক তুলনা করব। এ শুধু তুলনা নয়, বিকাশও বটে।

| প্রথম স্তর | দ্বিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর |
|---|---|---|
| সমাজ ১ রাজনৈতিক পটভূমি নেই। | ১, রাজনৈতিক পটভূমি ও প্রসঙ্গ | ১, পটভূমিতে বিষয়ে সর্বত্র রাজনীতি। |
| ২. শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ কোনো নির্দিষ্ট সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ছাড়া—তবুও শ্রেণীশোষণের চেতনা। | ২, মার্কসীয় বোধের অস্ফুট প্রকাশ। সুনির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যমূলক নয় উপন্যাসে; গল্পে অনেকটা। | ২, ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং প্রকট উদ্দেশ্য-মুখিতা। |
| ৩. পরিবার জীবনের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে গ্রাম জুড়ে—শহরের অনেক-টায় ছড়িয়ে পড়া। | ৩, বজায় আছে। গ্রামের তুলনায় শহরের প্রাধান্য। | ৩, দ্বিতীয় স্তরের মতো। |

| প্রথম স্তর | দ্বিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর |
| --- | --- | --- |
| ব্যক্তি ১. ব্যক্তির জটিলতা অন্তর্মুখিতা—নিষ্ক্রিয়তা<br>১. ১ চরিত্রের গভীরে অবদমিত যৌনবোধের বিচিত্র খেলা।<br>১. ২ আর্থিক লাভ-লোকসানের সূক্ষ্ম হিসেব<br>১, ৩, উপরের দুই উপাদানের বহু-মাত্রিক মিশ্রণ।<br>১, ৪. যৌনতা-আর্থিক উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ বিবিধ মনোকূট | ১, উপন্যাসে সর্বত্র না হলেও অনেক লেখায় এই সব জটিলতা আছে, তবে জট কমেছে, গভীরতা কমছে। নিষ্ক্রিয়তা এখনও একটি বড় বৈশিষ্ট্য। | জটিলতা নেই—<br>নেই গভীরতা।<br>নিষ্ক্রিয়তা—দার্শনিক নিস্পৃহতা নেই।<br>মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারিয়ে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিনিধি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।<br>মানুষ অর্থনৈতিক শ্রেণীর টাইপ। |
| ২, সক্রিয় কর্মসফল ব্যক্তি ও পূর্বোক্ত উপাদানের জন্য এবং অনির্দেশ্য দার্শনিক কোনো কারণে অনেকটা নিস্পৃহ। | ২, দার্শনিক নিস্পৃহতা ক্বচিৎ লক্ষণীয়। | |
| ৩. যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠী বিচিত্রস্বভাব ব্যক্তির সমাবেশ। | ৩, যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠী অভিপ্রায়মুখী—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঢাকা পড়ছে। | |
| রীতি উত্তেজনাহীন প্রাত্যহিক ঘটনা। বিশ্লেষণ প্রধান ভঙ্গী। সুস্পষ্টভাবে অনাটকীয়। কাহিনীতে নিটোল পূর্ণতা নেই। আবেগ প্রায় নেই। 'ছোট উপন্যাসে'র একটি প্রজাতির প্রতিষ্ঠা (রবীন্দ্রে সূচনা) | তবে বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা ক্রমে কমেছে। | বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় আছে |

| প্রথম স্তর | দ্বিতীয় স্তর | তৃতীয় স্তর |
|---|---|---|
| ভাষা সংযত সংহত আবেগহীন ?ক্র বুদ্ধি-দীপ্ত। যখন সংরাগ গাঢ় বা হিংস্র বা কুটিল তখনও শান্ত। | বজায় আছে বিশেষ ছোট গল্পে। কোনো কোনো ছোট গল্পে। | ভাষা সংযত, সংহত এবং স্বল্পাবেগ। বুদ্ধির ছাপও আছে। কিন্তু অনেক ফ্ল্যাট। সূক্ষ্মতা ও ইঙ্গিতময়তা নেই। কচিৎ দু একটি গল্পে আছে অবশেষ। |
| দৃষ্টিকোণ জীবনবোধ নির্মম নিস্পৃহতায় মাত্র ভেদ করা যায় মানব সত্য। বাইরে যে সুখদুঃখ ঘটনা দুর্ঘটনা তা পুতুল নাচ-নাচায় যে তার গোপন বাস ব্যক্তিমনের গুহায় —যৌনবোধে-আর্থিক স্বার্থে-বিচিত্র জাগরস্বপ্নে স্বপ্নভঙ্গে —পাপবাসনার অকৃত পাপবোধে। তা থেকে মুক্তি নেই। মুক্তির সাধনা ময়নাদ্বীপের কঠিনতর বন্ধন ও ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করে। চেতন চিত্ত তাই অসহায় নিষ্ক্রিয় অবক্ষয়িত। | মুক্তির আহ্বান বাইরের সমাজ থেকে ক্ষণে ক্ষণে ধাক্কা দেয় সেই গুহাহিত অস্তিত্বকে। জনজীবন-কমিউনিজম। জট খোলে না মহাকালের জটার। শুধুই প্রতিবিম্বে দৃষ্টি-বিভ্রম, সমচতুষ্কোণে রুদ্ধ গতি। | মনের আবর্ত ভেঙে শিল্পী বাঁচেন জনতার সংগ্রামে। শিল্প বাঁচে কি? একি জিজ্ঞাসার উত্তর, অথবা সব প্রশ্ন ছাড়িয়ে উত্তরণ? |

## পাঁচ

উপরের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমি দুটি সত্য বুঝেছি।

১. মানিকের শিল্পী-জীবনে একবার নয়, দুবার বদল ঘটেছে। আমার পরিকল্পিত দ্বিতীয় স্তরটিকে প্রথম বা তৃতীয় স্তরের ভেতরে টেনে আনা যায় না; ভাগ করে দুটি স্তরের মধ্যে বাঁটোয়ারা করারও সুযোগ নেই। কারণ তার পক্ষে তথ্যের ভিত্তি মিলবে না।

২. প্রথম বদলের তুলনায় দ্বিতীয় বদলে তাঁর লেখা শিল্প-মানে অনেক নেমে গিয়েছে।

মানিক কিন্তু কমিউনিস্ট হয়েই প্রথম বদলালেন।

প্রথায় অন্ধ অথবা ধান্দাবাজ বাজারী সমালোচকেরা বলেন, কমিউনিজম মানিককে শিল্পগুণভ্রষ্ট করেছে। তার জবাব দিতে গিয়ে, দায়বদ্ধতার গুণ-কীর্তন করে, পূর্বের লেখাকে অস্মিতার বিকার এবং উত্তরকালের রচনাকে বলিষ্ঠ জীবনমুখিতা বলে এড়িয়ে গিয়ে লাভ হবে না। আসল জবাব অন্যত্র।

এ কথা তো মানতেই হবে তৃতীয় স্তরে ভালো গল্প দু একটি—ভালো উপন্যাস নেই। বিষয় ভালো নতুন ও মনোমতো হলেই লেখা হয় না।—এই প্রাথমিক কথাটা আর যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে দেখাব না। দ্বিতীয় স্তরে অনেক ভালো গল্প,—প্রথম পর্যায়ের সঙ্গে অনেক সময়ে তুল্যমূল্য। মাঝারি উপন্যাসও দু-একটি আছে। পুতুল নাচ-পদ্মানদী-অহিংসা কোথায় পাবেন? বিশ্ব-সাহিত্যে (মাপ করবেন, আমার ইংরেজি-পড়া বিদ্যা) ও-রকম মুষ্টিমেয়ই হয়।

ওই সব সমালোচকদের স্তব্ধ করে দেবে এই দ্বিতীয় স্তরের ধারণা এবং বিশ্লেষণ। কমিউনিস্ট মানিক দ্বিতীয় স্তরে সফল শিল্পী—কমিউনিস্ট মানিক তৃতীয় স্তরে নন। কাজেই ব্যাপারটা কমিউনিস্ট বলে নয়, অন্য কোথাও।

তৃতীয় স্তরে পার্টির ভুল লাইন, তার অনুসরণে রবীন্দ্র গুপ্তের ভুল থিসিস শিল্পের কাছে যা চাইল তা সরাসরি রাজনীতি—শিল্প নয়। ভুল লাইন সংশোধিত হলেও জের মিটল না।

জোসেফ স্তালিন মায়াকভস্কি ছেড়ে পুরনো পুস্কিন পড়তেন। শিল্পীকে বলেছিলেন 'Engineers of Human Soul'। ঝানভেরা ইনজিনিয়ার' শব্দটা মনে রেখে 'সোল' কথাটা ভুলে গেলেন। ফাদায়েভদের রাইটার্স ইউনিয়নের দাপট গোটা সোবিয়েত সাহিত্যকে মাঠো জিনিস করে তুলল। ব্যতিক্রম অনেক খুঁজে পেতে হয়। না হলে আজ গ্লাসনোস্ত-এর তত্ত্ব এতটা জাঁক করে উচ্চারণ করতে হত না।

শিল্পী মানিক একজন ব্যক্তি। তিনি সত্যান্বেষী ও সমাজচেতন বলেই না কমিউনিস্ট হলেন,—সেকালে কমিউনিস্ট হবার বাস্তব দুঃখ-দারিদ্র্য মেনে নিলেন, লড়লেন। কিন্তু শিল্পীর ব্যক্তিধর্ম কোথায় যাবে? সমাজ তাঁর লেখায় ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে—তার বিকাশের নানা জটিল রঙ নিয়ে প্রকাশ পাবে—এটাই স্বাভাবিক। পাচ্ছিলও। দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় স্তর আমরা বড় জবরদস্তি করলাম। তার ফল মানিক-সৃষ্টির তৃতীয় স্তর।

সাহিত্যকে আজ যারা বাজারের সস্তা ও চালু পণ্য করে পয়সা করছে, প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য ও গোপন নির্দেশে কল্প-মনোবিকারকে পুঁজি করছে—তারা মানিকের কেউ নয়। সফট পর্নো, অহেতুক মর্বিডিটি, লক্ষহীন ভায়োলেন্সে প্রথম-দ্বিতীয় কোনো স্তরের মানিককে ছোঁয়া যায় না। আমরাও কি মানিকের আত্মীয়—ঐ তৃতীয় স্তরের গুণগ্রাহীরা?

# শিশিরকুমারের 'সীতা'

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'সীতা' শিশিরকুমারের নাট্য-লক্ষ্মী, বিজয়লক্ষ্মী। যখন তিনি থিয়েটারের 'অধিকারী' হয়েছেন, নিজের মতো করে থিয়েটার করতে পেরেছেন, তখন করেছেন 'সীতা'। ইডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা', তিন রাতের কথা ছিল, হোলো বারো রাত। যশ ও অর্থ দুদিক থেকেই নাট্যলক্ষ্মীর দৃষ্টি তখন অতি প্রসন্ন শিশিরকুমারের উপরে। অস্থায়ী থেকে তিনি স্থায়ী মঞ্চে এলেন, সাময়িক অভিনয় থেকে নিয়মিত অভিনয়ে এলেন. ইডেন থেকে এলেন মনোমোহনে, তখনও উদ্বোধন-রজনীর শুভ-নাটক ঠিক ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র স্বত্ব তখন হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তাতে শিশিরকুমার, প্রতিহত হয়ে অন্য কোন নাটক ধরলেন না। 'সীতা'ই করলেন—যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'। পেলেন তাতেও নাট্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি। এবারের দৃষ্টি প্রসন্নতর, উজ্জ্বলতর। ব্যাপক জনসমর্থন পেলেন শিশিরকুমার, যথেষ্ট অর্থসমাগম ঘটলো. বহু বিদগ্ধ সমালোচক লিখলেন উচ্ছ্বসিত অনুকূল সমালোচনা। এঁদের আলোচনায় প্রযোজনার কয়েকটি দিকে এঁরা বিশেষ জোর দিয়েছেন—যেমন কনসার্টের বদলে রোশনচৌকি, মঞ্চসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদের কালানুগত্য, ফুটলাইট তুলে দিয়ে ওপরে দিকে আলো স্থাপন, নতুন অভিনয় রীতি, টিম-ওয়ার্ক ইত্যাদি। নাটকের বিষয় বা গঠন নিয়ে তেমন আলোচনা হয় নি। ঘটনাচক্রের আয়রনি বা পরিহাস এই যে 'নবযুগের' উদ্বোধন ঘটলো একটা পৌরাণিক নাটক দিয়ে। নবযুগের নবত্ব কি তাহলে আসন-সারির বঙ্গাক্ষর, সানাই, সজ্জা, পরিচ্ছদ, আলো ও অভিনয়ের ধরনেই মাত্র চিহ্নিত? নাট্য-বিষয় এবং নাট্য-গঠনের সঙ্গে কি তার কোনো সম্পর্ক নেই? বিষয় ও গঠন পুরনো হলে সাজসজ্জা বা আলো বা অভিনয় কি তাকে নবত্ব' দান করতে পারে? বহু শতাব্দী ধরে সীতার দুঃখে বাঙালীরা চোখের জল ফেলেছে। সীতা-কাহিনীর এই জনপ্রিয়তাকেই কি কিছু নব্য প্রসাধনে সাজিয়ে 'নবযুগ' সৃষ্টির প্রচেষ্টা? এই প্রশ্ন আরো জোরালো হয়ে ওঠে এই কারণে যে সীতা-বনবাস-কাহিনী পুরাতন আখ্যানু মেনে মোটামুটি একই রকম ভাবে বলা হয়েছে, বিশেষ কোনো বদল ঘটানো

হয় নি। আজও অনেকে পুরাণকাহিনী নিয়ে নাটক লেখেন, কিন্তু তাকে আজকের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে নতুন তাৎপর্য দান করেন। তাতে গল্প মোটামুটি এক থাকলেও বিন্যাস ও তাৎপর্য পালটে যায়, তার আত্মা নতুন আলোক বিকীরণ করে। 'সীতা' তেমন নাটক নয়। তাহলে কোথায় কতটুকু তার নবত্ব?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের একটু আগে থেকে সুরু করতে হবে। বাল্মীকি, ভবভূতি, কৃত্তিবাস—এঁদের কথা বিশেষভাবে তোলবার দরকার নেই। কিন্তু সীতার বনবাস নিয়ে দুটি নাটক দ্বিজেন্দ্রলালের আগেই রচিত হয়েছে। 'সীতার বনবাস' নাটক লেখেন উমেশচন্দ্র মিত্র। রচনাকাল ১৮৬৬। এটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বইয়ের (১৮৬০) অনুসরণ। দ্বিতীয় বই 'সীতার বনবাস'। রচয়িতা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ সালে। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ—২০ জানুয়ারি ১৮৮২। বইটি গিরিশচন্দ্র উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে। বিদ্যাসাগরের বইয়ের মূল আদলটা তিনিও নিয়েছেন। রাম-সীতার প্রেমের জীবনে দুর্মুখের আবির্ভাব এবং কলঙ্ক-কথা-জ্ঞাপন। রাম সীতাকে ছলনা করে লক্ষ্মণের সঙ্গে তাঁকে বনে পাঠালেন। সীতা তপোবনে বেড়াতে যেতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্মণ যেন তাঁকে বেড়াতেই নিয়ে গেলেন। পরে বনে সব কথা বলে সীতাকে ফেলে ফিরে এলেন। এতেই দুটি অঙ্ক। পরের দুটি অঙ্কে লব-কুশের হাতে রামের যজ্ঞাশ্ব আটক, রামের সীতাকে পুনরায় গ্রহণের ইচ্ছা। সভায় সীতাকে সতীত্বের বিশেষ প্রমাণ দর্শাতে বলায় 'বজ্রাহতা' সীতা মানবলীলা সংবরণ করেছেন—এই ভাবে সীতার মৃত্যুর কথা আছে বিদ্যাসাগরে। গিরিশচন্দ্রে সীতার পাতালে প্রবেশের কথা আছে। তার পরেই 'শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব' এবং ব্রহ্মা লীলা-গান গেয়ে সীতা-রামের স্মরণ করিয়েছেন। অর্থাৎ পৌরাণিক নাটকের রীতি অনুসারে অলৌকিক ভাবে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার মিলন-সাধন। দুয়ের কোনো বইতেই শম্বুক-বধের আখ্যান নেই।

প্রধান অমিল রামচরিত্রে। বিদ্যাসাগরের রাম 'কুলের কলঙ্ক বিমোচন' এবং 'লোকরঞ্জনে'র জন্য 'বিনা অপরাধে', 'সরলহৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা' সীতাকে ত্যাগ করেছেন। 'আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক'—এই ভয়ও ছিল বিদ্যাসাগরের রামের। কিন্তু বিদ্যাসাগরের রাম নিজে সীতাকে কখনো কলঙ্কিনী মনে করেন নি। গিরিশচন্দ্রের রাম তা মনে করেছেন।

রামের মনে এই সন্দেহ তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন দুর্মুখ আসবার আগেই। সীতার মনেও কলঙ্ক, ভয় ও আবছা অপরাধ বোধ ঢুকিয়ে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। নাটকের গোড়াতেই আছে দুটি স্বপ্ন। প্রথমটি দেখেছেন রাম। স্বপ্নে মন্দোদরী তারা ও নিকষা দেখা দিয়ে একসঙ্গে বলে :

> 'মিথিলায়, অযোধ্যায়
> কহে জনে জনে "সতী নারী তব সীতা"—
> সেই ব্যঙ্গস্বর
> এখন জাগিছে অন্তরে আমার।'

'ম্যাকবেথ' নাটকের তিন ডাইনির মতো এরা সুরুতেই রামের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহের বীজ পুঁতেছে বা তার মনে যে সন্দেহ ছিল তার বিস্তারে সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি দেখেছেন সীতা : 'সুন্দর সন্তান করিতেছে স্তনপান,' সন্তানসম্ভবা সীতা এ স্বপ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পারেন। কিন্তু তার পরেই সীতার উক্তিটি মারাত্মক। তিনি শিউরে উঠে বললেন, 'দেখ, নাথ, কার এ সন্তান?' এই শিউরে ওঠা, 'কার এ সন্তান' এই প্রশ্ন—এ সবই সীতার কলঙ্কভয় থেকে জাত।

এর পরে আরো একটি ঘটনা আছে গিরিশচন্দ্রে, উর্মিলার অনুরোধে—সে সীতাকে দশ-মুণ্ড কুড়ি-বাহু রাবণের একটি চিত্র এঁকে দেখাতে বলে। সীতা তা আঁকেন। একটু পরে খুব ঘুম পায় সীতার এবং তিনি ঐ রাবণের ছবির উপরেই শয়ন করেন ও নিদ্রা যান। এটি কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে। একটু পরে রাম প্রবেশ করেন এবং সীতাকে রাবণচিত্রের উপরে ঘুমোতে দেখেন। তখন কৃত্তিবাসের রামের প্রতিক্রিয়া : 'সীতা পাশে যে রাম লিখিত ন।/সত্য অপযশ করে সর্বজন।' গিরিশচন্দ্রে রাম বলেন :

> 'এ কি!
> রাবণের চিত্র হেরি।
> ফলিল তারার অভিশাপ,
> দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার,
> কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী।—'

একটু পরে রাম সীতাকে বললেন : 'তপোবনে মুণিকন্যাগণে / কবে যাবে করিতে প্রণাম?' অর্থাৎ বনবাস-দানের সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন রাম। পরের দৃশ্যে (প্রথম অঙ্ক। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে) রাম লক্ষ্মণকে বলেছেন :

'দুষ্টা নারী সীতা,
চিত্রি রাবণের অবয়ব
হানি বাজ লাজে,
স্বচক্ষে দেখেছি সীতা ঢালিয়াছে কায়,
রাক্ষস-ছবির পরে।
... ... ... ... ... ... ...

পাপের সঞ্চার
নাহি জানি কি হেতু রমণী বধে!
কলঙ্কিনী বধিলে কি দোষ?
ছি ছি ছি ছি!'

লক্ষ্মণ রামের এই কথাকে বলেছেন 'নিদারুণ, তখন রাম বলছেন ঃ

'জান না, জান না, বুঝ না কুলটা-রীতি,
............. ........... ......

সরল তোমার প্রাণ,
জান না নারীর রীতি ভাই রে লক্ষ্মণ!
ছিল অহল্যা পাষাণী,
মহামুনি-গৌতম-গৃহিণী,
কুলটা দোষের হেতু।'

এখানেই থামেন নি গিরিশচন্দ্রের রাম। বালি-পত্নী তারা এবং রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর কথা বলেছেন—তারা এখন সুগ্রীবের সঙ্গে এবং মন্দোদরী এখন বিভীষণের সঙ্গে মিলিত। এর পরে রাম সীতাকে বলেছেন 'সাপিনী' এবং 'বিষময়'। এর পরে কিছু বিলাপও অবশ্য আছে রামের।

বাল্মীকি এবং ভবভূতির রাম এমন নয়। বাল্মীকির রাম সীতাকে শুদ্ধা বলে জানেন অন্তরে, কিন্তু অপবাদের ভয়ে বনবাসে পাঠাচ্ছেন। ভবভূতির রাম প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগরের রাম সীতাকে কলঙ্কিনী মনে করেন নি। বরং নিজেকে বলেছেন 'মহাপাতকী', 'চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্রগুণে অধম।' সীতা-বধের কথা তাঁর মনে হয় নি। বরং মনে হয়েছে 'যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি।' লক্ষ্মণের মুখে রামের সম্পর্কে শোনা গেছে 'কঠিনহৃদয়', 'নির্দয়', 'নৃশংস' এই সব বিশেষণ। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের রামের মন অনেকটা সংস্কারমুক্ত, আর গিরিশচন্দ্রের রাম গোঁড়া হিন্দুর রক্ষণশীলতার

দ্বারা আচ্ছন্ন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের উৎসর্গ-পত্রে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি মহাশয়কে লঙ্ঘনই করেছেন—তাঁর পশ্চাৎমুখী মনোভাবের দ্বারা।

'সীতার বনবাস' নাটক গিরিশচন্দ্রের একদম গোড়ার যুগের লেখা। দৃশ্য-বিন্যাসে শৈথিল্য আছে, সংহতি নেই। এ নাটকের চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক। তৃতীয় অঙ্কে এগারোটি গর্ভাঙ্ক। চতুর্থ অঙ্কে একটি গর্ভাঙ্ক। অঙ্কগুলির গর্ভাঙ্ক-সংখ্যা সমান হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবু এই বিন্যাসে ভারসাম্যের যেন কিছু অভাব আছে মনে হয়। আর দৃশ্যের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র, যেমন তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। এতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার সমস্যা বাড়ে, সময়ও বেশি লাগে, সংহতিবোধও ক্ষুণ্ণ হয়। পৌরাণিক নাটকের যুক্তিহীনতা ও অলৌকিকতা মেনে নিয়ে এ নাটকে নিকষা ও ব্রহ্মার উপস্থিতি ঘটানো হয়েছে। পৌরাণিক নাটকের রীতি মেনে এ নাটককে সীতা-বিচ্ছেদের দুঃখে সমাপ্ত করা হয় নি। একদম শেষে 'শূন্যে কমলাসনে লক্ষ্মীরূপে সীতার আবির্ভাব' দেখানো হয়েছে।

শিশিরকুমার যখন সীতা বিষয়ে নাটক করতে চান, তখন তাঁর সামনে গিরিশচন্দ্রের এ নাটকটি ছিল। নানা সূত্রে জানা যায় যে শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে খুবই সশ্রদ্ধ ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাস' খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৮৮) এ নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করেন। কিন্তু শিশিরকুমার এ নাটক গ্রহণ করেন নি। নিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা'. এই নির্বাচনের মধ্যেই শিশিরকুমারের নব্য মনের প্রাথমিক পরিচয় আছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের রাম সন্দিগ্ধ ঈর্ষাকাতর সংকীর্ণমনা নন। গোঁড়া রক্ষণশীলতা তাঁর চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি। রাম-সীতার ব্যক্তি-প্রেম এখানে উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত। প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে তাঁর দ্বন্দ্ব। রাজা ও প্রেমিক—এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বে দীর্ণ রামচন্দ্র। চরিত্রের এই জাতীয় দ্বন্দ্ব তখনকার নাট্যাদর্শে কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে। শিশিরকুমারের বা যে কোনো বড় অভিনেতার অভিনয়-ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও এটি অনুকূল। একমুখী ভাবপ্রকাশে এক ধরনের লিরিক্যাল আত্মউদ্ঘাটন ঘটে চরিত্রের, আর বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে সত্তার এক প্রবল উৎক্ষেপ ঘটে—এই দু রকমের অভিনয়েরই সুযোগ ছিল

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। 'সীতা' পৌরাণিক নাটক হয়েও আগের আমলের ধাঁচে একেবারেই রচিত নয়। যুক্তিহীনতা বা অলৌকিকতাকে এ নাটক প্রশ্রয় দেয় নি। কোনো চরিত্রকে ভাবে নি দেবতা বা দেবী। অন্তিমের দৃশ্যে শূন্যলোকে বা স্বর্গলোকে স্থাপন করে নি দুঃখহীন অনন্ত জীবনের মরীচিকা। পাঁচ অঙ্কের শেক্স্‌পীয়রীয় নাট্যবিন্যাস এখানে অনেকটা সুস্থিত। নতুন কাহিনী যুক্ত হয়েছে শূদ্রক-বধ। রাম-কৃত এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের জন্য শূদ্রক-পত্নী রামকে দিয়েছেন অভিশাপ। সীতা তাঁর প্রতি অন্যায় নীরবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই নীরব বেদনা ও শূদ্রক পত্নীর উচ্চারিত অভিশাপ—দুটি যেন জড়িয়ে গেছে অন্যায়কারীর জীবনে, দুর্বিষহ করেছে তার প্রতিটি মুহূর্ত। শূদ্রক-হত্যা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বক্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য: 'আমি স্বীকার করি যে, রাম কর্তৃক শূদ্রকরাজার শিরশ্ছেদ আমার কাছে একটি গর্হিত কার্য বলিয়া প্রতীতি হয়। আমি সে অংশ চিত্রিত করিতে সে দোষ ক্ষালন করিতে বা তাহার কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করি নাই। অনেক হিন্দুত্বের পক্ষপাতীদের মতে, সে কালে হিন্দুজাতির যাহাই ছিল তাহাই জ্ঞানের ও নীতির চরম উৎকর্ষ ছিল। আমার সে ধারণা নহে। আমার মতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় ব্যবহার অতি অন্যায় ছিল। গ্রীসে হেলটগণ যেরূপ প্রপীড়িত হইত, আমাদের দেশে শূদ্রগণ প্রায় সেইরূপ প্রপীড়িত হইত। মন্বাদি বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শূদ্রকরাজার প্রতি রামের ব্যবহার অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু আমি এ ব্যবহারের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে দোষী না করিয়া তাঁহার গুরুদের বশিষ্ঠকে দোষী করিয়াছি এবং মহর্ষি বাল্মীকির কাছে বশিষ্ঠের পরাজয়ে বশিষ্ঠের মত ভ্রান্ত এই মাত্র কল্পনা করিয়াছি। তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ও উদার হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করি নাই।'

আজকের দিনে এর পরেও নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে এগুলি কিছুটা অগ্রগতিরই স্বাক্ষরবাহী, পৌরাণিক নাটককে দেবলীলা হিসেবে দেখেন নি এঁরা, মনুষ্য-কাহিনী হিসেবে দেখেছেন, মানুষের চরিত্র ও সমস্যা বোঝবার চেষ্টা করেছেন। এর সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, আছেও, কিন্তু গতিটা ঠিক দিকেই ছিল।

মাত্র বারো রাত্রি অভিনয়ের পর শিশিরকুমারের এই সৌভাগ্য লক্ষ্মী অপহৃত হয়। বীর শিশিরকুমার এতে প্রথমে একটু থমকে গেলেও দমে যান নি। দ্রুত লিখিয়ে নিলেন নতুন সীতা। যোগেশ চৌধুরী তখন অখ্যাত। তিনি

'সীতা'র আগে কোনো নাটক লেখেন নি। তবু তাঁর ওপর শিশিরকুমার ভরসা করতে পারলেন তার কারণ তাঁর ভরসা ছিল নিজের ওপর। যোগেশ চৌধুরী শিশিরকুমার অভিনীত-নির্দেশিত 'সীতা'-র প্রতিটি শো-ই বোধহয় দেখেছিলেন। তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের কলম ও শিশিরকুমারের প্রয়োগ যে নতুন মঞ্চ-সীতা সৃষ্টি করে, সে-সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জানতেন। এ ছাড়াও তিনি শিশিরকুমারের পরামর্শ ও নির্দেশও পেয়েছেন। সুতরাং যোগেশ চৌধুরী 'সীতা' নাটকটির অন্তরালে শিশিরকুমার অদৃশ্যভাবে অনেকখানিই আছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকটিও শিশিরকুমার কেটেছেঁটে সম্পাদনা করে নিয়েছিলেন— অনুমান করি। তাতে অনেকটা নিজের মনের মত হয়েছিলও হয়তো। কিন্তু সম্পূর্ণ কি হয়েছিল? হয়তো না। কারণ মূল নাটকের একটা ছাঁচ থেকেই যায়। সম্পাদনা সেই কাঠামোর ওপরেই মূলত কাজ করে, তাকে পুরো বদলে ফেলতে পারে না বা মৌলিক কাঠামোয় হাত দিতে পারে না। নতুন 'সীতা'য় সুবিধা হলো পুরনো কাঠামোর সুবিধাও পাওয়া গেল, আবার ইচ্ছে মত স্বাধীন ভাবেও কিছু করা গেল। অর্থাৎ 'সীতা'-হরণে শিশিরকুমারের প্রাথমিক একটু অসুবিধা হলেও শেষ পর্যন্ত সুবিধাই হয়েছে। নিজের মনের মত একটি নাটক তিনি পড়িয়ে নিয়েছেন।

যোগেশ চৌধুরী তাঁর 'সীতা' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন:

'আদিকবি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ করে ভারতবর্ষের সমস্ত পুরাতন ও আধুনিক বড় কবি সীতা সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু লিখেছেন। আমার প্রথম নাটক আমি যে ভারতের এই চিরন্তন পুণ্যকাহিনী অবলম্বন করে লিখবার সুযোগ পেয়েছি, সেজন্য আমি নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। তথাপি সত্যের খাতিরে বলতে গেলে বলতে হয় যে আমার-অন্তরের কোনও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এ নাটক লিখতে অগ্রসর হইনি, বাইরের প্রয়োজন আমাকে লিখতে বাধ্য করেছে। কিন্তু লিখতে আরম্ভ করে আমি "রাম-সীতা বিরহের নির্ঝরিণী ধারা" আমার প্রাণের ভিতর অনুভব করিছি এবং বাইরে তার রূপ ফুটিয়ে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য হয়েছি কিনা জানিনে।

'স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 'সীতা' আমার চোখের সামনে অনেকবার অভিনীত হয়েছিল। সে নাটকের অনেকগুলি চিত্র ও চরিত্র আমার সমস্ত কল্পনাকে একেবারে আচ্ছন্ন করেছিল। সেজন্য আমার এই 'সীতা' নাটকের কোনও কোনও জায়গায় স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের নাটকের একটু-আধটু

ছায়া পড়তে পারে—তবে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করবার যথেষ্ট চেষ্টা পেয়েছি।

'আমার দু'জন হিতৈষী বন্ধু—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এবং সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—এই বইখানি লেখা থেকে আরম্ভ করে ছাপানো পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের দুজনের সাহায্য না পেলে আমি কিছুতেই এ নাটক প্রকাশ করতে পারতাম না। আমার অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু, সুকবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, আমার 'সীতা' নাটকের জন্য কয়েকখানি গান রচনা করে দিয়েছেন।…'

'নাট্যমন্দির'
৬৮বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বুধবার ২১ শ্রাবণ, ১৩৩১

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

যোগেশ চৌধুরী নিজেই বলছেন, অন্তরের প্রেরণায় নয়, বাইরের প্রয়োজনে নাটকটি তাঁকে লিখতে হয়েছে। পরে ক্রমে তিনি বিষয়টি অনুভব করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অনেকবার দেখার ফলে তাঁর সমস্ত কল্পনা একেবারে আচ্ছন্ন। প্রভাব অতিক্রম করবার চেষ্টা করেছেন, তবে একটু-আধটু ছায়া পড়তে পারে। যথেষ্ট সাহায্য করেছেন শিশিরকুমার ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গান লিখে দিয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। এই ভূমিকার নীচে যোগেশচন্দ্র তাঁর ঠিকানা দিয়েছেন 'নাট্যমন্দির', ৬৮বি বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শিশির-কুমারের তো বটেই, সামগ্রিকভাবে শিশির-পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে অখ্যাত যোগেশচন্দ্র 'সীতা' লিখলেন। তাঁর প্রথম নাটক, এবং রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। আর শিশিরকুমার? তিনি কি এগোলেন? হ্যাঁ, তিনিও এগোলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' থেকে আর একটা ধাপ এগোলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের কারণগুলি ব্যাখ্যা করি।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিখ্যাত সমালোচক প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, 'তখনও তিনি রঙ্গমঞ্চের আলোয় বিভ্রান্ত হন নি, স্বাধীন ভাবে লিখবার ক্ষমতা তখনও তাঁর ছিল। তাছাড়া তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মধ্যে যে কবিত্বগুণটি সর্ব শ্রেষ্ঠ, 'সীতা' নাটকে তার পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছেন। একে বলেছেন নাট্যকাব্য। অর্থাৎ নাটকের চেয়ে কাব্যের গুণ এতে বেশি, নাট্যকারের কলমকে লঘুভাবে ধারণ করে কবির কলম এখানে সার্থকভাবে সক্রিয়। কাজেই 'সীতা'র আলোচনা করতে হলে কাব্যরূপেরই

আলোচনা করতে হবে, যদিচ নাটকরূপটি একেবারে উপেক্ষা করা উচিত হবে না।'

প্রমথনাথ বিশী কথাগুলি প্রশংসা অর্থেই লিখেছেন। কিন্তু নাট্যবিচারে বিষয়গুলি খুব যে গুণের তা নয়। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তখনও দ্বিজেন্দ্রলালের যোগ ঘনিষ্ঠ নয়। তিনি তাই 'স্বাধীন' ভাবে লিখেছেন। এই স্বাধীনতা নাটকের পক্ষে ভাল নয়। নাটক স্বাধীন শিল্প নয়, মঞ্চ-নির্ভর শিল্প। সুতরাং মঞ্চ-অভিজ্ঞতা থাকা-টা নাট্যকারের পক্ষে আবশ্যিক। এই অভিজ্ঞতা যার যত কম, নাটক-রচনায় অসুবিধেও তার তত বেশি। নাট্যকার ও সমালোচক উভয়েরই ভাষ্য অনুযায়ী, 'সীতা' যতটা কাব্য, ততটা নাটক নয়। এই কাব্য কোনো কোনো সময় নাটককে আচ্ছন্ন করে। এই ত্রুটির কথা সমালোচক প্রমথনাথ বিশী অন্তত দুটি দৃশ্যের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'নাটকটি মিত্রাক্ষরে রচিত। এতে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু একাধিক দৃশ্যে, যেমন প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণ ও উর্মিলার কথোপকথনে, ঐ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে রাম ও সীতার কথোপকথনে যে মিত্রাক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে কথোপকথনের স্বাভাবিক ছন্দের চেয়ে গীতিস্পন্দ প্রবলতর। কিছুক্ষণ শুনবার পরেই দর্শকের মনে হয় যেন, সুরহীন গান শ্রবণ করছি। এতে নাটকের স্বাভাবিকতার হানি হয় বলে আশঙ্কা করি।' (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত দ্বিজেন্দ্রলাল রচনাসম্ভার, ভূমিকা।)

একদিকে যেমন নাটকের মাত্রাকে অতিক্রম করে কাব্যভাষা কোনো কোনো সময়, তেমনি অনেক সময় এমন গদ্য এসে পড়ে যা সঙ্গতি ক্ষুন্ন করে। যেমন, প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রুতকীর্তির উক্তি : 'কেউ ভালবাসে লুচি / কেউ বাসে পরমান্ন।' বা চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বাল্মীকি অযোধ্যায় যাবেন, সীতা সে-খবর জানেন না, তিনি বাল্মীকিকে প্রশ্ন করেছেন, 'কোথায় ?' তার উত্তরে বাল্মীকি বলছেন :

'কোথায় ?—উত্তর তার শুনিলে নিশ্চয়,
খাইতে আসিবে।......বলি নাই,
খাইতে আসিবে ?' এটা না বলিলে ছাই,
ছিল ভাল॥'

সংলাপ স্বাভাবিক করতে গিয়েই এটি লঘু করা হয়েছে। কিন্তু সিরিয়াস পৌরাণিক নাটক, তাতে ব্যবহৃত ভাষা, চরিত্রানুগতা, মুহূর্ত বিশেষ—এ সব কিছুই ভাবা হয় নি।

মঞ্চ-অভিজ্ঞতা নেই বলেই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নিশ্চিন্তে কলম চালিয়ে নির্দেশ দেন: 'রাম কর্তৃক শূদ্রকের শিরশ্ছেদ।' তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য। মঞ্চের উপরে এই শিরশ্ছেদটি যে কিভাবে দেখানো যাবে তা নিয়ে শিরশ্চালনা করেন না।

পৌরাণিক নাটক হলেও তাতে যুক্তিহীন অলৌকিকতা দেখাতে চান না নাট্যকার। সাধু সংকল্প। কিন্তু সবই একটা মাত্রা মেনে করা দরকার। দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বদা তা করতে পারেন নি। যেমন, শেষ দৃশ্যে ( পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে ) সীতার পাতাল-প্রবেশকে যুক্তিসিদ্ধ ও স্বাভাবিক করতে গিয়ে তিনি ভূমিকম্প ঘটিয়েছেন। ভূমিকম্পে সীতার পদতলের ভূমি দ্বিধাবিভক্ত হল এবং সীতা তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। একটু বাদে 'বিভক্ত ভূখণ্ড যুক্ত হইল।' এ সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য:

'এটি মৌলিক হওয়া সত্ত্বেও কাণ্ডজ্ঞানসম্মত মনে হয় না। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হ'ল, অন্যান্য পাত্রপাত্রীর কাজের কিছু ক্ষতি হ'ল না, কেবল সীতা ক্র্যাটল দিয়ে অতলে তলিয়ে গেল, এ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার, পাঠকের বিশ্বাসশক্তির উপরে অত্যন্ত বেশি চাপ পড়ে। পৌরাণিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে গেলে এমন হওয়া অনিবার্য। সমস্ত ঘটনাটির মধ্যে যে, হাস্যকরতা আছে, হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে তা এড়িয়ে গেছে।

এবার দেখা যাক নাটকের ঘটনাবিন্যাস। আগেই বলেছি যে, পাঁচ অঙ্কের শেক্সপীয়রীয় নাট্যবিন্যাস এখানে অনেকটা স্বীকৃত। কিন্তু শুধু পাঁচটা অঙ্কে ঘটনাগুলি ছড়িয়ে দিলেই হয় না। সূচনা, সংকট, সংকটের অগ্রগাত, তুঙ্গবিন্দু, পরিণতি—এই ক্রমে সাজিয়ে কাহিনীকে গতি দিতে হয়, তীব্রতা আনতে হয়। কিন্তু এখানে কাহিনীর ক্রমবিকাশ নেই। বলতে গেলে, তিনটে টুকরো আখ্যান জোড়া দিয়ে এ নাটক প্রথমে সীতার কলঙ্ক-কথা শ্রবণ ও সীতা বিসর্জন। দ্বিতীয় কাহিনী, শূদ্রক বধ। তৃতীয় কাহিনীতে আছে লব-কুশের যজ্ঞ-অশ্ব ধরা, সীতার প্রত্যাবর্তন ও পাতাল-প্রবেশ। এর মধ্যে শূদ্রক বধের কাহিনী নাটকের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে অবস্থান করেও অনেকটা সম্পর্কহীন। সব থেকে বড় ত্রুটি-অকারণ বিস্তার, সংহতিহীনতা। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য। এর পঞ্চম দৃশ্যে দুর্মুখ-রাম সংলাপ। দ্বিতীয় অঙ্কে, চারটি দৃশ্য। এর চতুর্থ দৃশ্যে সীতা-বিসর্জন। এখানে রামকে সীতার সঙ্গে ছলনা করতে হয়নি। সীতা নিজেই এগিয়ে এসেছেন। বলেছেন 'শুনিয়াছি সব।' বলেছেন,

'আমিও রাখি পতিসত্য'। তৃতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য। মূল আখ্যান—শূদ্রক বধ। শূদ্রক-পত্নী অভিশাপ দেন: 'যেই অগ্নি জ্বালিয়াছ আজ, / চিরদিন সে অগ্নিতে যেন দগ্ধ হও মহারাজ।' চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য। এর চতুর্থ দৃশ্যে যজ্ঞ-অশ্ব ধৃত। পঞ্চম দৃশ্যে শত্রুঘ্ন পরাস্ত। ষষ্ঠ দৃশ্যে রামের স্বপ্নে সীতার প্রবেশ। পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য। এর চতুর্থ দৃশ্যে লব পিতাকে প্রণাম করে না, পিতা সীতার উপর অন্যায় করেছেন বলে। পঞ্চম দৃশ্যে রামের ক্ষমা-ভিক্ষা ও ভূমিকম্প। পাঁচটি অঙ্কে মোট পঁচিশটি দৃশ্য। এই ফেনায়িত বিস্তারে, দৃশ্য-আধিক্যে ও দৃশ্য-বদলের কালক্ষেপে কী প্রচণ্ড অসুবিধাজনক ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' তা সহজেই অনুমেয়। শিশিরকুমার হয়তো কেটে-ছেঁটে একে খানিকটা সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু সে কতটা তা আমরা জানি না, কারণ কাটা কপি পাওয়া যায় না। তবে সম্পাদনার ধরন খানিকটা অনুমান করা যাবে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'য়। আগেই বলেছি, এই 'সীতা'য় শিশির-কুমারের প্রভাব আছে। তখন তো যোগেশ চৌধুরী অখ্যাত লোক। পরে যখন খ্যাত হয়েছেন, 'দিগ্বিজয়ী' অভিনীত হয়ে গেছে। তাঁর ঠিকানা তখন 'নাট্যমন্দির' নয়, ৫০।২ রাজবল্লভ স্ট্রীট, 'দিগ্বিজয়ী' (২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫), উৎসর্গ করছেন "নাট্যজগতে 'দিগ্বিজয়ী' বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের করকমলে" তখনও লিখছেন:

শিশিরবাবু

এ নাটক আপনিই লিখতে বলেছিলেন; নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনো গতিকে নাটকখানাকে পাঠকসমাজে বের কল্লাম; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না—আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও জীবন-রস-মণ্ডিত করে তুলেছেন। সুতরাং নাটকখানার উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি-সমর্থন কল্লাম—

স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইতি—

গুণমুগ্ধ

'যোগেশদা'

'দিগ্বিজী'-র 'নিবেদন' অংশে লিখছেন: ...নাটক ও উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি

(Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক এবং দর্শকের উপর।

'পুস্তকের নাট্য-রূপকে যথাসম্ভব সরল, সুন্দর ও অবশ্যম্ভাবী (inevitable) এবং নাটকের গতিকে যথাসম্ভব শোভন ও সাবলীল করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুহৃদয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য রসিক সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির (ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং ভাবগত) সমগ্র রূপই শিশিরবাবুর পরিকল্পনা। অবাস্তব ভাব, অর্থাৎ Airy Nothingকে কি করিয়া রূপে-রসে-রঙে মূর্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার বেশী কে জানে? তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দিয়া নাটকখানিকে জীবন্ত করিয়াছেন।...'

'দিগ্বিজয়ী'-র আমলেও এতখানি শিশির-প্রভাব। 'সীতা'-র সময়ে এটা আরো কতটা ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। 'নবযুগোপযোগী ইবসেনিয়ান টেকনিকে'র প্রস্তুতি 'সীতা' থেকেই সুরু হয়েছিল। এই টেকনিকের একটা বড় কথা—সংহতি, ঘনত্ব, দৃশ্য-সংখ্যা কমানো। 'দিগ্বিজয়ী'-তে পাঁচটি অঙ্ক। এর পঞ্চম অঙ্কে দুটি দৃশ্য। বাকি চারটিতে একটি করে দৃশ্য। এই রীতির সূচনা 'সীতা'তেই—তা সে যত দুর্বল ভাবেই হোক না। যোগেশ চৌধুরীর সীতায় মোট চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে একটি দৃশ্য। দুর্মুখের আবির্ভাব থেকে সীতা-বিসর্জন পর্যন্ত বর্ণিত এই একটি দৃশ্যে। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'-র দুটি অঙ্কের মোট নয়টি দৃশ্যে যে ঘটনা আছে, তা যোগেশচন্দ্রের একটি অঙ্কের একটি দৃশ্যে সংহত। এই সংহতি তখনকার একজন সদ্য-নাটক-লিখতে-আসা নাট্যকারের পক্ষে সম্ভব নয়—এর জন্যে নিশ্চয়ই শিশিরকুমারের মতো অভিজ্ঞ এবং নবযুগ বিষয়ে সচেতন নাট্যাচার্যের দরকার হয়েছিল। দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। এখানে শূদ্রক (শম্বুক) বধ, 'রাম শম্বুকের বুকে তরবারি হানিলেন।' ও শূদ্রক-পত্নী তুঙ্গভদ্রার অভিশাপঃ '...সহস্র বান্ধব মাঝে রহিবে একাকী...।' এই পংক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ যেন শোনা যায়, তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্যে 'অশ্ব ধরিয়াছে লব'। সীতার আশীর্বাদ: 'সমরে অজেয় হও।' লবের অযোধ্যা যাত্রা, দ্বিতীয় দৃশ্যে স্বর্ণসীতার মূর্তিদান করছেন রাম স্বয়ং। সীতামূর্তি-ধ্যান। বাইরে লবের কণ্ঠস্বর শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন: 'কার কণ্ঠস্বর?' রাজপুত্র এই আত্ম-

পরিচয় পেয়ে লব : 'না-না-না-না-না, / নহি আমি রাজপুত্র।' রাম : 'বাণপ্রস্থ করি গ্রহণ'। বাল্মীকির সমাধান : 'রাজ্যের নায়কগণ—জানকীর শ্রীচরণে ক্ষমা যদি চায়—' দুর্মুখ এসে খবর দেয় প্রজারা স্বর্ণসীতা দেখে মুগ্ধ, সীতাকে ফিরিয়ে আনা হোক। চতুর্থ অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য সুরু 'ধরার মেয়ে ধরার মেয়ে' গানটি দিয়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে সভা। বশিষ্ঠ : 'সবারে শুনায়ে কর মা শপথ, / পতিব্রতা তুমি।' লব : 'হেন অপমান!' —সীতা : 'সত্য যদি পতিব্রতা আমি, /···মাগো, স্থান দাও কোলে, অন্ধকার। ভূমি বিদীর্ণ, সীতা 'রহস্যময় লোকে' চলে যান। বাল্মীকির স্বস্তিবচনে নাটক শেষ :

'রাম,
প্রিয়তম সন্তান আমার,
আপন হৃদয় মাঝে
জানকীরে কর অন্বেষণ।
বাল্মীকির রামসীতা
চির-অবিচ্ছেদ।'

অর্থাৎ পুরাতন পৌরাণিক নাটকের মতো স্বর্গলোকে মিলন দেখানো হোতো না। বাল্মীকির উক্তিতে রাম-সীতার চির-অবিচ্ছেদ ঘোষিত হোতো। মঞ্চে অবশ্য বাল্মীকির এই উক্তির পরেও থাকতো রামরূপী শিশিরকুমারের গভীর বেদনার হাহাকার : 'সীতা—সীতা—।' এর পরে যবনিকা পড়ত ধীরে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'-র মোট দৃশ্য সংখ্যা পঁচিশ, আর যোগেশ চৌধুরীর সীতায় দৃশ্য সংখ্যা মাত্র সাত। দৃশ্য-বদলের হাঙ্গামা কমতো, নাটক চলতো অবাধে। তবে সুরুতে একটি বাড়তি প্রবেশক-দৃশ্য থাকতো। সুরু হোতো এইভাবে : ইলেকট্রিক বেল বাজতো না। বাজতো হাত-ঘণ্টা—একটা ছন্দে। থেমে যেত তোরণের সানাই। যবনিকা সরে যেত। মঞ্চে অল্প আলো। যেন একটা সবুজ আভা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা জায়গায় সামান্য একটু উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি—তার উপরে একটি আলোকরেখা এসে পড়েছে। সেই নারীর (অভিনেত্রী—প্রফুল্লকুমারী) কণ্ঠে রবীন্দ্র-রচিত পংক্তি : 'কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত, অনন্ত রাত্রে কেন চেয়ে বসে রও।' এর পরে অতীত কথা কয়ে ওঠে—রাম-সীতার কাহিনী সুরু হয়।

বিপুল সংখ্যায় সাধারণ দর্শক এ নাটক দেখেছে। দেখেছেন বিদগ্ধ-

জনেরাও। দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য ভাল লেগেছে, নাটকটা ভাল লাগে নি। তিনি লিখেছেন, '…শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। …সীতা বইটিকে আমি একটুও পছন্দ করিনে—ওটা নাটকই নয়—এই জন্যই এ নাটক অবলম্বন করে অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখান কঠিন—তৎসত্ত্বেও শিশিরবাবু নিজের ক্ষমতার জোরে ও বইটিকে চালিয়ে দিতে পেরেছেন।…( নাচঘর, ২০ ভাদ্র, ১৩৩১ )

নাটকের দুর্বলতার কথা আগেই বলেছি। তিনটে টুকরো ঘটনা। কাহিনীর ক্রম-উন্মেষ নেই। দ্বিতীয় আখ্যান শম্বুক-বধ প্রত্যক্ষভাবে নাট্য-বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। প্রথম ও তৃতীয় ঘটনার মধ্যে ( অর্থাৎ সীতার বিসর্জন থেকে পুনরায় গ্রহণ পর্যন্ত ) সময়ের ব্যবধান ষোলো-সতের বছর।

কিন্তু 'সীতা'র প্রশংসা করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাষায়: 'তাহার "সীতা" নাটকে কেবল যে পৌরাণিক জগতের রূপোজ্জ্বল, সম্পূর্ণ পরিবেশ ও যথাযথ ভাব-সমন্বিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কেবল তাহাই নহে, সার্বভৌম, যুগ-নিরপেক্ষ মানবিক সুরটিও ধ্বনিত হইয়াছে। পৌরাণিক পরিবেশকে নিখুঁত ভাবে বজায় রাখিয়া তাহার মধ্যে সর্বকালীন মানব-হৃদয়ের আর্তি-প্রকাশ-শক্তিই শিশির-প্রতিভার পরিচয়। রামের মর্মবেদনা যে কেবল কোন সুদূর অতীতের এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থায় ও নীতি-নিগড়ে আবদ্ধ দেব-মানবের নহে, তাহা যে সকল দেশের, সকল কালের শোক-দগ্ধ মানবাত্মার অসংবরণীয় রোদনাবেগ, তাহা শিশিরের কণ্ঠে শাশ্বত অভিব্যক্তি পাইয়াছে।'

নানা কারণে নানা লোকের ভাল লেগেছে। কিন্তু ভাল লেগেছে। আর তখনকার নাট্যজগতে একটা জোয়ার এনেছে। যশ ও অর্থের জোয়ার এনেছে শিশিরকুমারের কাব্যে। 'সীতা' শিশিরকুমারের বিজয়লক্ষ্মী। 'সীতা' সেই সময়ের নাট্যজগতের 'নবযুগ'-লক্ষ্মী। তবে আজ একটা প্রশ্ন জাগতে পারে। 'সীতা' আঙ্গিকে যতটা 'নব', দৃষ্টিভঙ্গিতে কি ততটা আধুনিক ছিল? এই আধুনিকের একটা নিরিখ যদি রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে ধরি, তবে চিত্রটা কেমন দাঁড়ায়? নারী-অধিকার সম্পর্কিত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ তখন অনেক অগ্রসর। 'সীতা' প্রযোজনার অনেক আগেই লিখেছেন 'হৈমন্তী' ( জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ ), 'স্ত্রীর পত্র' ( শ্রাবণ ১৩২১ ), অপরিচিতা ( কার্তিক ১৩২১ ) প্রভৃতি। হৈমন্তী' গল্পে সরাসরি 'সীতা' প্রসঙ্গ আছে। গল্পের নায়ক বেদনাবিদ্ধ ব্যঙ্গের স্বরে বলেছে, 'যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন। আর, আমিই যে সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা করিয়া মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।' শিশিরকুমার সেদিনের অযোধ্যায় কতটা ছিলেন, আর রবীন্দ্রযুগের কলকাতায়ই বা কতটা ছিলেন?

## শীত

অভিজিৎ লাহিড়ী

জানালা দুয়ার ভেঙে কোন গান আসে না এখানে।
লোহা গরাদের মতো গম্ভীর মুখে কেঁপে ওঠা নেই,
ছবি নেই,
স্থির পর্দার পাশে কোনও ফুল নেই
ধূপের বাতাসে লেগে আছে শীত, কাতরতা।

বিকেল গড়িয়ে পড়ে—

সন্ধ্যার পার্ক-স্ট্রিটে কেকের মতন নারী কোমরে ঝোলায় ছোরা
নখের বল্লমে তাক্ করে বসে থাকে কিশোরের নরম চোয়ালে
ট্রাফিকের শাদা হাতে গড়িয়ে
গড়িয়ে পড়ে
পেট্রলের জ্বালা আর শীত
পাতার মৃত্যুর নিচে মরে যায় আরও
আরও পাতা

কোনও গান আসেনা এখানে।
তুমিও কি ভুলে গেছো; তুমিও ভুলেছো—হে, শান্ত গ্রামাফোন
বিকেলের সেইসব উন্মাদ গান !

দিগন্তে নেমেছে মধ্যরাত।
অন্ধকার বারান্দায় একা পাশের বাড়ির মেয়ে,
অভিমানে চুল তার উড়ে যায় শব্দহীন শহরের দিকে
পাতাল গুহার মুখে অতিদীর্ঘ ছায়া ফেলে ক্রেণ নাকি ল্যাম্পপোস্টগুলি

অন্ধ কুয়াশায় ঝরে পড়ছে
ক্রমাগত

ওগো গ্রামোফোন—কথা বলো, কথা বলো, অপেরার মতো বাজো,
বেজে ওঠো…

ভাখো,
কলকাতার শীত বড়ো নির্বোধের মতো ফুটপাথে হাঁটু মুড়ে বসে
আগুন পোহায়

## দুটি কবিতা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

### জল

আমি সন্তরণপটু নই, মাছ নই, কে আর চেনাবে জল!
আমি খুব তেতোমুখে বিষ জড়িবুটি হাতে ডাঙায় অপেক্ষা করে আছি।
কথা বলি। মাটি ও উদ্ভিদের সঙ্গে কথা বলি। মানুষের সঙ্গে কথা বলি।
এত ক্লিষ্ট শব্দগুলি, এত ভার আবহসঙ্গীতে,
ঠোঁট নড়ে ওঠে আর জলের দর্পণে দ্রুত গান ভেঙে যায়।
সামান্য বুদ্বুদ তুলে কে ডুবেছে জলে—
পরিচিত বিস্কুটের মত তার জিভে
কচুরিপানার স্বাদ, জন্মদাগ এখনো সজল।
আমি ত ডুবিনি, শুধু স্থলজ-শূন্যতা দুই চোখে ভরে নিয়ে
চেয়ে আছি;
স্ফীত পেট, ওই মৃতদেহ যদি ভেসে ওঠে আজ,
আমি ওর হাত ধরে জলে নেমে যাবো।

### ধারাবাহিকতা

সামনে কি আছে, খাদ? তীব্র অন্ধকার?
আমার অতীত তার প্রতিবেশিনীর হাত ধরে পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।
ঝুঁকে আছি,
সামান্য আলাপ সেরে ঝাঁপ দেবো বলে।

বিশস্ত পেরেক, তুমি চটি ফুঁড়ে দিয়েছো কামড়,
দু-আঙুলে নাচিয়ে তোমায় ওই মহাশূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবো।
ভুল এ-বিবাহরেখা, আরো ভুল কুসুমে জড়িয়ে
নিয়ে যাবে;
যতো দূর নিয়ে যাবে তার চেয়ে যাবো বহুদূর।
আপাতত কুয়াশার রীড চেপে ধরি একা একা,
দু-পাশে নির্জন পথে বেজে ওঠে হারমোনিয়াম।
শব্দ হয়, সেই শব্দে নিভে যায় পরিব্যাপ্ত আলো।

## দুটি কবিতা

প্রবালকুমার বসু

### তোমার বন্ধু

আমি মেঘ হব বহতা অনীক মেঘ মেঘ করে কেঁদেছ অলক্তক
কালো নেমে এলে নিজেকে ভেবেছ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী
মেঘ কেটে গেলে ঘরময় জুড়ে তোমার জেগেছে শূন্য
বন্দিনী নও অথচ নিজেকে জেনেছ আমারই বন্দী

শিকল পরিয়ে রাখিনি তবু ভেবেছ শিকল ভাঙবে
এই অজুহাতে মানিয়ে নিয়েছ নিজেকে শাণিত অস্ত্রে
মানত রেখেছ তোমার সকল যা কিছু প্রেমজ আর্দ্র
বিধান নিয়েছ নিজেই নিজের করুণার অপশাস্ত্রে

মেঘ চেয়েছিলে নিজেই এখন মেঘ ছিঁড়ে এসে দাঁড়ালে
তোমার পিছনে ইতিহাস ছিল সে কথা কখনো মানো নি
আশ্রয়ে ছিলে গাছের মতন পরম কখনো জানো নি
এখনো এসো ভাসতে পারি দুজনে দুহাত বাড়ালে

বারবার ভুল করেছ রমণী পুরুষই তোমার বন্ধু—

### আজ একাদশী কর

ভাতের গন্ধে ম' ম' হয়ে এল দিক
গর্ভের থেকে ছেলে ডাকে ভাত দাও

জনমদুখিনী পৌষের ধু ধু মাঠে
স্বাখে উছলে উঠছে নবান্ন উৎসব

ভাত দাও ডাকে পাশের বাড়ীর ছেলে
মাংসের ঝোলে বাটি অবনত কাৎ
এত কিছু ভাসে ঝড়ে জলে নিঃশ্বাসে
খিদে কেন তবু ভাসে না অকস্মাৎ

ভাত দাও ডাকে পাশের বাড়ীর ছেলে
ভাত দাও ডাকে গর্ভের থেকে পাপ
মাংসের ঝোলে ভাত ভেসে গেল ছবি
গর্ভ ভাসল উজানে রক্তস্রাব

ভাতের গন্ধে ম' ম' আজ উৎসব
জনমদুখিনী তুই তার চেয়ে আজ একাদশী কর।

## দুটি কবিতা

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

### কলকাতা, তার কাছে

কলকাতা তার কাছে সন্তানের পাশ ফিরে শোওয়া,
ঘুমের গহন থেকে তপ্ত কপালে রাখা হাত।
কলকাতা তার কাছে কবির নিয়তি। ফুলচোর
কবরখানায় ফিরে অকস্মাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ফুলআঁকা তোরঙ্গ খুলে পোষাক বদল করে রোদ।
কলকাতা তার কাছে ঘুম ভেঙে একা হয়ে যাওয়া
চুম্বনে ছুটে যাওয়া শূন্যতা পৌনে তিনমাইল
কলকাতা তার কাছে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুর।

কলকাতা তার কাছে বর্ষায় যমজ ইলিশ।
বুকের খানিক নীচে অর্ধেক ট্যাক্সির হর্ণ।

কলকাতা তার কাছে জেলুসিল, সিল্কার, ঘুম
বিজ্ঞাপনের শিশু, ছিমছাম গন্ধ সনেট।

কুয়াশার হাত ধরে মর্ণিং স্কুলে যায় ভোর।
কলকাতা তার কাছে শোকসন্ধ্যা, রঙের ভিখারি।
রোজই যে পয়সা চায় সে কি বোঝে ভিক্ষার মানে ?
কলকাতা তার কাছে উৎসব, ছেঁড়া চপ্পল।

কলকাতা তার কাছে কবিতার গোপন অসুখ।
খেলা ভেঙে চলে যাওয়া তবু পায়ে এসে বেঁধা তীর,
কলকাতা তার কাছে ভোররাতে শব্দহীন চিঠি
মুঠোয় ভরিয়ে আনা পিছু টান, ধুলোর প্রতিভা।

## দিন

মুখের গহন থেকে উঠে আসে পাথরের দ্রোহ।
যারা ভালোবাসে তারা জানে শীত, অঘ্রাণ কামড়
দেয়ালে পেন্সিলের দাগ, ভুল বানান, প্লাষ্টিকের ফুল।
রোদ্দুরে কার পশমের গোলা গড়িয়ে পড়েছে !
কাছে থেকো। তুমি। কাছে। হাত রেখো হাতের উপরে
যেভাবে সাবান থাকে। পাখির কুসুমমাখা খড়
জড়ো করে জন্মদিন, ডানাভাঙা দূরের স্বদেশ।
সাদাপৃষ্ঠার উলটোপিঠে শুয়ে থাকে রঙের ভিখারী
ঘুম তো ভেঙেছে কবে তবু তার জেগে ওঠা নেই !
আলস্যপুরাণ ছুঁয়ে ফিরে আসে শেষ নভেম্বর,
মধ্যরাতের মেলা থেকে ধুলোবালি অঙ্গে নিয়ে হাওয়া।
মেঘছায়া বিকেলে কেউ বিছানা বালিশে মাথা রেখে
দেখে দিন বৃথা গেল, কেন কেউ এখনো এল না !
বাটি পেতে অন্ধ ছেলেটি বসে জনহীন পথে
তার পাত্র পূর্ণ হয় কাঁচরোদ্দুরে। কিছু দূরে
আকাশ ব্যথিত করে সন্ধ্যা নামে পাহাড়তলিতে।

পাঞ্জাবী কবিতা

মূল রচনা ঃ হরভজন সিং হুন্দল
ভাষান্তর ঃ অনির্বাণ দত্ত

[ পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক প্রবীণ কবিদের অন্যতম হরভজন সিং হুন্দল। বিশিষ্ট এই কবি নানা গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রী পাঞ্জাবী লেখক সভার সহ-সভাপতি। মার্কসবাদে বিশ্বাসী কবিকে জরুরী অবস্থার সময়ে কারাবাস করতে হয়েছিল দীর্ঘদিন। কৃষক পরিবারে জন্ম। পেশায় শিক্ষক। ]

## ঠিকানা

আমার বুকের ফাঁকা জায়গাটায়
যদি লিখতেই হয়,
তবে সবার আগে আমি তোমার নামই লিখব।

শুধু তোমার নাম ?
আর পরিচয় বসাতে···তার গোড়ায় ?

তাহলে চাই ছোট্ট একটি শব্দ, তোমার—
হ্যাঁ···কিংবা না।

কিন্তু আমাদের দুজনার নামই
পাশাপাশি লিখতে হ'লে
যে সৌরভ চাই,
যে পবিত্র নির্মল দুটি হাত চাই—
তা আমি কোথায় পাব ?

এই ভয়ংকর সময়
আর মাটির গর্তে—
এসো,
সেই ঠিকানাই আমরা জেনে নিই।
এমন দিন আর বেশীদিন নয়,
ভয় পাওয়ানো মেঘেরা, ভাখো—হাল্কা হচ্ছে এবার,

এতদিন
সন্ত্রাসের ধুলোয় ঢাকা ছিল চারদিক···
এখন সাফ হচ্ছে সেসব।

কাগজ খুললেই মৃত মুখ, হেডলাইনে হত্যার খবর—
আর থাকবে না সেসব।

কচি কচি হাতে আর কতদিন চলবে
স্টেনগানের এই বেপরোয়া খেলা ?
খুশি মুখগুলি আর বেরোবে না পথে ?
ফিরে—আসবে না আবার ?

ভাসবে না ফকিরদের প্রার্থনার সুর ?
সুফি বুল্লে শা'র সেই মুগ্ধমগ্ন উচ্চারণ ?

প্রভু নানক ডাক দেবেন আবার, জানতে চাইবেন ঃ
পাঞ্জাবের মানুষ, বলো—
কে ভুল বোঝালো তোমাদের এমন ক'রে ?
তোমাদের শান্তির ঘরগুলোকে
এমন কসাইখানা বানালো কারা ?

বিপ্লবের দীর্ঘজীবী বার্তা নিয়ে
ভগৎজী-ও ফিরে আসবেন আবার,
প্রত্যেক দরজায় গিয়ে বলবেন ঃ
তোমাদের আসল শত্রুকে এতদিনেও চিনতে পারলে না তোমরা !

ভাইয়ের তাজা রক্তে হাত ধোওয়ার দিন—
একদিন
ঠিকই শেষ হবে,
বাগানের বেড়াগুলো ঘেঁষে সেদিন শুধু লালগোলাপ আর
ঠাকুমার লালপরীদের স্বপ্ন ঃ আদর ক'রে
বাচ্চাদের বলবেন তিনি—
বেঁচে থাক্ বাছারা,
আমার মতোই থুত্থুরে আয়ু হোক্ তোদের।

# যাঁরা হারিয়ে যাচ্ছেন

বিদ্যাসাগরের উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহ 'শ্লোকমঞ্জরী'তে বিদ্যাব্যবসায়ী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কথা আছে। তিনি [ ব্রাহ্মণ ] বলছেন :

অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া।
বানরীমিব বাগ্‌দেবীং নর্তয়ামি গৃহে গৃহে ॥

অর্থাৎ, এই পোড়া পেটের জন্য আমি কী না করেছি! বাগ্‌দেবীকে বানরীর মতো ঘরে ঘরে নাচিয়ে বেড়াচ্ছি।

এই যেমন একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তেমনি তাঁদের বিপরীতে আছেন আরেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাঁরা কখনো বিদ্যা বিক্রয় করেন না। এঁরা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন পণ্ডিত কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ। বেদশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। উত্তরে কালীকণ্ঠ বলেছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, কদাচ বিদ্যা বিক্রয় করি না। প্রথম যৌবনে কালীকণ্ঠ কিছুদিনের জন্য এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন, কিন্তু তা ছিল অবৈতনিক।

কে এই কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ? রাজশেখর বসু [ পরশুরাম ] তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানে 'উৎসাহক বন্ধুগণের' নামের প্রথমেই 'পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থে'র নাম উচ্চারণ করেছেন। সংস্কৃতে, বিশেষত বৈদিক সংস্কৃতে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা শুনে রাজশেখর বসু তাঁর অভিধানের সংস্কৃত শব্দাবলী দেখে দিতে অনুরোধ করেন, কালীকণ্ঠ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

পণ্ডিত কালীকণ্ঠের জন্ম ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগণায় উনশিয়া গ্রামে, ১২৭৮ সালে। কৌলিক উপাধি সমাজদ্বার। উপাধিটি অদ্ভুত! সমাজের দ্বারস্বরূপ, না সমঝদার—এ বিতর্কে প্রবেশ নিরর্থক। এঁরা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। শৌনক গোত্র। বলা হয়েছে হরিবর্মার রাজত্বকালে শুনক

গোত্রীয় যশোধর মিশ্র কনৌজ থেকে বাংলায় আসেন। তিনিই শৌনক গোত্রীয় যশোধর মিশ্রকে বাংলায় নিয়ে আসেন। তিনি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। তাই শূদ্ররাজ হরিবর্মার দান গ্রহণে অস্বীকার করেন। তখন অভিন্ননামা বন্ধু সামন্তসার পরগণা দান করেন। এই থেকেই শৌনক গোত্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সমাজদ্বার শাখার উৎপত্তি।

দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী লিখেছেন, 'জীবনে যদি কখনো এমন মানুষের দেখা মেলে যাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যা, সামাজিকতাবোধ, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিগত ব্যবহার দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না এবং যাঁর স্মরণমাত্রেই মানসপটে এক ঋষিকল্প মানুষের প্রতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে—তাহলে বলতে হয় পণ্ডিত কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ ছিলেন তেমনি একজন দুর্লভ মানুষ।'

কালীকণ্ঠের দিনচর্যা সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নির্মলেন্দু বলেছেন, অত্যন্ত নিষ্ঠাবান জীবনযাপন করতেন জেমশাই [ জ্যাঠামশাইকে তিনি জেমশাই বলেই ডাকতেন ]। ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-জপ সেরে গঙ্গাস্নান ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। একাহারী ছিলেন তিনি। মধ্যাহ্ন আহার সারতেই বেলা দুটো-তিনটে পেরিয়ে যেতো। এরপর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম। ক্বচিৎ নিদ্রাও যেতেন। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শাস্ত্রালোচনা। সায়ং সন্ধ্যা সেরে আবার চলত এ আলোচনা বা পড়াশোনা যতক্ষণ না নিদ্রাদেবীর হাতছানি পড়ত। রাত একটা-দেড়টায়ও আলো জেলে লেখাপড়া করতেন।

এই শাস্ত্রাচারী নির্লোভ ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যকে নিত্যসঙ্গী জেনেও কখনো আদর্শভ্রষ্ট হন নি। তিনি অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ছিলেন বলে তাঁর যজমানের সংখ্যাও সীমিত ছিল। তিনি যে নির্লোভ ছিলেন তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। রাজাবাজারের বিখ্যাত দানবীর, চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের জমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পণ্ডিতমশাইকে দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কালীকণ্ঠ তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'মন্মথ, তুমি কি আমাকে জমিজমা আর সম্পত্তির লোভ দেখাচ্ছ? আমি যে একজন লোভী ব্রাহ্মণ তা তুমি স্থির করলে কিভাবে? এই প্রত্যাখ্যান কালীকণ্ঠের জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ।

শাস্ত্রজ্ঞান এবং যাজনিক বিদ্যার উপর নির্ভর করে জীবনযাপনের অনিবার্য ফল হল চির দারিদ্র্য বরণ করা। কালীকণ্ঠ তা-ই করেছিলেন। দারিদ্র্য তাঁকে পরাভূত বা পরাজিত করতে পারে নি। কিন্তু ক্ষতি করেছে। তিনি হিন্দুধর্মের বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রণেতা। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর গ্রন্থরাজি

অমুদ্রিত রয়ে গেছে। তিনি (ক) ঋগ্‌বেদীয় একোদ্দিষ্ট, বৃষোৎসর্গ, মাসিক, সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধকাণ্ড, (খ) ঋগ্‌বেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রয়োগ, (গ) ইন্দ্রাভিষেক বিধি প্রয়োগ, (ঘ) অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত প্রয়োগ, (ঙ) বীরাষ্টমী ব্রত, (চ) সত্যনারায়ণের পাঁচালী, (ছ) শনির পাঁচালী, (জ) লক্ষ্মীর পাঁচালী এবং (ঝ) আত্মজীবনী লিখে গেছেন, কিন্তু ছাপাতে পারেন নি।

তাঁর একমাত্র মুদ্রিত পুস্তিকা হল 'সানুবাদ মন্ত্রশক্তি বা সর্বাঙ্গ রক্ষা'। এই গ্রন্থের চতুর্থ কভারের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, কালীকণ্ঠ সম্পাদিত বিশুদ্ধ সংস্করণ। 'ত্রিবেদীয় দশকর্ম পদ্ধতি' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। কিন্তু আদৌ কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে বলাবাহুল্য হবে না যে, কালীকণ্ঠ পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত 'পুরোহিত-দর্পণ' আদ্যোপান্ত সংশোধন করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পুরোহিত-দর্পণের প্রচলিত কোনো সংস্করণে তার উল্লেখমাত্র আছে বলে আমাদের জানা নেই।

অবশ্য কালীকণ্ঠ-রচিত এইসব গ্রন্থাবলী থেকে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর সৃজনীশক্তির ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। বৈদিক সংস্কৃতে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করলে তাঁর কাছে আমাদের যে প্রত্যাশা জাগ্রত হয় তা পূর্ণ হয় নি। তাঁর বিশুদ্ধ জীবনচর্যা সমকালীন পণ্ডিত-সমাজে যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, পরবর্তীকালে তাঁর পরিজনমণ্ডলীর বাইরে তা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। কালীকণ্ঠ-গোত্রের পণ্ডিতেরা সমাজ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন, এটা অবশ্যই অনুশোচনার বিষয়। এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

জগদীশ ভট্টাচার্য

---

* সেই দ্বিজোত্তম: পণ্ডিত কালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ। সম্বোধি প্রকাশন, কলিকাতা-৫৮ মূল্য: ২৫.০০

## স্মৃতি-বিস্মৃতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে যাদের জন্ম, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে তাদের জানাচেনার পরিধিটা সীমিত। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক যখন সারা দেশ তোলপাড় করেছে, সেটা ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের বাল্য কি কৈশোরকাল, অথবা তারও আগের ঘটনা। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যখন চমকে দিয়েছে বহু শ্রোতাকে, সে তো আরও সুদূর অতীত। গীতিকার সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তরাধিকার বাঙালী প্রকৃত অর্থে বহন করেনি। দ্বিজেন্দ্রলালের একশ পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বইটিতে সুধীর চক্রবর্তী নাট্যকারের আড়াল থেকে গানের মানুষ দ্বিজেন্দ্রলালকে খুঁজে নিতে চান। 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ' গ্রন্থটির লেখকের এক অর্থে কোনো পূর্বসূরী নেই। কারণ গ্রন্থটিকে আদৌ শিল্পীর জীবনী বলা যায় না, বরং বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এক শিল্পীর শিল্পকর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে শুরু হলো। সেই আলোচনার সূত্রেই এসেছে শিল্পীর জীবনের কথা, তাঁর যুগের কথা।

গ্রন্থটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। 'অবহেলিত উত্তরাধিকার' অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়টিকে বলতে পারি গ্রন্থের ভূমিকা, যেখানে স্পষ্ট হয়, কী ধরনের আলোচনার অংশীদার হতে চলেছি আমরা। ধনধান্য পুষ্পভরা পৃথিবীতে যে দেশকে শিল্পীর মনে হয়েছিল সেরা দেশ, সেখানে তাঁর উত্তরাধিকার অবহেলিত কেন, তার কারণগুলির সঙ্গে প্রথম অধ্যায়েই আমরা পরিচিত হয়ে যাই। তারপর 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব' 'দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি', 'বাংলাগান বিলাতি চাল' এবং 'পুত্রের চোখে পিতা', এই চারটি অধ্যায় জুড়ে বিস্তার। আছে দ্বিজেন্দ্রকাব্য বিষয়ে একটি সুলিখিত অধ্যায় 'গদ্যের কড়া হাতুড়ি, পদ্যে'। ছ'টি পরিশিষ্টে পরবর্তী গবেষকদের জন্য মূল্যবান কাজ করে দিয়েছেন লেখক। শিল্পীর সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী আর রচনাপরিচয় ছাড়া আছে বিভিন্ন দ্বিজেন্দ্রনাটকে ব্যবহৃত দ্বিজেন্দ্রগীতির তালিকা, একাধিক নাটকে ব্যবহৃত দ্বিজেন্দ্রগীতি সম্বলিত পৃথক তালিকা, দ্বিজেন্দ্রলালের গানের স্বরলিপি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, শিল্পীকে নিয়ে লেখা প্রিয়নাথ সেন এবং বিনয়কুমার সরকারের কবিতা, শ্রীঅরবিন্দ কৃত দ্বিজেন্দ্রগীতির ইংরাজি অনুবাদ।

গানের ভিতর দিয়েই যে বাঙালী দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তরাধিকার সগৌরবে বহন করতে পারত, সেটাই লেখকের বক্তব্য। কিন্তু কেন তা হলো না, কী কী

বাধা ছিল সেই পথে, তার বিন্যাসে লেখক কোনো একটি কারণে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। শিল্পীর জীবনযাপন, ভরাট সংসারজীবন থেকে মৃতদার শূন্য জীবন পর্যন্ত সর্বদাই সরকারের চাকরির বাধ্যবাধকতায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাঁর ঘুরে ফেরা, দ্বিজেন্দ্রগীতির সুর আর গায়কীর সংরক্ষণে ইন্দিরা দেবী, দিনুঠাকুর, শান্তিদেব অথবা শৈলজারঞ্জনের মতো কোনো স্বরলিপিকার সংগ্রাহকের অনুপস্থিতি, এর কোনোটাই গৌণ বাধা নয়। অন্যদিকে শেষ জীবনের রবীন্দ্রবিরোধিতা যে দ্বিজেন্দ্রলালকে অনেকখানি সরিয়ে দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের দেশের শিল্পমোদী মানুষের কাছ থেকে, দ্বিজেন্দ্রগীতির একমাত্র সংগ্রাহক পুত্র দিলীপকুমার যে পিতার মৃত্যুকালে ছিলেন নিতান্তই কিশোর, এইসব প্রতিকূলতাই লেখক নৈর্ব্যক্তিক বিন্যাসে সাজিয়েছেন।

তবে তিনি বাদ দেন নি, সেই সব সাঙ্গীতিক হেতু, যা নাকি দ্বিজেন্দ্রগীতির মূলেই গ্রথিত। সুর এবং গায়নের সঙ্গে যে কারণ জড়িয়ে আছে, তার ব্যাখ্যা সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে গেলে, লেখককেও খানিকটা গানের মানুষ হতে হয়। সেদিক থেকে গ্রন্থটি সংগীতপ্রিয় পাঠকের সঙ্গে বিন্দুমাত্র শঠতা করে নি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশীগান বিষয়ে লেখকের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : '...খুব কম লোকই এ জাতীয় গান আজকাল যথার্থ কণ্ঠস্বাচ্ছন্দ্য ও আন্তরিক আবেগসহকারে রূপায়িত করতে সক্ষম। তৎসম উচ্চারণের স্পষ্ট ধ্বনিময় গাম্ভীর্য, ত্রিমাত্রিক ছন্দের দোলা, সুরের সাবলীল মুভমেন্ট এবং সর্বোপরি যথার্থ দেশপ্রাণনা শিল্পীর ভেতরে জাগ্রত না থাকলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের পরিপূর্ণ মহিমা বোঝা যায় না' (পৃঃ ৭৮)।

লেখক মনে করেন, দ্বিজেন্দ্রগীতির উত্তরাধিকারকে যথার্থ স্বীকৃতি দিলে বাংলাগানের সাম্প্রতিক বন্ধ্যাদশা কাটতে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গেও গ্রন্থে দুটি প্রতিবন্ধকের উল্লেখ আছে : 'রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে বেশির ভাগ বাঙ্গালী তরুণ তরুণী একধরনের সংবৃত গায়নে এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। অথচ দ্বিজেন্দ্রগীতির প্রকৃত রসাবেদন ফুটতে পারে একমাত্র খোলা-মেলা সুরেলা অথচ ওজস্বী কণ্ঠে এবং মীড়বহুল তানালাপে। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা এইখানে যে, দ্বিজেন্দ্রগীতির নির্মাণ এমনিতেই বেশ জটিল ও রূপায়ণধর্মী, তার উপরে পড়েছে অননুকরণীয় দৈলীপি কণ্ঠের নানা নিরীক্ষার প্রয়োগ। কোনো মাঝারিয়ানা বা মামুলী গায়নভঙ্গী তাতে খাটবে না' (পৃঃ ১২৮)।

দিলীপকুমারের নিরীক্ষার আলোচনা 'দ্বিজুবাবুর গান থেকে দ্বিজেন্দ্রগীতি'

অধ্যায়ে রয়েছে। প্রথম প্রতিবন্ধকটি মেনে নিতে কিছুটা অস্বস্তি হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মদিনের সামান্য আগে পরে যেসব নতুনতর রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের গান আমরা শুনছি, তাঁদের কণ্ঠে কি খুব নিয়মিত অথবা আদৌ সার্থক হয়ে ওঠে 'সার্থক জনম আমার', 'চিরসখা হে' অথবা 'স্বপন যদি ভাঙিলে'র স্বরবিন্যাস? বাণীমাধুর্য আর সুরসারল্যের যে সমন্বয় রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তার মূল কারণগুলির একটি, তার আড়ালে যে দ্বিজেন্দ্রগীতির যোগ্য কণ্ঠই কেবল মৌন হয়ে যাচ্ছে তা নয়, রবীন্দ্রসংগীতও হারাচ্ছে তার বিশিষ্টতা।

সুর আর গায়কীর ভিতর থেকে, গানের অন্তর থেকে সংগীতকে দেখবার চিনবার যে অর্থময়তা, সংগীত বিষয়ক বেশিরভাগ রচনাই সেখানে বড় রিক্ত। গানের ভিতরে ধরা পড়ল কিনা কোনো বিপ্লব অথবা আদর্শ, তা যথেষ্ট আধুনিক হলো কি হলো না, এইসব বিচারের আড়ালে হারিয়ে যেতে চায় সবচেয়ে বড় সত্যিটা; যে, গান আদৌ গান হলো কিনা। সুধীর চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ সেই অর্থে একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। দ্বিজেন্দ্র কাব্য অথবা গীতির হারিয়ে যাওয়ার সূত্রে তিনি বাণীনির্মাণে স্রষ্টার আধুনিকতার অভাবের কথা লিখেছেন। তবুও আশা করেছেন, দ্বিজেন্দ্রগীতির আশ্রয়ে এ দেশে সুরের ধারা আরও স্বতঃস্ফূর্ত ঝরতে পারে। সুরসপ্তকের বিন্যাসে যে অ্যাবস্ট্র্যাকশন-এ পৌঁছতে পারি আমরা, তার শান্তি দেশ-কাল-সমাজ নির্বিশেষে সত্যি; এই বোধ তো সংগীত বিশ্লেষণের স্তরে স্তরে অপরিহার্য।

লেখকের পরিকল্পনার গুণে এবং বিশ্লেষণের গভীরতায় গ্রন্থটি শুধুমাত্র দ্বিজেন্দ্রগীতির সাঙ্গীতিক ব্যাখ্যার অভিধান হয়ে থাকে নি। সম্ভবত সেই কারণেই গ্রন্থের সামগ্রিক বিন্যাস নিয়ে দু-একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই তথ্য অনেকসময় ঘুরে ঘুরে এসেছে। কখনও কখনও এই পুনরাবৃত্তিকে এড়ানো হয়তো অসম্ভব ছিল না। আর 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব', 'বাংলাগানে বিলাতি চাল' এবং 'পুত্রের চোখে পিতা'— এই তিনটি অধ্যায় কি একই অধ্যায়ে গ্রথিত হতে পারত না? তাতে কি আরও স্পষ্ট হতো না স্বদেশপ্রেম আর রাজভক্তির দ্বন্দ্বে, জীবন আর বেঁচে থাকার দ্বন্দ্বে, শিল্প আর জীবিকার দ্বন্দ্বে সেযুগের এক শিল্পীর শিল্পকর্মের জটিলতা?

'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' গানটি যে স্বদেশী গান হিসাবে কতখানি সার্থক, তা আমরা জেনেছি তৃতীয় অধ্যায়ে, যার নাম 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব'। কিন্তু গানটির সূত্রকে সবিস্তারে খুঁজে

পেতে অপেক্ষা করতে হয় পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত। তৃতীয় অধ্যায়ে, ৭৫ পৃষ্ঠার ফুটনোটটি ছাড়া এবিষয়ের দ্বিতীয় কোনো উল্লেখ নেই। 'বাংলা গানে বিলাতি চাল' শীর্ষক অধ্যায়টিতে লেখক জানালেন, কেমন করে জেমস টমসনের অতি প্রসিদ্ধ 'Rule Britannia' গানটি ভেঙে শিল্পী লিখেছিলেন 'যখন নীলিমাজলধিহৃদয়ে, / উঠিল বৃটন ঈশ্বর আদেশে,...'। এই তথ্য জানাবার পরে লেখক লেখেন, 'প্রথম যৌবনে এই গান ভাঙার স্মৃতি দ্বিজেন্দ্রলালের মনে শেষজীবন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। তারই প্রমাণ পাই মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানের ভাব-সংযোজনে এবং কোরাসযুক্ত গানের বিন্যাসে। এইভাবে বৃটিশ স্বদেশগীতি থেকে গড়ে উঠেছে তাঁর এক সার্থক স্বদেশী গান' (পৃঃ ১৪৭)। অথচ স্বাদেশিক চিন্তাভাবনা এবং ঔপনিবেশিক দুনিয়ার প্রসঙ্গে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ফারাকের কথা তো 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে আনতে ভোলেন নি লেখক।

সেই তথ্যও আছে ওই তৃতীয় অধ্যায়ে যে প্রকৃত তেজোদ্দীপক স্বদেশী গানের বেশির ভাগই এই গীতিকারকে নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেলতে হয়েছিল একান্তই রাজরোষের ভয়ে। রাজভক্ত চাকুরিজীবী দ্বিজেন্দ্রলাল আর কারও তোয়াক্কা না করা জেদী শিল্পী দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত শান্তি খোঁজে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয়তায়, সেই নাটকের অনেক উপাদানই নাট্যকার খুঁজে পান টড্-এর 'রাজস্থান' থেকে। এই আয়রনির আভাসও স্বদেশপ্রেম আর রাজভক্তির অধ্যায়টিতে আছে। তাই মনে হয়, শিল্পীর বিলাতপ্রবাস এবং তারই আনুষঙ্গিক বাংলা গানে বিলাতি চালের বিন্যাস এবং বিশ্লেষণ যদি একই অধ্যায়ের অংশ হতো, দেশ-কাল-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর টানাপোড়েনের আরও বাস্তব চিত্র পাঠক পেত। আরও স্পষ্ট বুঝতাম আমরা, সেই পরাধীন দেশে, উপনিবেশের শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোক যদি পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে মেলাতে চায় দেশের মাটিতে, তবে অনুকরণ আর সাবালক গ্রহণের মধ্যে বিভ্রান্তি কতখানি স্বাভাবিক; সেই বিভ্রান্তিকে পেরিয়ে, নিজের জীবন, শিল্প আর দৈনন্দিনকে রক্ষা করা শিল্পীর পক্ষে কতখানি কঠিন।

আবার দেখি, দেবরাজ ইন্দ্র যে 'বেকন্ অ্যাণ্ড এগ্স্' দিয়ে উপোষ ভঙ্গ করতেন, দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি লেখকের মনে পড়েছে 'পুত্রের চোখে পিতা' অধ্যায়ে এসে; দিলীপকুমারের সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনায় যে

কেমন করে কৌতুকপ্রিয়-ভোজনরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ে গেলেন। এই উক্তি কি কেবল কৌতুকপ্রিয় শিল্পীকেই চেনায়? স্বর্গরাজের প্রাতরাশে লুচি আর মোহনভোগ নয়, 'বেকন অ্যাণ্ড এগ স্'ই' যে মানানসই, তাও কি এক অর্থে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' অথবা 'ধনধান্য পুষ্পভরা'র মতো সংগীতের স্রষ্টার স্বদেশপ্রেম আর রাজভক্তির দ্বন্দ্বের অন্তর্গত নয়?

রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনামূলক আলোচনায় লেখককে বারবার ফিরে যেতে হয়েছে। তার কারণ অবিদিত নয়, এ গ্রন্থেও তার ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব' অধ্যায়ে তুলনাটা চলছে ততক্ষণই, যতক্ষণ উঠছে উভয়ের স্বদেশীগান রচনা এবং সেগানের জনপ্রিয়তার প্রশ্ন। দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে আসবার আগেই লেখক মুকুন্দ দাস, কামিনী ভট্টাচার্য আর ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির নাম না জানা সদস্যের স্বদেশী গানের উল্লেখ করে লেখেন, 'এমন দেশবিস্তৃত স্বদেশীয়ানার পাশে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিক ভূমিকা ও তাঁদের গানের বিচার করি তবে কিছুটা ভুল করা হবে' (পৃঃ ৮৫)। স্বদেশপ্রেমের প্রেক্ষিতে, রাজভক্তির প্রেক্ষিতে আর এদুয়ের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ আর দ্বিজেন্দ্রলালের অবস্থা ন কি তবে অভিন্ন? নাকি ওই দ্বন্দ্বটা দ্বিজেন্দ্রলালের একার ব্যাপার?

ইংরেজ সরকারের চাকুরিজীবী দ্বিজেন্দ্রলালকে 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা / হৃদয়-রক্ত করিয়া শেষ' কে বদলে লিখতে হয়েছিল 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা / মানুষ আমরা নহি তো মেষ'। জীবনভর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকের উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই দিতে চান নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রলেপ (পৃঃ ৮৯-৯০)। কিন্তু তেমন কোনো দ্বন্দ্ব কি কখনও বিচলিত করে নি দ্বারকানাথের পৌত্র, মহর্ষির পুত্র, আমাদের দেশের সেই মহত্তম প্রতিভাকে! সংস্কৃতির পীঠস্থান ঠাকুর-বাড়ির অন্দর-বাইরে যাঁর বাল্য এবং কৈশোর অভ্যস্ত, জীবিকার জন্য ইংরেজ সরকারের চাকরির উপর নির্ভরতা থেকে যিনি সম্পূর্ণ মুক্ত! তাঁর শিল্পে সেই দ্বন্দ্ব অথবা দ্বন্দ্বহীনতার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছিল? লেখক কি এই জটিলতাকে তুলনার বাইরে রাখতে চান? তাই কি অধ্যায়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত, লেখক লেখেন, 'রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের মতো দ্বিজেন্দ্রলালও সঠিকভাবে বোঝেননি উপনিবেশীয় শাসন-শোষণের তীব্র অন্তর্ঘাত (পৃঃ ৯১)! রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পারম্পরিক তুলনায় আমরা গ্রন্থ জুড়ে অভ্যস্ত থেকেছি। তাই যখন আসছে দুই স্রষ্টার স্বদেশী-

গানের প্রসঙ্গ, অধ্যায়ের নাম যখন 'স্বদেশপ্রেম ও রাজভক্তির দ্বন্দ্ব', তখন তো এমন স্বীকারোক্তি জরুরি যে ওই দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে দুই শিল্পীর অবস্থান কখনোই এক নয়! লেখক কি পাঠককে খানিকটা বিভ্রান্ত করে দেন না মুকুন্দদাসদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য নির্ণয়ের পরেই হঠাৎ থেমে গিয়ে?

এমন হয়েই থাকে। যে অধ্যায়টি প্রত্যাশা জাগায় সবচেয়ে বেশি, তাকে নিয়েই অপূর্ণতা বোধ থেকে যেতে চায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্প এবং জীবনের বিশ্লেষণে যে পরাধীন ভারতের নানান্ জটিলতা, স্ববিরোধকে গ্রথিত করা অসম্ভব নয়, এমন আভাস বর্তমান গ্রন্থেই পাওয়া গেল। লেখক যা শেখালেন, তাতেই আমাদের প্রত্যাশা বেড়ে গেল তাঁর কাছে, তাঁর পরবর্তী গবেষকদের কাছে।

রুশতী সেন

---

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ। সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি কলকাতা ১৯৮৯ চল্লিশ টাকা

এবছর বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে
পরিচয়-এর প্রাক্তন সম্পাদক ও বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক
ননী ভৌমিক-কে আমাদের অভিনন্দন